

(বিশ্বভারতী পত্রিকা)

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

দ্বাদশ বর্ষ। আবেণ ১৩৬২ - আশ্বিন ১৩৬৩

বিষয়সূচী



অ.	শ্রীপূর্ণ টি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ছাত্র-ও কর্ম-জীবন	১০৭	১১০
শ্রীঅজিত দত্ত		শ্রীনন্দলাল বসু
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৪৭	বনেন্দ্রনাথ
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়		ভবিষ্যৎ
গদ্যবন্দী	২০৩	শ্রীনরেশ গুহ
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত		জীবনানন্দ বাণ
ইতিহাসে মৃতি	১৪	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী		'কমেবিতৈব'-কাহিনী
দরশিনি	১০৭, ২৪৮	অর্চন কবি বিদ্যাকোষ হস্তি চরিত্র
শ্রীকল্যাণকুমার সরকার		শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্য
প্রবোধচন্দ্র বাগচীর গ্রন্থপত্র	১০৩	কবি বিদ্যাকোষ হস্তি
শ্রীকানাই সামন্ত		শ্রীপ্রিয়ব্রজ সেন
মোহিতলাল মুখোপাধ্যায়	৪২	প্রবোধচন্দ্র বাগচী
আইনগাইন ও রবীন্দ্রনাথ	১০৩	শ্রীবিনয় ঘোষ
শ্রীকালিদাস নাথ		বাংলার নবজাগরণে বিদ্য-মুদ্রা ১৪১, ১২৬, ২৪৮
জিহ্মপরিচয়	১৪১	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
শ্রীকিরিতমোহন সেন		বনেন্দ্রনাথের শিষ্যসংলাপ
বাউল-পরিচয়	১, ১৪১, ২১৮, ১০২	শ্রীবিমলচন্দ্র সিং
শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য		বিদ্যাবিক্রম বাগচী
হোমসাহিত্যের আবিষ্কার	১০৭	চন্দ্রপরিচয়
জিহ্মপরিচয়	১৪১	শ্রীবিদ্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণনাথ গুপ্ত		চন্দ্রপরিচয়
আধুনিক রূপ	৪২	শ্রীবিদ্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		শ্রীকৃষ্ণনাথের শিষ্যসংলাপ
উদ্যম মান	১৪১	শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বরদলি

১১১

১২
১, ১৯৮, ২৪২

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বসু
বিজ্ঞানের বিভাগিকার
নিগিহাদের নির্বাহ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিত্র

নিবন্ধন ও বাণিজ্য টকা
বরদলি

শ্রীসীতা মজুমদার
এমপরিচর

শ্রীশশিভবর্ষ দাশগুপ্ত

বাণিজ্য সাক্ষর

এমপরিচর

শ্রীমতেন্দ্রনাথ বসু
প্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীমুকুন্দর সেন
বরদলি কাহিনী
বিভাগিকার

শ্রীমুকুন্দর সেন
বরদলি

শ্রীমুকুন্দর সেন
বিজ্ঞানের বিভাগিকার

শ্রীমুকুন্দর সেন
এমপরিচর

শ্রীমুকুন্দর সেন
এমপরিচর ও বাণিজ্য
প্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীমুকুন্দর সেন
এমপরিচর

শ্রীমুকুন্দর সেন

কল্যাণীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহাজারীপ্রসাদ ক্রিবেদী
হিন্দী ভাষা

৩১০ রমেশচন্দ্রের চিত্রগ্রন্থাবলী

চিত্রগ্রন্থাবলী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানের বিভাগিকার

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভাগিকার

শ্রীমুকুন্দর সেন

শ্রীমুকুন্দর সেন

কল্যাণীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২

১৯৩

১৯৪

১৯৫

১৯৬

১৯৭

১৯৮

১৯৯

২০০

১৯১

১৯২

১৯৩

প্রতিভা ২ আন্তর্জাতিক

আইনগার্ডাইন ও হুইলার

কল্যাণীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪

১৯৫

১৯৬

১৯৭

১৯৮

১৯৯

২০০

২০১

২০২

২০৩

২০৪

২০৫

১৩.৬.৬৩

‘তোমার কবিতার চেয়ে

তুমি ৭.৩.৬৩

তাই তব জীবনের কথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায়

কবিতারে তোমার

বারম্বার।”

•

হে মৃত্যুঞ্জয় কবি! আমরা তোমার বৈচিত্র্যময় বিরাট
সৃষ্টির কথা স্মরণ করি; আর দেশবাসীর সঙ্গে তোমার
উদ্দেশ্যে নবোদয় করি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি।

৭/১১/৬৬

হাওড়া মোটর স্প্যানী

লিমিটেড



ପ୍ରସାଦିନୀ

କାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଘଟନ ଖଟାଟି

୧୦୭

ଦିନୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସନାମ ସହ



খাওয়া, কান্নাকাতি, অর্থাৎ প্রেমজন্য সজ্ঞকে বহুজন মরণকে সর্বাঙ্গ:বরণে স্বীকার করবই— দুর্লভভাবশত তার থেকে ঐ হতে পাবি কিছু শর্ত। তবে কোরানদিন যেন একথা মনে চিন্তাও না করি যে ঐখ চুলোর নাক বেশকি আমি খড় করে তুলব বেশের ততো চুরি করব, ডাকাতি করব, অস্ত্রায় করব। শৈশবকতা (প্যাটিংইটিভ) আদানের আদ্যকে চরম আশ্রয় দিতে পারবেনা, আমি নহুত্বকে বরণ করে নিয়েছি— আমি হীরের দুল। কাচ কিনব না— শৈশবকতা যে নহুত্বকে লক্ষ্য করবে এত আমি আমার জীবনে ঘটতে দিতে পারবনা— সেই পাখ দু পা বাড়িয়েই বেগুন, পারদুন না— বেশকি ছাড়িয়ে ঘুরি ঐখকে যদি বিখনাবকে না বেধতে পাই, 'যদি বেশের সংসারে আমার ঐখরকে আচ্ছন্ন করে, ততালে আমি আমার অ:দ্যায় বাস্তু হতে বঞ্চিত হই।

এ আবার উপর অদর্শই হয়ে উঠেছেন সেটা কেবল বর্জমান সময়ের উত্তেজনা। বশত। এই
সেই আবার উপর আনেকই বিরক্ত হয়েছেন। এ সময়ই সাম্যকে গ্রহণ করতে হবে। আমি
স্বপ্নের কাছে ধারম্য প্রার্থনা করেছি তাঁকে যেন আমি আমার সমস্ত সম্বর্ষণ করতে পারি তাহলেই আমার
সকল বোকা হাস্যময় হয়ে যাবে— আমার ব্যক্তি যদি তিনি কেড়ে নেন আমি বহি বহু ও মন্ত্র সকলের দ্বারা
অবজ্ঞার সহিত তিরস্কৃত হতে পারি তাহলে আমার বরষই হবে— এখনও আমি অস্ত্রের ন্যূনপেক্ষ করে
যাকি আমার সেই আত্মশ্রের অভাঙ্গ কাটেনি— পূর্ণবৎ একদা। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত বীর্ষন
ভরে উঠবে এমন ওজস্বিন যদি তিনি যেন তাঁকে যদি পষ্ট হয়। আমার প্রতি যদি কেউ বিমুগ্ধ ও বিরক্ত হন
তাহলে তুনি যেন কিছুমাত্র বেদনা বোধ কোরেন— ইশ্বর আমার সমস্ত কতিপূরণ করেন প্রত্যেক ক্ষতিতে
আমি তাঁকেই বেশি করে দরব— আমি তাঁকে কিছুতে ছাড়বনা। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ଅକାହ୍ନାବି

पुनर्विचारार्थ भादप

୧. ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ୧୦୦୦ ମାତ୍ର ଦିଆଯିବ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ।—“ମ
୨ ମାସ” ବର୍ଷ ୧୯୬୧ ଡିସେମ୍ବର, ଡାକ୍ତରୀ ୧୯୬୧ ମାସ; “ମହା”, ଡାକ୍ତରୀ, ବର୍ଷ ୧୯୬୧ ମାସ; “ମହା”, ଡାକ୍ତରୀ, ବର୍ଷ ୧୯୬୧
ଡାକ୍ତରୀ ୧୯୬୧ ମାସ; “ମହା”, ବର୍ଷ ୧୯୬୧ ମାସ। ମହାଶିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର—ମହାଶିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେବ।

[illegible]

বাউল-পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন

বাউল অর্থ পাগল। কেহ কেহ অর্থ করেন বাহালা বাহু সাধন করিয়া। স্বস্থাপথে দেহস্থিত চক্রের পর চক্র ভেদ করে তাহারাই বাহুল বা বাউল। বাউলদের মধ্যে অনেকে চক্রবেধ মানেন বটে, কিন্তু তাহা যে বাহু দ্বারা সাধিত হয় তাহা সকলে মানেন না। অনেকে মনে করে সেই “বেধ ধ্যানবেধ।” দেহতত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ ও জ্ঞানের ও ধ্যানের দ্বারাও বেধের কথা বৃত্তিতে পারা যায়। কাজেই বাউল অর্থ “বাহু দ্বারা চক্রবেধক নওলী” এ কথা মানা গেল না। বাউলের পাগল অর্থ ধর্মাই স্বাভাবিক। ইহা টিক বুঝাইবার মত নরনারির একটি পদ উল্লেখ করা গাইতেছে—

ভাই তো পাগল (বাউল) হৈলু তাই।

এখন গোবের বেঘর কেন-বিভের আর তো দাবিগদা নাই।

নাই হাকম হকম দুদুন বেন রীতি,

নিরানন্দে চলি সনাই (সহস্র) আনন্দভব শ্রীতি।

সদা ক্রোধেতে যোগ, নাই রে বিদোষ, সবার সাথে নারি সই।

এখন বাউল আর পাগল একযোগে ধরা হইয়াছে। এবং বাউল হইলে তার আর বাহু দাবিগদা রহিল না, তখন সে আনন্দভব ও শ্রীতিতে সকলের সঙ্গে প্রেমে মূক্ত হইয়া নাতিবে গাহিবে, বাহিরের লোকের বা শাস্ত্রের অর্থহীন হইবার জ্বল আর তার উপর চলিবে না।

দাবি তো কেবল বাহিরের শাস্ত্রের বা সনাজের নয়, নিজের ইচ্ছা কচি-অকচি, ইন্দ্রিয় ও কান্নের দাবিরও অস্ত নাই। ভাই সনাজের এই-সকলের জ্বল ও দাবিগদা মিটাইবার মত ইহাদের মধ্যে নিদম আছে জীবন থাকিতেই একবার মরিয়া গাইতে হইবে। মরিলে দাবিগদা সব জ্বাইয়া যায়। সনাজও তখন বাধা হইয়া নিষ্কৃতি দেয়। জীবন্তে মরার এই পন্থিক মুদগদান তাবের বাউলরা বলেন “কাবা”। এই শব্দ ও এই পন্থিক সুফদের মধ্যেও খুব চলিত। স্বর্বার নানক প্রভৃতির মধ্যেও “বাউর” পাগল অর্থে আছে এবং “কোতে হি বর জানা” (জীবন থাকিতে মরিয়া যাওয়া) তবটিও বহু স্থানে আছে।

এই বিষয়ে বিখ্যাত হুফী বোলা রুকী হিজাঘত-ই-হুতী নামে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে। পারস্যের এক বণিকের একটি প্রিয় ভোতাপাখি ছিল। পাখিটি ছিল ভারতের। বড় মধুর তার বুলি। বণিক-অন্ধকার ভারতে আসিতেছেন বাণিজ্য করিতে। জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি উপহার চাই। ভোতাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, ভারতে আমার মূক্ত ভাইদের জিজ্ঞাসা করিও আমি কিংল মুক্তি পাই। ভারতে আসিয়া বণিক বনচারী ভোতাকে জিজ্ঞাসা করিতেই ভোতাটি নাটক পড়িয়া মরিয়া গেল। বণিক অগ্রস্ত হইয়া যেনে কিরিয়া তাহার ভোতার কাছে বাধা হইয়া সেই কথাই ঘন সে বলিল তখনই তার প্রিয় ভোতাপাখিও বাঁচার মরিয়া গেল। পাখিটি কেত্রিয়া দিলে তখন সে আবার উড়িয়া গাছে বসিয়া করিল, এই উপদেশই আমাকে বনচারী ভোতা দিয়া গিয়াছে। জীবন্তে না মরিলে আর মুক্তি নাই। এখন আমার

যারা কেহ কোনো কাজ পাইবার আশা রাখিবে না। তখনই আনাকে মুক্তি দিবে। এই উপাখ্যানটির বহু অস্থান আছে। নিকলসনের ইংরাজী অস্থানে সহজেই মিলিতে পারে।

✓আবার যখন দাবি না থাকিলেও আপনাকে লুটাইয়া দেওয়া যায় তখনই তো প্রেম। দত্তকণ দাবি আছে, প্রয়োজনের বাধন আছে, দত্তকণ মুক্তি কই? মুক্তি না হইলে প্রেম অদৃশ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্তকে লইয়াই প্রেমের কার্যবার। তাহাই অর্থবোধে “উচ্ছিন্ন” (অর্থ ১১-২)। জীবনে মরিতে পারিলে যখন সব দাবি এড়ানো যায় তখন সবই “উচ্ছিন্ন” বা অতিরিক্ত; তখন সর্বত্রই মুক্তি ও প্রেমের অবকাশ।

বাউল-ভাবের ভাবুক গৃহী ও বৈরাগী দুই শ্রেণীই আছে। ইহার ভাতি পংক্তি, তীর্থ সেবতা মন্দির কিছুই নানেন না। বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোনো কোনো উৎসবস্থলে একত্র হইলেও ইহার কোনো সেবানিষেধ প্রবেশ করেন না। বলেন “ঠাকোর-ঠোকোর মোদের নাই।” ইহার নিষেধের যে সাধন-ধর আছে তাহাতে কখনো সেবদৃতি প্রকৃতি থাকে না। কোথাও কোথাও গুরু বা প্রাচীন সাধকদের আসন ধর করিয়া সাজাইয়া রাখিলেও সভ্যকার বাউলদের মধ্যে তাহা পূজ্য। করিবার রীতি নাই।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর খুব নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে হইতে এক-আধজন ভাবের ভাবুক লোক আসিয়া এই বাউলদের মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাই গৃহী ও বৈষ্ণব এই উভয় শ্রেণীর কাছে ইহার নিমিত্ত ও অবজ্ঞাত। নিম্ন ভাতিতে থাকিতেও কোনো মন্দিরে ইহার প্রবেশ-অধিকার থাকে না, তাই বাউল হইয়াও ইহার কখনো কোনো মন্দিরে প্রবেশ করেন না। গাছুর এই মানবসংগ্রেহই মধ্যে। বাহিরের ঠাকোর-ঠোকোর দর্শন করিতে যাওয়া ইহার অতিশয় অবজ্ঞার সহিত দেখেন। নিষেধের মানবব্দের গৌরব (dignity) ইহার এইভাবে লুপ্ত হইয়া যায়।

ইহার বলেন : মন্দিরে আর ঘাইব কেন? এই মানবসংগ্রেহী তো মন্দির। ইহার মধ্যে সেই পরমসেবতা পরমপূজ্য বিদ্যমান। মানবের রচিত ক্ষুদ্র ঠাকোর-ঠোকোরের স্থান এ মন্দিরে নাই। যে সেহ সবার নিমিত্ত ও লাহিত সেই সেহকেই তাঁরা সেবনশ্রি বলিয়া অশ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, আর সেবতাকেও মনের দাহন বলিয়া আপনার জন করিয়া লইয়াছেন।

নানা সম্ভাব্যের নানা ভাবে কেশ ও শব্দ রাখিবার ও কামাইবার বিধি; ইহাতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়। পাছে কাহারও সঙ্গে “ভেদ-বিভেদ” হয় তাই বাউলগণ সর্বকেশশব্দ রক্ষা করেন। বলেন, এই ভাবেও আনন্দা সহজ হইয়া থাকি, কোনো বিশেষ দলে ধরা দিই না। শিখদের সর্বকেশ রক্ষাও ইহার সহিত তুলনীয়।

✓ইহার কখনো নিজেই অনাকৃত বা নয় রাখাটা ধর্মের সাধনা বলিয়া মনে করেন না। বাউলদের মত, সর্বসেহ সারাপিধা আচ্ছাদনে পরিহিত রাখিবে। যদি নৃতন বস্ত্র না ছোটে তবে নানা স্থান হইতে ছিঁচা-খোঁচা বস্ত্র লগ্ন করিয়া যৌত পবিত্র করিয়া নিজের সেলাই করিয়া আলখালা বৈদ্যার করিবে। সেহগত স্নানতা সর্বত্র রক্ষা করিবে। কাছেই ইহার দিগন্ত বা ক্ষণিক শ্রেণীর মত নহেন। এ বিষয়ে ইহার অনেক পরিমাণে বৌদ্ধদের মত।

✓কবীর, নানক, রবীন্দ্র, দাদু, রামদাস প্রভৃতিও এই সেহকেই সেবতার মন্দির বলিয়াছেন। এই সেহেই বিশ্বদয়ের অধিষ্ঠানমূর্তি। এই “মানবসংগ্রেহী” বিশ্বনাথ ও বিশ্বমন্দিরকে প্রত্যক্ষ করিয়া কবীর বলিয়াছেন—

ইন্টু মতের বাবলীতে ইলী বেঁ নিলেন হারা।

ইন্টু মতের সাত সন্তানের ইলী বেঁ বোঁল তারা। কবীর ১-১১১

এই সেহের মধ্যেই কুরকানন, ইংহাতেই স্বজনকর্তা বিদ্যাকানন। ইহার মধ্যেই সন্ত সন্ত ও নব লক্ষ তারা।

রা ঘট হীতর কানী হারকা চাই বেঁ ঠাহুর হারা। কবীর ১-১১২

এই ঘটের মধ্যেই কানী হারকা, ইহার মধ্যেই ঠাহুরের মন্দির। এই ঘটের মধ্যেই সর্ব জ্ঞান ও সর্ব শাস্ত্র।

শাস্ত্রের কথা বলিতে দাদু বলিয়াছেন—

কাদা হনারী কিতাব কহিয়ে দিখি যাবই হিম্যান।

এই কারাই আমার কোরাণ শাস্ত্র। ইংহাতেই দয়ারদণ্ড তাঁর বাণী লিখি রাখেন।

রজব বলিয়াছেন—

শাবন হারকী মতের কপের আগ মফর নারি।

চহ পুস্তক কোট বিলা ধীচে সর্ব লক্ষ ন হবা হি।

শাবনের মন্তরই কাগজ, তাহাতে প্রাণের অক্ষরে প্রকটিত শাস্ত্র। এই পুস্তক কচিই কেহ পড়ে, মননের ধনি তনিদাও তনে না।

এই বাউলদের সার কথা হইল যোগ। তাগ নয়। জগতের কাহাকেও বা কিছুই তাগ করা সাধনা নয়। সাধনা হইল সবার সঙ্গে ও সব-কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। প্রত্যেক মানবজীবনই সেবমন্দির। জীবনের প্রতীপটি জলিয়া উঠে নাই বলিয়া মন্দিরকে আমরা মন্দির বলিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। সাধনায় দৃষ্টান্তে সকল মানবের সেই মন্দির দেখিয়া সর্বত্র স্রষ্টার প্রণত ও সর্বত্র স্রীতিতে যুক্ত হইতে হইবে। কাহাকেও কোনো দত্তা বা জ্ঞান দিতে হইলে অবজ্ঞার ও অপ্রেমের সহিত নিবে না; কারও, বিনা প্রেমে কোনো দত্তা ও দীবাগ্ন তব সেওয়া বা নেওয়া যায় না। প্রতি জীবনেই চিরময় পরমাত্মার প্রদীপ দীপ্যমান। দেখিতে জানে না বলিয়া অন্ধকার মনে হয়। স্রষ্টা ও প্রেমের দৃষ্টান্তে দেখিতে জানিলে সে বাধা মপগত হয়। এই কথাই কবীরও বলিয়াছেন—

ঘর ঘর দীপক ঘরে সবে নহিঁ অংগ হৈ।

সমস্ত সমস্ত লখি পরে কইট লব কল হৈ। কবীর ২-১০

ঘরে ঘরে দীপক জলিতেছে, অন্ধ ভূমি দেখিতে পাও না। দেখিতে দেখিতে যেই একদিন দেখিবা কেলিরে অযনি বরের পাশ যুক্ত হইয়া গাইবে।

কবীর আরও বলেন—

জোশী পড়ে বিলোম কই ঘর ঘর হৈ। কবীর ২-১১

বিযুক্ত হইয়া আছেন বলিয়াই যোগী বলেন সেই ঘাম বহু দূরে। সাধনার দৃষ্টী হইলেই দেখা গাইবে সকল ঘটে তিনি বিয়াকানন। তাই সর্বত্র যুক্ত হইতে হইবে।

বাউলদের যতাবতের সঙ্গে উত্তরপন্থিক, রাজপন্থানা, পজাব, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগের সাধকদের অনেক মিল আছে। তবে বাউলদের পন্থিকের ঐশ্বর সাধকদের মত নিজেদের সম্প্রদায়কে একটা বিশেষ মঠ বা church করিয়া গড়িয়া তোলেন নাই। কবীর প্রভৃতিরও ইচ্ছা ছিল যাহাতে মঠ

সম্ভাষণ গড়ি না উঠে। তবু তাহা ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে বাউলদের তাহা খটিতে সেন নাই। কয়েকই বাংলার বাউলদের এমন একটা বিশেষ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা আছে বাহা বুঝানো কঠিন। আর বাংলার বাউলদের বিষয়ই প্রধান আলোচ্য। প্রশংসাক্রমে অত্র প্রদেশের ভক্তদের বাণী এক-আধটুকু বলিতে হইতে পারে।

বাংলার বাউল

বাংলা দেশের নব্বের কথা প্রকাশ পাইয়াছে পল্লীর বাউলদের গানে। শিক্ষার বা বংশ-অভিজ্ঞাত্যের কোনো গোরবের দাবি ইহাদের নাই; অথচ অসাধারণ ইহাদের চিন্তার সাহস ও প্রকাশের অসুৰ্ব। সমাজের নিম্নতম জাতির লোকদের মধ্যে এই যে আধ্যাত্মিক নির্ভীকতা আমরা দেখিতে পাই তাহা উচ্চতর শ্রেণীদের মধ্যেও দুর্লভ। এই বিষয়ে দৃষ্টিদের মধ্যে একটি চমৎকার গল্প আছে। রাজার ছেলে ও চাষার ছেলে পড়েন এক পাঠশালা। পাঠ শাক করিয়া দুজনে ঘরে যান। দুজনেরই বাপ যাত্রা গেলে বহুকাল পরে আবার দুজনের এক তীর্থে দেখা। রাজার ছেলে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বাপের কবর কিসের?" চাষার ছেলে বলেন, "হাটি। তার উপরে একটি গোলাপ গাছ।" রাজার ছেলে গর্বে বলেন, "আমার বাপের কবর ত্রিশ হাজার শিলা-শিল্পী হুড়ি বছর ধরিয়া গড়িয়াছেন।" চাষার ছেলে বলেন, "টের পাইবেন তোমার বাপ বিচারের দিনে। ভগবানের ডাক আসিলে তাহাকে একটা এই দাম্প বাধা ভাঙিয়া বাহির হইতে হইবে।" ভগবানের ডাক আসিলে বাহ্যিক অভিজ্ঞতা তাহার জাতি কুল মান বিভ্রাৎ সম্পদ ইত্যাদির ভারে সে ডাক শুনিতে পান নাই। সহস্র অধিকনেরা সে ডাক অন্যায়ে শোনেন। তাই বৃদ্ধ তাঁর সিংহাসন, মহাপ্রভু তাঁর বিচার ভার সরাইয়া সেন। মহাপ্রভু তো স্পষ্টই বলেন, "আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নই, ত্যাগী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ নই, আমি শুধু প্রেমপথে পথিকদের দাস দাসহান্নাস।"

নাহ: কিংরা ন চ বরশক্তির্নাশি যোগো ন পুত্ৰ:

নাহ: স্বামী ন চ গুণশক্তির্নাশি কন্যো বর্তিণী।

বর্তমান কালের প্রভাবে এইরূপ ভারবৃত্ত সহস্র সরল নির্ভীক শ্রেণী এখন দিনে দিনে লোপ পাইতে বসিয়াছে, অথবা নিজের বিশেষ স্বাধীনতা এখন কোনোভাবে ইহার অস্তিত্বটুকুই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রাচীন কালের বাউলদের গানের মত গান আর এখন বড় একটা রচিত হয় না। সে সাহস সে বীর ইহারা ক্রমেই হারা হইতে বসিয়াছেন, চারিদিকের আবহাওয়াও এখন অস্বস্তিকর নহে। তবু এখনো যাহা যাহা যে সমুখ সাধক না দেখা যায় তাহা নহে।

তবে ধর্মার্থ বাউল দিনে দিনেই কমিয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন পরে ইহাদের দেখা পাওয়া অসম্ভব হইবে। অথচ ইহাদের লড়া পরিচয় এখন পর্যন্ত লিখিত ভাবে কিছুই রাখা হয় নাই।

আমাদের অন্তিমর সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ নিম্ন জীবনে ইহাদের কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি ধর্মোপে এই পল্লীসাধকদের বিষয় বহুতর বসিয়াছেন, তাহাতে কুহুংলী চিত্ত তাঁহাদের লক্ষ্যে আসে। কিছু আনিবার অত্র ব্যাঘ হইয়া গুটে। বাউলদের রচনায় প্রতি চিরদিনই তাহার গভীর স্রষ্টা ও অধরাণ ছিল। এই হুণে তাহার অর্পণ। বাউল-সঙ্গের মর্মজ ও বাউল-সাহিত্যের অহরহী কাহাকেও দেখিয়াছি বসিয়া মনে হয় না।

সহজ ভাব সহজীয় কে-কহখানা। পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে সাক্ষ্য বাউল ভাবের পরিচয় মেলে না। আসল বাউলরা তো পুঁথির ধারই ধারেন না। বাঁহারা অথবা বৈষ্ণব অথবা বাউল, কি অথবা তাত্ত্বিক অথবা বাউল, তাঁহারা ই নিজেদের পরিচয় খানিকটা বৈষ্ণব বা তাত্ত্বিকভাবে, compromise এর মত, দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বার্থ বাউলের সে নির্ভীক শক্তি বা ব্রহ্মচার গভীরতা এরা বাউলদের নাই। সহজ নামে তাঁহারা যে সত্য ইঞ্জির-উপভোগের পথ খুঁজিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না। চর্চাচর্চাবিনিস্তর প্রকৃতি এবং তাত্ত্বিক ভাবের এরা বাউলের শ্রেণীর সন্ধ্যা।

আসল বাউলরা কোনো রকমের শাস্ত্র পুঁথি বা লেখার ধার ধারেন না। তাঁহারা বলেন, “ও-সব তো সন্ধ্যা। অহুযোগের জীবনে সন্ধ্যা বিধা কি কাজ হইবে? ও-সব হইল বিহীনদের ‘গাঠ’। ও-সব আমরা মানি না। বিহয়ের হাটের ও-সব বোঝা প্রেমের দ্বায়ে অচল।”

মানুষের জীবনে যে নিত্য নব নব ভাবের সমাজী লীলা চলিয়াছে তাহাতেই তাঁহাদের আস্থা। অনির্বচনীয় এই লীলার প্রকাশ ভাষাতে করা যায় না। এই অপূরণ লীলা ধরা যায় কতকটা গানে। যুগে ও দুশ্বে ভাষায় যে অনির্বচনীয়তার আভাস দেখা যায় তাহাতেই এই লীলা কতকটা ধরা পড়ে। এট গান শুধু হইতে শিল্পরূপে ইহারা শিক্ষা করেন। শক্তি থাকিলে ও সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিলে নূতন গানও কেহ কেহ রচনা করেন কিন্তু পুঁথিতে তাহা সন্ধ্যা করেন না।

ইহাদের কাছে কোনো প্রহ্ন করিলে ইহারা সেই-সব গান গাহিয়াই উত্তর দেন। সাধারণ কথাই উত্তর দিতে ইহারা বড় চাহেন না। কারণ দ্বিভাষা করিলে বলেন, “আমরা পক্ষী জাতি, পায়ে ছাট্টা। চলিতে মানি না, আমরা পাখায় উড়ি।”

অবরা শবির দ্যত

বেটে চলার জাও মানি না, উড়ে চলার ব্যত।

শাস্ত্র বা সাম্প্রদায়িক কোনো পদ্ধতির ইহারা ধার ধারেন না। ভাব প্রকাশের শক্তি ইহাদের অপাঙ্গন, এবং ভাব ব্যক্ত করিতেও ইহাদের বিদ্যুৎমাত্র ভয়ভর নাই।

দক্ষিণ বিক্রমপুর-নিবাসী ছহু ঠাকুর নামে একজন অসীতিপর ব্রাহ্মণ কালিতে শেষ ভাবন ঘাপন করেন। ইনি নমঃশূদ্রভাতীয় গকারাম নামে একজন বাউলের শিল্প বলিয়া ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে তাঁহার কোনো স্থান ছিল না। কালিতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ বাইতে নিবরণ করিলে তিনি তাহা প্রদণ করিতেন না। বলিতেন, “আনি তো ব্রাহ্মণ নই। আমি মাহুঘ। মাহুঘ বলিয়া যদি নিমন্ত্রণ কর তবে বাইতে পারি।” কালিধান-স্থলত আচারবিচার তিনি মানিতেন না। অথচ তাঁহার মত প্রেমরসিক লোক জীবনে কখনই দেখিয়াছি। তাঁরোঁর নানাবিধ নোঃসায়িতে কখনো তাঁহাকে মলিন দেখি নাই। তিনি নির্ভরে তাঁহার ভাব বাউলের গানে ব্যক্ত করিতেন।

একবার একজন তাঁহাকে বলেন, “লোকের মধ্যে যে আপনাদের নিমার লীলা নাই। আপনি বাক্য-তাকে ও-সব কথা না বলিলেই হয়।” তাহাতে ছহু ঠাকুর গাহিলেন—

হুহু' রে হুহু হুহু হার মন বা লর গো।

আপন (সাক্ষ্য) পুঁথির পথিক আমি কার বা করি জ্ঞান গো।

আমের বীচে হয়ই যে আন, জানের বীচে হয়ই যে আন।

‘আমি’র বীচে আনল ‘আমি’ হল ওক হল হল সে। ইত্যাদি

ব্যক্তিকে তাহার সভা সম্মেলনের দিকে অগ্রসর করাই সভা সাধন। বাউলদের সাধনায় সেই সার কথা তিনি তখনই গানের মধ্য দিয়া উনাইয়া নিলেন।

বাউলরা অহুয়াগকেই প্রধান বস্তু বলিয়া মানেন। একবার এক বৈষ্ণবভাবাপন্ন লোক এক বৃদ্ধ সাধক বাউলকে বলেন, “বৈষ্ণবদের মধ্যে যে অহুয়াগের নানা শ্রেণীভেদ আছে সে-সব আপনি দেখিগাছেন?” বাউল বলিলেন, “আমি মূর্খ নিরক্ষর বাছুর, শাস্ত্রের বা জ্ঞানের কি কোনো ধোঁয়া আমার রাগি বাবা?” সেই লোকটি বলিলেন, “আমি আপনাকে তবে সে-সব শাস্ত্র পড়িয়া উনাইব।” তার পর বৈষ্ণবদের প্রেমরসের অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে অহুয়াগের নানা প্রকারভেদ ও নানা লক্ষণ বিশদভাবে সেই প্রেমিক বৃদ্ধ বাউলকে পড়িয়া উনাইলেন। বাউলটি কোনোমতে দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন তাহার কাছে সেই লোকটি সেই বিষয়ে জাহার মতামত জানিতে চাহিলেন তখন তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

হৃদের কল কে চুককরে যে সোনার জুহী,

নিষ্কবে যবর কমল আ নরি মরি।

অর্থাৎ, অহুয়াগের কৃষ্ণমবনে এই-সব বিবরীজন-হুলচ সুবিকারের পরীক্ষা চলিবে না।

ইহারা নিজেদের কোনো ইতিহাস রাখেনও না এবং তাহার জন্ত ইহাদের কোনো বাধাবাধাও নাই।

বিক্রমপুরে এক নদীতীরে এক খালের মুখে একবার এক বাউলের কাছে বলিয়া আছি, রিজালা করিলাম, “বাবা, তোমরা তোমানের কোনো ইতিহাস বা চিহ্ন রাখিয়া যাও না কেন?” বাউল বলিলেন, “আমরা সহজ কিনা, তাই কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাই না।”

পালে ডাঁটা, তখন জল নাই। কচিং দুই-একটি ডিঙিনোকার মাঝি গরুর দ্বারা কাটার মধ্যেও নৌকা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলিয়াছে। বাউল বলিলেন, “ঐ যে নদীতে সহজ জলে সব ডিঙি পাল ভুলিয়া চলিয়াছে, উগার কি কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায়? উহার যে সহজ পথের পথিক। ঐ কৃত্রিম কাটা-পথের মাঝি যে কাষে নাও ঠেলিগা ঠেলিগা নিম্ন চিহ্ন রাখিয়া বাইতেছে, সহজ পথের মর্ষ ও কি জানিবে?”

[ক্রমশঃ]



अवस्था : काली-कुलिर हवि

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

রাজশেখর বসু

(অনেক বংসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রতৃষ্টি করে চোঁট কানড়ে হাতে ইট নিয়ে মৃণালুপি দাঁড়িয়ে আছে। বহু দশ-এগারো, সম্পর্কে নাসভুতো ভাই। এরা প্রাচণ্ড কগড়া করেছে, এমন পরম্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুঁড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, ভবু হারতে প্রবৃত্ত আছে। এসের মাঝেই দূর থেকে সেবে ভয়ে চোঁটয়ে উঠলেন। চুতনেই আবার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, স্তবরাং এসের নিরস্ত করতে আনাকে বেগ পেতে হয় নি।

হাফিন আর সোভিএট মুক্তরাষ্ট্রের কর্তাসের বর্তমান অবস্থা প্রায় এই রকম, কিন্তু ঐসের নাম! দেই।) এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণু-বোমা উদ্ভূত করে পরম্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি হত হতে আছে। রকার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বংসরের মধ্যে দুই মহাদুষ্ক হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবী-বাণী আতক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবুদ্ধি। ঐসের বুদ্ধি এই রকম।—

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পূর্বে বুদ্ধ এত ভাবহ ছিল না। প্রথম মহাদুষ্ক আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল সেভর বোমা-বর্ণণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ক্রাফ-প্রশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোম্বর আর রুশ-রাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাসের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশি হয় নি। মেশিন-গন, মুরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরীন, বোমা-বর্ষা বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের কলে মাহুষের মানসিক শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অজ্ঞাত উৎকট মারাত্মক উপায় প্রবৃত্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্বহ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা ডেজক্রিম পদার্থ বা ডিক্সিথকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সনত লোক মড়বুতি হয়ে ভেড়ার পালের নতুন আয়তনপর্ণ করবে। মোট কথা, মাহুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু প্রেয়দ্বর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃপ্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অহঃপ্রকৃতিকে সংবৃত্ত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন ডলোদার, শিতর হাতে যেমন জলন্ত হশপ্তা, অদ্বৈতশী অপরিতত্ত্বি মাহুষের হাতে বিজ্ঞানও ডেমনি উৎকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক— বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই হত অনিষ্টের মূল। কল্পসোকে ধাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মাহুকত বিশেষবাসীর সঙ্গে মূবৌম্বি আলাপ, রেপমের চাইতে বহুবৃত্ত কাচের হুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্ত আনরা দশ-বিশ বংসর সত্ত্ব করতে রাজী আছি। মাহুষের ধর্মবুদ্ধি হাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হুক।

এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন — সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মাহুষের লংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে বে সব বুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টী ইয়ার্স ওমর, ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টান্টসের ধর্মবুদ্ধ, তুর্ক কত্ক তারত আবিষ্কার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুডেচ ও

স্বেচ্ছা, স্ফূট অশোক আর অলোকসংসারের সিংহবিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অল্পপাতে যে লোকসংখ্য হত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন — বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। বায়োসংযামন বেড়েছে, চিকিৎসা কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমাণু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা যোগ্য মুর্থতা।

উক্ত বাম-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে রাখা — বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সাদেশ বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিজ্ঞা বোঝায়। দুই বিজ্ঞাই পৃথক্‌পৃথক্‌ আর পরীক্ষার ফলে লভ, কিন্তু একটি নিষ্কাশ, অপরটি সন্ধান অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদির অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে — মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিশ্বের ভ্রমি বিশ্বের। ধারা বিশ্বের বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই অগণ্য বৈশি। ধারা বিশ্বের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসম্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিশ্বের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা ধারা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তপস্বী হন, এঁরা নিষ্কাশ শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক দল নিম্নের বা পরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এঁরা সন্ধান কলিতবিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ ভবুই নিষ্কাশ বিজ্ঞা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছোৱাত্তর বৎসর অন্তর দেখা পায়, নবল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ ক্রমশঃ ফেঁপে উঠছে — এই সব জেনে আশ্বাসের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অস্ত লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তস্ত আপাততঃ নেই। সেজন্য আর খেঁচু একই বর্গের পাছ, চামড়িকার মেয়ে রাজারের নতুন ঘর আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে — ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুষক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উঠবে আর এক প্রান্ত নিক্ষেপে আকৃষ্ট হয় — এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞান মাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লাগেগেছে। তপ্ত বা শিথল করণে বাস জ্বালায় হয় — এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

তাল মন্ড নানা রকম, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্বেষণে বা সন্ধান করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্তু জনকতক কুতূহলী আছেন ধারা কার্য আর কার্যের সম্বন্ধ তাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদির মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে, আগুনের উপর জল কপালে ক্রমশঃ গরম হতে থাকে, তার পর কোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন — জ্বাট যতই বাড়ানো হক, তুষ্টতে আরম্ভ করলে জলের উত্তাপ আর বাড়বে না। আশ্বাসের দেশের অনেক পাচক পাচিকা এই তথ্য জানে না, জানিলে ইচ্ছারের ধরত হয়তো একটু কমত।

কাজ্ঞান (common sense), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান — এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। মূল দৃষ্টি সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্ববেশ্য অস্থান ইত্যাদির দ্বারা লঙ্ঘিত, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাধারণে অজ্ঞিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা স্বাভাবিক নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপর্যায়ণও যুব হয়। চিরাগত তিরিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমন কি পেলার নিম্নও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরত-বিজ্ঞানও পেনি যায়।

ধর্ম নিরাক্ষর মিজাহ, লাভালাভের চিন্তা ধর্মের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধবিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন ধর্ম ফলকানী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অতীত সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ক্যাভেন্ডিশ, কুরী-নশ্ভি ও ক্রাফ্ট, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অল্প লোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এতিন টেলিকোন কোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, গালভার্সন ট্রেন্সমিটার প্রভৃতি যন্ত্রের, এবং কনক ক্যাম ট্রান্সমিটার আর অ্যান্টেন-হাইড্রোজেন বোমা! প্রভৃতি যন্ত্রগুলোর উদ্ভাবকগণ ফলভাজের স্বত্বই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এদের কাছে বিজ্ঞান মূল্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন নকদমা ক্ষেত্রে উপায়। নব নব তথ্যের আবিষ্কার এবং তথ্যের প্রয়োগ — এই দুই বিভাগই বিজ্ঞান, কিন্তু বিভাগ দুই অপর্যায়ণ হয় তবেই তা ভয়ঙ্কর।

ইউর গ্রীষ্মে যৌক্তিক জ্ঞান আছে তার গ্রীষ্ম সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ মৃত জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রকৃতি অস্থানে বিভার সুপ্রয়োগ বা সুপ্রয়োগ করে। দুই লোকে দলিল দ্বারা করে, অনিষ্টকর গুণের প্রচার করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে লোপপড়া নিষিদ্ধ করিতে কেউ বলে না। চোরের ক্ষত সিঁদকাটি আর গুণ্ডার ক্ষত ছোরা তৈরি হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাষ আর ঔষধ তৈরি স্থগিত থাকুক।

যুক্তিবিদ্যে নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অভ্যন্তর অপর্যায়ণ করেছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক — এই আবেদন করা যুগ। হুচুস্তের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্রে এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুক্তিবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্রে সর্বপ্রকার উৎকট নাগণ্যের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশার পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাষ্ট্রে এবং পরমাণু-বোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস দ্বন্দ্ব আছে — টি-এন-টি আর কলকল বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দহীন ট্রান্সমিটার, ইত্যাদি। যখন কার্জন বনুক ছিল না তখনও মানুষ ধর্মবাহী জলোচ্ছ্বাস বর্ষা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। হোক বিজ্ঞানের মধ্য, নাহবেয় স্বভাবেরই দোষ।

অশ্রাব্যকালে শত্রুশাসি রামকে মীতা বলেছিলেন — কর্ণকনু। যুক্তিগতভাবে শত্রুসেবনাং — শত্রুর সংসর্গে বুদ্ধি কর্ণ ও কলুসিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম নারায়ণ যদি হাতে থাকে তবে শত্রুশাসী রাষ্ট্রের পক্ষে সাহায্য অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনগণ যদি প্রবল হয় তবে অতি পদাঙ্কান্ত রাষ্ট্রকেও অশ্রাব্য-বরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিশ্ব-প্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

হয় নি, আরোহন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার ক্ষত দুই পক্ষই সংঘত হয়েছিল। পরমাণু-বোমার বিকসেপে যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভা মানবসমাজের থিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়ারকেও সংঘত হতে হবে। আশার কথা, ষাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শাস্তিকামীয়াও ঘোষণা করছেন যে পরমাণু-বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রাণ হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যদি পরমাণু-বোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার ফলস্বরূপ এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের সঙ্গে প্রকট হবে।

ক্রীতদাসপ্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপন্থি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রকৃত ক্রমশ নিম্নিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অত্যাচারের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাফকের অবাধ বাণিজ্য, কলসম্রাট, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রদ্রোহের সবচেয়ে চোঁটায় বহু পরিশ্রমে নিবারণিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির যথেষ্ট প্রয়োগও নিবারণিত হতে পারবে। এ. জি. ওয়েলস্, ওয়েগেল উইল্কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বহুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো হুঁচকো নিবারণিত হবে।

এক কালে পাকাত্তা মনীষীদের আদর্শ ছিল — 'সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা'। আত্মকাল গোনা যায় — মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে বেতে হবে তাইই মানবজীবন সার্থক হবে। পাকাত্তা অর্থনীতি বলে — আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও উপার্জন কর; কামনার ভাঙনায় খেটে যাও, আর বাড়ানো, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, জীবনযাত্রা উন্নত থেকে উন্নততর হবে। এই পরম পূর্বস্বার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাকাত্তা পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্বেগই হচ্ছে মানুষের বাচ্ছন্দ্য আর ভোগস্বপ্নের বৃদ্ধি।

ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে — যি চালালে যেনন আশুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শাস্ত্র হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাকাত্তা সমস্ত দেশে বিশাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, ভার্যই পরিণাম স্বরূপ অস্ত্র দেশেও লোভ দাঁবা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংঘত না করলে মানুষের স্বকল নেই এই সভা পাকাত্তা পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি।

গরিব দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়তে হবে। সকলের জন্য যথোচিত শাস্ত্র বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রায় চিকিৎসাবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যিক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানীর সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাছলী আর বিশাসপানগ্রীষ বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে বহু বার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেদের খাপ খাওয়াতে পেয়েছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধি ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার ক্ষতিও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর

ক্রেটা হচ্ছে তার কলেও সমস্ত দেখা দিচ্ছে। যদি ছুঁতক শিউড়তা এবং ব্যালোরিয়া বস্তা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারণিত হয়, প্রজাতি স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে ঘণ্টে জনসংখ্যা না হয় তবে জনসংখ্যা তীব্রভাবে বাড়ে, প্রজাতির অভাব যেটানো অসম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের কালে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের চতুর্বিধ বা পুরুষার্থ ছিল — ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি বিষয়ের সাধনা প্রেমের বিবেচিত হত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পুরুষ পুরুষার্থ তাতে গণ্য নেই। বিজ্ঞানের অবলম্বন কালে ভারতবাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সংসারে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক — কোনও নবাবিস্কৃত স্বল্প প্রয়োজনের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি হকম পাড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেটলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অন্তর্গত বিজ্ঞান। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে, অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণু-বংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটনাশক দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারে এমন বন্যকবচও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহুসংখ্য জাপানী সৈন্যেরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে এ কথা বার্কিন বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন নি। বোট কথা, বিজ্ঞানের স্বপ্রয়োগে যেমন মনুষ্য হয় তেমনি নিরুদ্ভূত প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে মনুষ্যের পরিবর্তে অস্বাভাবিক ফলও দেখা দিতে পারে।

ইতিহাসের মুক্তি

শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত

নাহুয বাহুবের কথা তনতে ভালোবাসে ; প্রাচীন বাহুবের কাহিনী, সমকালীন বাহুবের সংবাদ । আধুনিক সভ্য জগতে এই দ্বিতীয় চাহিদার ঘোষান দেয় খবরের কাগজ । প্রথম আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের ক্ষত অনেক পূর্ব থেকেই বাহুব রচনা করেছে ইতিহাস । কোনো ঐতিহাসিক নিষ্কর স্বীকার করতে রাজি হবেন না যে তাঁদের ইতিহাস-রচনা খবরের কাগজ প্রকাশের সম্বন্ধী । ইতিহাস গড়ার মালমসলা, প্রয়তাবিক ও সম্ভব অসম্ভব নানা মূল থেকে বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ কি খবরের কাগজের ক্ষত বন্ধ পথে ও সৃষ্টি কৌশলে স্বাঃবাদিকের সংবাদ-সংগ্রহের সদুপায় ? সংগৃহীত সংবাদের সত্যাসত্য ও লঘুগুরু ঘাটাই করে সম্পাদকীয় সন্দর্ভ যে তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে, সংগৃহীত উপকরণের তীক্ষ্ণ বিবেচনা ও নির্মম বিচারে খাটি সত্য নির্ণয় করে ঐতিহাসিক সে ব্যাপারের যে বিবরণ বেন ও তার মর্মগত ঐতিহাসিক ভাবের বিচার করেন, সে কি ঐ খবরের কাগজের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের সনগোদ্রীয় ? নিম্ন কর্মের গুরুত্ব অবহিত কোনো আত্মপন্থানী ঐতিহাসিক এমন কথা ভাবতে পারেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে তিনি অতীত ঘটনার সাংবাদিক ! যদিচ মনে পড়ছে, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড ফউলার তাঁর রোমের চিঠি ইতিহাসে, প্রাচীন রোমান সেনেটের যে বিবরণ পড়িয়েছেন অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষায় সংগ্রহ করেছেন, তার কিছু পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, এসব পাণ্ডিত্য বিশ্বস্তির অতলে ভোবাতে তিনি রাজি আছেন যদি ঐ রোমান সেনেটের একদিনকার অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন, অর্থাৎ যদি একদিনের অধিবেশনের রিপোর্টার হতে পারতেন ।

খবরের কাগজের সঙ্গে ইতিহাসের নাম একসঙ্গে উচ্চারণে ঐতিহাসিকের বিরক্তির কারণ তার চোটা ও সৃষ্টিকে খেলা করে দেখাতে । যে বিচারবুদ্ধি ও মননশক্তি, সভ্যসঙ্ঘটি ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ইতিহাস রচনার প্রয়োজন তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে । সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও সম্পাদকীয় স্তরের পেশাদার লেখকদের কথা তোলা বিকৃতকৃতি বসিকতা ছাড়া আর কিছু নয় । কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চ মানসিক চোটারে খাটো করে দেখাই ইতিহাসকে দেয় কতরা মুখ্য কথা নয় । বড় কথা ইতিহাসের লক্ষ্যকেই ছোট করে ফেলা । মনের নানা বেদাদর্শের চরিতার্থতায় বাহুব অনেক রকম দৃষ্টি করেছে । রাজ্যরাজড়া এবং বীরপুরুষেরা প্রাচীন বীরদের কাহিনী তনতে চেয়েছে । চারপেত্রা কিংবদন্তী ও কল্পনার নিশিড়ে গাথা রচনা করে রাজসভা ও বীরসভায় গান করেছে । বাহুব সাধারণ ও অসাধারণ বাহুবকে নিয়ে হাসি-কান্না উপহাস-পরিহাসের কথায় মশগুল হয় । তাই কথাসরিংসাগরের মত বই দেশে দেশে লেখকেরা লেখে । বাহুব গল্প শুনে ভালোবাসে । পুরুত-লিখতে-মানা আধুনিক পৃথিবী গল্প-উপক্কাতে ছেয়ে গেছে । কিন্তু ইতিহাস এসব মনোরঞ্জনদের দলে নয় । তার লক্ষ্য উঁচু । অতীতের কাহিনী সে বলে বটে — সমস্ত রকম বিখ্যাত-বিরাগ কল্পনার খাম-শুকু অতীতের খাটি সত্য । কিন্তু, সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের স্বাভাবিক নয়, যদিও গল্প সত্য হলে লোকের ভাঙে বেশী অহরহ । লোকে

ভূতের গল্প ও সভ্য-ভূতের গল্প স্তনতে চাহ ; কারণ গল্প-বলাটা ইতিহাসের উপলক্ষ না হোক, উপায় নয় । ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা । ভবদর্শী জ্ঞানীরা বেলব উপদেশ করেছেন তাঁদের উপদেশের বাস্তব রূপ দেখা যায় ইতিহাসে । সমাজ ও সভ্যতার অন্ধার ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের বাহা ও যাত্রাপথের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ইতিহাস । ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেশী । মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় ভবদর্শনের নীতিহস্তের ভাষা হচ্ছে ইতিহাস ।

২

ইতিহাসের এই উপদেশের পদার্থের অনেক কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে । মনস্তত্ত্বের লেখক খনজর, কেল লোক আনন্দনিস্তনী নাটোর ফলও বলেন ইতিহাসের মত গাংগারিক জ্ঞানবৎ গাংগারিক, সেইসব অল্পবুদ্ধি অরসিক লাপ্‌লোকদের নমস্কার করেছেন ।

আনন্দনিস্তন্থি রূপকে
গাংগারিক : ফলসম্ভব
গোংগারিক : ফলসম্ভব
তই নব : আনন্দনিস্তন্থি

খনজরের মতে নাটোর স্থান ইতিহাসের উপরে কি না সে কথা অবাস্তব । কিন্তু ইতিহাসের কাজ দে আনন্দ দেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়া, তাঁর এ অভিনব স্পষ্ট ।

খনজর আধুনিক লেখক । রাজ হাজার বছরের পূর্বকাল লোক । কিন্তু খনজরের মতের অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশের নানা পুঁথিতে ইতিহাস নামে বিস্তার উল্লেখ আছে ।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বিজ্ঞাতির পাঠের তালিকায় একটি পাঠ্যবিষয় হচ্ছে ইতিহাস ।

বাক্যবাক্যঃ পুরাণ চ নারায়ণীয় গাথিকাঃ ।
ইতিহাসাঃ স্তব্ধা বিভাঃ শতাব্দীতে হি যোক্তবৎ ॥ আচার, ৪৫
বেদার্থপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিভঃ ।
যজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ বিভাঃ চাঃধ্যাঃ দ্বিকীঃ অংশঃ ১০ আচার, ১০১

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি খুব কম কয়েক খনজরের পাঁচ শ বছর পূর্বের ।

• যজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে পিতৃপুত্রের শ্রদ্ধার সময় ফের শাস্ত্র পড়ে শোনার বিধি আছে আর মধ্যে ইতিহাস একটি ।

আখ্যায়ঃ শ্রাব্যঃ পিত্রো ধর্মশাস্ত্রানি চৈব হি ।

আখ্যানানীতিহাসাঃ পুরাণানি খিলানি চ ॥ ৩২২

যজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে যে পুঁথি আমরা পেয়েছি, খুঁটীয় অটম কি নবম শতকে বেদান্তিধি দ্বার ভাষা লিখেছিলেন, তার রচনা বা গ্রন্থ-কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে । কিন্তু কোনো মতেই সে রচনা-কাল খুঁটীয় দ্বিতীয় শতকের পরে নয় । তার চেয়ে দু-তিন শ পূর্বে হজ্জাই খুব সম্ভব ।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সামবেদ ঋগবেদ ও যজুর্বেদ এই ত্রবীর বাইরে ইতিহাসকেও অর্থর্ববেদের সঙ্গে বেদ বলা হয়েছে।

সামগ্যাদুর্বেদাশ্রয়ত্বাৎ। অর্থর্ববেদেতিহাসংবেদো চ বেদাঃ। প্রথম প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসকে বেদ বলাতে বোঝা যায় যে, নানা বিজ্ঞাকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অর্থে দশটি ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ কি তা রাজার নানা বিজ্ঞা চর্চার প্রশংসে কোটিল্য নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা দিনের পূর্বভাগে যুদ্ধের নানা অস্ত্রের বিজ্ঞা শিখবেন।

পশ্চিমমিতিহাসপ্রবণে। পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকেনাহরণঃ

ধর্মশাস্ত্রবর্ণশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ। দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায়

দিনের শেষভাগে ইতিহাস-শ্রবণে শিক্ষালাভ করবেন। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—এদের বলে ইতিহাস। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল পণ্ডিতদের বিরাট তর্কস্থল। কিন্তু অপণ্ডিত লোকও যদি প্রচলিত মহত্বতির সঙ্গে এ অর্থশাস্ত্র পড়েন তবে প্রতীতি হতে যেহি হয় না যে, কোটিল্যের বহু অংশ মহত্বতির চেয়ে প্রাচীনতর। সুতরাং যে পণ্ডিতেরা অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল বলেন খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক তাঁদের মত অগ্রাহ্য করবার কোনো সংগত কারণ নেই।

গৌতমধর্মসূত্রে, ফেলকল বহুস্তত্রাশ্রয় রাজার সঙ্গে সনাতন বা রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষা করেন, তাঁদের বহুস্তত্রাশ্রয়-লাভের ক্ষর ফেলব বিজ্ঞা আদত্ত করতে হয়, তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

যৌ লোকে দ্বুতত্রাতৌ রাজা ত্রাশ্রয়ন্ত বহুস্তত্রঃ। ১৮১

স এষ বহুস্তত্রো ভবতি।

লোকবেদবেদাশ্রয়িং।

বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ। ১৮১-৬

বাকোবাক্য নামে বিজ্ঞাটির উল্লেখ দৃষ্টিবস্তুত্বতির বচনেও আছে। টীকাকাররা ব্যাখ্যা বলছেন, প্রস্তোত্তর-রূপ বিজ্ঞা, সম্ভব তর্কশাস্ত্র, গ্রীসে Socratic dialogue—এ গার আরম্ভ।

ফেলকল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি টিকে আছে বা এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, গৌতমধর্মসূত্র তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এর ফেলব প্রশংসা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে এক ভাসের মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, গৌতমধর্মসূত্রের ব্যবস্থা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীনতর কালের ব্যবস্থা। পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, গৌতমধর্মসূত্রের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব দ্বয় শ থেকে চার শ শতকের পরে নয়। এ মত গ্রাহযোগ্য।

অর্থ্যং অন্তত আড়োই হাজার বছর পূর্বে থেকেই আনাদের দেশে ইতিহাস নামে বিজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছিল* ও চর্চা চলছিল। এ বিজ্ঞার স্বরূপ কি ছিল।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের গণনা স্পষ্টই পদ্ধতিভাবিক সংজ্ঞার ব্যাপার। এর মূল অপারিভাবিক অর্থ, অন্তর ফেলব বিজ্ঞার নাম করা হয়েছে তাদের সমষ্টি। পুরাতনকালের বৃত্তান্ত,

আখ্যায়িকা ও তাদের মধ্যে যে উপদেশ নিহিত আছে, ফেদ ঘটনার উদাহরণ তাদের দৃঢ় করে। এরকম উদাহরণের বেশ একটু চমকপ্রদ নমুনা কৌটিল্য থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

কৌটিল্য রাজাকে বাইরের ও ঘরের নানা শত্রু থেকে আশঙ্করকার সাধনাতার উপদেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ এই : অস্ত্রপুণে নহিবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রাজা পূর্বে পরিচারিকাকে দিয়ে অঙ্গুলদান করেন যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, এবং এমন পরিচারিকাকে সঙ্গে না নিয়ে একাকী যাবেন না, কারণ—

সেবীসূত্রে লীনেঃ হি ভাতা ভ্রসেনঃ জঘান।

মাতৃঃশয্যাস্তর্গতঃ পুত্রঃ কাম্রশন্।

লাজস্বধুনেতি বিবেণ পৰ্বতঃ সেবী কাশিরাশন্।

বিধিদ্মেন নৃপুণেণ বৈরন্ত্যঃ মেঘলান্বিনাঃ সৌবীরঃ।

জালুৎসারর্শেন বেণ্যাগৃহঃ শত্রুঃ কৃষা সেবী

বিস্রুৎ জঘান। ১১১৭

পট্টমহিবীর ঘরে লুকিয়ে থেকে রাজা ভ্রসেনকে তার ভাই হত্যা করেছিল। মার শয্যার তলে প্রহর থেকে কাম্রশরাকে তার ছেলে হত্যা করেছিল। মদ্রু ছলে রই-এ বিধিদ্মেন কাশিরাজের নহিবী তাকে হত্যা করেছিল। বিধিদ্মেন নৃপুণের আঘাতে বৈরন্ত্য রাজাকে, মেঘলামবির আঘাতে সৌবীর রাজাকে, মকুদের আঘাতে জালুৎসার রাজাকে তাদের মহিবীর হত্যা করেছিল। বেণীতে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে বিস্রুৎ রাজার নহিবী বিস্রুৎকে হত্যা করেছিল।

সন্দেহ নেই যে কৌটিল্য প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত স্বেদেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছেন, কল্পিত আখ্যায়িকার নয়। সে ইতিহাসের মূলে তথ্যের সঙ্গে কিম্বদন্তীর নতই মিশ্রণ থাকুক। মজ্ঞাত-মর্ত্যতের ভ্রসেন-বিদ্রুথের হত্যা থেকে হাল আনলের 'লিফাইডেশন' পর্বত ক্ষমতালোভী মাহুকের চল ও নিরুদতার পরিবর্তন হয় নাই।

৪

মহামুত্তির যে যেকোনো 'ইতিহাসাংক' ব'লে বহুবচনে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার ভাষ্যে বেদাতিথি লিখেছেন "ইতিহাসাংকমভ্যাজরভাষ্যঃ"। রাজবদ্য মুত্তির 'ইতিহাসাংক'র ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষর্য ঐ এক কথাই বলেছেন, "ইতিহাসাংকমভ্যাজরভাষ্যঃ"। বেদাতিথি ও বিজ্ঞানেশ্বর মত দুই ভিন্নমত অনেক আধুনিক। বেদাতিথি বৃট্টীয় অষ্টম কি নবম শতকের, বিজ্ঞানেশ্বর দশম কি একাদশ শতকের লোক। কিন্তু ইতিহাস যে মহামুত্তির মত গ্রন্থ এ এতিহ্য প্রাচীন। কৌটিল্যের সর্বশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে ইতিহাসকে বের বলা, ও মহামুত্তির যে পঞ্চম বের এই প্রচলিত ধারণা, সম্ভব তার প্রমাণ। মহামুত্তির কোথাও নাম করে মহামুত্তির উল্লেখ নেই। অনেক মনে করেন যে, মহামুত্তির বর্তমান আকারে রচনার সময় বর্তমান আকারের মহামুত্তির রচনা হয় নাই। কিন্তু মহামুত্তির মূল কাহিনী অবশ্য অনেক প্রাচীন; এবং সে কাহিনী নিয়ে অনেক রচনা, অনেক গাথিকার নিষ্কাশন হয়েছিল। মহামুত্তির আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই সে বীত্বতি রয়েছে। সৌতি বলেছেন, অমৃতকর্ষা বাসের যে রচনা তিনি শোনাতে যাচ্ছেন—

আচর্য্য করকঃ কেচিৎ সন্ন্যাসচক্রেতে পরে ।

আখ্যানান্তে তদৈবানো ইতিহাসমিবঃ কুবিঃ—আদি, ১১২৬

সে ইতিহাস কোনো কোনো কবি পূর্বে আংশিক বলছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন, এবং অল্প কবিরা ভবিষ্যতে বলবেন । এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে যে অনেক কল্পিত উপাখ্যানের মিশ্রণ ঘটেছে, সে কথা মহাভারতে স্পষ্ট করেই বলা আছে । উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের স্রোতঃস্রাৱ এক লক্ষ । কিন্তু উপাখ্যান বান দিয়ে যে চরিত্র হাজার স্রোতে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন প্রকৃত মহাভারত ।

ইদং শতসংস্কৃত স্রোতঃস্রাৱঃ পুণ্যকর্মণাম্ ।

উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়ঃ শ্রাব্যঃ ভারতম্ভবম্ ।

চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ চক্রে ভারতসংহিতাম্ ।

উপাখ্যানৈবিনা ভাবদ্বারন্তঃ প্রোচ্যতে বৃথঃ—আদি ১১ ৬৩-৬৪

অল্পমান করা কঠিন নয় যে, লক্ষকে কেটে নয়, চরিত্র হাজারকে বাড়িয়েই লক্ষ করা হয়েছে । সংক্ষিপ্ত রচনাটাই বৃল ভারতেতিহাস । সে কাহিনী যে ঐতিহাসিক, প্রাচীন কালে সভ্য সভাই ঘটেছিল, প্রাচীনযে এ বিশ্বাস দৃঢ় । আখ্যায়িকা ও পুরাণ থেকে তাঁরা মহাভারতের কাহিনীকে ভিন্ন করে দেখেছেন । পুরাণের কথার মেধাতিথি বলেছেন, "পুরাণানি ব্যাসাদিপ্রবীতানি সৃষ্টাদিবর্ণনরূপানি", অর্থাৎ যার বৈষ্ণব ভাগ কল্পনা । আনন্দের দেশের প্রাচীনরা মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন, যেমন খৃস্টিভিক্টে হোমার-বর্ণিত টোলেমান-যুদ্ধকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন । তবে মহাভারতের কাহিনীও যে উপদেশাত্মক, শাস্ত্যকারী সে কথা বলতে ভোঁলেন নাই । নবুদনাসর গুপ্তম অধ্যায়ে বিনয়ের হুকুম ও অবিনয়ের হুকুম-বর্ণনা আছে । জানবুদ্ধসেব উপদেশে চ্যাব নাম বিনয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অবিনয় । অবিনয়ের ফলে রাজ্যারা সপরিগ্রহ বিনষ্ট হয়, আর বিনয়ের গুণে কোশলী বনবাসীও রাজ্যলাভ করে । উদাহরণ,

যেণো বিনষ্টোহ বিনয়াম্ভবশ্চৈব পথিবঃ ।

হ্রদাস-বাবনৈশ্চৈব ভ্রম্মণো নিমিরেব চ ।

পৃথুং বিনয়াত্মজ্যঃ প্রাপ্তবান মহুরেব চ । ১১ ৪১-৪২

যেখাতিথি খুব সংক্ষেপে ভাষ্য করেছেন, "এতানি মহাভারতান্যখ্যানানি জ্ঞেয়ানি" । এবং মহাভারতেই তার উপদেশের স্রোতঃস্রাৱ বর্ণনা আছে । 'এতে চার বেদেরই কথা আছে, এ কাহিনী পবিত্র ও পাণ্ডবহারা' ।

বৈশ্বকর্ম্মভিঃ সংকৃত্যঃ ব্যাসস্তাকৃতকর্ম্মণঃ ।

সংহিতাঃ স্রোতঃস্রাৱাঃ পুণ্যঃ পাণ্ডবাপহাম্—আদি ১১২৬

নৈমিষারণ্যের কবিরা সৌভাগ্য আছে সোপাখ্যান লক্ষস্রোতঃস্রাৱ 'শ্রাব্যঃ ভারতম্ভবম্' গুণেতে চেয়েছিলেন ।

মহাভারতের কাহিনী থেকে নানা উপদেশ সংগ্রহ কিছুই কঠিন নয় । রাহুকের অনেক কর্ম্মচেষ্টা ও তার পরিণতি থেকেই কঠিন নয় । কিন্তু মহাভারতের বিভিন্ন দীর্ঘ ইতিহাসের রচনা হয়েছিল স্তম্ভিক উপদেশের

উপসংহত—ঐ উপদেশই লক্ষ্য, কাহিনীর বর্ণনাট। উপলক্ষ্য—এমন কল্পনা হ'ল যনের কল্পনা নয়। কোনো ভয়ের মারাত্মক বিস্তারিত না ঘটলে সূক্তি এমন সম্ভব হ'ল না। নৈমিত্তিক্যবাসী উপসংহত মারাত্মক-কথা শোনার ক্ষমতা পোতিবে যিরে গীতিয়েছিলে, কারণ সে কথা বিচিত্র—'চিত্রা: কথা:।'

তমাসবহুগ্রাণ্ড: নৈমিত্তিক্যবাসিন:।

চিত্রা: প্রোভু: কথাস্তম পবিত্রতাপনিন:।—আদি ১: ১০

যে কাহিনী বিচিত্র, গভীরগভীর সাধারণ ঘটনা নয়, তা মানুষের মনে গভীর ছাপ কাটে। মানুষ সে কাহিনী ভুলতে চায় না। তাকে রচনাও নিবন্ধ করে ছাপা করে রাখতে চায়। উপসংহতের চিরকালীন ভাঙ-বোঁধে নয়, অসাধারণ বিচিত্রকে স্থায়ী দেবদ মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। 'প্রকৃতিবোধ' কৃত্যনাং।' কিন্তু সমাজের হিতে গিয়া অনগ্রসর উঠা এক উপসংহত পুনরুদ্ধার শোধান করে মানুষের কাছে লাগতে চান। ঐতিহাসিক কাহিনী যে কাহিনী মাত্র নয়, সমাজের স্বাভাবিক অস্থি লক্ষ্যে, সে শিক্ষা উঠা। ইতিহাসের কাহিনী থেকে শিক্ষাশিত করেন—সহজে যা কঠোর। সমাজইতিহাসের 'প্রকৃতিবোধ'। ঐতিহাসিক বসন তথ্য। ভেবেছিলান অতীত নিয়ে বেলা করছি, কিন্তু যেখি সমাজের হিত করছি। মনে করেছিলান অটান কাহিনী-কৃত্যর মল এনেছি, কিন্তু যেখি যা এনেছি তা উপসংহতের ক্ষমত। 'খন্তোইহঃ'।

৬*

বর্তমানে আমরা যাকে বলি 'বাস্থ্য ইতিহাস' (real history), হোমারের ইয়ম্বুকের কি বেরবাসের ভাস্বতম্বুকের ইতিহাসের মত ইতিহাস নয়, তার লেখকেরাও অনেক বলেছেন যে, ওঁরা ইতিহাস লিখেছেন কেবল অতীতের কাহিনীকে বর্ণনার ক্ষমতা নয়, যাতে অতীতের কাহিনীর আলোতে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। খুঁজিছে পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন, যাতে সেই অতীত ঘটনা থেকে এর পর অল্পতম ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। পলিবিয়াস রোম-কার্থেজ-যুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধের অন্বেষণ করেছেন, যাতে ভবিষ্যতের মনুষ্য ঘটনায় এ যুদ্ধের প্রয়োগ করা যায়। ইউরোপের কেবল ঐকি ঐকি-রোমান যুগে নয়, তখন থেকে আর পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের এই রূপই কল্পনা করেছেন। ইতিহাস লোকশিক্ষক—স্বাভাবিক শিক্ষা দেয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের সে পরামর্শদাতা। এই কল্পনাকে যুদ্ধ উপহাস করে যাকে তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের গোড়ায় বলেছেন, 'ইতিহাসের উপরে যে কর্তব্য রত করা হয়, অতীতকে যাচাই করে বর্তমানকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, সে গুরুত্ব-বহনই তিনি অক্ষম। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র দেখতে চেষ্টা করতে পারেন যে যা ঘটেছে তা ঠিক কেন্দ্র করে ঘটেছে।'

*শাস্ত্রকি দার্শনিকেরা যে কারণে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিককে উপসংহত আসনে বসিয়েছেন সে সম্বন্ধ বহু ঐতিহাসিক লিখেছেন যাদের মত প্রত্যাখ্যান করেন নাই। সে মর্যাদা ও সম্মান শিরোধার্য করেছেন এবং নিজেদের কাছ সম্বন্ধে সেই কথা পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু যদি বাইরের মেজা পদবীর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজের কাছ পটীক করে দেখেন 'কি মনঃ' তবে ইতিহাসের স্বরূপ ও লক্ষ্যের মর্যাদা জ্ঞান, বৌদ্ধেরা যাকে বলেন 'সম্যক জ্ঞান', তা লাভ হয়।

খুঁজিছে ওঁর ইতিহাসের এর এই বলে আরম্ভ করেছেন—

‘এথেন্সবাসী থুকিডিজেল পেলপনেসিয়ান ও এথেনিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করেছেন। যুদ্ধের ঘটনাতেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এই ধারণায় যে, পূর্বে পূর্বে বা সব ঘটনাই এই যুদ্ধের গুরুত্ব তাদের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি দেখলেন, সমস্ত গ্রীস বেশ এই যুদ্ধে এক পক্ষে নয় অল্প পক্ষে যোগ দিয়েছে বা সেবার ক্ষত প্রকৃত হয়েছে, এবং অনেক অ-গ্রীকেরাও যোগ দিচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হবে। অতীতের, বিশেষ দূর-অতীতের কথা কালের ব্যবধানে সম্পূর্ণ ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু অহুলদান ও গবেষণায় বহুদূর জানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় না যে, অতীতের কোনো যুদ্ধ বা ঘটনার এই যুদ্ধের মত গুরুত্ব ছিল।’

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে থুকিডিজেলের পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বের ধারণা অতিমাত্রায় ন্যায়জ্ঞানহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেমন এইচ. ব্রি. ওয়েলশ বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত ও যুদ্ধটা ছিল একটা। মাকারি রকনের ভগড়া; ওর শ্রুতি একটু বেশী টিকে আছে এইজন্য যে, থুকিডিজেল তার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। থুকিডিজেলের ধারণায় বিজ্ঞতার হাসি হাসার পূর্বে মনে করা ভালো যে, বেশব ঘটনা ও ব্যাপারের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব আট্টাই হয়ে বর্তমানের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখেছেন, আড়াই হাজার বছর পরে সেসব ঘটনা ও ব্যাপারে তাদের ধারণা লোকে কি চোখে দেখবে— অবশ্য যদি ততদিন তার শ্রুতি বেঁচে থাকে।

থুকিডিজেল তার গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, উপসেন সেবার মহৎ কর্তব্য পালনের ক্ষমতা তিনি রচনায় প্রকৃত হন নি। এ রচনায় তাঁর প্রস্তুতি এতদূর, কারণ এ যুদ্ধের কাহিনী তাঁর মনে হয়েছিল ‘চিত্রাঃ কথাঃ’; এবং অতীতের সমস্ত ঘটনার তুলনায় ‘বিচিত্রাঃ কথাঃ’।

এর পর থুকিডিজেল তাঁর ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ ও রচনায়িত্যের কথা বলেছেন—

‘এই যুদ্ধে বেশব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অম্মানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করিনি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজেদের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ করিনি, কারণ একই ঘটনা দ্বারা যেখানে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও শ্রুতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশ্রণ নেই, সেক্ষেত্র হয়তো তেমন স্বপণা নয়। তবে তাদের তৃপ্তি সেবে দ্বারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্বাধীন সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।’

৭

থুকিডিজেলকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার গুরু। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ইতিহাসের ঔপকরণ সংগ্রহ ও বিচারের এবং অপক্ষপাত কল্পনামূলক অব্যবহিত কাহিনী রচনার যে যুদ্ধের তিনি সূত্রকার, আধুনিক ঐতিহাসিক রীতিকে তার ভাষা বলা যায়। অবশ্য অতি বিদূত ভাষা। কারণ আধুনিক কালে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও মূল্যবিশ্লেষণের চেটা ও পদ্ধতি যেমন বিপুল তেমনটি জটিল। দু-তিন শ বছরের মধ্যে অবিকৃত অনেক বিজ্ঞান-বিদ্যা ইতিহাসের জ্ঞান নির্ণয়ের সহায়, বার কল্পনাও থুকিডিজেলের কালে সম্ভব ছিল না। বহু বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বপ্নাভির্ভা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্পষ্ট করে ঐতিহাসিককে অনেক

প্রাচীন মূলধীন সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এবং এশব পুণ্ডল বিদ্যার সার্বিক অহুসীন সত্যনিখা-
পরীক্ষার যে কঠোর মনোভাবের ভ্রম রয়েছে, ইতিহাসের তথা নির্ণয় ঐতিহাসিককে তা প্রভাবিত করেছে।
তার স্বীকৃতির সঙ্গে উৎসর্গের খাবি মিশিয়ে আধুনিক ইতিহাসকার নিষেধ রচিত ইতিহাসের নাম দিয়েছেন
'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস,' অর্থাৎ বা প্রাচীনত্বের টিলেটাল ইতিহাস থেকে ভিন্ন। এ নামকরণে সত্যাতাঙ্গ কিছু
আছে, নামের মহিমা বস্তুর তথ্যপ্রকাশের চেষ্টা বা অপরিহার্য। কিন্তু আরকের বিনে ঐতিহাসিকের
হাতে সত্যনির্ণয়ের বা সব উপায় এগেছে তার তুলনায় প্রাচীনকালের ইতিহাসকার ছিলেন দিক-অন্ত
মুষ্টিবোদ্ধ। নান্ন। একটু দূর-অতীতের ইতিহাস রচনা খুঁজিডেসের কাছে খুব সম্ভব মনে হয় নাই।
কারণ তত পূর্বের ঘটনা সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তুত খুঁজিডেসের এক্ষণ বছরের ইতিহাস তাঁর লবঙ্গালীন
ঘটনার ইতিহাস। পলিবিদ্যায়ের পিউনিক-যুদ্ধের ইতিহাস ঠিক তেমন না হলেও প্রায় সমান। দূর-
অতীতের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে আধুনিক ঐতিহাসিকদের রীতিপদ্ধতি অনেক অগ্রসর ও অনেক
দৃঢ়। যে প্রাচীনত্বা ভ্রমের কালের ইতিহাস লিখে গেছেন বা এমন বিবরণ লিখে গেছেন বা থেকে
ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায় সে ইতিহাস ও বিবরণকে বহু দিক থেকে পরীক্ষা করে সত্য নির্ণয়ের
অঙ্গীন চেষ্টা। যে কারকে খুঁজিডেস কঠিন বলেছেন তা থেকে বহুগুণে কঠিন কাজ আধুনিক ইতিহাস-
লেখকেরা নিভা করছেন। বিবরণের লিপি কত প্রাচীন, তার ভাষা কোন্ কালের, যে প্রাচীন ভাষা ও
লিপির শ্রুতি লোপ হয়েছে তার পাঠ্যভাষা, নাছুরের সূঁচ্যতার ফেসব স্ট্রি যটির নীচে চাপা পড়েছে নাটি
খুঁড়ে তার পরিচয়-লাভ মনে হয় যেন অসাধ্যসাধন। সে অসাধ্যসাধন আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সাধারণ
কাজ। অতীতকে জানার এই চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্ভব হয়েছে অতীতকে জানার আগ্রহে। আর কোনো
কিছুর উপলক্ষ্য হিলাবে নয়, ঐ জানাই ঐতিহাসিকের চরম লক্ষ্য বলে। অতীতের নিহুঁল নিহুঁত জ্ঞানশাস্ত্রের
এই বিদ্যা মাহুধ স্ট্রি করেছে। সেই বিদ্যার ও তার স্বীকৃতির স্বীকৃতি ইতিহাসকারের উচ্চতর উৎস।
সেই আদর্শে পৌঁছবার কোনো অ্রকেই শ্রম মনে হয় না। এই আদর্শের মাপকাঠি ছাড়া অন্ত যে-কোনো
মাপকাঠির মায়ে ঐতিহাসিকের অনেক শ্রম মনে হবে নিরর্থক পণ্ডর। স্বীকৃতি ত্রয়েছিলেন পুষ্টিপূর্ব চার
অধে না দশ অধে, দৃষ্ট। আরম্ভ হয়েছিল শনিবার দুপুরে না রবিবার প্রাতে, সে গবেষণার শ্রম ও বুদ্ধি ব্যয়ের
আর কোন্ সার্বকতা আছে? সে সার্বকতা হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও সত্য কথনের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে
অবিচ্ছাতি। সত্যের দ্রষ্টাই সত্যের অনুসরণ। 'সত্যো নাস্তি ভয় কিঞ্চিৎ'— ঐতিহাসিকের সে ভয়
হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয়। অন্ত কোনো ভয় নয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যদি
হত অতীত সত্য ঘটনার উল্ল্যবণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া— ধর্মের নীতি, সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রের
নীতি— তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিস্তৃত করলেই তা উপবেশের বেশী উপযোগী হত। অলংকৃত
নিরাবল্ল্য সত্যের চেয়ে কল্পনায় রাঙানো ও সাজানো কাহিনীর আকর্ষণ লোকের কাছে অনেক বেশী।
যে আকর্ষণের অভাব আছে বলে খুঁজিডেস তাঁর ইতিহাস-রচনার ব্যাধনিবা করেছেন। যে কারণে
বৈমিথ্যারণার ঝড়িা লোপাধ্যান ভারতকথাকে অধিকতর শ্রাব্য মনে করেছেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে সকল বিদ্যার ধারক ও বাহক ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রাণকর।
তাঁরা যে ইতিহাস তখন লিখেছেন তার বেশীর ভাগ যুগ্মধর্মের নানা ঘটনার ও যুগ্মীন সাধুসন্তদের
স্বীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাসকে বিভিন্ন কল্পনায় পুষ্ট ও মনোহারী করে ধর্মের উপর লোকের ভক্তি

ও ভয় গাড় করার চেষ্টা সেবার ছিল না। তাতে লোকের ধর্মপ্রচারের নিষ্ঠাই প্রমাণ হত। এ প্রয়োজনে অসত্যাকথনেও সোষ ছিল না। কারণ ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক উর্ধ্বে। সে কাল গত হয়েছে, কিন্তু সে মনোভাবের বীজ মরে নাই। আজ জন্ম ধর্মের দাবির জাহাঙ্গী নিচ্ছে রাষ্ট্রের দাবি। ধর্মজ্ঞের আসনে বসেছে রাষ্ট্রনেতা। সেই ইতিহাস হবে তাদের কানা ঘাতে রাষ্ট্রের উপর, অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতাদের উপর লোকের ভক্তি ও ভয় প্রবল ও প্রণালী হয়। তাতে যদি কিছু অসত্যভাবের প্রয়োজন হয় তাতে প্রমাণ হবে রাষ্ট্রসভেতন ঐতিহাসিকের সেশপ্রশ্ন। ইউরোপের ন্যায়গুণে ধর্মিষ্ঠত্বের ইতিহাসের আদর্শ বেঁচে ছিল না। আজ সে পুনর্জীবিত আদর্শ অনেক বেশী স্পষ্ট, অনেক বেশী কঠোর হয়েছে। কিন্তু বসেশপ্রশ্ন ঐতিহাসিকের অভাব হবে না। সোনা ঘাবে ইতিহাসের স্তম্ভ ইতিহাস নয়। কেবল সত্যভাবের আদর্শ থেকে তার লক্ষ্য অনেক উচুতে, তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত, জাতির মঙ্গল।

৮

এক কাল ছিল যখন, আজ যে সকল বিদ্যা নিজের গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ, তার অনেকগুলি ছিল অল্প সাধারণ অর্থ ও উপায়। সেই উপায়ের কাজ সম্পন্ন করাই ছিল তার লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্তু মাহুকের চকল কর্মকর্তা নন ও প্রতিভা উপায়ের গতি ভেদ করে বস্তুর বিভিন্ন জাদের গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন বোদ্যবিভাগগুলি তার উদাহরণ। যে বিদ্যা ছিল কেরবরের শুধ উদ্যোগ ও সত্য অর্থ-গ্রহণের উপায় মাত্র, তা গড়ে উঠল জাহাঙ্গীরের বিজ্ঞান হয়ে। ছন্দ:শাস্ত্র বৈদিক ছন্দাবিভাগে আবহু থাকল না। স্রোতিষ ও স্মৃতিবিত্ত বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বাধীন বস্তুর বিজ্ঞান পরিণতি পেল। মাহুকের প্রতিভার এসব বহু ও বিস্তার চর্চাকে বৈদিক কুলপতিরা মনোহরে দেখেন নি। নহন-স্বিত্ত তার স্মৃতি রয়ে গেছে। 'যে বিদ্য কেব অধ্যয়ন না করে অল্প বিজ্ঞান অর্থ করে এই ময়েই তার সর্ব: আত পুত্র-প্রাপ্তি হয়।'

যোহনদীত্য দ্বিহো বেনমস্ত্র কুততে ভ্রম।

ন জীবদেব পুত্রমাতা গচ্ছতি সাধর: ২১:৬৮

'অস্ত্র' কথার ব্যাখ্যা মেধাতিথি লিখেছেন, "শাস্ত্রাণেব তর্কশাস্ত্রাণেব বা"। কুত্র লোকাহুতি বলেছেন, "অর্থশাস্ত্রাণে"। সর্বত্র ন্যায়গণ শুধ বলেছেন, "অস্ত্র শাস্ত্র," অর্থাৎ যে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান।

ইউরোপের ন্যায়গুণে তুর্কান ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে অল্প বিজ্ঞান দ্বারা চর্চা করত ধর্মজ্ঞরা তাদের সন্মতের চোখেই দেখতেন। এর প্রেরণা যে ভগবানের নর, আসে শব্দবানের কাছে থেকে, সে সৃষ্টিতে তার প্রাণ নিঃসংশয় ছিলেন। ফাউন্টের প্রাচীন গল্প এর উদাহরণ। ধর্ম ও নীতির রণক্ষেত্র বন্ধ থেকে বিজ্ঞানগুলির মুক্তি হয়েছে অনেক প্রতিফলিতার দ্বারা। কাটিয়ে। ইতিহাসেরও ঘটছে সেই মুক্তি। কিন্তু কোনো বন্ধ থেকে মুক্তিই চরম মুক্তি নয়। মুক্তিকে বন্ধার স্তম্ভ মাহুকের অস্ত্র থাকতে হয়। কারণ পুরাতন বন্ধ নতুন নতুন রূপে মাহুকের মুক্ত মন ও বিজ্ঞানকে আবার বীথতে চায়। মাহুকের মুক্ত মন ও বুদ্ধির উপর আধিকার পৃথিবী অঙ্গকূল নয়। সত্ত্ব ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ইতিহাস মনের একটা বেয়াল-পরিভূষ্টির উপায় মাত্র, মানুষের কোনো কাজে লাগে না? মানুষ নিজের কাছেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, হুতরাং মানুষের তা কাজে লাগে। কিন্তু, যে মানুষের কাছে লাগে সে মানুষ সত্যের পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তবুও মাঝে মাঝে কাটাছাঁটা প্রমাণসহ standardised মানুষ নয়। মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় ন্যূনত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে। হুতরাং প্রয়োজন শিথিল কাঠামো সে বস্তুকে পুরতে চায়। তাতে বস্তুর সমগ্রতা ধরা পড়ে না। কিন্তু সমগ্রকে ধরা কাঠামোর কাজ নয়; তাতে কাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। কার্ণিসিথির স্রষ্টা বা প্রয়োজন তা থেকে নিশ্চয়োজন স্বাস্থ্যরূপে দূরে রাখার ক্ষমতাই কাঠামো। যা থাকে কাঠামোর বাইরে প্রয়োজনশিথির দৃষ্টিতে তা অব্যব। তাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চলে এবং অগ্রাহ্য করলেই কাজ ভালো চলে। ক্রমে মানুষের ব্যবহারিক মনের ধারণা জন্মে যে, কাঠামোর মধ্যে বা রয়েছে তাই বস্তু, তার বাইরে বস্তুর আর অস্তিত্ব নেই।

আজ বার্না সভ্য মানুষ, একদিন ছিল যখন তাদের পূর্ণাঙ্গিতাম্বনের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হত শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার আহাৰ আশ্রয় ও আচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায়। সে মানুষের কাঠামো বুদ্ধিমান সৎসর্গ জীবের কাঠামো। তার পর অনেক হাজার বছরের নানা সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মন শরীরের একান্ত দাসিত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তাবস্থা মন সৃষ্টির প্রেরণা ও অনেকে বহু সৃষ্টি করে চলেছে যা শরীরের কাছে লাগে না, বাহ্যিক মুক্ত মনের কাছে লাগে। কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাস্কর্য সবই এই মুক্ত মনের সৃষ্টি। কিন্তু সেই আদিম কাঠামোর স্মৃতি মানুষের মনে বেঁচে আছে। তার এক কারণ, অনেক মানুষের মন আজও শরীরের সেই একান্ত দাসিত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। তাই যখন প্রশ্ন হয়, এ বস্তু মানুষের কোন কাজে লাগে তখন প্রশ্নকর্তা যে মানুষের কথা বলেন সে মানুষ হচ্ছে সৎসর্গ জীবের কাঠামোর মানুষ। প্রশ্নের অর্থ, সে বস্তু শরীরের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকোষ কাজে লাগে কি না। বস্তু গাভীর্ণ ও মূরক্ষিয়ানার সঙ্গে প্রশ্ন হোক-না কেন, একটু বাজিয়ে দেখলেই আওগাধ চিনতে স্কল হয় না। যে ইতিহাসের কথা বলছি সে ইতিহাসও মানুষের মুক্ত মনের সৃষ্টি। তাকে শরীরের কাছে লাগানো যায় না। যে সমাজ বহু শরীরে সমষ্টি মাত্র তার কাছেও লাগানো যায় না। চিরপরিচিত মানুষ মানুষের চিরকালের বিষয়। সেই চিরবিষয়ের বার্তা বহন করে ইতিহাস।

বিশ্বপাখিক বাঙালী

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সত্যতার আদি যুগে মানুষ ঘর বাঁধতে শেখে নি, তখন তার ছিল বাঘাবরুত্তি। পৃথিবীর সহস্র দানের প্রাচুর্য দেখানে মিলত দেখানে দিনকয়েক থাকত সে, তারপর আবার চলত অস্ত্র দানভাণ্ডার খোঁজার পালা। এমনি করে সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে বেশে বেশে, সে শুধন ছিল পথচলতি মানুষ, তার স্বপ্নমতায় স্বাবরকের কোনো বাঁধন ছিল না। তার পরে এল যুগবলের পালা। পৃথিবীর দান বোহন করবার কোশল তখনো মানুষের আদত হয় নি, কিন্তু জীবজন্তু পালন তখন তার আদতে। সে ছুঁ বাঘ, বাঁস বাঘ, বেঘের লোনে ছায়া করে, স্বস্তর চামড়ায় তাঁবু করে— তার জীবনের সঙ্গে পশুপালন সংযুক্ত হয়েছে। কালক্রমে এই পশুচারণ যুগও মানুষ কাটিয়ে এল সে যখন শিবল কৃষির গোড়ার তন্তু— পৃথিবীর দানকে নিজের মতো করে আহার করার কোশল। সে কোশল প্রথমে খুব উত্তেজিত ছিল না। এখনও আদিন দ্বাতের মধ্যে খুব চাকের প্রচলন আছে— হলকরণ তারা শেখে নি। যাই হোক, কৃষিজুগের শুরু দেখানোই। সেই প্রথম স্বাবরকের শক্ত বাঁধন পড়তে লাগল স্বপ্নমতায়। বাঘাবর বাঁধনছেঁড়াভাবে দেখানে খুঁই ঘুরে বেড়াতে পারে, তার কোনো শিচ্ছান নেই। পশুচারণ যুগে হয়তো সামান্য কিছুটা বাঁধন লেগেছে, কেননা পশুর পাল নিয়ে অত সহজে ঘুরে বেড়ানো যায় না, যেখানে চারণকর্ম নেই সেখানেও বসবাস করা যায় না। তা ছাড়া পশুর পাল শুধু জীবনের সহায়ই ছিল না, সময় সময় বিনিয়য়েরও বাহন ছিল। কিন্তু তবু তার স্বপ্নমতায় অভাব হয় নি। কিন্তু মাটির মায়া লাগালো প্রথম বাঁধন। যে জমি চাষ করে সে জমি কেনে সহজে অস্ত্র বেতে পারে না, অন্ততঃ বতকণ না আর এক লাঠগায় আরও ভালো জমি পায়। পেলেও সে জমি তৈরি করার পরিশ্রম আছে। সুতরাং কৃষিসত্যতার সঙ্গে মানুষও ঘর বাঁধতে শুরু করল, আরম্ভ হল গ্রামের পতন। ক্রমে ক্রমে গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগরী। সত্যতা যুগে যুগে বিবর্তিত হতে লাগল।

আনুর্ভব হবার কিছু নেই যে এই সত্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে জীবিকার কোশলই বদল হয়েছে তা নয়, মানুষের জীবন ও তার সমাজসংগঠনও বদল হয়েছে। কারণ, ইতিহাসের এই ব্যাপক পটভূমিকার আলোচনা করলে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মানুষ তার সমাজকে সেইভাবেই সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে যে সমাজের মাধ্যমে তার জীবনযাত্রা সুস্থভাবে চলতে পারে। দেখানে সে তা পারে নি সেখানেই তার ক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বল। যার, টমেনবী বলেছেন যজ্ঞমনি গ্রীক রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল না ততদিনে তাদের সমাজসংগঠন হিসেবে নগর-রাষ্ট্র বা City-Statesগুলির সার্বকর্তা ছিল যজ্ঞে— কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেখা দিল এবং গ্রামোন্নয়নও হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, তখনও তারা নগর-রাষ্ট্রের বাঁধন কাটিয়ে বেশজোড়া বৃহৎ সংস্থা গড়তে পারল না বলেই গ্রীসের ঘটল অপমৃত্যু। কিছু কিছু এমনকি সংস্থা গড়ে ওঠার চেষ্টা শেষের যুগে গ্রীসে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সফল হয় নি। বাস্তবিক, এই সহস্র সত্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। যে ধার্যবর মানুষ সঙ্গীহীন চলছে দেশেশাস্ত্রে, কোথায় তার পরিবার, কোথায়ই বা তার সমাজ আর কোথায়ই বা তার রাষ্ট্র! সে এক।

কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পত্তর দল চারণ করতে গেলেও কিছুটা সংগঠন দরকার, দরকার পারস্পরিক সাহায্য—
কাজেই তার মধ্যে রাষ্ট্রের বা সমাজের লঙ্ঘন না পাই, অন্ততঃ পরিবারের বা গোত্রের লঙ্ঘন গেলে বিধিত
হবার কিছু থাকে না। তেমনি একথাও সহজেই বোঝা যায়, কৃষির কাজ একসঙ্গে নয়, তার মধ্যে
বিপুল এবং বিরাট সংগঠন ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। কাজেই তার ভাগিদে যদি শুধু পরিবার
বা গোত্র নয়, সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও লঙ্ঘন পাওয়া যায় তা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রামীণ
জীবন ও নাগর জীবনের পার্থক্যের মূলও তো এইখানে। যে প্রয়োজনের ভাগিদে নগর বা মহানগর গড়ে
শে ভাগির আর গ্রাম্যসমাজের ভাগির এক তো নয়,— বরং একবারে মূলতঃ তফাত।

কৃষিজীবন ভগতে বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, শুধু ভারতবর্ষে নয় অন্তর্ভুক্ত। সে তুলনায় বহুসত্যতা তো
নেহাতই নাবালক। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে যে কৃষিসত্যতা চলে এসেছে বাস্তবঃ সে কৃষিসত্যতা বলে
চিহ্নিত হলেও তার চেহারা কালে কালে বিপুল পরিবর্তিত হয়েছে— বস্তুতঃ তার আদি ও অন্ত দুপের চেহারা
ষোটেই একরকম নয়। সমাজশাস্ত্রী জানেন, কৃষিসত্যতার গোড়ার যুগে জমির দখল ছিল যৌথ, ক্রমে
ধীরে ধীরে তা ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। এ বিবর্তন হতে কনসিন লাগে নি। এইভাবে কৃষিসত্যতাঃ চলতে
চলতে আর এক ধাপ দেখা দিল। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও যেমন চেহারা গেল বদলে, তেমনি
অন্যদিকে দেখা দিল হস্তশিল্প। এর সঙ্গে ঘটল আর একটি বৈশ্বিক পরিবর্তন। এবেলস্ তাই ‘পরিবার,
ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের গোড়ার কথা’ (*The Origin of the Family, Private Property
and the State*) নামক পুস্তকে এই বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, *The division of
production into two great branches, agriculture and handicrafts, gave rise
to production for exchange... and with it came trade, not only in the interior
and on the tribal boundaries, but also overseas.* অর্থাৎ কৃষি এবং হস্তশিল্প এই দুটি বিভাগ
গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন আর শুধু নিজের প্রয়োজন মেটাবার স্তর উৎপাদন রইল না— উৎপাদন
হল বিনিময়ের বাহন। লক্ষ্য ছেড়ে মানুষের মন ধাবিত হল ক্রয়ের ভাঙারের দিকে— প্রয়োজনের দীর্ঘানা
গেল বদলিরে। সেই সঙ্গে বস্তুই দেখা দিল বাণিজ্য। শুধু দেশের চতুঃসীমার মধ্যে বাণিজ্য নয়,
সমুদ্রাশ্রয়ের পেরিয়ে বাণিজ্যও।

কৃষিসত্যতার ইতিহাস মোটামুটি অস্বাভাবন করলে দেখা যায়, বহুসুপের পূর্ব পর্যন্ত তার বিবর্তন মোটামুটি
এইভাবেই চলে এসেছিল। সেই প্রাচীন স্কিনপীর নাবিকেরা পণ্য বহন করে কিংবদন্তি দেশ দেশান্তরে,
ভারতবর্ষের বাণিজ্যতরী শ্রোত্র ফেলেছে দেশবিশেষের ঘাটে ঘাটে। বাংলার মসলিনের বাহার জমেছে
গ্রীসে, রোমে— পরের যুগে ইংলওও। সেই বাণিজ্যতরী গিয়েছে গ্রাচাহুগেডের বন্দরে বন্দরে, তার
সম্ভ্রান্তিঃ যন্ত্রের পাড়ি ঘুরিয়েছে উত্তাল ভারতমহাসাগরে— শুধু বাণিজ্যের পণ্য নয়, ঐশ্বর্য্যের বার্তাও পৌঁছে
দিয়েছে দীপনয় মহা-ভারতবর্ষে। তেমনি পাহাড় মরুভূমি পার হয়ে চলেছে সার্ব্বাধ, চীনে জাপানে নিয়ে
গিয়েছে ভারতবর্ষের বার্তা। বস্তুতঃ ইতিহাসের সেই সূত্র অতীতে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এশিয়া— ইউরোপ
জন্মও জাগ্রত হয় নি। তাই সভ্যতার বিকাশের সেই গোড়ার যুগে গ্রাচাহুগেই চলত বেশিরকম
আনানোনা— দেশদেশান্তরের মধ্যে সংযোগ রচিত হতে থাকত।

এই বিরাট আননপ্রদান সূত্রও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কৃষিসত্যতার মূল কথাটা ছিল

আঁকড়ে থাক।। বণিকসম্রাট সেশ বিশেষে বতই ঘুম না কেন, ক্লিষ্টভাভার গোড়ার কথা হল মাটি। মাটি চেড়ে নড়াচড়া সহ্য নয়। সেইজন্য ক্লিষ্টভাভার আত্মবিক্রম হিসেবে বতই বাঁধিয়া চলতে থাকুক না কেন, তার মূল ছিল মাটির গভীরে, তার শিকড় ছিল শোঁতা। বণিকদের কথা ছেড়ে দিলে বাকী লোক বেশবিশেষে প্রায় যেতই না, দুবের শহর নগরেও নেহাৎ প্রয়োজন না পড়লে বেত না। গ্রামকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত হত, কারণ তাদের সমস্ত কর্মই ছিল গ্রাম ও ভূমিকে কেন্দ্র করে। অর্থনৈতিক জীবনের এই ভাগিয়ে সমাজজীবনও গড়ে উঠেছিল অস্বল্পপভাবে। তাই আমাদের পণ্যতরী বতই মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাক না কেন, জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, বহির্বিশ্বাত্মী নয়।

কালক্রমে বেশবিশেষের সঙ্গে আমাদের এই যোগসূত্রও গেল শুধিয়ে। বাণিজ্যের কৌশলধারা লুপ্ত হয়ে গেল। ফলে আমরা আরও আশ্রয়ী হয়ে পড়লাম, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ গেল কেটে। আর কোনো বসিষ্ঠ হিমালয় পার হয়ে গেলেন না ডিম্বভট্টাচার্য, কোনো অশীত-নীপাংকর গেলেন না বিশেষ, বিশেষের কোনো ছাত্র এসে শোভাবর্ন করতে থাকল না নালন্দার মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে। অজ্ঞান হল ভয়ের জয়ভূমি, অজ্ঞানকে ভয় করা নাহুয়ের স্বাভাবিক ধর্ম। বেশবিশেষের মাহুৎ ও তার আচার-বাহবাহ-সংস্কৃতি আমাদের বতই অজ্ঞান হয়ে পড়ল ততই তারা হয়ে দাঁড়াল ভয়ের আকর— আমরা তাদের সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ সামাজিক গঠন এবং মানসিক আদর্শের ফলে একদিন নিখিল বিশ্বে উন্নত আত্মজ্ঞান নিয়ে বলতে পেরেছিল আদ্যন্ত সর্বত্র: স্বাহা, সকলে আহুক সকল দিক থেকে, যার বাণী কাল ও দেশের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে নিখিল মানবচিত্তে ধ্বনিত হতে পেরেছিল, সেই ভারতবর্ষ ক্রমে জীর্ণ হ্রাসকে আচারের বেড়াফালের মধ্যে নিজে লুকিয়ে কেলে উটপাখির মতো। ভাবতে শুরু করল, এইবার মাটিতে নুখ লুকিয়েছি, আর বুঝি কেউ আমার খেঁজতে পারে না। আমাদের জীবনবর্নন ও তখন সমাজের প্রাণপ্রবাহ থেকে নুখ কিরিয়ে রাখার চুলচেরা তর্কের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের প্রাণপদের যে বিকাশ-সৌরভে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা এশিয়া আনোদিত হয়েছিল সেই প্রাণপদ মুদ্রিত হয়ে গেল। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পিছনে একটা বিরাট সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বদল ছিল।

বা ঘটেছে তা নিয়ে আক্ষেপ করা বুঝা। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে হয় আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি কি না। তার ক্ষমতা বৃত্তে হবে, এখন অগতে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠন হয়েছে এবং তার দাবি কি। একথা পাঠ্যপুস্তকেও ব্যর্থবার বলা হয়ে থাকে, গত দু'শো বছর ধরে জগতে যে যুগের আবির্ভাব হয়েছে সে যুগ হল যুগের যুগ, তার সভ্যতা হল যন্ত্রসভ্যতা। যন্ত্র যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে যন্ত্র এখনকার যন্ত্রের মতো মহাপ্রগতিশীল হয়ে ওঠে নি, আর তখন বতই সভ্যতার নির্মাতা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কালক্রমে যন্ত্রযন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারা পেল বদলিয়ে। উৎপাদিত হল ক্লিষ্টভাভা, ভেঙে গেল গ্রামকেন্দ্রিক স্বাধীনতা, গড়ে উঠল বড় বড় নগর বন্দর, পণ্য চলতে লাগল অনবরত বেশবিশেষে। এ পণ্য আগের যুগের পণ্য নয়, যা কেবল বণিকদের ব্যাপার ছিল। এ পণ্য উৎপাদন করে সারা দেশের লোক, বিশেষের বাজারের নুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়, জগতের এক কোণে মন্ডার লক্ষণ দেখা দিলে জগতের অপর কোণে সারা দেশের লোকের হাড নুখ শুধিয়ে। আরেকদিনার বিদ্রব ঘটলে ইংরেজের ঘরে ঘরে দেখা দেয় মাংসের অভাব, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ভাটীর ন্যান্টোনের ফলে কাশখানায় পড়ে কালো ছায়া। সারা দেশের লোকের

ভাণ্ডা গেল অপগ্রাণের সেশের সঙ্গে মড়িয়ে। মার্ক্স পর্বত ভেঙে বসেছেন, এই হল ধনতয়ের বৈশ্ববিক কৃত্তিকা। সে তার ধনধরন প্রদর্শিত করেছে সারা ভগতের গ্রামে নগরে, তার ছায়া পড়েছে নিখিল বিশ্বের প্রান্ত-প্রান্তেরে, উৎখাত করেছে সে দেশবিনেদের গ্রামীণ সভ্যতাকে, বিপ্লবিত করেছে কৃষিবাহিন্যকে, অবসান ঘটিয়েছে সানস্কৃত্যের, বেড়াঙ্গলে আবদ্ধ করেছে গোটা ভগৎকে, আকাশবাঙালী শোনা গিয়েছে তার পরাক্রান্ত সিংহগর্ভন। এইভাবে বাড়ন্ত বাড়তেই ভেঙে গেছে তার শেখ রূপ, থাকে শেনিন বলেছেন ফিন্যান্স-ক্যাপিটাল। তার রূপই হল আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ মানবিক প্রয়োজন বেটাবার উপকরণ নয় অর্থ, সে হল বিপুল উৎপাদন ও লাভের উপকরণ যাত্র। সে উৎপাদন আদিনি যুগের নতো নিভের ক: আশেপাশের লোকের প্রয়োজন মেটাবার স্তর নয়, সে হয়তো যশেরের স্ত্রী না নিতিয়ে বিদেশে চালান দেবার স্তর, যদি যশেরের চেয়ে বিদেশের বাজার হতে লাভের মাত্রা বেশি হবার সভ্যতা থাকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিরাট বিশ্ব একত্র গ্রথিত হয়েছে, ভাসের পারস্পরিক বোগদুই আর কটাবার নয়। এক সময় তো বিশেষী লাট্‌মার্কি কাপড়ের দামের ঠোপড়ার উপর অন্তত: কিছুটা হাস্যবৃদ্ধি হতে আনানের চাবীর বাদেই স্বত্বের।

আর ধনতয়ের যুগও অবসান হতে চলেছে, সেশে সেশে দেখা যাচ্ছে নতুন যুগের স্বঘোষা, শোনা যাচ্ছে নতুন কালের পদধ্বনি। সে বস্ত্র সাধারণাই হোক সমাজবাহী হোক, একথা নিশ্চিত যে ফিন্যান্স-ক্যাপিটালের নির্বাণ পরাক্রম ভগতে আর কোনোদিনই কিংবে না। * কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আবদা কুবেরের বলশে লম্বীর পুন:প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি বলে ভগৎকে আবার পিছিয়ে নিয়ে দাব বা পিছিয়ে নিয়ে বেতে পারব। বস্ত্র: তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আর তার প্রয়োজনও নেই। যে যন্ত্রাঙ্গ মাংসের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আজ তাকে আরও এনে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে এর নামে নয় যে যন্ত্রটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তার অর্থ হল যন্ত্রটার বোড় কেব্রাণ্ডে হবে, এই যাত্র। স্বতন্ত্র: মনে রাখতে হবে, আমরা হুঁশে বছর ধরে যে জাণে জড়িয়েছি, যখন প্রকৃত-স্বতা সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আমরা গমনে মাংস হিসেবে অপরের সঙ্গে মিশব তখন সেই জাল তো কাটবেই না, বরং অধীনতার মান্নিক অবস্থা মানবকল্যাণের পরিবেশে সে জাল আরও শক্ত হবে কল্যাণের হাথে সুঘোষ কৃত্তিক হবে। আজকের দিনের প্রত্যেক দেশের সমার ও অর্থনৈতিক সংগঠন এমনই যে আর আমরা একলা থাকতে কিছুতেই পারছি না। বরং বলতে পারা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জেগীর মধ্যে শোষক-শোষিত সঙ্ঘ বিলুপ্ত হলে তখনই তো বেশি করে এবং গভীর করে শুক হল বিশ্বপত্রিকের মহাস্তিভিষ্ণু, এই তো আরম্ভ হল তার প্রকৃত জয়যাত্রা। এই হল ভগতের বেলায় মাংসের সঙ্গে মাংসের মিলন, এই হল প্রত্যেক স্বীকৃতি যে আজকের দিনে কোনো মাংসই জন্তের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এতদিনে দেখা দিল সভ্যতার মহামিলনের ময়। বাস্তবিক, স্বাধীন ভারতবর্ষ দেশে মের্ণে কেপকশীদের বাণী বহন করে কিংবে সেটা মূলত: এই কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সেকালের ভারতবর্ষ যেমন সেকালের পরিবেশে জাক দিয়েছিল বিশ্বমানবকে আয়ত্ত্ব সর্বভা: স্বাধা, আজ তেমনি সে বলতে চাচ্ছে আমরা তোমাদের আস্থান করছি রণশাযা বায়িয়ে নয়, সৌর্ভলোর মান্নিতে নয়, পরাক্রমের স্বঃকারে নয়, আমরা তোমাদের আস্থান করছি মানবকল্যাণের যন্ত্রশালায়, তোমরা আয়ত্ত্ব সর্বভা:, সকল দিক হতে এগো, স্বাধা, তোমাদের মল হোক। আজকের দাম্পত্যিধ বড়াঙ্ক ভগতে ভারতবর্ষের কীণ কণ কতকৃৎ জতিগোচর হবে তা জানিনে, কিন্তু একথা সভ্য যে ভারতবর্ষ আবার নতুন করে এ যুগের পরিবেশে সেই

মানবকল্যাণের অব্যবস্থা করবারই চেষ্টা করছে বা শুধু ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীই নয় শাস্ত মানবাস্থার বাণী। কথাটা নতুন নয়।

একদিন না একদিন একথা হইতো বিশ্বজন্যকে জনডেই হবে, কেননা মাতলামিটা সাময়িক বিকার হতে পারে কিন্তু স্থায়ী ব্যাধ্যের লক্ষণ নয়। কিন্তু সে চিন্তার বাঁধ আমাদের নয়। আমাদের এই কথা ভাবতে হবে, প্রথমতঃ আমরা যে যুগে এসে পড়েছি সে যুগে দুর্ভাব্যবস্থার মাফও খনিষ্ঠ বস্তুনে বাঁধা। শুধু গ্রামটুকু নয়, শুধু চারপাশের সমাজটুকু নয়, কত দেশের কত চেনা অচেনা মানুষ তার সমাজ ও সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি নিয়ে আমাদের জীবনে ছায়াপাত করছে। তার উপর স্বাভাব্যতার সুবিধার ক্ষর কোনো বেশই ধার দূর নেই। লগুন তো আমাদের ঘরের কাছে, বিলেত থেকে ফিরবার পথে কারো এসে পৌঁছেলেই মনে হয় বেন আলানসোল পৌঁছে প্লেসু, পরের টেনশনই বর্ধমান অর্থাৎ বোম্বাই, তারপরেই কলকাতা। অপরূপ চলে বেশবিশেষে স্বাভাব্য। এইভাবে আমরা পরস্পরের দূর কাছাকাছি এসে গিয়েছি, দূরত্ব কমেই বিলোম্বমান। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এগর ব্যাপার তো স্বপ্নের সর্বত্রই আজ ঘটেছে, কিন্তু আমরা তার উপর দৃষ্টি নিয়েছি মানবমিলনের বাণী প্রচার করবার। আজকের পথই যে শুধু আমাদের বিশ্বপথিক হতে বাধ্য করছে তাই নয়, আমরাও আগ্রহসহকারে সে পথ বেছে নিয়েছি। সেসকল আজকের দিনে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হল বিশ্বপথিক হবার। এ যুগের তাৎপর্ষই এই। এমন কি সে পথ ছাড়া আমাদের স্বকীয়তার লক্ষণও হতে পারে না।

এর হল, আমরা সে পথে সত্য সত্যই বেরিয়েছি কি না। মনে রাখতে হবে, যখন জগৎ এরকম ঘনসংবদ্ধ হয় নি, পরাধীনতার প্রথম ধাক্কা যখন আমরা জর্প এবং উদ্বিগ্ন, পাকিস্তান সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে আমরা যখন ব্যতিব্যস্ত ও ভারকেন্দ্রচ্যুত, সেই বেসামান্য বিপৎ যুগে বাঙালীই সব প্রথম বিশ্বপথিকতা ও ভারতপথিকতার পথে বেরিয়েছিল। 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"যেমন বিশেষ দেশ নদীনাটক, তেমনি বিশেষ জনচিত্র আছে যাকে নদীনাটক বলা চলে।

সে চিত্রের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা ধার যোগে বাহিরকে সে আপনায় মধ্যে টেনে আনে, নিজের মনোকার তেববিশেষ তার ভেঙ্গে যায়, যে প্রবাহ চিন্তার কেন্দ্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অর বোগার সকল দেশকে সকল কালকে।

একথা সেই চিত্র ছিল ভারতের, তার ছিল মহান মননধারা।... দশ শত বৎসর চলে গেল, ইতিহাসের পুরোণামিনী গতি হোলো নিম্নত, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন বেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনায় মধ্যে আপনি শুকৌর্ণ, তার সমীর চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না, তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে, তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তায় বিয়। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে, তখন জ্ঞানের চলমান গতি হোলো অবরুদ্ধ, নির্ভীক হোলো নবনবোদ্বেগশালিনী বৃত্তি, উদ্ভত হয়ে দেখা দিল নিচল আচারপুষ্... ষণ্ড ষণ্ড গীমানার বাইরে স্বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।...

যখন সে আপন দুর্বলতা অতিক্রান্ত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে,... ভারতের চিত্র সেদিন যখন অর নূতন স্বরে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার

কেত ভরা ছিল আগাহার কবলে। সেই অজন্মার দিনে রানবোহন রায় হয়েছিলেন সত্যের
স্থান নিয়ে।...

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্তা, সেই অর্থ তাকে পূরণ
করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনীশক্তি
বলপাতি করে। -- মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্তাটা কোথায়? বেখানে কোনো মহতাব
কোনো মূঢ়তাব বাহুবে মাগুবে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানবসমাজের সর্বপ্রধান ভাব বাহুবেই এক।।
সত্যতার অর্থই হচ্ছে বাহুবেই একত্র হবার অহুশীলনা।...

ভারতবর্ষে তার সমস্তাটা হুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতির লোক একত্রে এসে জুটেছে।
পৃথিবীতে অল্প কোনো দেশে এমন ঘটেমি। দ্বারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে,
এই হোলো ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্তা। এক করতে হবে বাহিক বাহুবেই নহ, আত্মবিক
আত্মীয়তার।... এই অশ্বের বাহুগানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাহীকে সমুদ্র করতে কালে কালে
বে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রানবোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী।"

ভারতের কালে কালে শুধু রানবোহন নহ, বহু মহাপুরুষ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন দ্বারা এই দ্বারাকে
পুষ্টি ও সজীবিত করেছেন স্বকীয় তেজে এবং বীর্যে। বিজ্ঞানাগর এর মধ্যে আর এক বিশ্বকর আবির্ভাব।
আচারনিত্ত কৃশীল ব্রাহ্মণের ঘরে মনে সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়ে কি উদার আগ্রহ ছিল তাঁর সকল বাহুকে
তার প্রাণা সমান দেবার, চিন্তের দ্বারাদ্বা এবং বোহুত্ব মনের নির্বাধ অহুশীলনা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার।
আর কি নিদারুণ নির্ভীক বীর্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন তার জন্ত! একদিকে বিদ্বা-বিদ্বা,
দ্বীলোকের অধিকার-প্রতিষ্ঠা, বহুবিদ্বা-নিবারণ ও অল্প নানাবিধ সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা হতে শুরু করে
অল্প দিকে সমুদ্রানিবিশেষে জ্ঞানলাভের সুযোগবানের তীর্থ মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা (হিন্দু কলেজে
হিন্দু ছাত্র। কারও প্রবেশাধিকার ছিল না)—কোন দিকে তিনি অসীম বীর্যবতার সঙ্গে হুড় না করে
গিয়েছেন! শত্ৰুতা নীতার বনবাসের সঙ্গে তিনি যেমন পরিচয় ঘটিয়েছেন বাঙালী পাঠকের, তেমন
মালকপাঠা পুস্তকে লিখেছেন অস্ট্রিয়া ভিয়েনা জার্মানির গল্প। কি উদার আকাশে তাঁর চিত্ত বহুদনে বিচরণ
করেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু শুধু বিজ্ঞানাগর নহ। বিবেকানন্দের বহুত্বও ক্ষণিত হয়েছিল
ভারতবর্ষের নৈমিত্যে। ছাড়িয়েও, যেমন তাঁর তীর্থ শর বহিত হয়েছে আশাধের লামাভিক অস্তায় ও কৃষ্ণাভয়ের
উপর। আর এই অস্তায় শেষ পর্যন্ত এসে এই দ্বারার স্বেচ্ছ প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সঙ্গে ছোটবড়
আরও অনেক এসেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃই সংকীর্ণতার ঘূলায় বড় গুড়ে, কিন্তু হুয়েহুনাথ
প্রমুখ নেতারা এখন জাতীয় কংগ্রেসের কল্পনা করেছিলেন তখন সারা ভারতই তাঁদের চিত্তাকর্ষ দৃঢ় ছিল।
'এক ধর্মাত্ম্যগানে ছিন্ন বও বিকল্প ভারত বেঁচে দিব আমি'—এই ছিল তার মেট্রোপলিটান উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, বিশ্বপথিক বা ভারতপথিক হয়ে উদার বাঙালী বা বাঙালিয়ানা জ্ঞান
করেন নি, বাংলার ক্ষতিসাধন করেও অল্প লাভগার হিত করতে যান নি। বরতঃ মহত্ত্বের প্রকৃত সাধনাই
তা হয় না। রবীন্দ্রনাথই বসেছেন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্তা,
সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার
উদ্ভাবনীশক্তি বল পাতি করে। সুতরাং নিজের স্বকীয়তা বিদর্শন দিয়ে বিশ্বপথিকতায় কথা আগড়ানো

কেবল জানমাত্র। বস্তুত যে মানুষ তার নিজের স্বকীয়তায় সফল হবে, সৃষ্টি করতে পারবে তার চারিদিকসীমিত, উৎসাহিত হবে তার তেজ, সেই তেজের প্রেরণেই সে বিশ্বমানবের সাধনাকে অমূল্য করতে পারে, অত্যাশা নয়। এই পথে তার নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বহুমান চিন্তাস্রোত অস্ত্রক্ষেপে সজীবিত করতে থাকে, গাড়া জাগিয়ে তোলে দিকে দিকে, দেখতে দেখতে সে নতুন ইতিহাসের পুরোধা হয়ে ওঠে। গত শতকে বাঙালীর তাই ঘটেছিল।

আজ বাংলা শুধা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, যখন আমরা বাইরের সঙ্গে একালের সম্মাত্র ও রাষ্ট্রিক বন্ধনের অনিবার্য ফলস্বরূপ অনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়ছি, ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে এমন কতকগুলি দুর্লভ কথা যাচ্ছে যা মনে ভরসা জাগায় না। স্বাধীনতালোভের পর এ আশা অসম্ভব ছিল না যে দেশময় এবার বিপুল কর্মের নির্মল স্রোত বইবে, যে স্রোতে আমাদের বহুশালসঞ্চিত আবর্তনা ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। আমরা দেশে নানান স্থানে কর্মের কিছু কিছু ধারা বইতে শুরু করেছি মাত্র, কিন্তু তা এমন পরিমাণে নয় যাতে দেশের চেহারা ফিরে যেতে পারে। পঞ্চাশের দশক থেকে, আমরা পুরাতন বাধন সব ছিড়ে ফেলেছি, কিন্তু নতুন কোনো বাধন গড়ে তুলতে পারি নি। আগেকার সনাতন ও অর্থনীতির বাধনে শহর এবং গ্রামগুলি একধরনে বাঁধা ছিল। আজ সে বাধন কেটেছে। তার বশে নতুন সমাজের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগের কথা দিয়ে মৌচাকের কোষগুলির নতুন গ্রামগুলিকে গড়তে চেষ্টাছিলেন গাভীরা। কিন্তু তাও হয় নি। এখন আমরা যে পথ ধরেছি তাতে গাভীর কথা আর চলবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু সে কথা না চালেও কতি নেই, যদি আমরা একালের অস্ত্র কোনো সফল পদ্ধতিতে দেশ গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু তাও হচ্ছে না। তার ফলে আজ দেশে সকল বাধন কেটে স্বাধীন হবার হানাহানি প্রবল হয়ে উঠেছে। তার একটা বড় উদাহরণ অত্যাশা প্রাণেশিকতা। 'সেই সঙ্গে জাতিগত ভেদবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বাধীনতার পর একমুখ ফিরে যেতে চান সেই প্রাচীন কালে, অর্থাৎ সেই রামরাজ্যে, যে অর্থে গাভীরা কখনো রামরাজ্য শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু অস্ত্র প্রয়োগের কথা বলি কেন? আজ বাংলার দিকে সৃষ্টিপাত করলেও তা দেখা যায়, এখানে প্রাণেশিকতা প্রবল না হলেও ভেদবুদ্ধির অভাব নেই। বৃহৎ কার্কেশনতুন সমাজ গড়ার আঙ্গানে আমরা তেমনভাবে নিগতে পারছি কই? এমন কি সার্বজনীন পুরো কি সংস্কৃতি-সংঘলনের মতো ছোট ছোট ব্যাপারেও তা? আমরা কেবল ভেঙে ভেঙে টুকরো করতেই সিদ্ধহস্ত। স্বাভাবিকতার কথায় এরকম বুদ্ধি নিয়ে চুল চেনা যায় কিন্তু এছাড়া কী করা যায় না। সেইজন্যই বিশ্বিত হবার কারণ নেই যে আমাদের ভাগ্যে কেবলই গ্রন্থির উপর গ্রন্থি পড়ছে— আমরা যে সারা ভারতবর্ষের হাতেই নিরাক্ষর মার খাচ্ছি তাই নয়, আত্মহত্যার চেষ্টাও কম করছি নে। এক-এক সময় মনে হয় এই মারের অনেকখানিই হচ্ছে। আমাদের জাতি, পাওনা। যদি পানের পোলের সঙ্গে নিগতে না পারি, নিগতে না পারি পানের গ্রামের সঙ্গে, স্বাধীনতা যদি প্রলম্বক হয়ে ওঠে, প্রভাবনা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে প্রশংসিত হতে থাকে, সত্যনিষ্ঠার নাম হয় বোকামি, মানবিকতার কল্যাণমঞ্চে নিঃস্বার্থ কর্মীর স্থান বিরল হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, যে পথ প্রেরণের তাকে পরিত্যাগ করে আমরা আপাত-প্রেরণের পথই বেছে নিয়েছি, তা হলে স্বীকার করতেই হবে আজ বিরাট বিশ্ব তার বিশিষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিভাগের ফলে এ দুগে বিশেষ করে আমাদের যে পথে আহ্বান করছে

আমরা সে পথে চলছি না—তা হলে কোন নিতেই হবে মহাঘরের যে উত্তাপে অল্প শুধু আমাদের মুক্তি নয় এমন কি আর্থিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠাও, সেই উত্তাপের ত্বরণে আমাদের কানে পৌঁছয় নি। অথচ একদিন এই পথেই বাংলা ও বাঙালী বড় হয়েছিল। বসন্ত প্রকৃত বড় হবার পথই এই। আর সেসব সে পথই কান্না যে পথে বাঙালী শুধু যে পরস্পর মিলিত হতে পারবে তাই নয়, বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিহিতার্থকে পূর্ণ বিকশিত করে উদ্বেগপথিকতা ও বিশ্বপথিকতায় পথে বাংলাদেশকে বড় করবে, কারণ তাতেই তার চরিত্রে প্রতিষ্ঠা, তাতেই তার দেউ হেতের বিকিবন, যে মহান দকল কালে দকল আত্মকে উগ্রতির উত্ত্বলশিখরে পৌঁছে নিতে পেরেছে।



১ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' খ্রীষ্টচতুর্থশতাব্দীর ইঙ্গিত

শ্রীবিমানবিহারী মল্লমদার

১০১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তবসন্ত রায় বিশ্বক্সত মহাশয় বন-বিষ্ণুপুরের নিকট ঈকিল্যাগ্রামে এক গাঙ্গা পুথির সঙ্গে একখানি নামহীন খণ্ডিত পুথি পান। বসন্তদীন ধরিয়া অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত উহার সম্পাদনা করিয়া, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া ১৩২০ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে পুথিখানি প্রকাশ করান। হুদীর্ঘ দিনের পরিশ্রম সত্ত্বেও পুথির একাদশ খণ্ডের নামের পাঠোদ্ধার করা হইয়াছিল "বালখণ্ড"; কিন্তু উক্ত খণ্ডকে 'বালখণ্ড' বলিবার কোনো পার্থক্য নাই দেখিয়া পরবর্তী সংস্করণে উহাকে 'বালখণ্ড' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য প্রাচীন পুথিতে 'ল'য়ের সহিত দত্তা, 'ন'য়ের পার্থক্য কম, কিন্তু 'গ'য়ের বেলা সে কথা বলা চলে না।

একখানিমাাত্র পুথির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করা যায় না। বিশেষতঃ উপলব্ধ পুথিখানি এক হাতের লেখা নহে—তিন হাতের লেখা। তাহার মধ্যে আবার সম্পাদক মহাশয়ের মতে "তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অমূল্যরূপে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত দূর পড়ে না।" একই যুগে বা একই বংশের একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া একখানি পুথি নকল করিলে, একজন অপরের হাতের লেখার অমূল্যরূপে পরিবার চেষ্টা করে না। তৃতীয় লিপিকরের এই ইচ্ছাকৃত অমূল্যরূপে লেখকজনক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুথিখানির লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে উহাতে "একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় :—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অমূল্যলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।" তিনি পুথির কাল নির্ণয় করিতে বাইবা বলিয়াছেন, "কেবল যে সমস্ত পক্ষে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পক্ষের অক্ষরাক্ষরী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল"। কিন্তু একই পুথিতে তিন বকনের লিপি থাকিলে পুথির কাল নির্ণয় করা উচিত "অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষরের" কালের উপর।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশের তিন বৎসর পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উহার অল্পজীবিতা বিবরণ সংগ্ৰহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১০৪২ বঙ্গাব্দে উক্ত পত্রিকায় তিনি "বায় মন্ত স্থাপন ও পূর্বজাতি সংশোধন করিয়া" লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরের পুথির লিপিতে নাগরী ছাঁদ থাকিত, "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক-হাতের কয়েকটি ব্যতীতাক্ষরে কোণশূন্যতা ও উ স্বরাক্ষরে শূন্যহীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোণশূন্যতা নাগরীর চিহ্ন।" তাহার অভিনব যে কৃষ্ণকীর্তনের পুথি "১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বহু পরে, পূর্বে নয়।"

পুথি যদি খ্রীষ্টচতুর্থের তিরোত্তাবের পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার মধ্যে খ্রীষ্টচতুর্থশতাব্দীর কিছু ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নহে। "রাধাবিরহ"ও দেখি রাধা বড়াকৈ বলিতেছেন, "প্রাণনাথ কাহ্নাক্রি উচ্ছেদ চল।" কোথায় কোথায় কৃষ্ণকে খুঁজিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিতে বাইবা রাধা বলিতেছেন—

আগন্ত চাইহ বড়দি কলসের ঘরে।

আগন্ত চাইহ কাক দ্বারা বড় করে।

তব'। না পাইলো চাইব যথার্থ কোলে ।
 মাথাগতে কাঞ্চি তব'। নিল তোলে ।
 তব'। না পাইলো চাইব যথার্থ কুলে ।
 বাছা যাকিরোঁ কাঞ্চি মাএ সে যোগলে ।
 তব'। না পাইলো চাইব যথার্থ ঘরে ।
 নিশু লসে বেড়াএ সে যথার্থ নিকটে ।
 কৃপাধনে কাঞ্চি চাইব ভাল মতে ।
 তরঙ্গণে চড়ে কাঞ্চি না। যল বাড়িতে ।
 হাথতে গজড় বাধি বাএ সে যথার্থে ।
 তব'। চাইব না। হুনি সঙ্গে ।
 তথাত চাইলো না পাহ ঘরে কাঞ্চি ।
 তব'। চাইব যথার্থে গোপন ঘনে ।
 তব'। চাইব চাইব অস্বস্তিঘনে ।
 গোপন লগা কিনা করে নিশুনে ।

এই পৰ্যন্ত স্মৃতিতে কোনো কষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার পরই লক্ষ্য দেপি যে যাপ্য বলিতেছেন—

তব'। চাইলো ঘরে না পাহ যোগলে ।
 তব'। চাইব দিখা ভাগীরথী কুলে ।
 তব'। চাইব না পাইলো চাইব মাগের ঘরে ।
 মাগের ঘোমতে যাত পুষ্টি নহে ।
 তব'। স্মেলে ঘরে বড়ি না পাহ কাঞ্চি ।
 তব'। পুষ্টি বড়ি সব জন ঘনে ।
 তব'। পুষ্টি পাইব যথ'। স্মেলে ভাগীরথী ।
 আমি অস্ত কথা সব কহিল তোমারে ।
 তোমার ঘোমত কাঞ্চি মোর আদিবন্ধ পাশে ।
 বাসলী দিরে কবি গাইল চৌসালে ।

ঐক্যের কৃপাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোনো দ্বন্দ্ব নাই। সেইজন্য মনে হয় উক্ত অংশের রচয়িতা বলিতে চাহেন—“নিভাত্তই ঘনি ব্রজবংশের কোথাও ঐক্যের সন্ধান” না পাক্কা যায়, তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে ঐক্যের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে খোঁজ কর। সেখানে না পাওয়া গেলে মাগের কাছে লক্ষ্য করিও, কেননা ঐক্যরূপী ঐতিহাসিক মাগের প্রায়ই ঘন। আর সেখানেও না পাইলে সকল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তাহা হইলে “হুনি পাইবে,” সন্ধান বা তব পাইবে যেখানে জগন্নাথ বাস করেন। এই ভোমকে ভাগীরথীকূলের আদিলীলা ও জগন্নাথবনের অদলীলা “আদি অস্ত কথা সব কহিল তোমারে”।

এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিলে পুষ্টির প্রাচীনত্বের দাবি টেকে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে উড়াইয়া দিবার জন্য সম্প্রদায়িক দৃষ্টান্তে কতকগুলি আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ সংস্করণের মূল পদে “ভাগীরথীকূল” মুদ্রিত হইলেও, প্রথম সংস্করণের টীকাই এই পদ ছাপা হয় “ভাগীরথী” কূল রূপে; আর উহার ব্যাখ্যায় লেখা হয় “ভাগীরথীকূলে” অর্থাৎ ভাগীরথী নাম। (কোনো) গোপনত্বে, এইরূপ অর্থ

হইতে পারে।" "শাগরের ঘরে" 'শম্ভের' টীকার প্রথম সংস্করণে ছিল—“পূর্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃ ৬)। এখানে আবার শাগর গোআল বলা হইতেছে। ইনি কে? চতুর্থ সংস্করণের টীকার সংশোধক “ইনি কে?” শব্দ সোপ করা হইয়াছে। কবি বা গায়ক ‘শাগর’ শব্দে সমুদ্রের ব্যতীক করিয়া, পাত্রশর্পে অহুরোধে শাগরকে গোআল। বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। যেখানে মগরাধ বাস করেন সেখানে এই ঐচৈতন্যপী ঐক্যের সন্ধান বা তার মিলিতে পারে বলার তাৎপর্য বৃদ্ধিবার ভক্ত সোচনের ঐচৈতন্যবাদের নিম্নলিখিত উক্তি স্বরণ করা উচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়—

তৃতীয় অঙ্ক কো রবিবার দিনে।

দল্লোথে শীন গ্রন্থ হইল। আগুন।—বৈষ্ণব, পৃ ১১১

“ভাগীরথীকূলে”র অর্থ যে ভাগীরথ নামে কোনো গোআলার ঘরে হইতে পারে না তাহা উপলব্ধি করিয়া সন্দ্যাক মহাশয় পরবর্তী সংস্করণের টীকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ব্রহ্মবল্লব নানসঙ্গতাভীরে” (চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ২১১)। রত্ননাথ দাস গোআমীর স্তবাবলীর অন্তর্গত ব্রহ্মবিলালে “নানসঙ্গতাবীর” উল্লেখ থাকিলেও, রূপসনাতনের কৃন্দাবনগমনের পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়; যদি বা উক্ত নামধেয় সরোবর প্রাক-চৈতন্য যুগের হয়, উহাকে কেহ সহজবুদ্ধিতে ভাগীরথী বলিয়া উল্লেখ করে না।

ঐক্যকীর্তন নামধেয় গ্রন্থখানিতে ঐচৈতন্যলীলার আরও দুই ধরনের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ঐরাধার প্রণয়নাধুরী আচায়েন করিবার ক্ষুদ্র ঐক্য ঐচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্বরূপ-দানোদয় কর্তৃক প্রচারিত (চৈ. চ. ১৪১১) এই সিদ্ধান্ত গোড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের কোনো কথা ঐক্যকীর্তনে পাওয়া গেলে তাহা ঐচৈতন্য-পরবর্তী যুগের যোজন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; “দানবগের” এক আয়গার বড় চট্টোয়াস ঐক্যকেশ ঘারা বলাইহাচ্ছে—

করব কুললন হরি যের বাস।

এবে তোর ভরে কৈল আকতার কাক।—প্রথম সঃ, পৃ ১২৭; চতুর্থ সঃ, পৃ ৪০

আবার “ভারবণ্ডে” দেখি ঐক্যক বলিতেছেন—

ভোআর কারণ রাগা কৈলো অবতার।—প্রথম সঃ, পৃ ১০৫, চতুর্থ সঃ, পৃ ৭০

দ্বিতীয়তঃ বড় চট্টোয়াস ঐচৈতন্য-বচিত “নিবেষণে যুগায়িতঃ, চতুর্বা প্রায়ুয়িতঃ” শ্লোকের ভাব লইয়া দুইটি শীতোংশ রচনা করিয়াছেন। “নিবেষণে যুগায়িতঃ”, ঐক্যকেশের বিরহে এক নিবেদকাল একমুগ বলিয়া মনে হয়, এই ভাবের প্রতিফলি পাই বড় চট্টোয়াসের—

কাক বিনি যের

এবে একম

এক কুল হুগ তাএ।—প্রথম সঃ, পৃ ২৩০

আর “চতুর্বা প্রায়ুয়িতঃ” এর ভাব পাই

আবার প্রাণ যানে

যেখ বরিনে যের

জ্ঞান মননের পানী।

১/ প্রথমকুলে বলা হইতে পারে যে কবি যে কেবল ‘নজর’, ‘বজ্রবিয়া’, ‘কৃতঘাট’, ‘বাঁকি’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, বলা অর্থে ‘পানি’ শব্দের প্রয়োগ উহার অত্যন্ত প্রিয়। চতুর্থ সংস্করণের পত্রায় উল্লেখ

করিয়া করেকটি গুণ্ডিত দিতেছি—‘তোমার বৌবন রাখে পানির কোঠা’ (পৃ ২৬), ‘দখিঞা জাও তাঁগে ছুপে দেখি পানী’ (পৃ ৩২), ‘আবার সঁদি বাই জাও উগি ছুপে দেখি পানি’ (পৃ ৪২), ‘আর শোষত পানি নাই গীও’ (পৃ ৪৩), ‘বোল দখি ছুপ মোর মেলিলেক পানি’ (পৃ ৪৫), ‘বোল ছুপে বোর দিলেক পানী’ (পৃ ৫৬), ‘পানি ছুটি সিক তোকে না করিহ লামে’ (পৃ ৬০), ‘স্বাকর নাম নৈল চারি পাসে পানী’ (পৃ ৬৫), ‘তোমারে ঘরত অর পানি না বাইব’ (পৃ ৭২), ‘এহার পানী গাহিতে সব জনে’ (পৃ ৯৪), ‘সখি পানি নেউ হুগে’ (পৃ ৯৫), ‘আম্বে পানি নিব’ (পৃ ৯৮), ‘কাছের কলসী রাখা পানি জোলসি ল’ (পৃ ১১৩)।

কথা উঠিতে পারে যে বড়ু চণ্ডীদাস যে ঐচৈতন্যপ্রোক্ত স্লোকোক্তের ভাবাত্মক বহিষ্কারণে তাহার প্রমাণ কি? সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু নাই; কিন্তু ঐ কবি অসম্ভবের ৫৮-১৩ স্লোকের অহুবান ‘তোর রতি আনোআনোঁ গেলা অভিসারে’ (প্রথম সঃ, পৃ ২০২-২০৩); ১০১২—২ স্লোকের অহুবান ‘কদি কিছু বোল বোলসি তবে, বশন দ্ধি তোমারে।’ এবং দশাবতার স্লোকের ভাবাত্মক (প্রথম সঃ, পৃ ২০৫) প্রকৃতি স্থানে অহুবানে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে “ঐক্যকীর্তনে”র ৪১৫টি গীতের মধ্যে ২৮২টি অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৭০ ভাগে “বড়ু চণ্ডীদাস” জনিত। আছে। শুধু চণ্ডীদাস জনিতার কোথাও অহুবান দেখা যায় নাই। “অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল” প্রকৃতি, অনন্ত নামধ্বজ গায়ক বা কবির যে সাতটা গীত দেখা যায়, তাহার সহিত “বড়ু চণ্ডীদাস” এবং শুধু “চণ্ডীদাস” জনিতার ভাব ভাষা ও ছন্দের পার্থক্য লক্ষণীয়। “ঐক্যকীর্তনে”র তিনটি স্তোত্রপদ “তমাল হুহু চিকুর গণে” (প্রথম সঃ, পৃ ২২৫), “কেনা বাঁশী বাএ বড়াঘি” (ঐ, পৃ ২২৪), “এন বৌবন বড়াঘি সবই অসার” (ঐ, পৃ ৩০৬) শুধু চণ্ডীদাসের জনিত। পাওয়া যায়।

কিন্তু “ঐক্যকীর্তনের” পুণি গায়কদের মধ্যে শুনা গান হইতে দেখা। গায়কেরা জনিত। সম্বন্ধে সর্বত্র সন্দেহ থাকিতেন না। শুধু চণ্ডীদাস জনিতার অনেক নিকট গীতও ঐ পুথিতে স্থান পাইয়াছে। আনন্দা “তবেসি চাইহ সিদ্ধা ভাগীরথী কুলে” গীতাংশের যে এক স্তোত্র দিয়াছি তাহার জনিতা “বাসলী শিরে বনৌ গাইল চণ্ডীদাসে।” “ঐক্যকীর্তনে”র বহু প্রকারের জনিত। আছে, তাহার মধ্যে ঐ ধরনের জনিতার সংখ্যা সর্বাধিক। ঠিক ঐরূপ জনিতা ৪২ বার এবং “চণ্ডীদাসে” শব্দের পরিবর্তে “চণ্ডীদাস” দ্বিবা ২২ বার, এক্ষণে ৭৮ বার ঐ ধরনের জনিতা আছে। জনিতার দ্বয় ধরিয়া ঐক্যকীর্তনের বিভিন্ন গীতের রচয়িতার চিন্তাশৈলী, ভাব ও ভাষা বিচারের ইঙ্গিত নাত্র বিয়া এখানে এই ক্রম প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন

ঐন্দ্রনীলচন্দ্র সরকার

শিক্ষা-দর্শন ও সাধারণ দর্শন

তার নিজস্ব কোনো দর্শনের অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বার বার অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তা সবেও তাঁর একটি দর্শন ছিল। বুদ্ধি-গঠিত কোনো ইমারত নয়, এক দীর্ঘ বিচিত্র জীবনের যৌলিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃ-উৎসাহিত একটি দর্শন। প্রথমে ব্যাপক কাঠামো রচনা, পরে তার ধরপূরণ— এ পদ্ধতি তাঁর নয়। তাঁর দীর্ঘ রচনাজীবনে বিভিন্ন সময়ে ও প্রসঙ্গে উচ্ছাহিত ধারণা ও অসূক্ষ্মভঙ্গির আপাতবিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সামগ্রিক ও ধারাবাহিকতা আপন। থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং পরে এক বিস্তৃত সাধারণ দ্র্যানের মধ্যে এরা সহজেই ধরা দিয়েছে। হিবার্ট বক্তৃতা উপলক্ষে এইগুলিকেই তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, যদিও বুদ্ধির ক্ষুদ্র চিরকালই তাঁর কাছে অপ্রীতিকর। *The Religion of Man*-এ এই বক্তৃতাগুলিই প্রকাশিত হয়। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, নিজের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ স্ব-কৃত বিবৃতি এই গ্রন্থেই পাওয়া যাবে। এই দর্শনের মূল্য ঘাই হোক, এর বৈশিষ্ট্য এই যে রাহুণটি এখানে তাঁর দর্শনের অঙ্গবর্তন করেন নি, বরং দর্শনই একটি অদ্বৃত্ত ঐশ্বর্যময় জীবনের অঙ্গবর্তী হয়েছে, তাকে ব্যাখ্যাব্যতবে প্রকাশের চেষ্টা করেছে।

এইভাবে জীবনের মধ্য থেকে যে দর্শন জন্ম নেয়, তার পক্ষে একটা বিজ্ঞেয় বিষয়-নিরপেক্ষ সমগ্রতা বাস্তবিক। রবীন্দ্রনাথেরও একটিনাড়া সমগ্রপুষ্টির মধ্যে জীবন ও বিশ্বজন্যের বিভিন্ন দিক ও স্তর সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা সঞ্চিত হয়েছে। তাই তাঁর সাধারণ দর্শন ও তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মূলনীতির কোনো পার্থক্য নেই।

এই অভিন্নতা আবিষ্কারের অক্ষমতার স্রষ্টাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন শিক্ষাবিশ্বের কাছে তার পূর্ণমূল্য পায় নি। এমনকি ঠাৱা রবীন্দ্র-অমরশাস্ত্রী তাঁরাও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে যথেষ্ট প্রেরণা ও ইঙ্গিত লাভ করলেও পাত্যন্তা শিক্ষা-দর্শনগুলির সঙ্গে তুলনীয় কোনো একটি সমগ্র দর্শনের সাক্ষাৎলাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক রচনার পরিমাণ কম নয়, কিন্তু এগুলির অধিকাংশই কোনো-না-কোনো সাময়িক উপলক্ষের সঙ্গে অভিজিত, এবং প্রথম উচ্চারণের সময়েও এগুলির অনেক অসুচ্ছারিত অংশ পূর্ণ হয়েছে, বা স্রোতার মনে মনে পূরণ করে নিয়েছেন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের বৃহত্তর সূক্ষ্মকার্য।

বিশ্বমানব

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যমূলক গন্তরচনাও ইঙ্গিতপ্রদান, উপমাবহন, বোধির বিদ্যায়-চমকে উজ্জ্বল। কোনো স্থানির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা স্থলবদ্ধ সার-সংকলন সম্বন্ধীয় পক্ষে সোচ্ছন্দ্য হয়েও তাঁর কাছে আশা করা যুথ। কাছেই তাঁর ইতিহাস: বিক্ষিপ্ত মতামত একত্র করে সরল স্থলবদ্ধ বিবৃতিরচনার দাবিই আনামেরই নিতে হবে।

এই বিস্তৃত ধার্মিক প্রমাণিত হতে পারে রবীন্দ্রনাথের থেকে উদ্ধৃত হওয়া। সেই চেষ্টাই এখানে করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অর্থ বিশ্বদত্ত বা বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও তারই প্রভাবে ব্যক্তি-সত্তার বৃদ্ধি ও বিকাশ। এই বিশ্বচেতনার মধ্যে আছে মানুষের সংস্কার, গ্রাণ, মন ও আত্মার অন্তর্লব্ধ স্বরূপ। মানুষের অতীত বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ তার মধ্যে সন্নিবেশিত। পরমা নিষ্ঠুরতা বা অপরিবর্তনীয় পূর্ণতার ধারণা এই বিশ্বচেতনা নয়, তাই তাকে absolute বলি চলে না। কিন্তু অত এক অর্থে বিশ্বমানব পূর্ণ ও চরম— তিনি একই স্বল্পত্ব স্বয়ংস্ব চেতনায় নিশ্চিত করেন অসংখ্য ব্যক্তি-বৈচিত্র্য, আর্থিক অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিক সত্য। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তিনি একটি সক্রিয় শক্তি, একটি তাঁর বিশ্ববাস, আত্মা, মন, গ্রাণ ও তত্ত্ব থেকে তিনি রচনা করে চলেছেন শেখার বিবর্তনীয় সৃষ্টি-পদক্ষেপ। তাঁর এই বিপুল উদ্বেগের কুসংস্কার দেখলেই তবে মানুষের বিবর্তনের সত্য অর্থ বোঝা যায়। মানুষ ইচ্ছা করলে তার সন্তান শক্তির এই উৎস, অসংখ্যের এই কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা দূরে রাখা করে চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাকে থাকতে হবে বিবর্তনশক্তির একটি অজ্ঞান নিষ্ক্রিয় ক্ষমতায় হয়ে। কিন্তু যদি সে যুক্ত করে নিজেদের বিশ্ব-অভিপ্রায়ের সঙ্গে, তা হলে তার পক্ষে নিজের বিবর্তনে সজ্ঞান সক্রিয়তা সম্ভবপর হয়। বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে এই যোগসংযোগ ও সহযোগিতার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে প্রকৃত শিক্ষার মূল্য নির্ণয়।

কিন্তু যেতে পারে, এই রকম এক বিশ্বব্যাপী অস্তিত্বের প্রমাণ কি। রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই যে, অত পূর্ণত্ব মানুষের সভ্যতাগুলির সন্তান প্রমাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন সাধনা ও বিভিন্ন মানবদগ্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে তার আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিস্তারের সন্তান চেষ্টার মুখ এই বৃহত্তর দিকে। তার সচেতন মন বিশ্বমানবকে স্বীকার না করুক, তার বসন্তের প্রবণতার মধ্যে এই বসন্তই রয়েছে।

The Religion of Man গ্রন্থে নানাদিক থেকে এই বিশ্বমানব সত্যটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধৃত নীচের দুটি অঙ্কেই এই ধারণার রূপটি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় তা রবীন্দ্রনাথের কথায় পাওয়া যাবে।

“মানুষের একমাত্র বৃত্তির ভাষায় ঘাই নাম দেওয়া যাক—না, অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানব। শ্রেষ্ঠ মানবদ্বারা করি যখন অপরের মধ্যে নিজেদের পাই— আর এই হল ভালোবাসার দৃষ্টি। এই প্রেমই সবগ্রন্থের শাস্ত্র যখন করে আনন্দ— বা মানুষের পূর্ণ ও শেষ সত্য। এরই দ্বারা উন্মোচিত হয় আমাদের বৃহত্তর বৃত্তির ক্ষেত্র—এবং সেখানেই মানব-আত্মার অতুল ঐশ্বর্য অস্তিত্ব হয়েছে সংস্কৃতি ও সহযোগিতার দ্বারা, জ্ঞানের নিত্য সাধনার দ্বারা, আত্মবিশুদ্ধি-নিবিশেষে জনসেবার জন্য বৃত্তির কঠোর তপস্কার দ্বারা। আমাদের জীবনে বা অতিরিক্ত তারই অসংখ্য মনো প্রবণের সেবা, তিনি আমাদের চেতনাকে বিচ্ছিন্নবোধের মাঝ থেকে মুক্ত করেন, মানুষের ভগ্নত্ব তিনিই চিরকাল একত্বের দীপ্তিবিস্তারের আয়োজন—আর সেই হল সভ্যতার মূল প্রেরণা।”

আবার—

“কল্পনার দ্বারা আমরা দর্শনলাভ করতে পারি এই বিশ্বপুরুষের, কিন্তু তিনি আমাদের মনের সৃষ্টি নয়। ব্যক্তিমাত্রের চেয়ে তিনি অনেক বেশি সত্য, আমাদের প্রত্যেককে অভিন্ন করে তিনি তাঁর সর্বব্যব সত্তার অধীশ্বর। তাঁর বিরাট সংস্কারের অসংখ্য চিত্রাঙ্কন বহু বাধাবিহীন অভিন্ন করে সারিবদ্ধ হয়ে

কেবলি চলেছে পূর্ণপোতার দিকে। তাঁর সংগঠনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে। কিন্তু তাঁর সংকল্পের সঙ্গে সজ্ঞান-সামঞ্জস্য রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন। এমনকি আমরা নিজেদের সর্বনাশ স্বীকার করে তাঁর পথে বাধ্যস্বীকৃত করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা সংযোগিতা করি তাঁর সঙ্গে তখন কেবল লাভ করি আমাদের সত্য ধর্ম।”

বিশেষভাবে শিক্ষামূলক রচনাগুলিতে এই ধারণাগুলি কখনোই বিত্বতভাবে বিবৃত হয় নি, কিন্তু এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও স্পষ্ট ইচ্ছিতের অভাব নেই। এবং এ কথাও মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রধান রচনা A Poet's School, একটি অধ্যায় হিসাবে *The Religion of Man*-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর থেকে এ কথা নিঃশেষে প্রমাণ হয় যে তিনি তাঁর শিক্ষা-বর্ণনাকে তাঁর সাধারণ দর্শনেরই একটি অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। নীচের উদ্ধৃতি দুটির দ্বিতীয়টি A Poet's School থেকে—

“তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, যা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।”

“আমি একান্তভাবে দুটি জিনিসকে মিলিত করবার আকাঙ্ক্ষা করছি : প্রাচ্য সাংস্কৃতিক অদ্বৈতের দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্ভরন সে দেখা পায় বিশ্ব-আত্মার; আর সেবার্কে সেই ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ— যা ইচ্ছাপ্রসূতি-প্রসঙ্গের দ্বারা সংস্কারের অভিমার মধ্য থেকে আগিয়ে তোলে সম্পর্কে, সৌন্দর্যকে, কলাবাহকে।”

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত

বিশ্বপুরুষের এই তথ্যটি আর-একটু মনোযোগের সঙ্গে এইবার বুঝে দেখা দরকার। জানা দরকার পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য কোথায়। তাতে রবীন্দ্রনাথের স্থাননির্ধারণ ছাড়া আর-একটি উদ্দেশ্যও সাধিত হতে পারে। সব রকমের বিখ্যাত ও অতিপ্রাকৃত তথ্যকে ‘প্রাচ্য’, ‘উপন্যাস-মূলত’, ‘আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অচল’ প্রভৃতি ধারণার দ্বারা চিহ্নিত করে অবজ্ঞাপোষণের একটি প্রবণতা। আধুনিক পাঠকের মনে থাকা সম্ভব। তা এর দ্বারা দূর হবে। দেখা যাবে পাশ্চাত্য জগতেও বিশ্বাসের অভাব নেই, এবং আধুনিক চিন্তাজগৎ গুরাদির এই তথ্যকে গ্রহণ না করলেও এর থেকে নিশ্চয় বহু চিন্তা ও ধারণাকে আশ্রয় করেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু পরিভাষা সম্পর্কে একটি সংশয়ের নিরসন করতে হবে। বিখ্যাত বা সার্বিক, পরম বা চরম (absolute), অতিপ্রাকৃত, তুরীয় (transcendental)—এই কথাগুলির অর্থের তীক্ষ্ণ সীমানা কেবলি অস্পষ্ট হয়ে পরম্পর মিশিয়ে যেতে চায়, শুধু অবিশেষজ্ঞ পাঠকচিন্তে নয়, সুবিখ্যাত দার্শনিকদের রচনাতেও। সব চেয়ে অসুবিধা শেষ শব্দটি নিয়ে। ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্যে তার বিভিন্ন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একেবারে উচ্চতম শিখরটিকে স্থাপন করা হয়েছে এই দ্বারাজগৎ, নিখিল বিশ্ব এমনকি উচ্চতর লোক বা জাগরণসূত্রেরও উল্লেখ। এই শেষ, পরম সত্য বা জিগন্তাতীত, বিভ্রম, বহুত্ব, বিকল্প, বিকার ও জিন্মাঙ্গিতার দ্বারা বা চিহ্নিত নয় তাকেই ভারতীয় অর্থে বলা যায় তুরীয়। ইউরোপে ক্যাথলিক অধ্যাত্মবাদের কিছু অংশ ছাড়া আর কোনো দর্শনের এই অর্থে তুরীয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেখানে নির্বিচারে এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে মেটোর World of essence ও archetypal ideas সম্বন্ধে, শিষ্টাঙ্গ ও হেগেলের দার্শনিক মতবাদের বিশেষণ হিসাবে, এমনকি কান্টের ‘ক্রিটিক’গুলি সম্বন্ধেও। কান্ট নিজেই ঐ বিশেষণ

ব্যবহার করেছেন অতীতের লতাকে বোকাতে। 'পরম' কথাটিও খাটি ভারতীয় মতে শুধু ঐ তুরীয় সত্য সম্বন্ধেই গ্রহণ্য, কারণ এতেও বোকার নামকরণই লবল সম্পর্কমুক্ত নিচল নির্বিকার সত্যকে।

আমাদের আলোচনার উপরের অর্ধে তুরীয় ও পরম শব্দ দুটি নিশ্চয়োচ্চন, যদিও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি লেখবার সময় পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী কখনো কখনো এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাহলে সেপা দ্বারা পাশ্চাত্য দর্শনগুলিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: যেন্তলি কোনো রকম সার্বিকতা বা বিশ্ববাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যেন্তলি আপেক্ষিকতা ও বহুবাসের ভিত্তিতে গঠিত। শেষের গুলির দৃষ্টী ঐচ্ছিক (secular) এবং বিশ্বহুই ব্যাপারে তার। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাসের অনুবর্তী। আগের গুলির মধ্যে কোনো কোনোটি প্রকৃতির কাঠামোর মধ্যেই তাদের সার্বিক তরুটিকে খাপ পাইয়ে নিয়েছে, কোনোটি বা অতিপ্রাকৃত সত্য স্বীকার করেছে। এই 'অতিপ্রাকৃত' মানে এমন-একটি তথ্য যা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধ ও দৃষ্টির অনধিগম্য, কিন্তু অল্প উপায়ে দ্বার উপলব্ধি অসম্ভব নয়। 'অতিপ্রাকৃত' শব্দটি এই অর্থেই আত্মকাল পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ক রচনায ব্যবহৃত হুচ্ছে।

কোনো বিষয়তরের মধ্যে, আবাসের পৈনন্দিন অতিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোনো অতিপ্রাকৃত সত্যের মধ্যে এই পরিদৃষ্টমান ভগতের অর্থ ও উদ্বেষ্ট অবস্থানে রবীন্দ্রনাথ একা নন, এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গী আছেন ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো, সেন্ট, টমাস একুইনাস, শ্পিনোজা, ক্লোয়েবেল ও বার্মার। এদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে শেখোক্ত দুজনের সঙ্গে তাঁর দর্শনের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁর স্থানকাল পরিসূর্ণ দৃষ্টিতে, তাঁর বিষয়তরের একটা অস্বল্প জীবন্ত প্রত্যক্ষতায। এই তরের সব কয়টি স্তরকেই তিনি ব্যাখ্যাত দৃশ্য নিয়েছেন, এবং সেগুলি আপনা থেকে বিলিত হয়ে রূপ নিয়েছে এক পূর্ণ সত্যের, সার্বিক পুঙ্খবহ। এই পুঙ্খ সত্তা বা তাঁর বিভিন্ন স্তর কেবলমাত্র কতকগুলি অংশের সমষ্টি নয়, শুধুই একটা বিদূর্ন (abstraction) বা সাধারণীকরণ (generalisation) নয়। পূর্ণ তাঁর অংশগুলির যোগফলের চেয়ে অর্থগতীরতায়, সত্যের উচ্চতায়, গুণ ও ক্রিয়ায়, সব রকমেই বড়। ভগতে সে অন্তর্লীন (immanent) সবুত গতিবিধি ক্রিয়ায় প্রদোষক শক্তি রূপে, কিন্তু নিজেই মধ্যে এ একটি সক্রিয় (dynamic) আত্মস্বষ্টিপরায পুঙ্খ-শক্তি যিনি নিজের বিষয়য তত্ত্ব গ্রাণ নন আত্মার ভূগুণং সফলানে নিরন্তর পূর্ণতা থেকে উচ্চতর পূর্ণতায় অগ্রসর হুচ্ছেন। এই পুঙ্খকে ধানলে তাঁর সাহায্যে সাহুয়ের বিবর্তনের আভোপাত্ত ধারাটি দেখা যায়, সেপা দ্বার তা দেহ থেকে গ্রাণ, গ্রাণ থেকে মন ও মন থেকে আত্মার আরোহণের একটি ছেইন প্রবাহ। এবং সব চেয়ে প্রশিবানযোগ্য কথা এই যে, এই পুঙ্খশক্তিকে সাধারণীকৃত ক'রে ভগতে একটা নূতন শক্তির প্রবর্তন করা যায়, ব্যক্তিগত বিবর্তনকে স্রাবিত করা যায়।

কিন্তু তাঁর পাশ্চাত্য বিশ্ববাসীদের উল্লেখ করা হুয়েছে তাঁদের দিকে চাইলে সৌঁচ তাঁদের সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ ও মনোযোগ বিষয়তরের মানসস্বরূপের দিকে। কেউ কেউ অপর রূপগুলিরও ইঙ্গিত নিয়েছেন, কিন্তু হয় এই ইঙ্গিত থেকে গেছে বিচ্ছিন্ন, না হয় তাদের মিলানো হুয়েছে শুধু একটা বুদ্ধিবদ্ধনে। এবং গ্রাণ প্রতি কেহুই তাঁদের চিন্তায় শেষ ফল ও প্রবণতা অগ্রসর হুয়েছে ঐ কেবল একটি বিশ্ববাস-ভগাত্বনের দিকে। এমনকি কোনো বিশেষ দার্শনিক ধর্মের বহু ক'রে তাঁর বিষয়তরকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা কিংবা বুদ্ধিমেধ অতিরিক্ত কোনো গুণ বা ঐশ্বর্যের দ্বারা স্রিত ক'রে তুলেছেন, শুধনি পাশ্চাত্য মনের

স্বাভাবিক ঐহিকতা ও বস্তুতত্ত্ববাদ, সে দেশের পণ্ডিতদের সব রকম অতিপ্রাকৃত ও অতিরৈখিক (supra-rational) তত্ত্বের প্রতি বিধ্বংসতা, কল্পনাটিকে নানিবে এনেছে যাটির পুণিবোধে, এবং তাকে তার সমস্ত রোমান্স ও অতিপ্রাকৃত এলিমেন্ট হিত করে কাছে লাগিয়েছে নিজেদের।

মেটে। বেগেছিলেন একটি সার্বিক 'আইডিয়া'র স্বপ্ন। কিন্তু হুম্বের, প্রেমের চকিতবোধিত ও তাঁর চোখে পড়েছিল। কিন্তু এই সবগুলির সমন্বয় তিনি করতে পারেন নি এবং তাঁর দর্শনকে শুধু এই idea-র ভিত্তিতেই স্থাপিত করেছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁর আইডিয়া একটি অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব, কিন্তু তাঁর নিজের শিষ্য আরিস্টটল-এর হাতেই তা সংকুচিত হয়ে হয়ে পড়াল। Universal Reason বা বিশ্বমানস, যা অতিপ্রাকৃত হবেই এমন নয় এবং যা সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য। আরিস্টটল-এর এই Reason-এও অর্থের যে প্রসার, বুদ্ধিবাদের অতিরিক্ত একটা চেতনার যে পরিবেশ ছিল তা কয়ে কয়ে সেন্সুয়ালের পরে এসে ঠেকল নিছক বুদ্ধিবাদে এবং এখন সাধারণতঃ এই দুটি ধারণা— reason ও rationalismকে একাধিক বলে ধরা হয়ে থাকে।

শ্পিনোজা-দর্শনের বিশ্বতত্ত্ব এই স্বপ্নের অঙ্গলীন। তাকে কখনো তিনি দেখেছেন আত্মস্বষ্টিপূর্ণ প্রকৃতি, 'Natura naturans' রূপে, কখনো বা 'সমস্ত স্থানে ও কালে ছড়িয়ে থাকা মানসিকতা'র সমষ্টি হিগাবে। বাবে বাবে তিনি এই তত্ত্বের প্রাথমিকতায় আনন্দময়তারও স্বপ্নপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, সর্বসম্মত একটি সূক্ষ্মচক্ষু চিত্র তিনি উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর দর্শনের ভাষাও মেটোর দর্শনের নতাই। পাকাতা সৃষ্টিতে বেগুনি এর আতিশয্য বা কৌনিকতা তার বস্তুতত্ত্বের পর এ দর্শন এখন আধুনিক বিজ্ঞান-চিত্তার মূল ভিত্তি, এমনকি একে বলা হয় বিজ্ঞানের নিম্নতম দর্শন।

আধুনিক ইউরোপে বার্গস-দর্শনের অবির্ভাব একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। তাঁর বিশ্বগ্রাণ, élan vital ও তাঁর নিজস্বগণীল আত্মস্বষ্টিমূলক বিবর্তন, emergent self-creative evolution, মানসীয় কাল্পনিকতা মাত্র নয়, নিছক বুদ্ধিকৃত সংযোজননের কোশলও নয়। বার্গস জীবনবোধে 'কান পেতে শোনের', 'আধ্যাত্মিক স্টেটিস্কোপের দ্বারা' শোনের প্রাণের ছন্দপিকরণ। তাঁর বিশ্বতত্ত্ব এমন একটি প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য যা ইউরোপীয় দর্শনে জন্ম, বয়ঃ প্রাপ্ত্য সাধকপ্রটোর উপলব্ধির সঙ্গেই তার মিল দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দিকে পাকাত্যাহ্বলত অহুসারের ফলে বার্গস তাঁর এই 'প্রত্যক্ষ দর্শন'কে প্রাণতত্ত্বের বুদ্ধি-প্রমাণের উপর স্থাপিত করতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববাসকে বার্গসের এই প্রেরণাময় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে দেখাই পাকাত্যামনের পক্ষে হিতকর হবে। রবীন্দ্রদর্শনের একটি দিকের রহস্য এর ফলে উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই বিশেষ দিকটিতেও রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ তাঁর বিশ্বতত্ত্ব শুধু অঙ্গলীনই নয়, তা শুধু বোধির (intuition) ক্ষুণ্ণেই নিজের কাষ কুঁয়ে চলে না। নিজের ইঙ্গিত বাইরেও এর পড়াবার স্থান আছে, এবং পূর্ব জ্ঞাত জ্ঞান চিত্তার ধারা কাম করতেন এ সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথের বলাক-সুগের কাব্যে বার্গস-প্রভাব অনেকটাই দেখেছেন। বার্গসের রচনাপাঠে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আত্মা অভিজ্ঞতার স্বরূপ অপেক্ষাকৃত সহজে বিরোধ করেছেন এ কথা বলা অসম্ভব হবে না। নির্ভরের স্বপ্নতত্ত্বেই এই প্রাণরূপের প্রথম আবেগের প্রকাশ, এবং এ কবিতা সেবা হয়েছিল Creative Evolution প্রকাশিত হবার বহু বৎসর আগে। কবিতাটির মূলতত্ত্ব-নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ নিজেই The Religion of Man-এ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ণতর সাদৃশ্য পাওয়া যাবে এমন একজনের মধ্যে যিনি শিক্ষাবিদ হিসাবে অগ্ন্য-বিখ্যাত, কিন্তু দার্শনিক জগতে তার প্রতিষ্ঠা কম। স্ক্রোয়েবেল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পুত্র, বাংলায় ক্যাথলিক ধর্মভক্তের কিছু কিছু অংশ তাঁর মানস-গঠনের মধ্যে স্থায়ী স্থানলাভ করে। এক হিসাবে বলা যায় তাঁর শিক্ষাদর্শনে স্ক্রোয়েবেল পুনর্জীবন দান করেছেন অ্যারিস্টটল-টমাস রকাক (Aristotelian-Thomistic solution), যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপের শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সেট টমাস অ্যাকুইনাস গ্রহণ করেছিলেন অ্যারিস্টটল-এর Universal Reason, তার 'matter'-এর নিরন্তর বিবর্তিত হয়ে 'form'-এ পরিণত হওয়ার মতবাদ, অর্থাৎ এই জগতের মতোই সম্ভাবনাগুলির মধ্যে। পরিণত হওয়ার তাৎপর্ষ্য। এরই সঙ্গে তিনি জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন ক্যাথলিক অতিপ্রাকৃত ভাগ্যবতত্ব। ফলে এই দু'রকম তত্ত্ব পরস্পরকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও যতটুকু থেকে গিয়েছিল। স্ক্রোয়েবেল এই সমস্যাটির সাধনা করেন। তাঁর রুচিবিশিষ্ট-শিক্ষা ও বাহিরের মুক্তজীবন তাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে অস্বল্প পরিচয়ের অধিকার দেয়, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি অতিপ্রাকৃত সত্যের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবনের প্রত্যক্ষ ও মৃৎ তথ্যগুলির যোগসমনে লক্ষ্য হন, তাঁর নিজের ভাষায় 'চার্টের সঙ্গে যুক্ত করেন প্রকৃতির নন্দিত'। স্থায়ী প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা নয়, বরং যা তাঁর সবত লেখার দেখা যায় সেই ধীর শ্রবণীয় মননশীলতার দ্বারা তিনি পান তাঁর 'চিরন্তন ঐক্য'কে।

"এই সং-নিয়ামক বিশ্বাসের ভিত্তি ও উৎস হতে পারে একটি সর্বব্যাপী, উদ্ভোগশীল, জীবন্ত, আত্মসচেতন, অতঃপর চিরন্তন ঐক্য।" "এই ঐক্যই ঈশ্বর।"

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের মূখেও অস্বল্প হতে পারে। শুধু ঐ 'বিশ্বাস' ও 'ঐক্য'র বিদূর্ত দায়বাহ্য উপর হয়তো তিনি এতটা কোর দিতে পারেন না। বরং তিনি তুলে ধরতেন প্রকৃতি ও জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের দিকটিকে, স্বষ্টির পরমাস্বর্গকে, এক বিরাট চেতনার দীপ্তি, শান্তি ও স্ববাক্যে। প্রসঙ্গ, গভীরতা, ও প্রত্যক্ষদর্শনের যে তথ্য এই দুজন মনীষীর মধ্যে দেখা যায় তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের মন ও আত্মার অধিকতর ঐক্য ও সার্বভৌম। তা নইলে দু জনের নিজস্ব-তত্ত্বী ও গতিপথের আদর্শ সাদৃশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্ক্রোয়েবেলের একটি উক্তি নীচে দেওয়া হল। দেখা যাবে আগে উক্ত রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য খুঁজি কম।—

"শিক্ষার দ্বারা জীবিত তুলতে হবে মানুষের দিবা সারাংশকে (divine essence), তাকে তার ক'রে এসে তুলে ধরতে হবে সচেতনতার; সবত হাঙ্গলটাকেই জায় মধ্যে যে দিব্যতত্ত্ব জীবন্তভাবে বর্তমান তার স্বাধীন সচেতন অহবর্তিত্য প্রবৃত্ত করতে হবে এবং জীবনে এই তত্ত্বের স্বাধীন রূপায়নে সর্ব ক'রে তুলতে হবে।"

এখানে স্ক্রোয়েবেল ও রবীন্দ্রনাথের মিলগুলি আরো স্পষ্ট ও স্পষ্টত্বপূর্ণভাবে নীচের বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে।—

১. বাস্তব জগতের চেয়ে উর্ধ্বতর একটি সত্য আছে।
২. তা শুধু একটি বিদূর্ত বা নীতি-সময়

নয়, কল্পনার আত্মোৎক্ষেপনও নয়। আমাদের মৈনন্দিন জীবনের চেয়ে তা সত্যতর, তার নিম্নেই একটি স্বতন্ত্র সক্রিয় প্রাণশক্তি আছে, এবং তা আত্মসচেতন। ৩. এই তত্ত্ব শাবিক ও শাশ্বত, অতএব 'অতিপ্রাকৃত'। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেও এ উপস্থিত। প্রতি মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান তার অন্তরতম ঐক্য, পরিণতিশীলতার শক্তিরূপে। দৃষ্টান্তরূপে পরিপূর্ণ করে এ অভিন্ন করে বর্তমান। ৪. এই সত্য তার বিরাট চেতনার মধ্যে ধারণ করে আছে মানুষের প্রাণ মন আত্মার অসংখ্য বিভিন্ন স্তর। ৫. শিক্ষার অধিবেশ উদ্বেগ হল ব্যক্তি-চেতনাকে এই উচ্চতর চেতনার অঙ্গপ্রবেশ করতে ও তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিণতিলাভ করতে সাহায্য করা, এবং, বহির্জীবনে ও কর্মে আত্মাত্মিক এই পরিণতির স্বাধীন প্রকাশ ও রূপায়নে হনিপুণ করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বস্ত ক্রিয়াকে বলেছেন 'গ্রেম ও কর্ম', 'বিশ্ব-আত্মার ধ্যানময় দর্শন' ও 'সেবাকর্মে তার বহিঃপ্রকাশ'। শুধু তাঁদের মতবাসেই নয়, শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ও ক্রোয়েবেল আনন্দময় জীবন ও স্বষ্টিমূলক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের সেই পরীক্ষার ফল জগতের দামনে উপস্থিত করেছেন।

বেদন প্রত্যাশা করা যায়, শিক্ষার প্রক্রিয়া ও উপাদান সম্বন্ধে দুই মনীষীর বিষয়কর সাঙ্গু আছে। সে সাঙ্গু এত দূরপ্রসারী যে আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'কিওয়ারগার্টেন'-পদ্ধতির সঙ্গে কখনো না কখনো রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অঙ্গবিত্তর পরিচয় হয়েছিল। কিংবা ক্রোয়েবেলের রচনা খুব সম্ভব তিনি পাঠ করেছিলেন। বেদন ভাবেই হোক, তাঁর চিন্তার ক্রোয়েবেলের কিছুটা প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে ধারা পরিচিত তাঁদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সঙ্গে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর দর্শন যে তাঁর মন ও আত্মার পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। বার্মিস-প্রভাবের মত এক্ষেত্রেও বলা যায় সহস্রাব্দী একটি ব্যক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর নিজের চিন্তাগুলিকেই সহজে বুঝে পেয়েছিলেন।

কিন্তু নিল যতই গভীর হোক, পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্য শেষ কালে, দুজনের কল্পনার শেষ ভূমির ছোঁয়ায়, সমগ্র চেতনার ভিত্তরকার আবেগে। যথাস্থানে হৃদয় পার্থক্যগুলির আলোচনা হবে, কিন্তু দৃষ্টি ও আবেগের কয়েকটি মূল প্রভেদ এখানে সেওয়া হল :—

১. একজন ক্যাথলিক প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, আর একজন কবি— প্রথম তত্ত্বদর্শন হয়েছে দুজনের দুইকন পথে। ক্রোয়েবেল অগ্রসর হয়েছেন 'বিশ্বাস, অস্তিত্ব' ও শীর্ষ একাধি চিন্তার মধ্য দিয়ে; রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। উপলব্ধির অশ্লষ্ট স্থানগুলিকে দৃষ্টিতে তুলতে তিনি সাহায্য নিয়েছেন 'কল্পনা'র— যে কল্পনা আত্মকেন্দ্রিক নয়, সত্যসন্ধি, কিংবা তাঁর আলস্তহীন স্বষ্টিকর্মের অভিজ্ঞতার।

২. স্বভাবে চরিত্রে বালাশিক্ষার কলে ক্রোয়েবেলের প্রবণতা। বুদ্ধিপরাধগতা ও দার্শনিক স্খিত্যের নিকটে। *The Education of Man*-এ তাঁর নির্দিষ্ট শিক্ষানীতির দৃষ্টি হচ্ছে এই: (ক) 'জ্ঞানী হওয়াই মানুষের বস্তুম উদ্বেগ'। (খ) 'শিক্ষার লক্ষ্য হল একটি বিশ্বস্ত, শুদ্ধ, অবাতিচারী, অতএব সাধু জীবন (holy life)'। ক্রোয়েবেল জীবনের বিজ্ঞানে আগ্রহীল এবং তাঁর ঐক্যতর ব্যাখ্যানে গণিতবিশ্ব-বিশারদের বিস্ময়জনক দৃষ্টি লাভ্য পাওয়া যায়। ঈশ্বর ও সাধুজীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ সম্ভারের অঙ্গুত মতবাসের দ্বারাও তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই বেশী স্নেহবান, আবেগগ্রন্থ, সৌন্দর্যপ্রিয়, কল্পনাকুশল, বহিঃ বুদ্ধিমত্তাতেও তিনি কিছুমাত্র কম নন। তিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁর বিশ্বের আধ্যাত্মিক মনুষ্য অবিশ্বাস্য। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক ও ঐহিকের মধ্যে কোনো ভেদরেখা স্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে এ দুই-ই একটিনায়ে ধারাবাহিক পরস্পর-সঙ্গ্রহবিষ্ট সত্যের অংশ। সাধারণ জীবনের বিপরীত কোনো সাধুজীবনে তাঁর আগ্রহ নেই, তিনি চান শুধু হৃদয়ের আনন্দের জীবন, ভালোবাসার জীবন।

৩. উপরের দুটি প্রভেদের মূল হচ্ছে এই। ফোরেবেল থাকে বলাছেন ঈশ্বর এবং সেখানে একটি বিদূর্ভ তত্ত্ব হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ তাকে সেখানে বিশ্বমানব, পরমপুরুষ রূপে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতত্ত্ব তাই একটি নিকটতর, পূর্ণতর সত্য যা মানুষের জীবনের সমস্ত নিকটতিকে স্পর্শ করে। কোনো কঠোর ত্যাগ, ব্যক্তিস্বের কোনো অংশ বর্জন, আমাদের পৃথিবী-জীবনের পূর্ণ অর্থের কোনো সংশয় এ এই সত্য দাবী করে না। বরং এই সত্য নিজের পুরুষসত্তার (personality) বলে মানুষের মনোভাব পুরুষকে সবরকমে কৃতার্থ করে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে বিশিষ্ট দান।

স্বীকৃতি

রুক-বিশোধ চিত্রের রুক বোম্বাইয়ের United Asia পত্র হইতে; নববর্ষ চিত্রের রুক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংগ ও কলিকাতা সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়-অঙ্কিত আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের চিত্রগ্রন্থনীর স্বাক্ষর হইতে;

- জীবনানন্দ দাশের প্রতিকৃতির রুক 'কবিতা' পত্র হইতে; এবং কল্পনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মল্লিকারের রুক 'শনিবারের চিঠি' হইতে প্রাপ্ত। আইন্সটাইন ও নেহরু চিত্র ক্রীড়ামিথ চক্রবর্তীর সৌন্দর্য প্রাপ্ত।

অন্ধাঙ্কলি

কল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮৪, ১২ নবেম্বর ১৮৭৭ মৃত্যু ২২ মার্চ ১৩৬১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫

অনেক দিন আগের কথা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। কল্পানিধানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অরাবুলে’র তুমিকার স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কথা বলেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে আজ সেই কথা মনে পড়ছে। স্বধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “গোয়ালার ঘোলাে দুধ এবং খাঁটি দুধে যে প্রভেদ, একপকার প্রকাশিত রাসি রাসি কবিতা এবং কল্পানিধানবাবুর কবিতায়ও সেই প্রভেদ।”

সহজ কথা সহজ করে বলার মধ্যে যে সত্যতা আছে, কল্পানিধান সেই সত্যতার অবিকারী।

কথার কারিকুরি মিথ্যে চমক হাটি ক’রে একরকমের কবিতা রচনা করা যায়। কিন্তু চমক যেমন চমকেই শেষ হয়ে যায়, ঐ কারিকুরির বাহাদুরিও তেমনি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। স্বপ্নস্বায়ী এই সৌভাগ্য লাভ করার থাকের অভিক্রিতি তাঁদের প্রকৃত কবি ব’লে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু নগদ-বিদায়ের উপরেই থাকের ঠোঁক বেশি তাঁরা আমাদের স্বীকার করা বা না-করা গ্রাহ্য করবেন—এমন আশা করা ঠিক না। আমরাও না হয় তাঁদের গ্রাহ্য না করলাম।

কিন্তু যে-কবিতা অগ্রাহ্য করব ব’লে স্থির করা হবেও অগ্রাহ্য করা যায় না, সে কবিতা হচ্ছে গোয়ালার ঘোলাে ছুধের না, সে কবিতা খাঁটি দুধের কবিতা— সে কবিতা কল্পানিধানের কবিতা। কোনো রকমের কৃত্রিমতা বা আড়ম্বর কল্পানিধানের কবিতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাইরের প্রকৃতি এবং এই কবির নিজের প্রকৃতির মধ্যে যেন বিশেষ পার্থক্য নেই। বাইরের প্রকৃতি যেমন নিজে নিজেই নিজের খুশিতে পূঙ্কিত ও পুঙ্কিত হয়ে ওঠে, কল্পানিধানের কবিপ্রকৃতিও ঠিক তেমনি। পোশাকী সাজের চেয়ে খাট-পোরে সম্বাই কল্পানিধানের কাব্যের বিশেষত্ব। কোনো দক্ষ নালীর হাতের হস্ত একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে সৌখিন বাগান রচিত হয় নি তাঁর কাব্যে, কল্পানিধানের কবিতা হচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে নিসর্গ-লালিত একটি কানন, হিসেব করে গাজিঘে-গুছিয়ে বসানো নেই কোনো লতা কিংবা কোনো গুল্ম, অথচ সব নিলে-মিলে প্রকৃতির এক অপূর্ণ রূপের হাটি হয়েছে।

কল্পানিধান প্রকৃতির কবি। কিন্তু এই কথাই সব কথা নয়, কল্পানিধান প্রকৃত কবি।

প্রকৃত কবির লক্ষণ আছে অনেক। তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে—প্রকৃত কবিতা রচনা করা। আর-একটা লক্ষণও আছে, নিজের ব্যক্তি সম্বন্ধে উদাসীনতা হচ্ছে সেই লক্ষণ। জনপ্রিয়তা-অর্থনের জন্তে কাঙ্ক্ষাশূন্য করা প্রকৃত কবির স্বভাব নয়, প্রকৃতিও নয়। কল্পানিধান প্রকৃত কবির এই স্বিবিধ লক্ষণে লক্ষ্যমস্ত।

জনপ্রিয়তা-অর্থনের জন্তে জনতার চাহিদার যোগানদার হতে হয়। কিন্তু কল্পানিধান যোগানদার ছিলেন নিজের মনেই চাহিদার। বাইরের প্রকৃতিতে যখন শুষ্ক হস্ত উৎসব, স্বর্ষ্য ধ্বন ‘আকাশের কোলে কোবল কাঞ্চল’ ফুটে উঠত, কাউয়ের বনে ঝালর উঠত হলে, তখন কবিও নিজেকে সেই উৎসবে দিতেই মত্ত ক’রে। এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। কবির সেই আনন্দ-উগাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে

অস্বাভাবিক কবিতার রূপে। অত্রের চূর্ণ আকাশে নিক্ষেপ ক'রে যেকি তারকার বিকিরণিকি তিনি দেখান নি, নগ্ন-বিবাহের কাঠাল ছিলেন না বলে তিনি হৃৎকীর্ণ নীলাচলের দেশ থেকে খাটি ভাঙার কিলিকিলি নিয়ে এসেছেন আশাবাদের দ্বারে।

অন্যতঃ হাতভালি নিয়ে কাব্যের বিচার হয় না, কাব্যের বিচার রসবোধের করজোড় নমস্বারে। করুণানিধান সেই নমস্বার লাভ করেছেন। তিনি সার্থক কবি।

এই সার্থকতার ছেতু আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে পরমাত্মীয়-রূপে গ্রহণ ক'রে গভীর হয়েছেন করুণানিধান। তাঁর কবিতার ছন্দে-ছন্দে প্রকৃতির সেই পরিচিত পদধ্বনি ছন্দে ছন্দে বেগে চলেছে। প্রকৃতির কোনো রূপ কিংবা কোনো পোতা আবিষ্কারের উৎকর্ষ উদ্ভাস নেই তাঁর কাব্যে; বর্ণনা-কালে সকলের জ্ঞান এবং সকলের দেখা পোতারই কথা যেন স্বপ্নোক্তিতে তিনি বলছেন, এই রকম অনাড়ম্বর ভঙ্গির সঙ্গেই তাঁর কবিতায় এই আন্তরিক হৃৎ ধ্বনিত হয়েছে।—

চলিলাম যুগে, গ্রামপথে ধূলা, সাপ গেছে পায় হয়ে,

কোথাও পায়ির নখের ভঙ্গি— চোখে পড়ে রয়ে রয়ে।

গ্রামপথের ধূলায় উপর এই অস্পষ্ট চিহ্নগুলিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রকৃতির পোতা ও সৌন্দর্যের অন্তরে তিনি ছিলেন একজন ভূবারি। সেই নিবিড় নেপথ্য-লোকে নিজেকে লুপ্তায়িত রেখে সর্বস্ব যেন মেখে এসেছেন প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ ও স্বর।

বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সম্মতি কবি অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে উপনীত ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। মানবমনের দুঃখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-প্রীতি কামনা-ধ্বনি প্রকৃতি বিবিধ ভাবের সঙ্গে কবির বোগ ছিল অন্তরঙ্গ। এর সবচেয়ে বড় উপাধেয়-রূপে উল্লেখ করা যায় তাঁর 'স্মৃ' কবিতাটি, তার কয়েকটি ছন্দ—

ময়ূরকল্পী চেলীর মতন ফুসানো গিরির শিরে,
গহনা উঠিয়া বাতায়ন-দ্বার খুলিয়া দিলাম ধীরে—
হেরিহু স্মৃৎ বাহুটি বেড়িয়া দু'হায়ে পড়েছে বেশ,
চুমন দিহু কপোলে তাহার হৃদয় লক্ষ্য লেশ।
কি-এক আবেশে মৃদু জীবনে হেরিহু স্নান স্নান,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম বনফুল-বোতুক।

কবির প্রীতিকরুণার হৃদয় আলেখ্য অঙ্কিত করেছে।

যে-কবি যেখানেই স্মৃৎ করল, তাঁর আবাসস্থল থেকে কাব্যতীর্থের দূরত্ব সমান। এই দূরত্ব লাঘব করার দ্বারা যদি কোনো কবি সময় ও শক্তি সঞ্চয় করেন তা হলে তাঁকে প্রকৃত কবি যেমন বলা যায় না, তাঁকে বুদ্ধিমান কবি বলাও ভেদনি দূরত্ব। করুণানিধানের কবিতা পাঠ ক'রে যখন মৃদু হতে হয় তখন তাঁর বুদ্ধির তারিকও করতে হয়। তিনি আত্ম কাব্যতীর্থের দৃশ্যাবলির উপনীত। জীবনের কোনো দূর্বল মুহূর্তেও তিনি কাব্যতীর্থের বীর্ণপথটি সংক্ষিপ্ত করে নেবার দ্বারা ক্ষেপে পড়েন নি। একমুঠ পরিব্রাজকের মত তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রমা ক'রে চলেছিলেন। আত্মপ্রত্যয় না থাকলে এইভাবে তীর্থযাত্রা সম্ভব নয়।

করুণানিধানের কাব্যে রূপের সঙ্গে ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ভাবের লাঘবের সঙ্গে শব্দচরনের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। উপবৃত্ত ভাবপ্রকাশের দ্বারা উপবৃত্ত ছন্দ যেমন দরকার, বিশেষ

কোনো চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে ভেদনি বিশেষ একটি কথা না হলে চলে না। স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই কবির কাছে এই কথা এসে থা। সে বটে, কিন্তু সব সময় নয়। একটি কথা খুঁজে বা'র করার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘদ্রাঘিও অভিযাহিত হয়ে যায়। কল্পানিধানের শব্দচরনের সার্থকতা দেখে মনে হয় হাততালি পাবার মত শব্দ চয়ন না ক'রে তিনি যে করজোড় নবম্বারের ক্ষেত্রে কথা খুঁজে বের করেছেন— এর পিছনে তাঁর বহু বিনিময় স্বকীয় দীর্ঘ ইতিহাস আছে। অথচ, আশ্চর্য এই, কোথাও কোনো-একটি বিশেষ শব্দ যে অনেক স্রম ও সাধনার ফলে তাঁকে নির্বাচন করতে হয়েছে, সেই শব্দের ধ্বনিতে তার প্রতিধ্বনি নেই।

কল্পানিধানের দীর্ঘদ্রাঘনের তুলনায় তাঁর রচনার পরিমাণ খুব বেশি না। অথচ, সেই করেকথানি বইই তাঁর জীবনের সার সংগ্রহ ক'রে আমাদের সম্মুখে কবি-পরিচিতি রূপে বর্তমান। 'করাফুল' দিয়েই কল্পানিধানের কাব্যজীবনের সূত্রপাত। এই বইটির আগে আরো দুইখানি বই 'বনমঙ্গল' ও 'প্রসাদী' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন তিনি অজ্ঞাত কবি। 'করাফুল' থেকেই তিনি স্বীকৃতি লাভ করতে আরম্ভ করেন। এর পরে 'শাস্ত্রিকল' 'ধানদূর্বা' 'রবীন্দ্র-আরতি' ও 'পীতাম্বর'— এই চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতার সংকলন ক'রে 'শতবরী' ও 'ত্রয়ী' নামে দুইটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

কল্পানিধানের সত্তর-বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে কবির সংবর্ধনা-সভায় মোহিতলাল মজুমদার যে কবিতাটি রচনা ক'রে এনে পাঠ করেছিলেন তার কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করে এই আলোচনার উপসংহার করি—

আজও তুমি আগে আগে, আমি ডব পিছে চলিরাছি,

এবারের যাত্রাপথে হারাণ না পশ্চিমে ডব ;

আজও পেঁথে আনিয়াছি সেই ফুল মালা একগাছি—

রূপ বার একদিন রচিঁতাম স্বপ্ন নব-নব।

আপনি লইতে কঠে সে-মালিকা তুমি শ্রীতিভরে,

ফুল ঘোর বড় হয়ে ফুটিত যে তোমার আদরে।

আমি আর কঠে নব, একটুকু পরশন ঘাচি'

বাখিলো করমূলে, আনাবারে— আজও আমি আছি।

কিন্তু হায়, বাংলার এই দুই কবির কেউই আজ আমাদের মধ্যে নেই।

হুম্মিল রায়

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম ১৩ আষাঢ় ১২৩৪, ২৬ জুন ১৮৮৭

মৃত্যু ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

(যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা রবীন্দ্রনাথ থেকে বড়র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে প্রধানত বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিতীর্ণত রচনাকৌশলের অভিনবত্বের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির, আবেগপ্রবণ, মর্জাতীত অতীন্দ্রিতার বিকল্প হিসেবে যতীন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছিলেন বৃহৎ নবের বাস্তবমুখী মুক্তির স্বপ্ন। যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, যে কাব্যমর্শন নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বাংলার কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার প্রতিপাদ্য এই কথা যে, অগতে দুঃখটাই প্রধান, সুখটা বিরল।) ভালো চেয়ে দেখা নম্র যে বেশি নাহিক সন্দেহ—এই দুঃখবোধ তাঁর কবিতার এক অভিনব স্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।) রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ তরুণ নবের কাছে নূতন ভাবে বলা এই নূতন কথাগুলি অত্যন্ত ভালো লেগেছিল।) অন্যথা মুহূর্ত হইত।

কিন্তু কবিতার কাছে এই আকর্ষণ আরো বেশি দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, (তৎকালীন ‘অতি-আধুনিক’ সাহিত্যিকের; রবীন্দ্রনাথের থেকে অল্প বয়স হবার চেষ্টায় তখন নূতন নূতন পথ খুঁজছে।) যতীন্দ্রনাথের বাস্তবমুখিতা, তাঁর স্বপ্ন ও বহুর ভাষা-দৃশ্য, তাঁর অবিচল ও বিজ্ঞানের ভিত্তির ন্যায় নবীন কবিতা এক অভিলষিত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের কবিতার সহস্র ঘরোয়া আটপোরে ভাষা, বিলম্বিত ভাল, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা, মাঝে মাঝে তনুপ্রসূ উপমা ও বর্ণনা তাঁর কবিতাকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে, তার আকর্ষণ তরুণ বিদ্রোহীমুখ কবিগণের কাছে যে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে এ তো স্বাভাবিক। বিশেষত যতীন্দ্রনাথের কবিতার বিষের সৌন্দর্য যে বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নি এমন নয়। তাই যতীন্দ্রনাথ বর্ণন বলেছেন—

কোথা হতে তুমি এসে গো লক্ষ্মি! কোথা ছিলে এতদিন!

আমার প্রমোদভবনের তরে কা'রা হ'ল ভিটাইন?

আমার বীণালি রাস্তা,

উজ্জল আঁধার কত না জীবের নিবাসে জীবন ব্যতি!

অলপাগরে শোভে সহস্র নরন কলরল,

তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণতল!

তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন জরি'

যে ছায়া পড়ছে, তাহাতে লুকাই কত শোক-বিভাবেরী!

ভবেছ আতরদানি

কত প্রভাতের আধেকোটা ফুল বর্ষ নিঃশাতি' ছানি'?

কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব-সুগন্ধ-ঢালা—

লগ্ন-ছিন্ন শিশু-হৃদয়ের কচি মুণ্ডের রাশা!

তখন সেকালের নবীন কবিতা এ রচনার মধ্যে এমন একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেছিল, যা তাঁরা সাপ্তাহে সপ্তাহে সংগ্রহ করে গিয়েছে এই কারণে যে, এর রচনা তাদের রবীন্দ্রসাহিত্যপুট মনের সৌন্দর্যবোধকে নীড়িত করেনি।

✓ হতীশ্রবণের দুঃখবাস তাঁর কবিতাকে বস্তবের বৈশিষ্ট্য আকর্ষণের বিষয় করেছে, আর প্রকাশভঙ্গির অসাধারণতা তাঁর কবিতাকে রম্যাক্ষর করেছে। নতুবা কেবল দুঃখের প্রাধান্য প্রচার ক'রে তিনি একজন স্রবণী কবি হয়ে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। বস্তু তাঁর কবিতার উৎকর্ষ তাঁর বর্ণনাকৌশল ও উপমা-গুলিতেই বেশি প্রকট। হতীশ্রবণের বক্তব্য চমক লাগায় সত্য, কিন্তু তাঁর বলার ভবিটিই প্রকৃতপক্ষে পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য হতীশ্রবণ পেনওথকে রবীন্দ্রোত্তর কবিদলের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ও উৎকর্ষ কবিত্তবে চিহ্নিত করেছে।

✓ যে দুঃখবাস হতীশ্রবণ তাঁর কাব্যে প্রায় আগাগোড়াই— অঙ্কত 'রসীতিকা', 'রসশিখা', 'রসমায়া'তে প্রবলভাবে প্রচার করেছেন, তাঁর মূলে আন্তরিকতা অবশ্যই ছিল, এবং কাব্যে তাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতেই হয়তো তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু ওর মধ্যেই তাঁর আন্তরিক প্রত্যয় সীমাবদ্ধ ছিল, একপ মনে হয় না। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে উল্টোভাবে কথা বলার ভবিটি তিনি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলেন— যেন রবীশ্রবণ 'ক্ষণিকা' রচনাকালে ঠাট্টাচ্ছিল গভীর কথা বলার একটি ভবি বেছে নিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধামাত্রেরই নুতন ভাবে তাঁর বস্তবকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চায়। বিশেষত রবীশ্রবণের সহস্র সাবলীল লাঙ্গলতোর পথে তাঁর আত্মবাস ও অতীন্দ্রিয়তাকে অহসরণ ক'রে এমন কবিতা লেখা সেকালে সহজ ছিল না, যা নিজেকে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। একারণে রবীশ্রবণের কবিতা থেকে দত্ত, অত্র ধাঁচের কবিতা সেসববার একটা আকাঙ্ক্ষা হয়তো হতীশ্রবণকে এ জাতীয় রূপ আটপোরে ভাষায় নুতন ধরনের মতবাস প্রচারে অহুপ্রাণিত করেছিল। 'অহুপ্রা'র প্রথম সংস্করণের কৃত্তিকার কবি বলেছেন, "পুত্রকের নামকরণ বিষয়ে আমি চিরজ্ঞান বাঙা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমির আনন্দানি কোরে একটা কোতুল জাগিয়ে তোলায় প্রয়াস করেছিলাম।" এ উপায়ে পাঠকের কোতুল জাগিয়ে তোলাবার প্রয়াস যে তাঁর কবিতার বক্তব্য নির্বাচনেও কতকটা প্রকাশ পায় নি, এ কথাই বা বলা যায় কী ক'রে? অবশ্য তাঁর এ প্রয়াস যে আন্তরিকতাময় ছিল, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তবে, আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে তাঁর জীবনবর্ণন বলে মনে হতে পারে, সেটা সে-বর্ণনের একটা আধরণমাত্র ছিল, এটাই বেশি মনে হয় ৬

১ হতীশ্রবণের প্রকাশের স্বভাব, বর্ণনার স্পষ্টতা, রচনার বলিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি তাঁর উপমার অসাধারণত্ব পাঠকমাত্রকেই চমকিত করে। তাঁর সহস্রাবস্ত বাস্তবকৃষ্টিভবি তাঁকে অস্বস্তিক তুলে, বস্ত ও সাধারণ দৃষ্টকে হৃদয়ভাবে সেসববার ক্ষমতা দিয়েছিল। যার ফলে তাঁর বস্তব্য অনেক সময়েই অনেক দুরোয়া উদাহরণ, উপমা ও বর্ণনাকে আশ্রয় ক'রে দানা বেঁধেছে।

২ বস্তু লুকায় রাঙা মেঘ হালে পল্লভবে আনন্দনা

✓ রাঙা লছ্যার বারান্দা হয়ে রক্তিন বারান্দা।

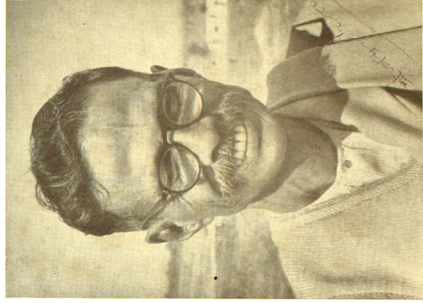
অবস্থা

দিনান্তে ঘবে বার্থ সে রবি অতশিখর 'পরে

ছেঁড়া মেঘে পাতি দুল্লাশমন রক্ত বমন করে।



মোহিতলাল মল্লিক



রতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh)



ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh)

প্রভৃতি পংক্তিতে শুধু অসাধারণ উপমা-কৌশলই লক্ষ্যীয় নয়, প্রকৃতির বহু দৃশ্যাবলীর সঙ্গে বেতাবে নাগরিক ও বৈদেশিক জীবনের বেশবাহ্যে রূপকে উপনিবেশ করা হয়েছে, তাতে তাঁর দৃশ্য বাস্তবদৃষ্টির ও পরিচয় পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের কবিতা যিনি আগে পড়েন নি, তাঁর কাছে এই সব পংক্তি বাংলা কবিতায় অসম্ভব মনে হবে সন্দেহ নেই।

বুদ্ধির মধ্য দিয়ে বকায় বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা যতীন্দ্রনাথ যে ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন তা বন্ধুর ও অনভিলসিত, তাঁর ভাষার দৃষ্টান্ত (diction) গুচ্ছাভিমুখী। যদিও তাঁর ছন্দ-বিল নির্মূল, তবু অনেক দায়গাথ, অনেক উৎকৃষ্ট পংক্তিতে একবরের বিল ব্যবহার করতে তিনি বিধা করেন নি। 'থেকে'র সঙ্গে 'বুকে', 'বাক্য'র সঙ্গে 'কোথা', 'বরীতিকা'র সঙ্গে 'ধাকা', 'জালা'র সঙ্গে 'তলা', 'অমীনতা'র সঙ্গে 'নাতা' প্রভৃতি একবরের বিল তিনি প্রকৃতভাবে এবং অকৃতোক্তের ব্যবহার করেছেন—যা তাঁর সমদায়বিক বা পরবর্তী কোনো কবিই এখন স্বল্পে ব্যবহার করতে সক্ষম পান নি। স্বপ্নের বিষয়, যতীন্দ্রনাথের কবিতায় এর একটি বিলও প্রতিষ্ঠা বদে মনে হয় না। তাঁর ভাষার ও বুদ্ধির আবেগে এ ক্রটি—যদি একে ক্রটি বলা যায়—সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে।

যতীন্দ্রনাথের যে-সব উচ্ছল অসাধারণ পংক্তি আমাদের মনোহরণ করেছিল, এবং যা কে-কোনো পাঠকেই মুগ্ধ না করে পারে না, এখানে তাঁর কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল, যা থেকে যতীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে অপরিচিত পাঠক তাঁর কাব্যের স্বরূপ কতকটা বুঝতে পারবেন বলে আশা করি।

কত না অক্ষ, কত হাছতাশ, কত হাতে পায়ে ধরা,

জ্ঞান হইয়া শাস্তি লভিতে কর্ণ কত না কবি করা।

সব হয়ে যায় কৃষা, =

আসে, হাসে, কাঁদে, চলে যায় ঘুরে, বায়োন্টোপের স্তিতা।

—ঘূনের ঘোরে, দ্বিতীয় বোঁক

কেন ভাই রবি বিহীন করো? তুমি বেশি সব-ঐচ্ছা,

কিরণ-ঝাঁটার ছিন্ন-কাটিতে কেন চোখে বারো খোঁচা?

—ঘূনের ঘোরে, প্রথম বোঁক

স্বপ্নে কে হবে সাবী,

প্রশ্ন ও ধর্ম জাগিতে পারে না বাসোটার বেশি রাতি।

—ঘূনের ঘোরে, প্রথম বোঁক

চিত্তার বহিঃকৃত বিধবার সিঁথার সিঁথুর চেটে

বিশ্বস্তর, হে গণেশবর, যোগাথ জোয়ারি পেটে!

—ঘূনের ঘোরে, দ্বিতীয় বোঁক

ফল সেখে যার নাহি কীমে প্রাণ করা ফুলল লাসি,

তার সত্যকবি, আমরা বহু দুখবানী বৈরাগী।

—দুঃখবানী

ভক্তি যেমন মেঘে গন্ধিত যেমনার শিহরণ,

আলোক যেমন অন্ধব্যোমের হাট্কার-কম্পন,

বিলন যেমন বিরহের ডগে মুখে মুখ, বুকে বুকে,—

জীবন তেমনি মরণের ডগে হৃদের দুক্ দুক্ ।

—জীবন ও মৃত্যু

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে কেবল যে বতীভ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটিই প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, এর মধ্যে তাঁর ভাবাবেগ, বিশ্বের সৌন্দর্যচেতনা এবং উদ্ভাস-উপহার বৈশিষ্ট্যও ছুটে উঠেছে। এককালে নবীন সাহিত্যিকেরা বতীভ্রনাথের ছুটি পংক্তি নিয়ে প্রচুর সোরগোল তুলেছিলেন—

চোখুন্নির থেকে

✓ একখানি মেঘ দার দিতে পারো গোবি-সাহায্যর বুকে ?

এই পংক্তি দুটি অতটা কোলাহলবোমা হোক বা নাই হোক, এর মধ্যে বাস্তবসূচী কবিত্বের যে বেদনাহত রূপটি ধরা পড়ে তা শব্দের নকশেই নাড়া দেয় ।

অগতের ও জীবনের চারদিকে ছড়ানো নানান খুঁটিনাটি থেকে বতীভ্রনাথ তাঁর কাব্যের বিষয় আহরণ করেছিলেন । যে দুঃখ, যে-বেদনা অগভ্যাগ্ন, তার মিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এমন সব ভুল্ল অথচ সদাঙ্গুমান ঘটনাকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন, যা রবীন্দ্রোক্ত 'রোম্যান্টিক' কবিতায় অতিবিলল, অথচ বাস্তব বাস্তব, জেলের ঘনি, পেজের-বাগান নিয়ে তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলি শুন্মাত্র বাস্তবতা-সর্ব্বথ তর্কে পর্দাবসিত হয় নি, ওই সাধারণ অকাব্যিক উপকরণ থেকে তিনি যে প্রকৃত কাব্যরূপ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেটাই বতীভ্রনাথ লক্ষ্যে বড় কথা । বাস্তবের মাছ দেখে

✓ এখনো যে মেঘ কপোর পাত, যে, হীরের টুকরো জাঁখি—

মরণের শীত করে নিবারণ বরফের কাঁথা ঢাকি ।

এ আত্মীয় ভাব যে কবির মনে উদ্ভিত হয়, তাকে একান্ত বাস্তববাদী বা বস্তুতাত্ত্বিক বলা যায় না । এই জন্য আধুনিক বা সামাজিক বাস্তববাদীরা কবিরের সংগে বলি বতীভ্রনাথকে বর্ণনা করা অসংগত । বরং এ কথাই বোধহয় বলা চলে, যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বতীভ্রনাথ কাব্য রচনা করেছিলেন, তা অল্পহৃতিময় সৌন্দর্যলোকের মিকেই বেশি অগ্রসর । জীবনের বহু দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তিনি বেভাবে বহুস্তর কাব্যলোকের মিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, তা তাঁর কবিতার একটি লাইনেই সবচেয়ে ভালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

✱ সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে সেও উকি ।
✱ শ্রাণ্ডভাঙ্গার ছুটে চেয়ে থাকে নখের হৃদয়ী !

৩

বতীভ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রেক্ষাগে তাঁর প্রথম চারখানি কাব্যগ্রন্থ 'বরীচিকা', 'নকশিখা', 'মকমাদা'

✓ এবং 'সাহস'—এ প্রকাশ পেয়েছে । 'জিহামা' ও তার পরবর্তী রচনার তাঁর কাব্যের বসিষ্ঠতা কিছুটা নিখিল হয়ে এসেছে ; এবং এ সময়ে তাঁর আটপৌরে কক ভাষা, বিভিন্ন বর্ণনা ও উপমা, অন্তঃসাহায্য ছন্দবাদ সবই

স্থিতিত হয়ে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল বলে মনে হয়। 'শায়র' গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতা বর্তমানাবস্থার কাব্য-মর্যাদার ভাব-পরিণতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। 'নাতিব' কবিতার কবি লিপ্সু—

আবার আবারে ঘিরে হাসিবে এ ধরা ?
হয়নী সাজাবে তার তারার পদরা ?
চিন্তামাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরঙ্গে নবতত্ত্ব পড়িবে কি টলে ?
সিন্ধুপারে আনন্দিতা নিমিত্তা স্বন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের ভরী ?
মৃত্যুভলে ভিলে ভিলে উঠিছে বা মনে
হয়তো ফিরিয়া পাবে। জননে জননে
নব নব রঙ্গে রূপে। শুধু জানি হাথ
তোমাতে পাই নি বন্ধু পাবো না তোমাথ । •

দুঃখ মোর তাই

হইয়া পরানবন্ধ থাকিয়াও নাই।

'চিরবৈশাখ' কবিতাটি 'মরীচিকা' 'মলশিখা'কে স্মরণ করিয়ে আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যায়।

যত্ন জানো তেও দুনি,—

বাংলার ছেলে ভালোবেসেছিছ কেন আমি মক্কুনি।
শোনো মো বন্ধু ঐ পশ্চিমে মাঘুনি মেঘের ডাক
সেই ভেঙে গিল জোশো হুখ আরু এই সোশো বৈশাখ।
মহাবাহির শূন্য আশ্রয় জলিছে বা জাড়া হুকে,
ঈকরসিক ঝাপটা লাগিয়া কখন সে ধার হুকে।
পকাশ পার, জ্বাই আবার এখনও রাবিব আশা ?
চিরবৈশাখ বাসিবে কি মোরে নির্মলা ভালবাসা ?

'শায়র' গ্রন্থ থেকেই কবির বিদ্রোহ স্থিতিত হয়ে এসেছে বোঝা যায়। 'দুয়ের শাবী' কবিতাটি বে বর্তমানাবস্থার 'দীপালসিনী'কে পক্ষে পক্ষেই স্মরণ করার, বর্তমানাবস্থার কবিত্বপট বোঝবার জন্য এ কথা মনে রাখা দরকার। (বর্তমানাবস্থা বর্তমান-প্রভাবিত বর্তমান-ঐতিহ্যপূর্ণ কবি হইবেও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশিষ্ট প্রকাশ-কৌশল, স্বকীয় ভাষা ও অস্বাভাবিক সব উপনার সাহায্যে তাঁর কবিতাকে গভীরতরঙ্গিততার উর্ধ্বে বাতাস ও সার্বিকতার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমানাবস্থার প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তিনি তার থেকে নতুন স্বরের কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন—এ কৃতিত্ব, কি ঐতিহাসিক বিচারে, কি কাব্যবিচারে, সর্বদাই স্বস্বীয়। তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ তাঁর রচনার স্বতঃই পরিচুট, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তিনি নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি, স্বকীয় একটি জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, যা তাঁর সমসাময়িক সকল কবির মধ্যে পাওয়া যায় না।)

মোহিতলাল মজুমদার

কর ১১ কার্তিক ১২০৪, ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রী ১০ চ্রাবণ ১৩৪২, ২৬ জুলাই ১২৪২

এ দেশের ও অত্র দেশের প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রগুলিতে কাব্যের হৃদ্যভিত্তিক বিচার-বিস্তরণ করা হয়েছে, অথচ নিখিল কাব্য বা কবিতার উৎপত্তির কবিমানস সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি; কবির স্বরূপ বা স্বভাবের সাহায্যে কাব্য-ব্যাখ্যার কৌশল 'আধুনিক' পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছেই আমাদের শিখতে হয়—সমালোচক মোহিতলাল একাধিক প্রবন্ধেই এ কথা বলেছেন, আর আমরা তা মেনে নিতেও প্রস্তুত আছি। প্রাচীনবয়স কাব্যবিচার যে শব্দার্থের বিচার, ছন্দের বিচার, রীতির বিচার, অলংকারের নান-রূপ-নিরূপণ এবং বিশেষেও-নির্বিশেষ রসের 'বোধে বোধ' মাত্র নয়—ক্ষীণকণ্ঠেও এ প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে পারি এমন শাস্ত্রজ্ঞান আমাদের নেই। এ তথ্যও অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যবিচারের চরম দায়িত্ব ধারা বেচ্ছায় ও সার্বকভাবে গ্রহণ করেছেন উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দের পাশ্চাত্য মনীষারই অস্বকর্ষন করেছেন বেশি; ভারত ভ্রমহ আনন্দবর্ধন প্রভৃতি মূনি বা মনীষীদের উক্তি প্রতীতি তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। 'রসাস্বক বাক্যই কাব্য' অথবা অস্বকর্ষন ভাণ্ডারগম্য আর দু-একটি বচন আমাদের জাতিগত ক্রতি বা শ্রুতির পর্দায় উন্নীত বলা চলে, সেই ব্যাক্যাবলিরও ঘেঁষা ব্যাখ্যা আমরা সচরাচর করে থাকি সেটা প্রধানত: 'আধুনিক' মন আর মতি নিয়েই। নূতন পাত্রের যেন পুরাতন সুরাশার-সিক্তন। শোচনীয় পরিণাম সব সময়েই ঘটে এমন নয়।

মোহিতলালের মুদ্রিত কবিতাবলী থেকে মোহিতলালের কবিপ্রকৃতির স্বরূপ-জানই আমাদের লক্ষ্য। একবার সেই স্বরূপজ্ঞান পাকা হলে, কাব্যে ফিরে এসে কবিতার রূপে ও রসে নয় হওয়া, মুছে হওয়া, বহুগুণে সার্বক ও সম্বরণ হবে।

পূর্বাচরণের অঙ্গসংগে প্রথমেই বলে নিই (সেই আচার্য্যরম্পরার মধ্যে, দেশ ও কালের সঙ্গিকট সোপানপীঠে, মোহিতলালকেও সম্মানে ও সাদরে বরণ করে নিতে হবে) স্বরূপ করে নিই—কবিতায় তথ্য ও তত্ত্ব, এমন-কি ভাবা ও ভাব, কখনোই মুখ্য নয়। আর, নয় ব'লেই তো কবিপ্রকৃতির নিবিড় ও নিরুট পরিচয়-সাত এমন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। বড়ো বড়ো অবা-ধরনের অর্থ নিম্নেবেই কথ্য ক্ষেত্রে এমন ঘর উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রাণপত্র বা কবিতা এমন অনায়াসেই রচিত হলে কথা থাকত না। এ দিকে, আয়াস স্বীকার ক'রেও বল নেই, সে আয়াস ও অধ্যবসায় যদি প্রধানত: মতিব্রজীবা বা বুদ্ধিগত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ায় 'বিশেষ' নেই; যে ক্ষেত্রে যেটুকু আছে বাদ ব'লেই গণ্য হয়ে থাকে, না থাকলেই বড়ো ভালো হ'ত। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনো ব্যক্তির, কোনো বিশেষের, বিশেষ কোনো ছাপ নেই আর থাকারও অসংগত। কিন্তু বাসনা বেদনা আবেগ ও আনন্দ থেকেই কবিতার উৎস, অনির্বচনীয় রসেই তার গতি ও স্থিতি। এ বস্তু সভাই অনন্ত ও অ-পূর্ব। অর্থাৎ, রাম রহিম রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ সত্তায়, বিভিন্ন জীবনে, এগুলির বোধ ও ব্যক্তন এবং বাস্তব প্রকাশ একরূপ নয়। অস্বহ্যত একা অবতীর্ণ আছে, না হলে একের ভাষা অস্ত্রে বৃত্ত না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর বিশিষ্টতাই অতিপ্রকট। আর, এই কারণেই কোনো রসিক যখন কোনো কবির রচনাকে গ্রহণ করেন সেই কবির ভাবেই নিম্নেবে ভাবিত করেন, কবির রসে নিম্নেবে রমিত করেন। আবার, যে-কোনো

রচনাকে বিভিন্ন রসিক ব্যক্তি বিভিন্নভাবে বোধ করেন না, যে-কোনো রসগ্রন্থকে কিছু বা নতুন করে স্বপ্নন করেন না, এ কথাও কখনোই বলতে পারব না। 'নিবর্তিতকৃতনিরমরহিতা' দ্বন্দ্ববৃত্তির ধর্মই এই। একজনই প্রতিদিন প্রভাতে একই সূর্য ওঠে নিত্যানুভব বর্ষজুটায় ও স্রোতিকংসনে এবং রবীন্দ্রনাথ যা দেখলেন হোমার তা দেখেন নি; ছাগের দৃষ্টিও যত্ন; আর বহু মধু আপনি আমি কী যে দেখছি, বক্তঃপ্রকাশ সৌন্দর্যে প্রকটিত করতে পারি এমন তাবা আশও ছোটে নি।

আমাদের মতো 'নীলব কবি'দের আরও তাই আগ্রহ সার্থক কবিত্ব নিয়ে, বিশেষ বিশেষ কবিত্বের। নিয়ে, কবিত্বীবন নিয়ে এবং কবিত্বের প্রকৃতি নিয়ে। জীবন বলতে অসঙ্গত স্থল জীবন নয়।—

বাহির হইতে দেখা না এমন ক'বে,

আমার দেখা না বাহিরে !

একই শরীরে সামাজিক নাহয় একটি আছে আর আছে একজন 'অসামাজিক' 'অশৌকিক' কবি, উভয়ে যুগ একটি সৃষ্টিবন্ধনে বাঁধা হলেও অভিন্ন নয়, প্রবন্ধকার মোহিতলাল এটি পুনঃ পুনঃ বলছেন— আমন্ত্রণও অস্বীকার করি নে। বাস্তবজীবনের অনিচ্ছিত অস্থির তথ্যরাশিকে অহুসানে 'ও কল্পনায় সুপীকৃত' করে তুলে কবিকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে হাস্যবাস সত্তাবনাই বেশি; কবিতার দল অপমানের সকল বাস সংবরণ করলেও অহুযোগ করার কিছু থাকবে না— অভাব, সে উভয়ে আমাদের কাশ নেই।

২

অন্ত্যুত্তরস্তাঃ লিপি সেবাস্তাঃ হিন্দালয়ো নাম নগাপিরাঃ ।

পূর্বাণ্যরৌ ভেরানিবীষণাঃ স্থিতঃ পূর্বব্যা ইব বাননঃ ॥

পূর্ব কবির অপূর্ব এই স্নোকে বিশেষভাবে পরিচিত যে শ্রবির পাদবন্দনা অহুচিত হবে না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই নাম। পূর্ব ও পশ্চিম ভোক্তানিধিতে অবগাহন-পূর্বক গগননগল স্পর্শ করে আমাদের পিয়ারে দণ্ডায়মান। জ্ঞাতির মানস-ভুলওলকে ক্রিাযিত্ত ক'রে ফেলে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের নাকবানে সাংযোগ এবং ব্যবধান উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। এমন-কি, সূর্য্যজয়ের গতিপথস্পর্শী উন্নত মন্তক অবশ্যে কোন্ অদৃষ্টের চরণে নত করেছিলেন যে অগ্রর বিদ্যাহুলাস (দরহুলোভব শ্রীমুখন) তাঁরও বিদ্যে ও বেদনার আবেদন জ্ঞাতিকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছেন। এই রবীন্দ্রনাথ থেকেই বাঙালি জ্ঞাতির বা বাংলা সাহিত্যের অগ্রশ্রুত এবং অব্যাহিত আধুনিক কাল, যে কাল মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে নিদ্রতই ধাবিত— সাময়িক বাধা বা বিপণ্য ফেননই হোক। আধুনিক সাহিত্যবিচার বা কাব্যবোধ তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিশাল কবিত্বের পটভূমিতেই লভ্য; এই বানদেওই সূর্য বা বৃহৎ অন্ত্য কবিত্বের রূপজ্ঞান ও স্বরূপজ্ঞানের সহকাধ্য। অতএব মোহিতলালের কবিপ্রতিভার ধারণাও ঐ নির্ধারিত পন্থায় কেমন ও কতদূর অগ্রসর হয় দেখা দাক।

লোকোত্তর রবীন্দ্রপ্রতিভার অভ্যাম্বল পরিচর উৎখাটিত হয়েছে যে মুহূর্তে, ঐ সময় থেকে আর ঐ আলোকে ও উত্তাপে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে যা-কিছু রচনা, তাকেই রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলা চলে। গোবিন্দদাস ও জিৎমঞ্জলী না হলেও, শরৎচন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয় ও মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক। উপস্থিত, সমালোচক মোহিতলাল সম্পর্কে বেশি কিছু বলবার স্থান নেই আর অল্প কিছু বললেও অসুচিত

হবে, অতঃপর কবি মোহিতলাল যে রবীন্দ্রোক্তর বাংলা কাব্যে অভিনয় বিশিষ্ট— তিন-চারজন প্রধান কবির মধ্যে একজন— আমাদের এই ধারণাটি পরিষ্কৃত করতে পারিলেই যথেষ্ট হবে। অক্ষরকুমার, রজনীকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি; রবীন্দ্রপ্রতিভার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন তাঁদের কাব্যেও যদি থাকে, যে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে টেনে এনে কাজ নেই এবং এইটুকু বলাই ভালো যে, রবীন্দ্রোক্তর কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ বড়ো কবি নন, দীর্ঘায়ু হলেও বড়ো-কবিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন যে এমন নয় (রবীন্দ্রনাথের পরে বড়ো কবি বলতে পারি এমন কেউই এই বন্ধুকে ভয়গ্রহণ করেন নি, আগামী শত বা দ্বিশত বৎসরের মধ্যে করবেন কি না তাও বলা যায় না) তা হোক, সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ একটি কবি; অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সহজেই তাঁকে পৃথক করা যায়; তিনি ভাবে ভাষায় ছন্দে অনেকটা রবীন্দ্রপ্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি কখনোই নন। এই বিশিষ্টতার কারণ আর-কিছু নয়, যনের বিশেষ গঠন ও প্রকৃতি, সমালোচক মোহিতলালের ভাষায়— বিশিষ্ট কবিত্ববাস।^১ তিনি বলেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ‘মনোযন্ত্র’, ক্ষুধাবানী, নীতিপরায়ণ, প্রত্যক্ষ-বাস্তবের ‘পূরারী’; ‘চক্ষুর্গের পিপাসা, দৃষ্টি ও শ্রুতির আনন্দ, ...শব্দের ঘর। চিত্ররচনা ও ছন্দের দ্বারা শব্দভরসা’ তার স্বভাবসিদ্ধ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায ছিল বোধের উপর বুদ্ধির প্রাধান্য, সত্যের গভীর গভীর আবেগ ও উপলব্ধির পরিবর্তে ‘মস্তিষ্ক’ের পথে পথে সত্যত বহির্গমনোন্মুখ আবেশ ও কল্পনা, কল্পনা থেকেও ভাষাসংকর কোঁতুল ও কোঁতুক। এই কারণেই, তাঁর কবিতায় এত ছিল বাণবিকৃতি, ছন্দের চাতুরী, মনোমুগ্ধকর কারিগরি, অথচ কী জাতি কী একটা ছিল না, বা অতি অল্পই ছিল। সেই কী-জাতি-কী বস্তুকে ইচ্ছা হয় অলংকারকনি বা রসধনি কলুন, ইচ্ছা হয় তো বলুন—

‘Eternal passion !

‘Eternal pain !’

এই ‘অদীর্ঘ ক্ষুধা ও অনন্ত হাতনা’ বাংলা কাব্যে আনয়ন করেছেন রবীন্দ্র-পরবর্তী দু-চার জন কবি*, তাঁদের পুরোভাগেই আছেন— মোহিতলাল। এই ‘ক্ষুধা ও হাতনার’ বাঘের প্রকাশে আবহমান কালের বহুবিধ সংস্কার বিবাস ও অভ্যাসকে পঙ্গুপাত ক’রে পরিণামভাবনাহীন বিস্রোহ মুখর হয়ে উঠেছে; বিস্রোহের রক্তকেন্দ্র উড়েছে ব্যাপ্য কালবৈশাখী ঝড়ের ঘূর্ণি-খুলোটির আবেগে ব্যাকুল-বিশীর্ণ হয়ে। সেই বিস্রোহের ও বিস্রোহের মোহিতলালই পুরোধ। প্রাণের ও গানের অদীর্ঘ উজ্জলতায দুঃস্বপ্ন, দুর্দমন নব্বকল, তাঁকেও মোহিতলালের অস্থগামী বলতে হবে, কেবল কালক্রমের হিলাব খড়িয়ে নয়, কলাশাফল্যেরও বিচার-বিবেচনায়। কারণ, নব্বকলের ‘বিস্রোহী’ আর তৎসং অন্তান্ত অতিখ্যাত কবিতা, এক কালে বড়ই চমকপ্রদ মনে হয়ে থাকে, আজ আমাদের প্রাণে মনে ভেদন ক’রে আলোড়ন আগাগো না যে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নির্বর কালের বিচারে এ যেন স্থির হয়েই গিয়েছে যে, সে কবিতায ঘড়টা উত্তেজনা অল্পই ভঁতট। গভীর গভীর সত্য নেই। নব্বকলের প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্বের সারীণো বা সহযোগে তার বড়টা জৌলুধ, সেই

১ মোহিতলালের ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ-সন্দর্ভে একটি সুনির্দিষ্ট এবং আছে। ঐ প্রকল্পেরই বহন বর্তমান প্রসঙ্গে বানান বানান উৎকর্ষিত হয়েছে।

২ নব্বকল বই জার্মানির বন্যার বাঘা নেই।

৩ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যের আলোচনায় জগদীশ-কবি গোবিন্দলালের কথা আসে না, এ কথা গুরুই বলা হয়েছে।

দীর্ঘত্ব জলন্ত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার ভেতর আর নীপ্তি নেই, সাহ নেই। অর্থাৎ, নজরুল ও তাঁর কবিতা, দুঃপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই আত্ম ইতিহাসের সাংঘাতী হয়ে উঠেছে, অতীত হয়ে গেছে। মোহিতলালের বিশ্রোহের স্বাধীনতা এমন উত্তরনা না থাকলেও, থাকে নি ব'লেই, তার প্রতিতির গভীর গভীর ভাব ও দার্ঢ়্য, আবেগের স্বাধীন ও সংক্রান্ততা, স্বভাবগত রাগদ্বয়ের সংবৃত সংহত শক্তি—বহুগুণেই অধিক। রবীন্দ্রোক্তের বাংলা কাব্যের বিবেচক পাঠকের কাছে এ কথা আজ বতাই প্রমাণিত মনে করি। উল্লেখিতভাবে এ প্রবন্ধকে ভারী করা অনাবশ্যক।

৩

Eternal passion !

Eternal pain !

তবে কি রবীন্দ্রকাব্যে এর আবেগভরতার অধির করাঘাত এবং গদগদবচন কখনো বাজে নি? বেয়েছে বৈকি। কড়ি ও কোমল'এ, মানসী'তে তার সাক্ষ্য আছে।—

জুগা মিটারার খন্ড নহে যে মানব,

কেহ নহে তোমার আমার

এ কথা কবি এক দিনে বলে উঠতে পারেন নি। কিন্তু, বলতে পেরেছেন যে এই এক বিশ্বয় আর এই আমাদের আশ্রিত্যে এক সৌভাগ্য বলতে হবে। passion and pain -অভিহ্রমণের পালা প্রায় নেপথ্যেই গেলে এসেছেন, বাইরের দশ জনে জানে নি।—

কত প্রাণপণ, দৃঢ় জ্বর, বিনিত্র বিভাবরী,

জান কি, বহু, উঠেছিল গরন কত ব্যথা জেল করি !

অরিতম্বুজিত্তেই উত্তীর্ণ হয়েছেন কবি পরবর্তী কালে, অলক্ষ্য অলোকলোকের দ্বার দেখানে অব্যাহিত, আর—

অকূল শান্তি, সেখায় বিপুল বিরতি !

একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি !

নাহি দেশকাল, ভূমি অনিবেষদুরতি—

ভূমি অচলবানিনী !

এর পরেও নানা ছন্দে, নানা হুরে, নানা ভাষায় এতল আর্তি বা আকৃতি মেগেছে সম্বোধ নেই—

মহান্ দৃষ্টির সাথে মুখামুখি ক'রে হাও ঘোরে

বস্ত্রের আলোতে।

অথবা—

পারবি না কি রোগ দিতে এই ছন্দে রে

খ'লে দাবার, তেলে দাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে !

অথবা—

ধোবা নয়, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোথানে !

কিন্তু, সে হল সম্পূর্ণ অস্ত্র জিনিস ; অর্থাৎ ঐসত্তোষ অথবা divine discontent তাকে বলা যেতে পারে ;

passion and pain'এর—‘দেহ’গত, এমন-কি ব্যক্তিগত, বাসনা বেদনা ও কোডের কী এক আত্ম-দেহান্তর, রূপান্তর !

৪

কিন্তু মর্ত্তজীবনের জালা-ধরণী স্বপ্ন, অসীম জ্ঞান ও চির-অল্পপ্তি, আশা ও অশ্রের শেষ নিফলতা, এগুলিকে অন্তিমতঃ পরিণামে পৌঁছিয়ে দেওয়া, বিদ্বাদগণি সংসীতের বেগে ও ক্ষয়-ক্লেশের পুষাক্ষে, আগ্রহ ও সকল কবির পক্ষে সম্ভব নয়—আর, তার প্রয়োজনও দেখি নে। আপন আপন জীবনের নির্বিড় গভীর অভিজ্ঞতার উৎস থেকে আনন্দবেদনার উজ্জ্বল উদ্ভিত হয়ে উঠবে, কবিতা সম্পর্কে এইটুকু কেবল রসিক-মাত্রেয়ই দাবি—তা ব’লে সকলের সব অভিজ্ঞতা এক ছাঁচেই ঢালা হবে কেন ? হয় না ব’লেই বিশ্ব ও বৈচিত্র্য আছে, আগ্রহ এবং ঐশ্বর্য রয়েছে, আর আমাদেরও এই আলোচনার প্রবৃত্তি হতে হয়েছে।

মোহিতলালের ‘বাখার আরতি’, স্বরগরলের অবিশ্বরণীয় পিপাসা, দেহপাখারের-গঙ্গুনে-অঙ-হংগা-স্পর্শসিকতা, অভিনব ‘দেহবার’ অভিধানে আব্যাত হয়েছে। নূতন একপ্রকার ‘বীরাচার’, নূতন তত্ত্ব, নবরহস্তবার, এমন বললেও অসুচিত হবে না। সাত-সমুদ্র-পারের কোনো কোনো কবিকীর্তির সঙ্গেই বৃষ্টি তার সাক্ষাৎ সম্পর্ক এবং স্বাভাবিক মিল—ডি. এইচ. লরেন্সের নাব স্বতঃই মনে পড়ে। ফরাসী কবি বুলেঙ্কারও আমাদের কবির অপরিসীম ছিলেন না। আর, ঐরূপ আরও দু-একজন পাকাত্য কবির সঙ্গে বর্তমান লেখকের প্রথম পরিচয় মোহিতলালেরই বলিষ্ঠ ভাষান্তরের মধ্যস্থতায়।* সহধর্মিতা বা সহমমিতা। কতখানি নির্বিড় ও গভীর হলে ‘প্রোতপূরী’র মতো স্বাধীন ও সচ্ছন্দ ভাষান্তর সম্ভব হয়, রসিকজন বিবেচনা করে দেখবেন। ‘ভাষান্তর’ শব্দটি ব্যবহার করতেই ঘেন সংশয় ও সংকোচ আসে। অতএব এ কথা কখনোই বলব না যে মোহিতলালের এই দেহবাদ বস্তুটি ধার-করা বা সমুদ্রপারের আমদানি। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মেহের নবোই দেহবাদের মূল আছে এ কথা যেমন সত্য ততোধিক সত্য হল এই যে, দেহতত্ত্বের সাধনা বা ‘সহজিয়া’ আচার বিচার ও বিশ্বাস যে শেষে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে, সে শেষের সম্মান আপন মেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রয়েছে ঐ মন্ডের ও পথের উত্তরাধিকার অর্জন করে বসে আছে। প্রাণবর ‘চৈতন্য’বর মেহের রক্তরাগরঞ্জিত সেই উপলব্ধি এত দিনে যুগোপযোগী কবিতা লিখা কল, বিশ্বজন-গ্রাহ্য সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হল, মোহিতলালের কবিকীর্তিতে এইটেই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দ, কাব্দনেপুণ্য এবং শব্দগাণীত অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রতিভার হিতকর বা কিছু প্রভাব, এ-সমস্তই গ্রহণ করে, আত্মস্বা করে, রবীন্দ্রনাথের অঙ্গ অঙ্গুষ্ঠিত বা অঙ্গকরণের বাইরে গিয়ে ধাঁড়ালেন মোহিতলাল এবং কবি হিসাবে সার্থক হলেন। রবীন্দ্রোক্ত কাব্যে এ ঘটনা এই বৃত্তি প্রথম ঘটল। অকাল-প্রস্থিত সত্যোক্তনাথ আনিকের দিক দিয়ে অল্প মৌলিকতা দেখানো-সহেও, নেপুণ্য-সহেও, আপন রক্তের অক্ষরে আপনার লেখাগুলি লিখতে পারেন নি—আমাদের এ ধারণা আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি। মোহিতলালের সমকালীন বর্তমান্য লেখকের কাব্যশ্রুতিতে ভাব ভাষা রীতি পদ্ধতি অলংকারধর্ম ও রসধর্ম সব-কিছু অপ্রত্যাশিত এ কথা যেমন সত্য এও সত্য যে, উচ্চনিষ্ঠ আল-পথে যিচ্ছ-চালনার মতো দৃঢ়তা ছন্দে আর তৈলহীন রস মেহে সে কবিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার অনেক প্রসারই বাহ্যতঃ উপেক্ষা করেছে ; অন্তরে

* ‘দেহ-পাখারী’ গ্রন্থ—অল্ফ্রেড মালার্মে (Alfred Mallarmé), বাসার্ক এবং প্রোতপূরী (George Sylvester Viereck)

যা নিয়েছে হৃদয়ভাঙার বিশেষ একটি পরিণতি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই ধরা পড়ে নি। তা ছাড়া, বতীগ্রন্থাৎ বাস্তববাদী হতে পারেন, সেহাবাদী ঠিক নয়। অস্তিত্ববোধে অথবা 'শব' ক'রে নাস্তিক যদি বা হয়ে থাকেন, সহজিবা সাধক বা তান্ত্রিক নয়। তাঁর জীবনবর্ণন জ্বালাদা। তাঁকে দুঃখবাদী বলা হয়, সেটা অর্পণতা সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, বতীগ্রন্থাবের যেমন একপ্রকার 'আনন্দময় দুঃখ-বাদ'—

আনন্দ লহ লহ ;

বিজ্ঞ দুঃখ নিজ দ্বুঃখ— দুঃখেরি কেহি বহ !

মোহিতলালের ডেপুটি 'সেহাবাদ' হলেও, সে একপ্রকার 'চৈতন্যময় সেহ-বাদ'। কারণ,—

বশিতে বাজিল ব্যাধার গোহিনী,

রক্তি হল রাসা চির-বিগ্রহিণী

এবং—

যোর কামকলা— কেলি-উজ্জ্বল

নহে মিলনের মিথুন-বিলাস

আমি যে বয়সে কোলে ক'রে কানি, দত হেরি তার মুখ !

আমার পীরিতি সেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—

ভবক্লেশ কামের হৃদকে ধরা মিল নয়কিৎ !

ভোগের ভবনে কীদিছে কান্দা—

লাখ' লাখ' যুগে আঁধি ছড়াল না !

সেহেরি হাবারে সেহাভীত কার ক্রন্দন-গদীত !

অর্থাৎ, সেহ দিয়ে আর সেহের ভিতরেই সেহাভীতের সন্ধান। বাংলার 'বীর' সন্ধান ছাড়া এমন দুঃসাহস হয় কার ? অথবা, দুঃসাহসীর সংখ্যা একাধিক হলেও, অধিকারী বেলাই দুইয়। এ ক্ষেত্রে মোহিতলালই হলেন উচ্চ অধিকারী, হয়তো বা একমাত্র অধিকারী আধুনিক বাংলা কাব্যে। এ বিষয়ে মোহিতলালের অঙ্গণানী অস্ত্রাত আধুনিক কবি (এক কালে তাঁদের গোত্র-নাম ছিল 'অতি আধুনিক') সমভাবে সার্থক হতে পারেন নি। জীবনের জ্বালা তাঁদের কাব্যেই কম নয়, বিশেষ উজ্জ্বল, কলাকৌশলেও উপর নথলও প্রাশংসনীয়, তবু হয়তো বেদনার মূল প্রদর্শিত হয় নি সত্তার গভীরতম প্রদেশ-অবধি, হৃদ্যচিত্ত তীব্রতার অভাব ছিল হয়তো উপলভিতে, এবং বহু ক্ষেত্রে হয় কথা নয়তো কৌশল বস্তুত্বকে আর বেদনাকেও ছাপিয়ে উঠে থাকবে। (ন বেঙ্গল ন বহুনা শ্রুতেন।) সাধকবিশেষে এই বেহবজ, এই শবদান্য, কাশলৈতরবের অকান্ত বোধন, প্রতিভার প্রাণ-হানিকর বা প্রকাশ-হানিকর হয় নি যে এমনও বলা যায় না। মৃত্যু বা নৃহী এনে দিয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যে সেই অপূরণীয় ক্ষতি।

সেহাস্তবাদের পুরোবাহী পথিক মোহিতলাল কিন্তু এ-সব গুরুত কাটিয়ে চলে গেছেন। বিস্ময়ী, শরৎকাল, হেমন্তপৌর্ণমী— কোনো কাব্যগ্রন্থেই* তাঁর আত্যাত্তিক পদাশ্রয় ঘটে নি। সজ্ঞান, সচেতন, সবেদন ভাবে তাঁর প্রাতিভা স্বপ্ননের ক্রিয়া অগ্রসর হয়ে চলেছে।

* পূর্বপ্রকাশিত 'কন্দ-পদ্য' দিয়ে চারখানি মোহিতলালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ; প্রকাশ বাংলা ১০২৮ থেকে ১০৪৮ সালের মধ্যে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহই কবির স্থাপিত প্রতিভার পরিচয়।

অথচ এই সবল প্রতিভার ভিতরে ভিতরে কণ্ঠ আছে, আত্মবিরোধ আছে, সব-শেষে এ কথাও না বললে নয়। আমরা বতপূর বুকেছি সেই কণ্ঠ বা বিরোধ ত্রিবিধ— সেহে এবং আত্মা বিরোধ, বুদ্ধিতে এবং বোধে বিরোধ, আত্মিকে এবং অতীন্দ্র্য বিরোধ। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্পপরিমিত এ বিষয়ে অতি সামান্য ইবিত্ত দেওয়াই হুখেই।

সেহাঅবিরোধ। এই বিরোধের বোধ কোনো না কোনো আকারে মননশীল মরজীব-মাত্রের অস্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। এই বিরোধের সমাধান কেবল বিশ্বাসে উজ্জিত ও অহংয়ের একান্ত আত্মনিবেগনে। তা হলেই সামন্ত ও সংগতির বোধ, একটি শাস্তি ও সন্তোষের কুটিকা, সন্তুষ্টপন হয়। ভগবৎপ্রসাদ, অপারোক্ষানুভূতি, অবিসৃষ্ট— সে তো লক্ষ লক্ষ বেহুয়ারী মধ্যে দু-একজনই পেয়ে থাকে। তবু, রূপিপাশা আর ভূপিপাশা এক বা অবিক্ষেপ্ত নয় ব'লেই, সে বহুশা সকল কবি বা শিল্পীকে ভোগ করতে হয় না মোহিতলাল বা ভোগ করেছেন— বা তিনি কোনো ক্রমেই এড়াতে পারেন নি। তন্ত্রাহারা ভবমিহাসার এই পীড়নে কবিপ্রতিভাতেও চাঁড় বেয়ে গিয়েছে, পূর্বোক্ত কণ্ঠ বেসা দিয়েছে, মোহিতলালের বহু কবিতাই তার অন্ন বা অধিক শাক্য বহন করে। যেমন বলা যেতে পারে, স্বরগরলের 'নারীতোত্র'ঈর্ষক দীর্ঘ কবিতায় বোধের বা বুদ্ধি-বিচারের পায়বর্ষ ও শৃঙ্খলা কতখানি আছে? ঐশে-তোলা আকৃতি বা'ও বা আছে, জীবনগত ও স্বঃপূর্ণ ঐক্য একটি আছে কি? যদি না থাকে, সেহাঅবিরোধের মাদিক বোধই তার হেতু। 'বুধ' কবিতাটিতেও এমনি বিঘাতির 'প্রভাষ' আত্মক'প্রকটিত মনে হয়।—

কুসেছি আত্মার কথা, মানি শু শু সেরে লীলানা

এবংবিধ উজ্জিত বিশেষ আত্মা স্থাপন করা যায় না— না হ্রস্বের দিক দিয়ে, না বুদ্ধির দিক দিয়ে। আর, সেহই যদি সব হয়, অথবা সেহই যদি আত্মা হয়, তা হলে সেহবিশ্ব ও বিশেষ বুধ বা ভোপনহর'কে সম্বোধন ক'রে একপ দীর্ঘাভিনৌর্য ভাবনের বিশেষ কোনো মানে হয় না।—

যদি যদি স্তির-মরণে !

ব্যথা আর নাহি পাই— শেষ হয় নয়নের ধারা !

বল, বল, হে সন্ন্যাসী ! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা ?

এ পিপাসা স্নানধূর— বল তুমি, বল, স্বপ্নহর !—

বুজিবে না ?— মরণের শেষ নাই, বল আর যায় !...

• বুপবধ পত্ত আদি ?— ভরিতেছি স্বভূর বর্ণর

স্তম্ভ শোণিতের ধারে ?— না, না, সে যে মথুর উত্থার !

হুই হাতে শূত্র করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ববার।*

বস্ততা, এসব ক্ষেত্র বিশেষতঃ সেহোক্ত কবিতায়, রসোজ্জল ছন্দরাতি আর অপতপ শব্দশীল-সংকেত, অস্তরীল একটি বিরোধের কারণে কবিত্বতির শিল্পগত ঐক্য বা সার্থকতা পদে পদে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

এই বিরোধকেই অল্প দূরীকোণ থেকে দেখলে বোধ এবং বুদ্ধির বিরোধও বলা যায়। হ্রস্ববোধে স্বভাবতঃই একটি অবিক্ষেপ্ত ঐক্য থাকে। এমন-কি ভিন্ন ভিন্ন বোধেও যদি বিরোধ বেধে ওঠে সে বিরোধ স্বাভাবিক হয় না, নূতন একটি বোধের জন্য দেব। সেহের সঙ্গে বেধ যেমন বিশেষ যায়; আকস্মিক সংঘর্ষে বহুবিদ্যাতের বিকাশ

হলেও তার স্বাধীন অতি অল্প, নির্বিঘ্ন মিলনাবেগেবই এই তাবা ও উদ্ভাস, ত্বাভর্ণণ স্ববিত্ত বারিবর্ষণে তার অবদান। কিন্তু, বোধ ও বুদ্ধির মিলন তেমন অবশ্যস্বাভাবী নয়। শিল্পরূপ এবং রসরূপ পোতে হলে যেমন তখনকে তেমনই তখনকে কবি-বোধের সন্ধানে আত্মনিবেদন করতেই হয়। অর্থাৎ, তখনকে, তখনকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করেই আবেগ ও উপলব্ধি কাবোয় রূপ পায়। অজীর্ণ ভাবনা কাবায়নীরকে অস্বস্ত, কানেই অস্বস্ত করে; এমন-কি যে বনোন্ময় চিত্রের লোকে কারবরূপে ক্ষণে ক্ষণে কত কবিতার জন্ম এবং মৃত্যু, দেখানে হতে হতে হয়ে ওঠে না কবিতা— অর্থাৎ, ঐক্যবান্ প্রাণবান্ কোনো সত্তা পায় না, যদি বা কোনো প্রকারে পুত্রকেও ছাপা হয়। হৃৎকের বিষয়, এমন জুটনা, বোধ ও বুদ্ধির অনাবতক অচ্ছেদ্য বিতর্ক, হয়তো বা লাঠালাঠি, মোহিতলালের একাধিক কবিতায় ঘটেছে।

আঙ্গিকে ও অতিপ্রায়ে বিরোধ যে-কোনো কবির রচনাতেই থাকতে পারে। একাত্তাই আকর্ষক ঘটনা। না ঘটতেও পারে। মোহিতলালের রচনায় একটি বিশেষ কারণে তা বার বার দেখা গেছে, আমাদের এই ধারণা। মোহিতলাল কবিপ্রতিভার যে প্রকৃতি তাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দোবন্ধের নৈখিলমিত্ত পনক্ষেপই তার পক্ষে সহমসিদ্ধ ও স্বম্বর। ছড়ার ছন্দেব কবুহুহু নৃপুত্রব, তার চট্টল চরণের নৃত্যভঙ্গিতে তেমন স্থানে কৈ বাধে নি। সত্যোন্ননাথকেই বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। (ছড়ার ছন্দে দেখা 'মুঘু' ভাঙ্ক' কবিতাটি সার্থক ব্যক্তিজন— 'বিশ্বরী' কাবোয় এই কবিতাটির মতো আরও অবশ্য থাকতে পারে।) রাবীন্দ্রিক শব্দশীত সম্পূর্ণ আত্মসংক'রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবন্ধের সুদূর্ভট চাকতীর আর কান্ধকর্মেও কবি আবারে চমৎকৃত করেছেন। কোনো কোনো কাব্যরসিক বলেছেন বনে হয়, নৃবহান ও মহাসীম, মৃত্যু ও নৈতিকতা প্রভৃতি নাত্যকাব্য-রচনায ববীন্দ্রনাথের পরেই ইনি স্বরীয় সাক্ষ্য অর্জন করেছেন। তথা হিলাবে অস্বীকার করা যায় না, অথচ আর-এক হিলাবে ববীন্দ্রনাথের পর এ ক্ষেত্রে আর-কারোই উল্লেখ করা চলে না। আসল কথা এই যে, এগুলি মোহিতলালেরও স্বেচ্ছা সৃষ্টি নয়। অতি পুণ্ডিত স্মৃতিচরিত্রের সত্যাববণতঃ কি না কে জানে, ষপন-পসারী কাবোয় 'শেখ-শয্যায় নৃবহান' কবিতাটি বর্তমান লেখকের মনের পটে লঙ্ঘ্যাবেবের জানাঘনান সোনার বর্ণে অঙ্কিত—

যসে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আগিলে বেয়ে—

লাল হয়ে গেল পাণ্ডুর রাত্তি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!

জোবের ভীম— পিপাসা-অধির কৈবে কৈবে বয় পাছাড়ে নদী,

তোমার আবার জো সে জোব— এই গাছ-জলে বস'পো যদি!

এমন কোনো কোনো ছত্র আশ্রয় মনে পড়ে। (এই কবিতায় এবং অল্প অনেক কবিতায় বাংলায় সবে উদ্-কার্শি জ্বানের সন্নিবেশে মোহিতলাল অদ্বুত ভক্তিয দেখিয়েছেন, সত্যোন্ননাথ বা নক্ষত্রের তুলনায় কম'কি বেশি হঠাৎ বলা যায় না।) বেদুইন, কান্দাপাহাড়, নাদিরশাহের জাগরণ, নাদিরশাহের শেষ— একাক্ষিত্বলে রচিত হলেও, রসবস্তুর বিচারে এগুলিকেও একপ্রকার নাত্যকাব্য বলা যেতে পারে। তা হলে, রীতিবচিচ্ছার ও কবিত্বজ্ঞের পরিমাণ সন্দিক ব'লে অবশ্যই স্বীকৃত হয়।

বর্তমান প্রবন্ধের শেষ সীমায় এসে স্বতাই মনে হল, সমালোচনাচ্ছলে এ কচকুটি কেনই বা? কবি মোহিতলালের কতগুলি কবিতা, বহু কবিতা, কত যে ভালো লেগেছে, বহুকাল ধরে বহু লোকেরই

ভালো লাগবে, সেই আসল কথাটা বলা হয়েছে কি ? মোহিতলালের কবিতাবগত গভীর তথ্যজ্ঞানসা আর অনাহুত অব্যাহিত বিতর্ক (সেই তার শক্তি, সেই তার দুর্বলতা) তারই ছাওয়া লেগে আমাদেরও সাধ হল বৃষ্টি তব্দননী সাজতে ! সে সাজ দলকে বানায় না। তজ্জুই আর ক্লান্ততা এক নয়। কান পেতে শুনি-না এই স্বর, লোকিকে অলৌকিকে বেশা, বিধানে ও বেদনায় মধুর—

আজিকে স্তম্ভ হেমন্ত-বিতাবরী,
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, হুম্বরী।
তুমি এস মোর রোমনের দিনশেষে
ফুলমালাকে হৈমবতীর বেশে—
ছুটেছিল যার। যৌবনবৈশাখে
রৌত্র-মদ্রি পান করি' মাখে-মাখে,

বত তাপ ভত সরস বাদের তত্ত্ব, হাসিতে ঘাঘরা হাছাকার চেপে বাখে—

তারি নাই আশ, ডর নাই—এস তুমি !
বরষার শেষে শীতল আজি এ তুমি ;

উদিয়ে এখনি কান্তিকী-পূর্ণিমা। হিমনিবিক্ত ধরণীর মুখ চুমি'।...

তুমি এস মোর রোমনের দিনশেষে
তুহিনবোহিনী হৈমবতীর বেশে !

নীলব নিখর বড়ের পাখার শুণু বিখারিরা দাও নন্দনির্নিবেশে।

কবি মোহিতলাল, মনোবী মোহিতলাল, আপন অক্লান্ত কীতি ও কৃতিত্বের উপযোগী সমান ও সমাবর এ বেশের শিক্ষিতলাল অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছ থেকেও পান নি— সে এ বেশেরই ছাখের কথা, লঙ্কার কথা। 'শক্তি মোহিতলাল' সম্পর্কে কোনোরূপ সোথারোপ ক'রেই তার আলন হয় না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার কাছে ঞ্গী। কবি ছিলেন তিনি অস্থিরজ্জায়, বেহে মনে, তন্ত্রায় ও জাগরণে। আর কেউ তত্বক বা না'ই তত্বক, তার জীবনশেষের নিবেদন তার জীবনান্তর্গামিনী অবস্তাই তুনেছেন—

পরশহরবে মজি নাই—তাই গেয়েছি মেহের গান,
মেগে র'ব বলি' করি নাই তা'র অখরের মধু পান।
কত্রেবু সাখে রক্তির সাখনা করিয়াছি একালনে,
প্রাণের পিপাসা জীবিতে জয়েছি রূপের অবেশেবে।...
'অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে বাগিছে প্রাণ !

কানাই সায়ন্ত

জীবনানন্দ দাশ

জন্ম ৬ ফাল্গুন ১৩০৫, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২২

মৃত্যু ৫ কার্তিক ১৩৬১, ২২ অক্টোবর ১৯৪৪

তার আকস্মিক মৃত্যুর পরে তখন দেশ তাঁকে স্বীকার করল। শুধু কলকাতা শহরে নয়, থাকে আমরা মক্কেল বসি, যে কোনো সন্ধ্যার আন্দোলনের ডেউ বেখানে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে একমুগ্ধ অন্তরত: কেটে যায়, সেইসব ছোটো শহর, আধা-শহর, পল্লীগ্রাম, এমনকি প্রবাসী বাংলাসমাজেও তার স্মরণসভার অস্থান অলংকার হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এক সংস্করণ শেষ হতে অন্তরত: পনেরো বছর পেপেছিল, 'বনলতা সেন'-এর দু বছরও লাগল না। দেখে একদিকে ধ্বন আনন্দ হয়, অন্যদিকে ভেমনি এই ভেবে দুঃখ বোধ করি যে, বেঁচে থাকতে তাঁকে কতবড়ো অনাসরই গল্প করতে হয়েছে। প্রতিভার প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রাথমিক বৈরিতা হঠাৎ শুধু বাংলাদেশেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু সে কথা ভেবে আত্মদোষের দায়বদ্ধ হয় না কিছু। জীবনানন্দ দাশের প্রতি আক্রমণ অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে উঠেছিল, তার কারণ আমাদের অনভ্যন্ত আলংকারিক ভাষায়, অনভ্যন্ত ছন্দে এমন এক প্রবল কাব্যমোহে তিনি বইয়ে দিলেন যে, বধির হয়ে তাকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব ছিল। অক্ষমকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি; আর যিনি শক্তিমান তাঁকে প্রথমে অপ্রভা করি, অবিশ্বাস করি, নিন্দা করি, তার পর গ্রহণ করতে বাধ্য হই। মৃত্যুর শোক চিরকাল থাকে না, এবং অসম্ভব ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আমাদের কিছু পূরণও করে। জীবনানন্দের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পরে তার কাব্যের এবং সাধারণভাবে আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রতি বৃহৎ বাঙালী পাঠকসমাজের অনীহা বহি কিছুটা পত্রিমাপেও দৃশ্য হয়ে থাকে—মৃত্যুর ষ্টীডল হাত থেকে সেই দানটুকুই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব।

যেমন পা গিয়েই আমরা ধারা আধুনিক কাব্যের নিবিচ্ছিন্ন আশান করেছিলাম, দ্বিষ্টতাবীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করার প্রবৃত্তি হয় নি ধানের, তারা সেই নিবিচ্ছিন্ন ফলের মধ্যেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীর প্রতি একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাতে শিখেছিলাম। আর যখন ভেবে দেখি 'কেন' তখন একসঙ্গে এত কথা ভিড় করে আসে, এই কাব্যের মাত্রা-আরগটিকে একদিক থেকে আলো ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে যে, সে কথা সংক্ষেপ বলতে বাঙালী বিড়ম্বনা মাত্র। যে স্রাস্তি এবং বিষাদকে বলা হয় আধুনিক মনের উপলব্ধিগত প্রচণ্ড সত্য, আমরা কি সেই উপলব্ধির স্বা পেরেছিলাম জীবনানন্দে? সে কথা হয়তো নিখোঁদ নয়।

আগিয়াছি নেমে এই ক্ষেত্রে ;

সরীরের অবসাদ—জন্মের দর কুল বেতে।

শুভল চাঁদের মতো শিশিরের ভেদা পথ হয়ে

আমরা চলিতে চাই, তার পর যেতে চাই ক্ষর

দিনের আলোর দাল আচ্ছন্নের সুখে পুড়ে সাহির বসন্ত ;

অদ্য যানের ছন্দ আশায়েষ দন

ভ্রাম্যন্ত জরিতে চাই যেহে কবি— পাঠার্থীর উত্তর দলন।

—অক্ষরের দান

এইসব কবিতার মধ্যে অল্পহাত হয়ে আছে যে মনবী বিবর্ততা তার মধ্যে আমরা আমাদের জন্মের প্রতিধ্বনি

মেশাতে পেরেছিল। কিন্তু বিবাদ হলেও তার চরিত্র এমন নয় যার থেকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার স্রস্র হবে। ফলতঃ জীবনানন্দীর কাব্যকলা জীবনকে বর্জন করতে শেখায় না; সবগুলি ইন্দ্রিয়কে তা আঘাত করে, সজাগ করে তোলে, পরমার্থ প্রাপ্তিস্থান প্রতি প্রগাঢ় মৃত্যুভয় জন্মদায় করে দেয়। আধুনিক মনের এই লক্ষণ। জলিল জীবনানন্দের শেষ ফল অক্ষয় আনন্দের প্রতিভা— সে কথা নিঃসন্দেহ নিরুদ্বেগ চিন্তে অবনি কেউ বললেই তা নিয়ে আর আমাদের মন কিছুতে ভরতে চায় না। অসংখ্য গুণ বস্তু সৃজনাত্মক জীবিত আর মৃত্যু ছড়ানো স্বর্গলোকের চেতনা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করছে। অথচ এই অসম্ভব ক্ষতিতে ভরা বিশ্বের পটে অন্ধকার রহস্যের মতো, যেন কোন্ অলৌকিক আধিক নিয়মে অন্ধ অবাধ আনন্দিত প্রাণের আবর্তনও চলেছে, হেমন্তের ফলকাটা মাঠ ঘাস কথা নিরন্তর স্রবণ করিয়ে দেয়। সভ্যতার জটিলতাকে যখন আঘল যেন নি জীবনানন্দ, যখন তিনি ছিলেন নির্জন নিসর্গঙ্গীলার কবি, হেমন্তের মাঠ ঘাট বন জঙ্গল কীট পতঙ্গ শোণাশাখারি কথায় যখন তাঁর কবিতা ভরা, তখনো সেই নিসর্গনিকেতনকে তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তির স্বস্তির সেবালাস বলে তার নান্দীপাঠ করেন নি। মৃত্যুর সম্মিলিত দাড়িয়ে তবু যারা জন্ম ভরে জীবনের সুখাপান করতে লক্ষ্য পায় না (‘জীবন কি নীরন্তু স্রাট এক সুখাখোর’), শেক্সপীয়ারী অর্থে সেই অপরাধের ভাঁড়ের কণ্ঠধর তুমি জীবনানন্দের কাব্যে—

কলর নাটের ‘পরে আমরা দু’জি না আর করণের হান,
এর আর লিপানর গান’

আমরা গাহিয়া যাই পাড়াপীর ভাঁড়ের সজন ;

কল— যাদের কলে বাহ্যের মন

ভরে উঠে উপেক্ষা করি। ক্ষেত্র সান্নাঘোরে, অবহেলা

করে ক্ষেত্র পৃথিবীর সর সিংহাসন—

শেক্সপীয়ারী কল্টোয় কিস্তি, ‘হ্যামলেট’র খনকণ্ঠলের মানসিক চরিত্র বাসের স্পর্শ করে না, জীবনানন্দে ‘রূপ আর কামনা’র গান তাঁদের কাছে অপরিব্যক্ত, অনতিব্যক্ত থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করি। ‘কলসালেবু’র মতো কবিতার স্বাদ তাঁরা কিছুতেই উপভোগ করতে পারবেন না, বুঝবেন না কোন্ প্রাণের উল্লাসে সেখা বায়—

আবারো ইচ্ছে করে এই বাসের স্রাণ হরিৎ রসের মতো

কেনাসে কেনাসে পান করি,

এই বাসের পরীর ছানি— চোখে চোখ যবি,

বাসের পাখবির আবার পাখক,

বাসের চিত্তর বাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নির্বিড় বাস-মাতার

পরীরে সুখাণ অন্ধকার থেকে সেয়ে।

—হাস

তার পর ডিগ্র আর এক অধ্যায়ের উন্মোচন হল জীবনানন্দের কাব্যে, ‘বহাপৃথিবী’, ‘সাতটি সান্নাঘর ভিবি’ ইত্যাদি গ্রন্থে যার নিবর্ধন আছে। ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার রদহুমি, যে শহরকে এককাল এড়িয়ে চলেছিলেন তার তাঁর আর্দ্রাদকে আর ফুল থাকতে পারলেন না। তাঁর এই মধ্যপর্কের কবিতাবলী ব্যাধি বিক্রম, ক্ষয়ক্ষতি মণ্ডিতার বেদনায় যথিত হয়েছে।

কবে হয় এর প্রথম সন্ধ্যাকারে ভূমি বাগান ভাগে
এইখানে
পৃথিবীর এই রাস্তা এ কলার কিনারার সেনে
এখানে আদর্শ সব মানুষ রয়েছে ।
তাদের সন্ধ্যাট নেই, সেবাগতি নেই ;
তাদের জন্যে কোনো সন্ধ্যাগতি নেই ;

চারিদিকে বিকলতার অন্ধত্ব— অলীক প্রাণ ।
কবিতার শেষ হল পুস্তকের নব মস্তুর ;
দুঃখ শেষ হয়ে সেনে নতুন দুঃখের নাবীরোগ ;
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন বহু স্বপ্ন
আঁধার সন্ধ্যা ছাড়া স্বপ্ন
কবিতার দৃশ্য রান ক'রে দেওয়া ছাড়া স্রিয়মাণ
নেই ।...

—এই সব বিন রাত্রি

এই উন্নতিত বেদনার বিষ পরিপাক ক'রে তার পর উত্তীর্ণ-আনন্দের, প্রত্যয়ের সন্ধ্যাগান—

'আজ্ঞা আছে আছে' এই বোধি, ভিতরে
চলছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় রস ;
জয় অতর্ক্য, জয়, অমণ অরুণালয়, জয় ।

তার কাব্যে সাবলীল, উন্নতিত হয়ে উঠতে উঠতে আকস্মিক ভাবে সময় শেষ হয়ে গেল ।

জীবনানন্দ অসামান্য প্রতিভার কবি । কবিদের মধ্যে অসামান্য তাঁরাই যাদের রচনায় জীবনের প্রগাঢ়তম আনন্দবেদনার রূপ উন্মোচিত হয় ; ইন্ড্রিয় দিয়ে বা উপভোগ করবার, হ্রস্ব দিয়ে বা উপলব্ধি করবার, এবং প্রাপ্তের গভীরে বা বোধ করবার বিষয় তাকে ধারা অভাবিতপূর্ব গতিময় ভাবার স্পন্দনে স্বরগীতভাবে তর্জনা ক'রে দেন আমাদের ক্ষর, যা আমরা আর তুলতে পারি না, যে তর্জনার স্রগতে প্রবেশ করলে নিঃক্ষেপে এবং বিশ্বপৃথিবীকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করি আমরা—অসামান্য কবি তাঁরাই । দশ বছর আগেকার নতো আশ্রয় বিজ্ঞপের রাত্রি জীবনানন্দের নাম স্পর্শ করছে না, বটে, কিন্তু এখনো যে তিনি 'বনদত্তা সেন' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা নিয়েই অধিকাংশ পাঠকের কাছে সমধিক পরিচিত তার অনেক অনেক কারণের মধ্যে বিশেষ ক'রে একটি কথা বলা প্রয়োজন । বাঙালী পাঠক স্বাভাবিক পন্থে সেই-সব ধরনের স্মৃতি নিয়েই অভ্যস্ত যার মধ্যে ভাবের কোনো প্রবাহ কিংবা গতি নেই, কোনো এক জায়গা থেকে শুরু ক'রে আর কোনো প্রান্তিতে বা পৌঁছে পের না, যার প্রথম পংক্তি কিংবা স্তবকেই প্রকাশ সে কবিতার কবির অভিশ্রাবটি কী, এবং পরবর্তী পংক্তিগুলিতে উপমা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি উপস্থিত ক'রে সেই কথাটিকেই বিশদ করবার চেষ্টা । কিন্তু আধুনিক কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হাতে নিলে দেখা যাবে কাব্যের গঠন সেখানে একবারে বদল । তার শুরু আছে, মধ্য আছে, পৌছনো আছে । বিশেষতঃ জীবনানন্দের কোনো কবিতা কী কথা বলতে চায়—এক শাইনে তার কোনো সারসংক্ষেপ হবার নয় ।

এসব কবিতা হচ্ছে ভাষায় বোনা কোনো উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শব্দের ধ্বনি এবং ব্যক্তির যথা দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাঠককে সেই অভিজ্ঞতাটি নিজের মধ্যে পুনরায় গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই অভ্যাস দু'দিনে আয়ত্ত হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতাবলীতেই কি বাঙালী পাঠক আজ পর্যন্ত স্বাক্ষর লাভ করতে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথেরও গীতা পরবর্তী, বৈখ্যভাবে দেশ তাঁদের গ্রহণ করবার আগে আনরা তাই আরো কিছুদিন সহজেই অপেক্ষা করতে পারি।

নরেশ ঙ্গ



আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

সম্প্রতি লোকান্তরিত, বিশ্ববিখ্যাত, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আর রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের মধ্যে ১৪ জুলাই ১৯০০ তারিখে একটি সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা হয়। *The Religion of Man* গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্দিনিশ্ঠ-রূপে উহার একটি অঙ্কলেনন সংকলিত আছে। উক্ত অঙ্কলেনন—উহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিপিত মন্তব্য-সহ বাংলা অম্বুবাদে নিয়ে মুদ্রিত হইল।—

'প্রথম মহামুস্কের পর জর্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ নেয়া। মনে পড়ে আবারে আধুনিক জীবনব্যবস্থার বান-উদ্ভবনে আধুনিক স্বল্প শিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম, আর আশঙ্কও আমি বিশ্বাস করি, ধর্মবিশ্বাস এই উন্নতি অঙ্গলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অঙ্কল—বিশেষতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের ভাগ্যমায় বাহ্যের বিজ্ঞানবৃত্তি জীবনে যে স্থ-বিধা'র সৃষ্টি করেছে তার স্থিতিস্থিত লব্ধব্যবহার করাই হে। আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে বয়ে বাহ্য আর উন্নতি, তাতে যখন আঙুলে জনি ঝাঁচড়ে গাশ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি চরমপন জানেন্সির কর্বেদ্রিৎ যেখানে পরাক্রিত আমাদের বৃত্তিভূতি যথ দ্বয়ন ক'রে আমাদের অঙ্কলতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের নিল হল যে, নতুন নতুন দ্ব্যাবিকাষের সাহায্যে প্রকৃতির অঙ্কলস্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনব্যবস্থার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

'গত বৎসরের গ্রীষ্মে আমার যখন জর্মানিতে গাই, বর্লিনের অঙ্গুরে Kaputh আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দু দিন' আগে অক্সফোর্ডে হিব্রুই বক্তৃতাভাষণের ৭ বলেছিলাম, আর *The Religion of Man* নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন বাস্তব ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের ফলপাত্তেই বুঝলাম যে তিনি ধ'রে নিয়েছেন, 'আবার বিশ্ব' মানবিক ধ্যান ধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে বাহ্যের মনবৃত্তির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, বাস্তবানব ঐক্যস্থানে বাধা সেই বিদ্যা মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের সূনিকায় বিরাজিত বাহ্য, সেই অনন্ত মূলভূই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সঙ্গীত বাস্তবতা নিয়ে তার কথক-কারণ তার আছে সত্যভূতের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐপ্রকার সত্যভূতের সীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়; নিরাবরণ নিরাভরণ 'অন্তি' নিয়েই তার কাববার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্মসাধনার নিছক বাস্তব সত্য বা তৎসম্পর্কিত ভাব কোনো কালে মাগে না।

'একক নিঃশব্দ বাহ্যে ব'লে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। কুম্ভাতিভূম্বের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি বাহ্যের বনকে বৃত্তি পেয়ে যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর স্বভাবসক্রে ভূর্যাই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্ত-চূষী, সীমাবদ্ধ অহমের অটল আল থেকে—অগং থেকে—

নিঃস্পর্শ মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট, দুটিই মানুষের স্বরূপপ্রকৃতির প্রকাশ, দৈনিক প্রয়োজন-অগ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিণীম এক সার্থকতা আছে। —রবীন্দ্রনাথ

আইনস্টাইন। সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ভগবৎ-সত্তার আপনার বিশ্বাস আছে কি ?

রবীন্দ্রনাথ। বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের অপ্রমোদ্য সত্তার নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারণা। মানুষী সত্তার গৃহীত হতে পারে না এমন কিছুই তো সেখা ঘর না; কাজেই বিশ্বের বা সত্য তা মানবসত্য। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটি পরিষ্কৃত করা দাক— জড় পদার্থ যে-সব প্রোটন ও ইলেকট্রনে গঠিত তার মাঝে মাঝে আছে অবকাশ, কিন্তু জড় বস্তু তবু কাপা দেখায় না, কঠিন ও সংহত বলেই মনে হয়। তেমনি অগণ্য ব্যক্তির সমাবেশে সমষ্টিমানব, মানবিক সম্পর্কের প্রসায়ে পরস্পর তারা যুক্ত, আর সেই কারণেই মানুষের সংসার একটি জীবন্ত সংহতি। বহুচেতনের বিশ্বভুবনও একই প্রকারে মানুষের সঙ্গে যুক্ত। এ হল মানবিক ভুবন। আমার এই ভাবনা-স্থরের সত্যতা ও সার্থকতা আমি দেখেছি সাহিত্যে, শিল্পে আর মানবজাতির অধ্যাত্মচেতনায়।

আইনস্টাইন। বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে পৃথক দুটি ধারণা রয়েছে— ১. সৃষ্টি হল মানবনির্ভর একটি সংহতি আর ২. সৃষ্টির আছে একটি স্বতন্ত্র সত্তা, মানব-অতিরিক্ত।

রবীন্দ্রনাথ। আমাদের এই সৃষ্টি যখন মানুষের নিত্যসত্তারই দ্বারে বাধা থাকে তখনই তাকে আমরা সত্য বলে জানি, হৃদয়ের বলে বোধ করি।

আইনস্টাইন। সৃষ্টি সম্পর্কে এটি ‘নির্ভেজাল’ মানুষী ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ। অন্তঃস্বপ্ন ধারণার সত্তাবলী কেমন? এই বিশ্বভুবন যে মানবিক বিশ্বভুবন; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পৃথক বিজ্ঞানী মানুষেরই দৃষ্টি। বিচার এবং বোধের একটি কোনো নীতি-অনুধারী তার সত্যতা, নিত্য-মানবেরই সেই নীতি, নিত্যমানবের জীবন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে।

আইনস্টাইন। এ হল মানবিক সত্তার আত্ম-আবিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথ। হাঁ, নিত্যমানব-সত্তার। আমাদের আবেগ-অনুভূতিতে তার অহুতব, কর্মের ভিতরে ভিতরে তার জিন্দা। আমরা জানি সেই পরাংপর মানব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকাশিত, অথচ সকলপ্রকার ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। বিজ্ঞানের বিষয় হল তাই যা ব্যক্তিগত নয়; নৈর্বাচক মানবভুবনের সত্যই তার সত্য। ধর্মসাধনার পথে এই সত্যই আমাদের সত্তার গুরু গভীর প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে, সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও উপলব্ধি একটি সার্বভৌমিকতায়, সার্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সত্যের বিশেষিত মূল্য বা তাৎপর্য আছে, সত্যের সঙ্গে আপনাকে হ্রদে বেঁধে সত্যকেই কল্যাণ বলে জানা যায়।

আইনস্টাইন। সত্য বা হৃদয়ের তবে তো মানব-অতিরিক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ। না।

আইনস্টাইন। সৃষ্টি থেকে মানুষ যদি সোপ পেয়ে যায়, অপরাপ অ্যাপোসো। মূর্তির লৌক্য বা অপরাপতা সেই সঙ্গেই সোপ পাবে ?

রবীন্দ্রনাথ । হাঁ।

আইনস্টাইন । হৃদয়ের সম্পর্কে এ উক্তি আমি যেনে নিই, কিন্তু সত্য সম্পর্কে না।

রবীন্দ্রনাথ । নহে কেন ? মানুষের মধ্যে দিয়েই তো সত্যের ধ্যান-ধারণা।

আইনস্টাইন । আমার বিশ্বাসের অহুহুলে কোনো প্রমাণ আমি দিতে পারি নে, তবু এই বিশ্বাসই আমার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ । এক দিকে, পরিপূর্ণ শব্দবহুর বা সংস্কৃতির যে কল্পরূপ বিশ্বসত্যের উদ্ভাসিত, নিখিল সৌন্দর্যে সেই ছেতু, অত্র দিকে বিশ্বমনের নিখুঁত ও সম্পূর্ণ যে ধারণা তারই নাম সত্য। মনে মনে আমরা ব্যক্তিগত তুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে, সাক্ষীদ্বারা অভিজ্ঞতার সাহায্যে, ব্যক্তিবৈচিত্র্যের আলো জ্বলে, ঐ সত্যের নিকে অগ্রসর হই—সত্যকে জানবার অন্য উপায় কী আছে ?

আইনস্টাইন । বিজ্ঞানদত্ত পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে পারি নে যে, মানুষকে বাদ দিয়েও সত্যতা থাকে, এমনভাবেই সত্যকে ধারণা করা চাই—তবু এরই অহুহুলে আমার হৃৎ প্রতীতি। দৃষ্টান্তরূপে বল। ধ্যায়, জ্যামিতিতে পীথাগোরাসের উপপঞ্জিট (the Pythagorean Theorem) এমন একটি তত্ত্বকে উপস্থিত করছে যা বিশ্বসত্যের মানুষ থাক বা না-থাক সত্য ধরার বাধা নেই। যেটি কথা, মানুষ থেকে স্বতন্ত্র কোনো ‘সং’ যদি থাকে, তৎসম্পর্কিত সত্যও নিশ্চয়ই আছে ; আর, অমানব ‘সং’ যদি না থাকে তেমন সত্যও কিছু নেই।

রবীন্দ্রনাথ । সত্য আর বিশ্বসত্য একই—গেটি হল মানবিক। না হলে ব্যক্তিগত হিসাবে সত্য বলে যা-কিছু জানছি তার সত্যতা কোথায়—অতত, বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে গেলে তো মুক্তিবিচল অপরিহার্য, অর্থাৎ মানবিক মনের মহাহতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মই নির্বিশেষ সত্য, ব্যক্তিময় তাকে আলাদা করে ধারণা করতে অক্ষম। বাক্যে তার বর্ণনা হয় না, কেবল তার আনন্দে আপনাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে ব্যক্তি তাই হতে পারে। কিন্তু এই সত্য তো বিজ্ঞানের এলাকায় নেই। আমরা আলোচনা করছি প্রতীদ্বারা সত্য নিয়ে—মানুষের মনের কাছেই যার সত্যতা, অতএব যা মানবিক, বাক্যে আমরা মাথাও বলি।

আইনস্টাইন । তা হলে আপনার মতে, অথবা ভারতীয় মতে, এ মাথা বা ‘বস্তু’ ব্যক্তিমনের নয়, সন্য মানবজাতির ?

রবীন্দ্রনাথ । বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল এই যে, ব্যক্তিমনের সীমা ও সংকীর্ণতা, ঐশি ও ভ্রান্তি, বাদ দিতে দিতে, বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে ধারণা সম্ভব সেই দিকেই আমরা যেতে চাই।

আইনস্টাইন । সবতো তা এইখানে, সত্য, আমাদের জ্ঞান বা চেতনা-নিরপেক্ষ কি না।

রবীন্দ্রনাথ । আমরা বাক্যে সত্য বলি সে হল সং-বস্তুর ব্যক্তিগত আর বিশ্বগত দুটি দিকের মুক্তিস্ত একটি সমন্বয় বা সংগজিত, তার ধারণা স্থান ব্যক্তি-অতীত মানবে।

আইনস্টাইন । আমাদের বৈদ্যনিন্দী জীবনেও, আমাদের ব্যবহারের জিনিসগুলিতেও, মানুষ-নিরপেক্ষ একটি বাস্তবতা আমরা স্বীকার না করে পারি নে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মুক্তিপিত একটি সম্পর্কে ও শূন্যলাঘ ঘাঁথতে হলে এ দরকার। দকন-না কেন, ব্যক্তিগত কেউ রইল না, ঘরের টেবিল তবু তো ঘরেই থাকবে।

হবীন্দ্রনাথ । ই, ব্যক্তিমনের বাইরে পড়ে রইল টেবিলটা, বিশ্বমনের বাইরে নয় । আমার জ্ঞানগোচর টেবিলটা আমার জ্ঞানের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ।

আইনষ্টাইন । মানুষ-নিরপেক্ষ সত্য সম্পর্কে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না মানি, তবু এটি সব মানুষেরই ধারণা—আদিবাসীরাও বাদ যায় না । সত্যে মানব-অতিরিক্ত বাস্তবতা আনয়্য অবশ্যই কল্পনা করি ; আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মন, এ-সবের অতীত একটি সত্যবস্তু না হলে আমাদের চলই না— কেন, কী অর্থে, তা অবস্ত বলা যায় না ।

হবীন্দ্রনাথ । বিজ্ঞান প্রমাণ করছে, টেবিল যে একটা কঠিন পদার্থ এটা ইন্ড্রিয়ের অহুমান মাত্র, মানুষের মন যদি না থাকে মানুষের মনের ধারণায় ধরা সাধারণ টেবিলটাও থাকে না । কী থাকে ? এটাও তো বলতে হবে, ও যে কেবল অচিন্ত্যাবেগবান্ ইলেক্ট্রন-প্রোটন-পুঞ্জেরই ঘূর্ণাবর্ত, টেবিল সম্পর্কে, তার 'শেষ সত্য' সম্পর্কে, এই অ-সাধারণ ধারণাটিও মানবমনেরই সৃষ্টি ।

সত্যের অবধারণ ব্যাপারে, বিশ্বমানবমন আর ব্যক্তিতে-বদ্ধ মন দু'য়ের একটি চিরস্থ্য আছে । তারই চিরসমাধান হয়ে চলেছে মানুষের বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মনীতিতে । সে বাই হোক, একেবারেই মানুষের কোনো অপেক্ষা নেই এমন সত্যবস্ত্ত যদিবা থাকে আমাদের কাছে তার একেবারেই না-থাকা ।

এমন মনের কল্পনা করা কঠিন নয় তার সামনে বস্তুগাঢ়ত্ব নেই বেশ জুড়ে, আছে কেবল ঘটনার পরস্পর কালের ভিতরে । স্বরের বিস্তার যেমন সংগীতে । 'একপ মনে সত্যের সত্যতা-বোধ, হৃদের বোধের সঙ্গেই তুলনীয় ; সেখানে পীথাগোরীয় দ্ব্য্যানতির কোনো অর্থ আর থাকে না । কাগজের বাস্তবতা আর কাগজে-ছাপা সাহিত্য-বস্তু উভয়ের মধ্যে অপরিণীম্য ব্যবধান । গ্রন্থকীট কাগজ বা বই পুরোপুরি চিবিযে খেলোও, সাহিত্যের অস্তিত্ব তার কীট-মনের কাছে কোনোখানেই নেই ; অথচ মানুষের মনের কাছে তো কাগজের তুলনায় (হরপেরও তুলনায়) সাহিত্য-শব্দগুণ বেশি ক'রেই আছে । তেমনি, মানুষের মনের কাছে, ইন্ড্রিয়প্রত্যক্ষ হিসাবে হোক, আর সূক্তি-প্রমাণসিদ্ধ ধারণা-রূপে হোক, গোচর নয়, এমন কোনো সত্য থাকলেও সে নেই বতর্কণ আনয়্য মানুষ আছি ।

*আইনষ্টাইন । তা হলে বৈখি, আন্তিক্যবুদ্ধি তো আপনার থেকে আয়ারই বেশি ।

* হবীন্দ্রনাথ । আমার ব্যক্তিসম্মতি ব্যক্তি-অতীত মানবে, শাস্ত মানবে সেলানো, এই নিয়মেই আমার আন্তিক্যবুদ্ধি বা অধ্যাত্মবিশ্বাস । এইটেই আমি 'মানুষের ধর্ম' বলে ব্যাখ্যা করছি ।^{*}

১ ১৯২০ বুটাম্বেরই আশ্চর্য মাসে কবি ও বিজ্ঞানী উভয়ের আর একটি লাক্ষ্যকোষ ঘটে ; সম্ভাবনিক Asia পত্রে সেই আগাগ-মাগাগোয়ার বিধান প্রকাশিত হয় । পর বৎসরে, ১৯২০ আশ্বিনের 'বিচিত্রা'র উহার একটি কাল্পনিক স্মৃতি হইয়াছিল ।

গ্রন্থপরিচয়

চিঠিপত্র সমাখ্যিক্ত। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রিয়কানন বঙ্গল এম. এ. সম্পাদিত। বিশ্বভারতী। পৃ ১২০।
মূল্য পনের টাকা।

এইখানি সম্পূর্ণরূপে একখানি নতুন ধরণের বই হইয়াছে। খৃস্টীয় ১৮২২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮২২ পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যতঃ জঙ্গিরখীর পশ্চিম তীরের কতকগুলি রেশম প্রাপ্ত এইখানি প্রাচীন চিঠিপত্রের সংগ্রহ। ইতিহাসের সন্ধর্ষে আমাদের দৃষ্টিকোণ এখন অন্তরূপ হইয়া দিয়াছে। আগে ইতিহাস বলিলে আমরা সাক্ষ্যাদ্ভার কথাই বুঝিতাম, সমস্তাধি বুদ্ধবিগ্রহ পদ্ম-দিলন প্রভৃতি রাজাদের ব্যাপার লইয়াই ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন আমরা ইতিহাস বলিলে কোনও একটি বিশেষ জনসমাজের সাধারণ মানবের সমষ্টিগত কাহিনীই বুঝি। এইরূপ দৃষ্টিকর্ষ ইয়োহোপে নতুন করিয়া আসিয়াছে এবং সহস্রভাবে এই দৃষ্টিকর্ষ প্রাচীন ভারতের লোকেও বানিয়া লইয়াছিল বলিয়া আমরা সংকৃত সাহিত্যে ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝি। অবশ্য “ইতিহাস” শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত সংজ্ঞা এবং আধুনিক পাকাত্য পণ্ডিতদের অর্থমোদিত সংজ্ঞা, এই দুই-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্য বৌদ্ধিক নহে। আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই নবীন আদর্শ আসিয়া বাণ্যায় কিছুকাল হইল স্বর্গীয় হর্গাচন্দ্র সাক্তাল ও ককিরচন্দ্র দত্ত মহাশয় “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” নাম দিয়া বাঙ্গালদেশের কয়েকটি প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্ধর্ষে প্রচলিত গালগল্পের মতলন করিয়া একটি ছপাঠা পুস্তক প্রবহন করেন কিন্তু তাহা ঠিকমত বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ছিল না। সেদিকে সচেতনভাবে চোঁটা করিয়াছেন ভক্তার শ্রীধর নীহারবরদ প্রায় তাঁহার “বাঙ্গালী ইতিহাস”এ। কিন্তু এই বই কতকগুলি সাহিত্যিক এবং প্রত্নলিপি সম্বন্ধীয় আধারের উপরে রচিত— ইহাতে ইতিহাস-সম্বন্ধের নিম্নের পাণ্ডিত্য ও কৃত্তোদর্শনের প্রকাশের ঘোঁটে অবকাশ ছিল। এই বই কেবল মুসলমানপূর্ব যুগ লইয়া, এবং ইহাতে বঙ্গভাষী জাতির উৎপত্তি এবং তাহার প্রাথমিক যুগের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক ইতিহাসের সন্ধর্ষে বিচার বিবেচনা আছে।

আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য অন্য ধরণের। ইহা পুরাতন বাঙ্গালার ঘরোয়া পত্রের একটি মতলন।
মতলনবিচার উদ্দেশ্য— এই পত্রগুলি হইতেই তখনকার সমাজের নানা দিক এবং পত্রলেখকগণের মনের কথা আধুনিক বাঙ্গালার পাঠক জানিতে পারিবেন। এই ধরণের পত্রের সংগ্রহ বাঙ্গালী ভাষায় ইতিপূর্বে যে হয় নাই তাহা নহে। স্বর্গীয় শিবরতন বিজ্ঞ মহাশয় *Types of Early Bengali Prose* নাম দিয়া কতকগুলি পুরাতন পত্র ও দলিলসমূহের সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯২২)। কিন্তু তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য বাঙ্গালী ভাষার প্রগতি দেখানো। অধ্যাপক শ্রীধর ব্রহ্মবরদ প্রমুখ সেন মহাশয় ভারত সরকারের নবীপত্রের মহা দিল্লীস্থিত মহাকেন্দ্রশাসনার পুরাতন নবীপত্রের মতলন থাকাকালীন ঐ স্থানে রক্ষিত বাঙ্গালী ভাষার লেখা অনেকগুলি চিঠিপত্র দলিল দরবার ইত্যাদির একটি লক্ষণীয় সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। এই সংগ্রহ প্রকাশের মূখ্য উদ্দেশ্য— খৃস্টীয় ষোড়শ শতকের

বিত্তীয় দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া উত্তর পূর্ব ভারতের নানা প্রজন্মীয় ঘটনার সিদ্ধান্ত কথ্য— এই সমস্ত ঘটনার পাত্র ছিলেন এই ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ছোট বড়ো রাজ্যের রাজা। উজ্জীর প্রভৃতি পরিচালকগণ; সাধারণ মাহুষের কথা ইহাতে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই আসিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত চিঠি diplomatic correspondence অর্থাৎ রাজনৈতিক পত্রব্যবহার পর্য্যায়ের, এইগুলি বিশেষ বৃত্ত করিয়া। এহং হিসাব করিয়া লেখা— ধর্মোত্তর চিঠিপত্রের স্বাভাবিকতা। এইরূপ পত্রে থাকি সম্ভবপর নহে। স্বর্গীয় ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” নান দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্রের পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে যে সমস্ত ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে সেগুলির একটি অতি মনোহর সম্বলন প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সে যুগের সমাজের একটি নিগূর্ণন পাওয়া যাইবে, কিন্তু এহ বহু। প্রস্তুত “চিঠিপত্রে সমাজচিত্র”-র মধ্যে আমরা যে ছবি পাই তাহার মত বড়ো কথা হইতেছে যে সে ছবি যেন একেবারে কটোয়ালের মতো সত্য অবস্থাকে ধরিয়া তুলিয়াছে। ইরোরোগীয়া সাহিত্যে Letters বা পত্রলিপন একটি যেন সাহিত্যিক প্রকারভেদ হইয়া গড়াইয়াছে। অনেক বড়ো বড়ো চিন্তাশীল লেখক “চিঠি” নাম দিয়া বাহা লিখিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রবন্ধের মতো এবং প্রথম হইতেই সেগুলি সাহিত্যের পর্য্যায়েরই বস্তু। লেখক যেন তাহার ভবিষ্যৎ পাঠকদের দিকে আকর্ষণে চাহিয়াই লিখিয়াছেন, কোথায় ও বা পূর্ব দৃষ্টিতে তাহদেরই মূখমণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু বেখানেন সে উদ্দেশ্য লইয়া এইরূপ পত্র লিখিত হয় নাই সেগান সহজাত সারল্যের গুণে এইরূপ পত্র সকলের মনে একটা লাড়া ছাড়াইয়া তোলে। পক্ষান বাবু ললিত চিঠিগুলি এই ধরনের। তাহার লিখিয়াছেন তাহার অতি সহজভাবে উপস্থিত তাঙ্গির মিটাইবার ক্ষম্ভই লিখিয়াছেন—তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা হৃৎ-বিধান, ছোটখাট সাময়িক প্রয়োজন বা বীর্যবাহী কার্যের বন্দোবস্ত এ সমস্তই without reservation অর্থাৎ কোনও রকম স্কেচ বা গোপন না করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন। জীবনের কত দিকে নাহুৎ নিজের প্রকাশ করিয়া থাকে! তাহার ঘর দ্বা পূত্র কস্তা আশ্রয় এবং তাহার বাহিরের সমাজ শিক্ষা ধর্ম রাজ্যের ব্যবসায় জমি জেলায় প্রভৃতি সব কিছুই তাঁহাকে খিদিয়া আছে, তাহার সব চিন্তায় ও কাণে জড়াইয়া আছে।— এই যে নিতান্ত আত্মসমাহিত ব্যক্তি ও একাধারে সামাজিক মাহুষ তাঁহারা ই নিজেদের ধরা দিয়াছে এই সব চিঠিপত্রে। তাঁহারা একে একে নিজের কথা বলিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের পান্নিপান্নিকের হাওয়া এবং মনের ভিতরের হাওয়াও একসঙ্গেই এই সব চিঠির মধ্যে বহিতেছে।

সম্বলনকার মুখ্যতঃ সেই ‘মানবিকতার এবং সামাজিকতার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই চিঠিগুলি একত্র করিয়াছেন এবং এগুলিকে বিষয় ও সময় ধরিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। এই ‘চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে অনেক সময় এক অদ্ভুত রূপে আগ্রহ হয়। মাহুষ তাঁহার নিজের মনের প্রতিফলন শুনিয়া যেন খুশী হয় তেমনি অপ্রত্যাশিত অবস্থার পরিচয় পাইয়াও সে শ্রীত-বিশ্মিত হয়। এই সব চিঠির মধ্যে পুরাতন কালের মাহুষকে তাঁহার বচন ঠিকমতো এবং অতি নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় বলিয়াই এগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ হইয়া থাকে। পুরাতনের সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক মোহ আছে এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে সে দিনের ছোটখাট খুঁটিমাটি কথা আমাদের কাছে বিশ্বাসের বস্তু হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস মনের দরদ দিয়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন—বিশেষ সমীচীনতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ সেই কবিতাটি তাঁহার পুস্তকের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আত্মিকতার জীবনের বাহা তুচ্ছ অতি সাধারণ, তাহা কালপ্রভাবে বিশিষ্ট এক রূপ ধারণ করিয়া বসে—সময়ের ভাণ্ডে সাধারণ ও অসাধারণের পর্ধ্যায়ে গিয়া উঠে। বোধহয় কালের ব্যবধান সহজেই আপন হইতেই এক প্রকারের সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করিয়া থাকে; দ্বীপ্তনাথের কথা

আজি দার জীবনের কথা তুচ্ছতম

সেদিন জ্ঞাবে তাহা কবিত্বের সন।

সামান্য একটি উৎসবের বর্ধ কিংবা কোনও বিবাহের জন্ত পত্র কিংবা সামাজিক অভয় বা প্রতিকারপ্রার্থী কোনও ভীত নিপীড়িত ব্যক্তির কাতরতা, সংসারের নানা অভাব অভিযোগে রাগের বনের বিহুকা প্রভৃতি কত শত দৈনন্দিন ঘটনা আমাদের এ যুগের মতো তখনকার লোকেরিগকে বিব্রত করিয়াছে, তাহার কথা এই জিহ্মপড়ে পাইয়া আমরা যেন চোখের সামনে প্রাচীন জীবনের চলচ্চিত্র দেখিতে পাইবোঁহি। ইহার মধ্যে যে সাহিত্যরস আশ্বাসন করা যায় তাহা জীবনেরই প্রতিকলন বলিয়া উপভোগ্য হইতে প্রাপ্ত রসের সম্বন্ধে।

প্রস্তুত থওে শ্রীকৃষ্ণ পকানন বাবু তাঁহার আলোচনার আধারস্বরূপ ছয় শত বহিঃস্থানি চিঠি ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রমুখমান প্রথম খণ্ডে এই সমস্ত পত্রের উল্লিখিত বিবাহবস্ত্র ও ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইবে। তখন এই একনিষ্ঠ সাহিত্য ও ইতিহাসের সাধকের চোখে আমরা আত্ম-শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের একটি তাঁহার স্বরচিত নিখুঁত বর্ণনা পাইব, যে বর্ণনাকে সম্বলনকার তাঁহার নিজের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোক দ্বারা পূর্ণভাবে প্রকাশশূদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। বইগানির ছাপা এবং বাহুল্যের স্বন্দর এবং বিশ্বভাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এইরূপ দ্ব্যলম্বন একখানি বই বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিতেছেন বলিয়া তিনি ও বিশ্বভারতী উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্থী।

শ্রীমদীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির অন্তর্গত—শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ সান্যাল। বিদ্যালয়। দ্ব্যলম্বন। চার টাকা।

পুরাতন প্রসঙ্গ সাহস কখন লেখে কখন পড়ে, এই দুটি প্রশ্ন অবশ্য এক জাতের নয়। সাহসে পুরানো কাহিনী বলতে ও লিখতে চায় বার্ষিকের আগমনে; এবং পড়তে ও শুনেতে চায় প্রাধান্য শৈশবাবস্থায়, কিংবা যৌবনের প্রারম্ভে দেখানে স্মৃতির অথবা মান স্মৃতির একটা পরিমাপের প্রয়োজন আছে, যখন মূল্যসঙ্কটের আবেগ তীব্র হয়। কিন্তু দুটি প্রশ্নের সহজ মিলন ঘটে যখন শিশুহুল্লভ কোহুল্লভ অতীত সম্বন্ধে আগ্রহকে অগ্রপ্রাণিত করে। সহজ মিলনের প্রক্রিয়া নিছক বৈজ্ঞানিক বৃত্তি নয়, টিক জ্ঞান-শূহাও নয়, বাস্তব বিষয়। মিলনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আর প্রশ্নকারে থাকে না, রূপান্তরিত হয়ে যায় সচকিত অহুত্বভিত্তে, দার কলে কেঁদেটাও পরিণত হয় আবহাওয়াতে। ব্যাপারটা একই রোম্যান্টিক ধরনের, কারণ রোম্যান্টিক মনোভাবের মূল কথাই হল বিষয়। এবং স্মৃতিতে উল্লিখিত শতাব্দীর গোড়ায় যে ইতিহাসের পতন হয়েছিল তার প্রেরণা ছিল ঐ রোম্যান্টিক আদর্শেরই। অতএব পুরাতন কাহিনী কল্পনা, লেখা, শোনা ও পড়ার মধ্যে ঐতিহাসিক আগ্রহেই পরিচয় রয়েছে। এবং সেই জন্যই শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ

সাহস্য এখন 'স্বভির অতলে' বইখানির ভূমিকা মন্তব্য করেছেন যে তিনি ইতিহাস লিখতে বলেন নি তখন মনে হয় যে তিনি অধ্যাপকীয় ইতিহাসকেই ইতিহাস বিবেচনা করেছেন। যে শৈলী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ, এবং যে বাস্তবরণ আমাদের অজ্ঞানিতে পরম্পরা ও ঐতিহ্যের দৃশ্যকে সহজে অস্বভূতিতে পরিবর্তিত করে, এই দুয়ের সমাবেশে যে কাহিনী তৈরি হয়, তাই হয় জনসাধারণের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসই অমিয়নাথ লিখেছেন। সংগীত সম্বন্ধে এমন অল্প কাহিনী বাংলা সাহিত্যে দূর্ভব।

অতীত। ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও অমিয়নাথ-বর্ণিত পুরানো কাহিনীর সঙ্গে আমিও দৃঢ়। অমিয়বাবু যে সব গায়ক-গায়িকার সম্বন্ধে লিখেছেন আমিও তাঁদের গানবাহিনী জ্ঞানেছি, এবং প্রায়ই একই সময়ে প্রায় একই আসরে। ঐ ডেইরা সাংঘে, বৈজুদ্দিন, বসির, মীর্জা, বাসল খাঁ, গিরিলালবাবু, বিশ্বনাথ রাও, গহন, মলুকা, আবদুল আলি, ঐ ১০১ হারিসন রোড, ঐ নাটোয়ারের বাড়ি, সবই আমার পরিচিত। কৈয়াম খাঁকে প্রাণভরে জনতে আরম্ভ করি ১৯২৩ সাল থেকে, এবং এখানে খাঁর গান ঐ বছরেই মাত্র দুদিন শুনি লক্টো-এ। মনির ছিলেন করিখন্দার। তাঁর গলায় কুঁড়ির হৃদয় রূপ হৃদয়ভাবে ছুটে উঠত, আর এসবক্ষে তাঁর হাত ছিল অতি মধুর। লাগাও কুঁড়িতে মনির ছিলেন পোক, আর আমার কোঁক ছিল ধ্রুপদ-ধানারের গুপার। তা ছাড়া, আমার অম্বরূপ অস্ত্রাভ বিষয়ে বিভক্ত হয়ে যায়; অমির কেবল জাকারিতে। সে বাই হোক, আমার ছিলাম সমসাময়িক এবং সংগীতস্বপ্নাঙ্গী। উপভোগের ক্ষেত্রে ছসামান্য পার্থক্য থাকলেও আমাদের মিলটাই ছিল প্রধান। আমরা উভয়েই 'একই যুগের লোক, একই পরিবেশে লালিত-পালিত। সেই জন্যই বোধহয় 'স্বভির অতলে' আবারো বড়টা নড়া দিয়েছে ততটা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে দেবে না।

আমার ব্যক্তিগত উপভোগের কথা ছেড়ে বইখানির কৃত্তিম সম্বন্ধে গোটা কয়েক সাধারণ মন্তব্য করছি।

'স্বভির অতল' থেকে উদ্ধার করার বিপর অনেক। সব সময় যেটি গুটে না। মোস্তফির বিচার হয় ডাঙায় ব'লে। অতএব অবচেতনতার মধ্যেই তার বদলায় একথা ভুল। স্বভি-উদ্ধারের মধ্যে নির্বাচনবুদ্ধি সক্রিয়। এইখানেই হুজুরি কথা গুটে। বিস্তর অভিজ্ঞতা সক্রয়ের পর স্রামলালবাবু ও তাঁর গোষ্ঠীর কৃতি মার্জিত হয়েছিল, সে-কৃতির অংশীদার ছিলেন মনির। এই অজিত কৃতিই মনিরকে সাহায্য করেছে স্বভির অতল থেকে বৈজুদ্দিন, কৈয়াম, কালে খাঁ প্রভৃতির মতন মহাশয়কে উদ্ধার করতে। হয়তো কৈয়াম খাঁ কৈয়াম উদ্ধার কথাটি প্রবোদ্ধা নয়। কেননা তিনি মাত্র সেদিন গত হয়েছেন, এবং এখনও আমাদের কানে তাঁর হুজুরের দরবারী আওয়াজ, তাঁর বোল-ভানের কেরামতি, তাঁর ছন্দের সোলা অস্বরপিত হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিতে আমরা এখনও মুগ্ধমান। কিন্তু বৈজুদ্দিন, কালে খাঁ এখন নাম মাত্র। অতএব তাঁদেরই বোলা উদ্ধার কথাটি খাটে। কিন্তু মনির বৈজুদ্দিন ও কালে খাঁ সম্বন্ধে অত উচ্ছ্বসিত কেন? তার কারণই হল মনির কৃতি। এই কৃতি সাহায্যেই বৈজুদ্দিনের অশিক্ষিতপট্টমকে প্রতিভা বলতে মনির থিখা করেন নি। আমার বক্তব্য মনে পড়ে, ভাতখণ্ডোজী মাত্র দুজন গায়ক সম্বন্ধে বলতেন, 'ঐদের কথা আল্লা'—এক বৈজুদ্দিন আর আবদুল করিম খাঁ। বৈজুদ্দিন (এবং আবদুল করিম খাঁ) ছিলেন নিরবহিহুত। তাঁদের সম্বন্ধে নিরবদগন্ত বিচার চলত না। তাঁরা কখন কি করে বলবেন, কখন আশ্রয়ী ছেড়ে অস্বরা ধরবেন, কখন কোন্ স্বর প্রয়োগ করবেন, কখন কোন্ অলুত তান তুলবেন, কখন কি লয়কারি দেখাবেন, আগে থাকতে বিশেষজ্ঞ শ্রোতাও বলতে পারত না। অথচ তাঁদের গায়ন অরাজকতার নানাবিধ ছিল না। রাগরূপকে লগভও তাঁরা নিশ্চই করতেন না; রাগের নতুন রূপই দিতেন। বৈজুদ্দিনের ভৈরবী, টোড়ি, পুরীয়া-ধানন্দী, তাঁর

নিষ্কেষ সৃষ্টি ছিল। এই নিষ্কেষজ্ঞা আবারে চমক লাগাত; এবং অনেক সময়, বিষয়ের বশে গঠনপদ্ধতির ব্যতিক্রম স্বাভাবিক। নন্দীকর্ষন খাঁ, রামকৃষ্ণ ওরো, আলাবিবা খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, মোস্তাক হোসেন, শ্রীকৃষ্ণ রতনদত্তার, বিলায়েৎ খাঁ, দলীপকুমার বেনী প্রভৃতির গায়ন-পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে পর-পর গড়ে জোলায় চিক্ স্মৃতি। ফেন ধীরে ধীরে একটি প্রাণালি গড়ে উঠেছে। মৈত্ৰীন্দ্রের মধ্যে এই প্রকার architectonic ছিল না। যখন হস্ত জাহ্নবলে সে গন্ধর্বপুত্রী থেকে এক অশুর হর্না তুলে এনে সামনে রাখলে। আবহুল করিন খাঁর অ-নিয়ম একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। তিনি ধ্যানের সাহায্যে রূপ ফোটাতেন। যে নাটকীয় গুণ মৈত্ৰীন্দ্রের ছিল সেটি আবহুল করিনের ছিল না। তাঁর সৃষ্টিতর স্বকল্প নয়, বৈরাগ্য। তবু দুজনেই মহাশক্তি। এই মহাশক্তির আবিষ্কারে যে-কটির প্রয়োজন সেটি শাস্ত্রমত রচনা হতে পারে, তবু সেটি সাক্ষিত ও অভ্যন্তরীণ রচনা।

প্রমাণ বইখানির ছত্রে ছত্রে। অমিয় রাগরূপের বিচার করছেন না, সৃষ্টির অপূর্বতা, মনোহাস্থিত্বই সবার সর্বত্র। করছেন। এটা তাঁর এক প্রকার আর্টিস্ট-মনের নিদর্শন। সে-প্রকারটিকে নোটান্টী বৈজ্ঞানিক বলা যায়। এবং এইটাই অমিয়ার পক্ষে স্বাভাবিক। ঠাঁরির প্রকৃতিই তাই। আমি ভিন্দার নিন্দা করছি না, বরঞ্চ স্বাভাবিক করছি। ঠাঁরির শিক্ষা ও উপভোগের মধ্যে বিশেষ করে সৃষ্টির লাবণ্যলতার উপরই বেশি তোক পড়ে, যেটা প্রাণ, ধারার এবং প্রাণ-সেবা বিলম্বিত সেবার মধ্যে পড়ে না। আর নতর পড়ে ব্যক্তির উপর। অবশ্য স্বাক্ষরিত আলাবদে, নন্দীকর্ষন, রাধিকা গোঁসাই-এর অলোপ-প্রাণ-ধামারেও ব্যক্তির মুটে উঠত। কিন্তু সেটা নির্ভর্য পরোক্ষভাবে। মৈত্ৰীন্দ্র ও ফৈয়াজ খাঁর ঠাঁরির গানে ব্যক্তি ছিল নিত্য স্মৃতি, প্রত্যক্ষ। সেইসব 'সৃষ্টির অতলে' রাগরূপের ঐশ্বর্য্য রূপশ্রীসেই প্রতিক্রিয়া জাহ্নবান। ভাব্যেওঁর মুখেও পুরানো ওঁরার অনেক স্বর শুনেছি। একদিনের কথা মনে হচ্ছে। শেষ বললে তিনি প্রাণ পুত্রাণুরি বধির হয়েছিলেন। বড় দুঃখ হত। দুকদিন শিলাসা করলাম, 'ভালো গান শুনে পান না বলে আক্ষেপের হয় না?' তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'বোটেই না। রোজ রাতে একটা-না-একটা রাগ আমার সামনে উপস্থিত হয়। কাল এল মঙ্গল রাগ। প্রাণ পক্ষাৎ বঙ্গের পূর্বে একজন মূলমান ওঁরার মুখে শুনেছিলাম। তারপর ঘোর দু-একবার। কাল মঙ্গল রাগ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতীয়ার মতন নিজের মধ্যে আবিস্কৃত হল।' এই বলে গভীর কণ্ঠে মঙ্গল রাগটি গাইলেন। কথা ছিল না, সারগম ছিল না, ছিল মাত্র রাগের স্বররূপ। সৃষ্টির আশ্রয়ে এই formal রূপ খোলে অন্ত-ধর্মী আর্টিস্টের মনে। সে-বন অমিয়ার নর বোধ হয়। তাতে দুঃখ নেই বোটেই। যে-মন যে-কটির পরিচয় তিনি দিয়েছেন সে-মন সে-কটি এখন দুর্লভ। তার মতন গুণগ্রাহী প্রোক্তা আমার বহুবৈর মর্মেই বলে অত্যাধিক হবে না। তাঁর রচির উদাহরণ আমি চিরস্থায়। তাঁর জ্ঞানের উল্লেখ নিম্নরোজন।

অমিয়নাথের স্বকৃতির আর-একটি প্রমাণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। ঐরা evocative রচনা করেন তাঁদের মন্তব্যের মধ্যে একটা রাহ-বিচার প্রায়ই গোপন থাকে। (বার্নার্ড শ'র বেলা সেটা নিত্যকই খোলাযুগি। তাঁর সংস্কৃত ও অভিনয় সংক্রান্ত রচনা একই সঙ্গে evocative ও didactic)। অমিয় বধন কালে খাঁ, মৈত্ৰীন্দ্রের সম্বন্ধে লিখেছেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের মনে ধারণা জন্মাচ্ছে যে এমনটি আর হয় নি, হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজে এখন কোনো ইচ্ছা লিখেছেন না যে ঠাঁরির মৈত্ৰীন্দ্রের স্বভাব সম্বন্ধেই শেষ হয়েছে, এবং আর বেন কেউ ঠাঁরির না গায়। এ-প্রকার ইচ্ছা বিলে স্বাভাবিক হত

না, আনাদের বয়সী লোকেরা হয়তো খুঁই হতেন। কিন্তু এই কথা তিনি মেনে নি। না যেওনাটা কেবল উল্লসিত পরিচয় নয়, ঐতিহাসিক জ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি ইতিহাস লিখছেন না বললে কি হবে— তিনি স্বার্থ ঐতিহাসিকের মতনই অভিব্যক্তিকে প্রভা করেছেন। সংগীত, এমন কি ভারতীয় সংগীতও চলেছে তিনি জানেন। তাঁর না মেনে উপায় ছিল না, কারণ তিনি নিজে ১০১ নম্বর হারিসন ব্রোডের সংগীত-বিমবীষেরই একজন। ১৯১০ সাল থেকে বাংলা দেশে সংগীতে বিদগ্ধ এসেছিল ইংরেজি বেয়ালা (ও রবীন্দ্রনাথ, যিনি প্রজ্ঞালাল, রজনী মেনে প্রকৃতির রচনার) মাধ্যমে। অমিয়নাথ এই বিনয়ের অংশীদার। (তাই তিনি রবীন্দ্র-সংগীতেরও ভক্ত)। অতএব সৃষ্টির অতলে nostalgia থাকলেও ঐতিহাসিক প্রভা ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন বর্তমান। তাঁর কাছে অতীত বর্তমানের বুকে বাসা বেঁধেছে— কলিঙউত্তের ভাষায় incapsulated হয়েছে।

যে-বাসা সৃষ্টি হল সেটি আবহাওয়া। সৃষ্টির প্রক্রিয়া দুটি। এক আবেগময়, ভাবসম্পন্ন ভাষা। আদ্যার এ-ভাষা পছন্দ নয়। সে ভাষার মধ্যে যে সব উর্ধ্ব বৃষ্টি আছে সেগুলো আদ্যার লক্ষ্যে-কানে লাগে। তবে ঐ প্রকার উর্ধ্ব জ্বালনই ঐ গোষ্ঠিতে প্রচলিত ছিল। গায়ন-পদ্ধতির উপভাষার বেলাও তাই। এই সব মোম সকেও, এমন কি আদ্যার মনে হয় অনেকটা এই সব মোমের জন্তই, আবহাওয়াটা অমিয়নাথ জ্বালতে পেরেছেন। গুণাধনমাঝে অভিরঞ্জন ও ঠাট্টাতায়াগা খাড়াবিক। তা ছাড়া, উর্ধ্বর শব্দ, এমন কি কুল উর্ধ্বর সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের যোগ প্রায় অচ্ছেদ্য। আজকাল সে যোগ ছিন্ন হচ্ছে। আজকের দরবার মধ্যবিকের, অতএব দরবারী সংগীতের আসরে অমিয়নাথ উর্ধ্ব না বললেও চলে। উর্ধ্ব এই feudal exclusiveness আবহাওয়া-সৃষ্টির পরিপন্থী। কিন্তু অমিয়নাথকার প্রোভা ও পার্থক্যের মনের উপর এই ধরনের প্রক্রিয়াটি কতটা সার্থক হবে? জানি না। আদ্যার কাছে যে হয়েছে তাঁর কারণ অমিয়নাথের ও আদ্যার সৃষ্টির ভাণ্ডার প্রায় একই। দুই, গুণাধনের ব্যক্তিগত স্বরূপ বর্ণনা, তাঁদের সম্পর্কে নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ। এই প্রক্রিয়া, সব দিক দিয়ে বখাষ। অবশ্য নিছক রাগরূপের আবহাওয়া সৃষ্টি করা তাঁরই ক্ষেত্রে সম্ভব; কিন্তু ধ্বনি আদ্যার notation নেই, তখন প্রায় অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকের গাওয়া ভৈরবীর রূপ বৈজ্ঞানিকের মাথার সাধা-ও চোখের কাঁচল বাধ দিয়ে কেবল রে পা খ। নিঃসঙ্গ প্রায় কি ভাবে মনে দেওয়া যায়? বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা। রহস্য খাঁর পাগলামিতে ও অপরাধের ক্ষমতা ব্যাকুলতার অতি স্বল্প ভাবেই মরা পড়েছে। তেমনি কৈবাল খাঁর বেলোতেও। গহরজানের সঙ্গে ব্যবহারে কৈবাল খাঁর যে-ব্যক্তিগত প্রকৃতি হয়েছে সেই গাধকীয় আশ্রয়প্রতিষ্ঠাই কৈবাল খাঁর টোঁচি, নটবেয়াগ, দরবারীর প্রায়বক ছিল। গহরজানের সঙ্গে 'নবাবা' তাঁর পরকে, হোলিতে, গজলে পরিচুট। এঁদের ছিল বিরাট ব্যক্তিত্ব। বৈজ্ঞানিকের মাঝে কোনো বেয়ালা-রূপী গলা ফুলতে সাধনী হতেন না আমি জানি। একজনেতেই সে পাকা গানের আসর জেঁটে দিতে পারত। আর কৈবালের পার্সজালিটির কথা তো সকলেই জানেন। (কালে খাঁর গান আমি দুবার শুনেছি— অতএব তাঁর সত্যকে বেশি কিছু বলতে পারি না। তবে এখন প্রশ্ন হল যে গুণাধন একটু বেগেটিত ধরনের লোক ছিলেন)। মোদা কথা এই, অমিয়নাথ সংগীতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন প্রধানত ব্যক্তিত্ব-বর্ণনার মাধ্যমে। ব্যক্তিত্ব কেবল গুণাধনবর্ণের নয়, জামালাবাবু, জুবাবু, রাজাবাবু, মুনিচাঁদ, নবীবাবু প্রকৃতির মতন সংগীতাত্মবাসীসেরও। জামালাবাবু নবু ও পবিত্র চরিত্র এই গোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন ছিল। অমিয়নাথ এই তথ্যকে কখনো গম্ভীর দিচ্ছেন। গহরজানের চটুলতা, মালকাবানের গাভীর্ষ আদ্যার চোখের

সাবনে ভেসে উঠেছে। গহ্বরজানের সযত্নে আরো কিছু লিখলে আমি খুশী হতাম। তাঁর মতন প্রতিভা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো বাইএর মধ্যে সেবি নি।

অমিয়নাথের কাছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে অনেক পুরানো কথা শ্রবণ করিয়ে দিলেন, যে সব কথা অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের তলায় চাপা পড়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে, তিনি সংগীতের মতন কলায়, ধীর শ্রুতি রেকর্ড ভিন্ন ধরে রাখা যায় না, সেই কলায় একটি মূহুর্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। তারিখের কুল হয়তো দু-একটা আছে। কিন্তু তাতে আসে যায় না। অমিয়নাথ খিসিস্ লেখেন নি। 'স্মৃতির অতলে' যে সব মোতি পড়ে আছে সেগুলিকে উদ্ধার করে এবং নির্বাচন করে আবারে সাবনে রেখেছেন। বর্তমান যুগের পাঠক যদি সেগুলিকে মোতি বলে স্বীকার করেন তা হলেই অমিয়নাথ সার্থক হবেন, এবং আমিও কৃতজ্ঞ হব। আমার কৃতজ্ঞতার কারণ সহজ। আজকালকার সংগীত উপভোগের মান সেই মনে হয়। বৈজ্ঞানিক, কৈরাম, কালে ধীর গায়ন-পদ্ধতি সযত্নে জানলে একটা মান পাওয়া বাবে আমার বিশ্বাস। যে-ব্যক্তি, যে-রচনা আমাকে স্ট্যাগার্ড শ্রবণ করিয়ে দেয় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারি না।

দুর্জিৎসিংহ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি

সেই তো আমি চাই—

সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই ।

ফলের তরে নয় তো খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোকা—

যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই ।

এমনি ক'রে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা,

নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন বাধা ।

পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি ছ'হাত মেলি—

নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই ।

কথা ও স্বর । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি । ত্রিভুবীরচন্দ্র কর

II { সা -। রা । মজা -রসা । রা -গা I মা -পা -। -। I
সে ই তো আ • নি চা ই

I (নগা -। -মা । গমা -পনা । -জরা -জা))
চা • ই রে •

I জা -রমা জা । রা -। সা
শে • য় হ বে • মো

I গা -মা
না

II { সা ^সপা -পা }
পা -পা -। পা
ফ সে হ ত

পা -ধা I না -। সা । রসা -না । সা
রে • ন য় তো দো • • আ

I ^১জা^১ জা^১ -।। ^১রা^১ সাঁ:-এ: I ^১রা^১ ^১সাঁ^১ -।। গা^১-ধা^১। (গা^১-ধরা^১)। I পমা-গমা I
কে ব ই বে যে বিং ব য় বো বা • • ভাং

I পা^১-সাঁ^১ ^১না^১। সাঁ^১-না^১। সাঁ^১-নরা^১ I ^১সাঁ^১ ^১গা^১ -।। ধা^১-পা^১। মগা^১-মা^১ I
বে ই ক লে ক • ল ধু মা য় কে লেং

I পগা^১ গা^১ -।। ^১ধা^১-পা^১। মগা^১-রগা^১ I গা^১-মা^১ -।। পা^১-ধা^১ I
আং বা য় হ ল হ টা ই হ

I পধা^১-পা^১-সাঁ^১। ^১ধা^১-ধা^১। -পা^১-। II
টাং • ই বে

II [সা^১-রজা^১ জা^১। জা^১-রা^১। ^১জা^১ I জমা^১-মা^১ ^১জা^১। রা^১
এ • য় নি ক • বে ঘোং য় জী ব

I সা^১ সা^১-গা^১। ^১ধা^১-পা^১। মগা^১-রগা^১ I গা^১ মা^১ -।। I
অ জী য় বা হ ল ভা

I মা^১-পা^১ পা^১। পা^১ পা^১-। I পধা^১ ^১পা^১-মগা^১। গা^১-মা^১। মা^১ I
নি ভা য় ভ য় সাং য় না • তে

I মা^১-গপা^১ ^১মা^১। জা^১-রা^১। সা^১-রজা^১ I ^১রা^১ সা^১-। -। -। I
নি • • ভা য় • ভ • য় বা বা • •

[২^২সী পা . ১^১ধা]

I ২^২পা পা -১ । পা -১ । পা -ধা I না নর্সী সী । র্সী -না । সী I
পে লে ই লে ভো হু বিং বে বেং লি

I ২^২সী সী -১ । ২^২র্সী -১ । সী -১ I ২^২র্সী ২^২সী -১ । পা -ধা । (পা -ধর্সী) I পমা -গমা I
আ বা ব্ আ • বি হু• হা ড্ যে লি •• লি•

I পা -সী না । সী -না । সী -নর্সী I ২^২সী সী -১ । ১^১ধা -পা । মগা -মা I
নি • তা বে ও ঘা •• হু রা• ব্ না • বে• •

I পা -পা পা । ১^১ধা -পা । মগা -রগা I গা -মা -১ I
নি • তা বে ও ঘা• তা হু

I পমা -পা -সী । ২^২পা -ধা । -পা -১ • II II
তা• • ই বে





বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-শেষ ১৩৬২

কুমুদিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম দ্রষ্টব্য

ও

কল্যাণীয়া

রবীন্দ্র-পরিচয় আবার লেখাসময়ে আলোচনা করবে শুনে খুব খুশি হইলাম। “ধরে বাইরে” বইখানির উপরে ভূমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটা আবার দৃষ্টগোচর হইল— ভালো লাগল— সে লেখার প্রশংসা অনেক গুণে লোকের মুখেই উঠেছে। ওর মধ্যে বিচারের গভীরতা আছে। এই ভাবে ভূমি আবার সস্তর গল্পগুলির দ্বি-বাখ্যা করো সাহিত্যে সেগুলি স্থপথ্য হবে।

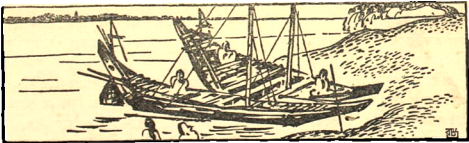
কুমু আরো কিছু বিস্তারিত পরিচয় ভূমি আবার কাছে শুনতে চাই। রচয়িতা সাহিত্যকৃষ্টির যে পরিচয় সেই সে লক্ষণের দ্বারা, বিচারক তার পরিচয় সেই বিবরণের দ্বারা। কুমু জীবনের অনেক-কিছুকে এক করে তুলে তার সমগ্র ছবি খাড়া করা হয়েছে— এইটে হোলো আবার কাম— তোনার কাম হচ্ছে সেই এককে অনেকের মধ্যে বিকীর্ণ করে তার পরিচয়টিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঘাটাই করে নেওয়া। এই হই বিপরীত কর্তব্য আমাকে দিয়ে সমাধা করবার চেষ্টা করো কেন? তবু একটা গোড়াবার কথা তোনার লক্ষ্যগোচর করে দিই।

সেকালের বনেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে কুমু ঘর। বনেন্দ্রচন্দ্র সাধারণত আপন পাকা দেহালের মধ্যে আপন সাবলীল কালকে বেঁটন করে রাখে। সেই সাবলীল কালের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু সে আপন আভিমানাত্মীয়তার দ্বারা ঐক্যপথে বীকার করে, যে কোনো বাহ্যিক তার কাছে ইতর বলে ঠেকে বা কলপৌরুষের অধোদ্বারা বলে সে মনে করে সর্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্জন করে। কিন্তু এই বেটনের বাইরে সে নীচ পরিবর্তন ক্ষতবিক্ষেপে খুঁজে তার মধ্যে আভিমানাত্মীয়তার দ্বারা গৌরব নেই— তাই তার ভাষায় ভাবে কামনাও কখনো উঠে, ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই এই রকম কালের সঙ্গে বাইরের সমাধের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থায়ী থাকে। কুমু যে সময়ে হয়েছে সেই সময়ে একাকার হবার পালা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তবু স্বদেশ-বন্দে আত্মপূজনের একটা বাধা রীতি ছিল। কুমু ভয় তারই মধ্যে। বাইরের সমাধ যে কতই পৃথক তা ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলবেলা থেকে ভাইয়ের বেহে পালিত কুমু নিঃসঙ্গিনী— এই নিঃসঙ্গ নির্জনতার তার বাস্তবিক ধ্যানগ্রন্থতা কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল

হয়ে উঠেছে। যে-দৌষনের মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্ধরে অন্ধরে নিজের অপোচনেরও আকর্ষণ করেছে সেই বয়সে তার ঠাকুরের মধ্যে সেই আদর্শের সে প্রতিষ্ঠা করেছে, বস্ত্রত আপনায় নারীর প্রথম পূজার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। সেই ঠাকুরকে সে আপন ধ্যানের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রচনা করেছে। এমন কুমু আপন সংস্কারের নোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে জেকেছেন—স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আত্মান সার্থক হবে, এই ঠাকুরের পুন্ডাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। হয়তো ভক্তির মোরে তাই হতে পারত—হয়ত স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরমপাথরে সে সোনা করে তুলত কিন্তু মধুসূদনের স্থল প্রকৃতি তাকে একাঘাই বাধা দিলে—এইখানেই ছায়েছি। মধুসূদন অত্যন্ত হাল আনলের কুতী পুরুষ—ধন ও বাহু মান উপার্জনে দিখিলাতেই তার একান্ত লক্ষ্য। তাদের বংশও একদিন সম্বানী ছিল কিন্তু দারিদ্র্যের তলার পাকে লিপ্ত হয়ে তাদের আত্মদায়নের দারিদ্র্যবোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। হাল আনলের প্রচলিত রীতি অহুসারে ধনের গৌরবকেই সে সব চেয়ে বড়ো বলে দাত্তিকতার দীপ্ত হয়েছিল—এমন অবস্থায় কুমু তাকে আত্মদায়ন করতে পারলে না—তাতে তার আত্মদায়নে নিরতিশয় যা দিলে—এতবড়ো অপমানকর সমস্ত তার পক্ষে বাড়িচারের সমতুল্য—এ যেন বেবতার অবমাননা—নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পক্ষে বিলুপ্ত করা। কুমু এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হোলো। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই।

আমায় একান্ত সমঝাভাব। ইতি ১৪ ডিস ১৩৩৪

ঈশ্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর



নিধিরামের নির্বন্ধ

রাজশেখর বসু

নিধিরাম সরকার ভেবে ভেবেই যারা গেলেন। তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, সাংসারিক শোক তাপও তিনি পান নি, শুধু দুর্ভাবনায় তাঁর ঘোঁরনাত্ত হল।

নিধিরাম সরকারের বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অভাব খুঁতখুঁতে। তাঁর মনে নিরন্তর সংশয় উঠত—স্বপ্নে বাড়ুড়ো না বিপিন পাল, বেঙ্গলী না ইংলিশম্যান—কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পণ্ডিতজী—কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, হিন্দুহাঙ্গামা, কমিউনিস্ট আর সমাজতন্ত্র! মল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা বেন নি, ছেলে পেপান নি, ডাকতি করেন নি, স্বভো কাটেন নি, ত্রোলে ঘান নি, শুধু মনে মনে মরলের পথ খুঁজতেন। অবশেষে নৈরাশ্র আর চিন্তাবিবে জর্জর হয়ে বেহতাগ করলেন। তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বললেন, মরবেই তো, সংশোধন বিনম্রতি। আর এক ইগবন্ধ বন্ধু বললেন, কোয়ার কিস্‌ড এ কাট।

নিধিরাম পরলোকে এলে বিখ্যাত তাঁকে বললেন, বংস, তুমি সম্বেদ্যাকুল কর্মবিশুৎ হলেও তোমার চরিত্রটি প্রায় নিশ্চাপ ছিল, তাই এই আনন্দলোকে এসেছ। কি আনন্দ ভোগ করতে চাও তা বল।

নিধিরাম উত্তর দিলেন, ভগবান, আনন্দ চাই না। পৃথিবী অধঃপাতে যাচ্ছে, যাতে রক্ষা পায় তাই করুন।

বিখ্যাত বললেন, তুমি দেখছি মরে গিয়েও ভববন্ধনে জড়িয়ে আছে। ওহে নিধিরাম, পৃথিবী নেই, তোমার দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। শুধু আমি আছি, এবং আমিইসুতুমি।

—প্রভু, সলিৎসিদ্ধ আর অধৈর্য্য আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি মরে গেলেও প্রগং থাকবে না কেন? সমস্ত পৃথিবীর ভাল যদি নাও করেন তবে অস্বস্ত ভারতের যাতে ভাল হয় তাই করুন।

—ভালই তো চিরকাল করে আসছি।

—তার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না, যা করে থাকেন তা শুধু লীলাখেলা।

—ও, আমার লীলাখেলা তোমার পছন্দ নয়, তোমার ঘরমাসী খেলা চাও? 'নিভা তুমি পেল বাহা, নিভা ভাল নহে তাহা, আমি যে বেগিতে কছি সে খেলা বেলাও হে।'—এই তোমার আবলার? বেশ, তোমার দেশের কিয়কম ভালু চাও তাই বল।

—মাহুৎ ভাল না হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অস্বস্ত সিকি লোককে ভাল করে দিন, তারাই বাকী সবাইকে শোধরাতে পারবে।

—আচ্ছা, ঐতত্ত মহাপ্রভু আর রাক্ষসক পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো?

কপালে হুত্বকর ঠেকিয়ে নিধিরাম বললেন, ওঁরা অবতার কি না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে লব্ধ নেই।

—ভারতের সিকি লোক মানে ন কোটি। যদি ন কোটি ভারতবাসী ঐঐতত্ত বা ঐরাক্ষসকে তুল্য হয়ে যায় তা হলে তোমার মনকাম পূর্ণ হবে তো?

মাথা চুলকে নিধিরাম বললেন, ভগবান, ঐরা যে সর্বভাষী সন্ধ্যাসী। দেশের চার আনা লোক যদি বিরাগী ভক্ত হয়ে যায় আর বাকী বানো আনা তাদের অহুশরণ করে তবে সংসার যে ছারখারে যাবে। আমাদের দরকার কর্মী বুদ্ধিমান জনহিতৈষী সংসারী সংপূর্ণ। ভাষী ভক্ত সন্ধ্যাসী গুটিকতক হলেই চলবে।

—উত্তম কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তুমি যে সব গুণ চাচ্ছ তাও তাঁর প্রচুর ছিল। যদি ভারতের ন কোটি লোক রবীন্দ্রনাথের তুল্য হয়ে যায় তা হলে খুশী হবে তো?

নিধিরাম আবার নমস্কার করে বললেন, প্রভু, এক শ বৎসরে যদি একটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় তাহলেই দেশ ধন হবে। কিন্তু যদি বিস্তর আসেন তবে আর রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য যে বর্ষ হবে, তাঁকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা, যদি ন কোটি মহাত্মা গান্ধীর মতন জানী কর্মী জনহিতৈষীর আগমন হয়?

—একই আপত্তি প্রভু। মহাত্মা গান্ধীকেও সন্তা করতে চাই না। আমাদের দেশ অসাপ্ত অকর্মণ্য চোর ঘুংখোর বন্ধাত লোকে ভরে গেছে, তাদের পরিবর্তে দরকার গভরিত্র সাধারণ কাজের সাহাব। লোকান্তর পূর্ণ খুব কম হলেই চলবে।

—যুগেছি, লোকান্তর পূর্ণের ইনকেশন চাও না। আচ্ছা, যদি দেশের দিকি লোক জগৎহরলালের মতন হয়ে যায় তা হলে চলবে তো?

একটু ভেবে নিধিরাম বললেন, নেহরুজী জানী কর্মী দূরদর্শী জনহিতৈষী সংপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত মন্ত্রী আর সরকারী আপিসের কর্তারা যদি তাঁর মতন হয়ে যায় তা হলে দেশের অপেক্ষ মরল হবে। কিন্তু সে রকম ন কোটি লোকের উপযুক্ত কাজই বেশে নেই, তাঁদের দিয়ে তো বোট। কাজ করানো চলবে না।

—আচ্ছা যদি ন কোটি উর্বোষী কর্মবীর ধনপতির আবির্ভাব হয় তা হলে তোমার আশা মিটেবে তো?

—আপনি পরিহাস করছেন প্রভু। ন কোটি বাবসাধার কর্মবীরের স্থান কোথায়? কার ধন নিয়ে তাঁরা ধনপতি হবেন? অরণ্যের চার আনা পণ্ড যদি বাস হয় আর বাকী বানো আনা যদি হরিণ হয় তবে আগে হরিণরা লোপ পাবে তার পর বাঘরা না খেয়ে মরবে। আমার নিবেদনটি শুধুন। ন কোটি মৃত্যুস্তা সন্ধ্যাসী, বা স্ফন্দা মহাপুঙ্খ, বা রাজনীতিজ্ঞ স্বাধাশক হলে চলবে না। আর, ন কোটি ব্যবসারী ধনকুবের তো উপদ্রব স্বত্বপ। নানারকম সাধারণ গভরিত্র কর্মীর দরকার — চাষী কারিগর শিল্পী বাস্তবকার যন্ত্রী বিজ্ঞানী শিক্ষক বিচারক পরিচালক কেরানী ইত্যাদি। তা ছাড়া অল্প গুটিকতক কলাবিৎ অর্থান লিবিষে আঁকিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েও চাই। লোকান্তর পূর্ণ কোটিতে এক-আধটি হলেই চের।

—তুমি যে রকম চাচ্ছ সে রকম কাজের লোক তো বেশে আছেই।

—কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিস্তর দুর্খ আর দুর্ভিক্ষ লোক আছে, তাইই দেশের মরল হতে দিচ্ছে না।*

—ওহে নিধিরাম, বাস্তব হওয়া না। তোমার দেশে বত দুর্খ আর দুর্ভিক্ষ আছে তারা খেয়েখেয়ি মায়ামারি করে আপনাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পর কালক্রমে স্ববুদ্ধি সংপূর্ণের আবির্ভাব হবে।

—তবেই হয়েছে। আপনি অনন্তকাল এক্সপেরিয়েন্ট করতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের অত ধৈর্য নেই, তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাল মন্দ উপায় খুঁজছে। আপনি ইচ্ছা করলেই তাদের স্থপথে চালাতে পারেন।

—আমায় ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। স্থগিত স্থিতি লব যদিও কাটার মতন বর্ণান্বিত হইছে, প্রাপতিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

—ভগবান, বেশী কিছু তো চাচ্ছি না, লোকে যাতে অসংখ্য উচ্ছ্বল আর স্নানোহরী না হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

—যে নিধিরাম, অশ্রুতল সমাজব্যবস্থার ক্ষতই তোমার গণে চাতুর্য্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তুমি পৰিণাম কি হয়েছে দেখছ তো? তুমি যে বন্ধ চাচ্ছ তা পাবে ইত্যর প্রাণীর মধ্যে, তারা কখনও স্বহস্তের দ্বারা থেকে ক্ষত হয় না। কিন্তু মাছের চিরকালই নিজের মতলবে চলে।

—প্রভু, যদি একজন মনুষ্যের অবতার পাঠিয়ে দেন তবে তিনি তো অবলীলাক্রমে সাধুদের পরিগ্রহ, দ্রুততমের বিনাশ আর ধ্বংসস্থাপন করতে পারবেন।

—তুমি কি মনে কর নিভিলিয়ানদের মতন একমল অবতার আমি পুণে দেখছি আর তোমাদের দরকার হলেই পাঠাব? মাছের মাঝেই অবতার, কেউ কন, কেউ বেশী। জনসমাজের অস্বাভাবিক নবল যে করতে পারে সেই অবতার। তোমারও সেই শক্তি আছে। যদি ইচ্ছা কর তুমি আবার অগ্রগ্রহণ করে তোমার জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার।

—আমার কতটুকু ক্ষমতা প্রভু? আমার কথা ভনবেই বা কে?

—জ্ঞানী না শুধু, তারা আর কখনই বা বাঁচবে। ছেলেরা ভনতে পারে, তারা এখনও কাম হতে ঘাব নি।

—হা ভগবান, আপনি দেখছি কোনও খবরই রাখেন না!

—শোনো নিধিরাম। ছেলেরা জ্ঞানের কথা না শুধু, সমবয়সীদের কথা ভনতে পারে। তুমি পৃথিবীতে দ্বিগুণে যাও, প্রতিদ্বন্দ্ব না হলেও তোমার সমিচ্ছার সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর যুবকদের তুমি হস্তক্ষেপ দিও।

—আমি একটা সন্তানই আনি,— আগে বিনয় ও শিক্ষা, তার পর কর্মপথ।

—যে তো, ওই মহাপাই দিও।

—আমার কথাই কেউ যদি কান না দেয়?

—তোমার চাইতে তারা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনে নি। তুমি দখালাধ্য চেষ্টা করো, তাতেই তোমার ক্ষমতা সার্থক হবে। এক দ্বারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ করো। যদি অন্যত্র কালে কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ক্ষতি হবে না।

অল-বীরুনী ও সংস্কৃত

ঐত্বনীতিকুয়ার চট্টোপাধ্যায়

আবু রহমান মুহম্মদ ইবনু অহম্মদ অল-বীরুনী (অথবা অল-বেয়োনী) ১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক বীর্তা রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সম্ভবতঃ আফগানিস্তানের গজনী নগরে ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে খিষ্টা রাষ্ট্রের নাম ছিল খারিজ্ম, এবং প্রাচীনকালে গ্রীকরা এই দেশকে Chorasmia 'খোরাস্মিয়া' বলিত। অল-বীরুনী মধ্যযুগের এক অতি বিরাট পণ্ডিত বলিয়া স্থপরিচিত। এই বহু-বিদ্যাবিশিষ্ট পণ্ডিত একাধারে গণিত এবং ত্রুণবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং দর্শন, রসায়ন এবং ঐতিহাসিক কাল-নির্ধারণ, ইতিহাস এবং নৃত্য, ও চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি প্রাচুর্য এবং বিজ্ঞান সমানভাবে পায়সন্য ছিলেন। উপরন্তু তিনি প্রধান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ভারত-বিজ্ঞাবিশিষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহার মতো ভারত-সংক্রান্ত এত বড়ো পণ্ডিত, বিদেশীদের মধ্যে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিকে ছিল তাঁহার সংগ্রাহী এবং দৃষ্টি পাত্তিত্য, আর অন্যদিকে ছিল তাঁহার এক প্রশস্ত উদারতা এবং বহুনিষ্ঠতা; এই উভয়বিধ গুণের ক্ষত্র, অল-বীরুনীকে সমগ্র মানবজাতির প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠ চিন্তামেনোদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Edward Sachau এডুয়ার্ড স্যাক্ষাউ, যিনি অল-বীরুনীর দুইটা মুখ্য গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট আধুনিক জগৎ অল-বীরুনীর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত পুস্তকের আরবী-ভাষার মূল এবং ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের ক্ষত্র বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকিবে, তিনি (এডুয়ার্ড স্যাক্ষাউ) অল-বীরুনীর পাণ্ডিত্যের বাক্য বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবত্তা ও তাঁহার ব্যক্তিকের বৌদ্ধিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার গুণ প্রশংসা করিয়াছিলেন। (মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, লন্ডন হইতে, এবং ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। স্যাক্ষাউ পণ্ডিত এবং মাহুয হিসাবে অল-বীরুনীর কৃতিত্ব যে সন্মোক্ষ প্রশংসা করিয়াছেন, সে প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে তাহারই প্রাপ্য; এবং উপরন্তু, বীর বাচস্পত্যের ক্ষত্র যে প্রশংসা সকলেই হবেন প্রভাব আনয়ন করে, তাহা—এবং সার্থোপরি, অল-বীরুনীর গ্রন্থের বাক্য মূল্যবত্তা—এই সকল মিলিয়া, অল-বীরুনীর আসনকে স্থাপিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। অল-বীরুনী, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, আরও বেশি করিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য, কারণ তিনি ভারতবর্ষের প্রধান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকার-রূপে দেখা দেন। মনে হইতেছে যে, এখন এতদিন পরে অল-বীরুনী তাঁহার উচ্চতম সমাদর লাভ করিবেন; কারণ তাঁহার তিরোধানের প্রায় ১০০ বৎসর পরে ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার পণ্ডিতসমাজ তাঁহার ক্ষত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ১২৪৮ সালে জুলাই মাসে পারিসে যে একবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিজ্ঞান-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে "অল-বীরুনী সহস্রাবিকী" উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার পরে কলিকাতায় ইরান-গণিতের উদ্‌যাপনে অল-বীরুনী উৎসব অহুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যদিও অল-বীরুনীর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান গভীর ও বিস্তৃত ছিল, কেবল ইহারই ক্ষত্র আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তিনি নিছক পণ্ডিত ছাড়া আরও বড়ো ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যকারী মাহুয;

ঊঁহার নিম্নের বিশিষ্ট ধর্মবিচার ও আস্থা, সম্পূর্ণ অস্ত্র বাস্তববোধের মধ্যে বাহ্যিক পড়িয়া উঠিয়াছে এমন অস্ত্র একটী জনসমাজের সভ্যতাবিশেষকে বহুদূর করিতে অথবা দেহ প্রতিপন্ন করিতে সের নাই। সার-লডাকে কেবল নিম্নেরই আশ্রয় বলিয়া বনে করা, এবং অস্ত্র ধর্ম-ন্যস্তকে সেই একই সভ্যতার সন্ধানে সহস্রাব্দী-রূপে সেবিয়া সহস্রাব্দীতির সহিত তাহাদের আলোচনা এবং প্রাণিধান পক্ষে প্রায়ই বাহ্য। অস্বকুল নহে, এইরূপ বিশেষ-শাস্ত্র-নিবন্ধ গৌড়-বস্ত্রের ধর্মের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতে অল-বীহীনতার মন বিশেষ লক্ষণ-ভাবে দৃষ্ট ছিল। সভ্য বস্তু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অল-বীহীনতার পুণ্ডরেক সম্পূর্ণ আশ্রয়ী নামকরণ একজন গৌড়। মূলমানে-ধর্ম-বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোণ হইতে হইয়াছিল বলা—“ধর্ম বা ধর্মার্থ এবং ধর্ম বা বর্জনীয় এইরূপ উভয়বিধ বস্তু লইয়া হিন্দুচিন্তার সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের এক ধর্মাত্মক বর্ণনা” (কিতাব...কী তহ-কীক মা-ল-হিন্দু মিন্ ১৯৯৬, মুকুবল্, কী-ল-অকল্ অতি মিন্‌মুল্), তথাপি এই পুস্তক বাগ্‌বিত্ততানের অথবা প্রচার-মূলক নহে, এবং বিশেষ একটী দৃষ্টিকোণকে অস্ত্র সমস্ত দৃষ্টিকোণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে নাই। হিন্দুধর্ম ঐ সময়ে জীবনসংগ্রামে মূলমানে-ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের নিকট হারিয়া গাইতেছিল, এবং সেইজন্য বাহির হইতে আগত একজন বিশ্বাসী মূলমানে ও উপরন্ত পণ্ডিত হিসাবে ঊঁহার মনে যে হিন্দুদের তুলনায়, স্বজাতির সম্বন্ধে একটী সহজবোধ্য শ্রেষ্ঠত্বের ভাব থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; এইজন্য ইনি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এবং সহজভাবে একথা ধরিয়াই লইয়াছেন যে ঊঁহার ইসলামী মনোভাব, হিন্দু মনোভাব অপেক্ষা আরও অধিক আন্তর্জাতিক এবং বৃত্তিতর্কীমূল্যবোধিত বলিয়া, উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই বোধ সবেও, তিনি মানন ও সন্মান করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-সংগতে যে সমস্ত বস্তু এবং বিচার, অস্বকুল এবং ভাবধারা, বৈজ্ঞানিক ও সহস্রাব্দীর বাহ্য বলিয়া ঊঁহার অস্বকুলে শাস্ত্র করে নাই, তিনি সেগুলিকে কেবল “বিশ্বী বা কালক্রমের পণ্ডিতপ্রস্তুত আচার-প্রণালী” বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। *ঊঁহার লেখা পড়িয়া মনে হয় যে, এই-সব বিষয়ে হিন্দুরা অতি সাধারণ মানবের মতোই ছিল, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন; এবং পৃথিবীর অস্ত্র অংশের মানবসমাজের মধ্যে প্রচলিত অস্বকুল বিষয় বা বস্তুর নক্সা সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন—যেমন প্রাচীন গ্রীকদের অথবা প্রাচীন আরবদের মধ্য হইতে। ঊঁহার আরও এতদেব মূলমানে পাঠকবৃত্তি যদি ভারতবর্ষের লোকসমাজ সম্বন্ধে ঘৃণা বা তুচ্ছতায় ভাব পোষণ করিতে আগ্রহশীল হইত, সেই আগ্রহ এই উপায়ে তিনি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-পুস্তক মনের উপযুক্ত এই পুস্তক বা উপর্য উপস্থান অথবা নির্বৈজ্ঞানিকতা, ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত অথবা জাতি-সংক্রান্ত কোনো পক্ষপাতিতা বাহ্যতে নাই, *অল-বীহীনতার মনে সেই গুণ থাকার ধরন, ভারতের হিন্দু আশ্রয়ীর ঊঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং এই ক্ষেত্র সমগ্র বিজ্ঞান-অস্বকুল পণ্ডিতসমাজের উচিত ঊঁহার কৃতির প্রতি প্রদর্শন থাক। মানবিকতার দিক হইতে বিচার করিলে, অল-বীহীনতার এই দৃষ্টিকোণ, নিছক পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আরও অধিক মহাশয় বস্তু।

ঊঁহার সময়ে অল-বীহীন ছিলেন একজন অস্বকুল দৃষ্টি পণ্ডিত। এখন তিনি ঊঁহার মানসিক জীবনের পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ কালে বিজ্ঞান ছিলেন, ধর্ম বাউক আশ্রয়ানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ২০০ বৎসরেরও অধিককাল আগে, তখন নিঃসন্দেহ-রূপে তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বিদ্বান এবং সকলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্ধ পণ্ডিত ছিলেন। চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে সেই সেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ

পণ্ডিতদের নৃষ্ট কেবল চীন অথবা ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; এই দুই দেশের এমন কেহ ছিলেন না যাদের মনে পশ্চিমের অর্থাৎ ইসলামিক ঋগতের—তথা প্রাচীন গ্রীসের এবং প্রাচীন রোমের—বিরাট সভ্যতার সম্বন্ধে অল্পমাত্রা ধারণারও অবকাশ ছিল। এমিকে ইটালিকে ধরিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে এই যুগ ছিল এক অন্ধকারবহু যুগ—তখন পশ্চিম-ইউরোপে লাতিন ভাষার মাধ্যমে একটু খ্রীষ্টান ধর্মের জ্ঞান, এবং প্রাচীন লাতিন লেখকদের দুই চারিখানি পুস্তক বাহ্যর পাঠ অল্প কয়জন উল্লাসী পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, এইটুকুই ছিল বিস্তার পরিধি। পূর্ব-ইউরোপে খ্রীষ্টান গ্রীক অর্থাৎ Byzantine বা বিজাণ্টীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও তেমনি আরব ও অন্ত প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানের সাহিত্য অথবা সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। মুসলমান আরব সাম্রাজ্য, সিরিয়া, মিসর, উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন ও সিসিলি-বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার উত্তর হইল। অল্-বীহ্নীর মধ্যে এই আন্তর্জাতিকতা অসাধারণভাবে দেখা দেয়। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল আরবী; কিন্তু তুর্কীভাষী খারিজম্ দেশের মাহব ছিলেন তিনি, এবং পরে তিনি গচ্ছনী নগরের তুর্কীভাষী অভিজাত সমাজে বিচরণ করিতেন, এইজন্য তুর্কীভাষাও তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাঁহার মতন জিজ্ঞাসু এবং সর্ববিষয়ে রসগ্রহণেচ্ছু পণ্ডিতের পক্ষে এই দুই ভাষায় বড়টুকু সাহিত্য হাতের কাছে তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, এমন অসম্ভবন করা যায়। আরবী ভাষা তখন ছিল সমগ্র ইসলামিক ঋগতের ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃতির ভাষা; এবং এই আরবী তিনি খুব ভালো রকমই জানিতেন—ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী লেখকগণের মধ্যে ইংরেজী জ্ঞান খতটা গভীর ও ব্যাপক রূপে দেখা যায়, অল্-বীহ্নীর আরবীর জ্ঞান অন্তত: ততটা ছিল, ইহা অসম্ভবন করা যায়; সম্ভবত: তাঁহার আরবীর জ্ঞান আরও গভীর ছিল। এই আরবী ভাষাতে অসম্ভব পাঠ করিয়া, প্রাচীন গ্রীক এবং বিজাণ্টীয় বা মধ্যযুগের খ্রীষ্টান গ্রীক, তথা সিরিয়ান, ঋগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকটায়,—এবং উপরন্তু গণিতে ও জ্যোতিষ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার একটা বড়ো অংশের—সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। বগদাদ-নগরে আরবের ইসলাম সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ হইতে, আরবী ভাষা, আরবদেশের আশ-পাশের দেশগুলিতে প্রাচীনতর যে-সমস্ত সভ্যতা ছিল, সেগুলির সঞ্চিত সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্-বীহ্নী প্রাতোন Plato এবং অরিস্তোতল Aristotle-এর লেখা হইতে তাঁহাদের বক্তব্য উদ্ধার করিয়া নিরাছেন; এই প্রাচীন গ্রীক লেখকদের গ্রন্থের সম্বন্ধে, সিরিয়ান ভাষায় অল্পবয়সের আরবী অসম্ভবন হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই ভাবে দুই হাত ধুরিয়া আসিলেও, তিনি মূল দার্শনিকগণের ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য এবং উপযোগিতা ভালো ভাবেই বুঝিতেন। এমিকে আবার তিনি সরান পরিচয় ও জ্ঞানের সহিত কপিল এবং ব্যাস হইতে, বরাহমিহির হইতে, সংস্কৃত পুরাণসমূহ হইতে উদ্ধার করিতেছেন; এবং আরও বড়ো কথা এই যে, এই ভারতীয় লেখকগণের মূল ভাষা তিনি জানিতেন—এবং এইরূপ জ্ঞান তাঁহার স্বজাতির মধ্যে নিভান্নই বিরল ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০-এর দিকে, ভারতীয় হিন্দু, আরব-ইরানীয় এবং তুরানীয় অর্থাৎ তুর্কী-সমস্ত সমগ্র ইসলামীয়, এবং উপরন্তু সোমাজজি গ্রীকের মারক্শ না হইলেও প্রাচীন গ্রীসের—এতগুলি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্য ঋগতের সহিত তুল্য পরিচয় রাখা, সম্ভব ব্যাপার নহে; এবং বড়দূর জানা যায়, সমগ্র সভ্য ঋগত্রে এইরূপ পণ্ডিতের অধিকারী একজন মাত্র ছিলেন—তিনি ছিলেন অল্-বীহ্নী।

যে রাজার অধীনে অল্-বীহ্নী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, তাঁহার ৪৪ বৎসর বয়স হইতে ৫৮ বৎসর পর্যন্ত—

বাস করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মহাবাহির গমনীয় হুলতান মহম্মদ; এবং কতগুলি রাজনীতিক ঘটনা-পটভূমির কারণে, এই রাজার পক্ষে অল-বীহীনীয় একজন বিদ্রোহীরা পৃষ্ঠপোষক হওয়া গিয়া উঠে নাই, যদিও এইরূপ পৃষ্ঠপোষক হওয়া তাঁহার উচিত ছিল। কেন সে এইটাই হইবে নাই, তাহার কারণাবলী স্বাধাউ বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহম্মদের দরবারে, মহম্মদের শত্রুপক্ষীয় অন্য রাজার প্রতিষ্ঠা বা জাফির হিঙ্গাবে অল-বীহীনী আধিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য নিশ্চয়ই সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত, কিন্তু রাজনীতিক কারণে তিনি উপরুক্ত সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। গমনীয় হুলতান মহম্মদ এক অতি শক্তিশালী রাজা ছিলেন; এবং, অল্পবিশ্বাস-পূর্ণ ধারিত আগ্রহ তথা দূরত্ব-পূর্ণত্বের উচ্চ প্রযুক্তি, এই উভয়ের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে কতগুলি অভিযান চালাইয়াছিলেন, যে অভিযান-সমূহের দ্বারা তিনি প্রতিবেশী হিন্দুগণের সমুদ্র ক্ষতি করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তিনি বধ করেন, এবং দাস করিয়া ধরিয়া লইয়া যান, এবং বহু নগর, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেন, ও কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠ করিয়া লইয়া যান। এই সকল অভিযানের ফলে, হিন্দু জনসমূহের মনে মহম্মদ ও তাঁহার তুর্কী সেনার প্রতি কোনো অস্বস্তি বা বিরক্তির ভাব আদিবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং হিন্দুদের মধ্যে “তুর্কী” এই নামটি, ভয়ের এবং দুঃখের বস্তু হইয়া পড়ানো স্বাভাবিক ছিল। ১০২১ খ্রিঃাব্দে মহম্মদ তাঁহার সাম্রাজ্যে ভারতের পঞ্চম প্রদেশ সংযুক্ত করিয়া লইলেন। এইভাবে, যদিও দেশের অধিবাসী প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল, একজন মুসলমান রাজার অধীনে আসিয়া এই দেশ এক “শান্তির দেশ” (দাক-নু-সলাম) হইয়া পড়িয়াছিল, যেখানে মুসলমান ধর্মের প্রচার অব্যাহত বাড়াইতে লাগিল, এবং যে দেশে সিপাহি হোউক অব্যাহত পঠিত হোউক, যে-কোনো মুসলমানের অবাধ চলাফেরা সহজ হইল। এইরূপ অবস্থা অল-বীহীনীর পক্ষে বিশেষ সুবিধামূলক হইয়াছিল—তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এবং সেখানে অবস্থান করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির আলোচনা করিবার এক বিশেষ সুযোগ পাইলেন। ইহার পূর্বে, জ্যোতিষ এবং গণিতের আলোচক-রূপে এই দুই বিজ্ঞানের বিষয়ে হিন্দুদের লেখা বই দ্বারা আরবী অসহবাসের দ্বারাও তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহা হইয়া তাঁহার নিজের বেশ খারিজের জাফির-রূপে ১০১৭ খ্রিঃাব্দ হইতে তাঁহাকে গমনীতে থাকিতে হইল। তখনই সম্ভবতঃ হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পৌরোহিত্য জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ তাঁহার জুটিল। ঐ সময়ে গমনী নগরী ছিল এশিয়াতেও অন্যতম বিশাল মুসলমান রাজ্যের কেন্দ্র; এবং মহম্মদের মতো শক্তিশালী ও কৃতকর্মী শাসকের রাজধানী বিহার, নিঃসন্দেহরূপে অস্তিত্ব-প্রাপ্ত এবং যথা-এশিয়ার সমস্ত অংশ হইতে লোকে গমনীয় প্রতি আকর্ষণ হইয়া আসিত; এবং গমনীর নানানাজাতীয় জনসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষেরও অভাব ছিল না। বহু ভারতীয় সৈন্য ও শিল্পী রাজ্য-রাজত্ব ও পণ্ডিতলোক গমনীতে দ্রুতবন্দী-রূপে ছিলেন; এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভাষা হিন্দি। ভারতবর্ষে আসার ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়া খটিলও, ভারতবর্ষে ঐ স্থানে সাধারণ হিন্দুজনগণের অন্তর্গত মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটাইয়াছিল যে, তাহারা নিজেরা কোনো ক্রমে তুর্কীদের নিকট হইতে বহুদূরে থাকা অথবা অন্য কারণে বাড়িয়া গেলেও, এই-সমস্ত হিন্দু দ্রুতবন্দীদের বিদেশে প্রেরণ তুর্কীদের মধ্যে বাস করা তাহাদের পক্ষে অনগণ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এবং স্বপক্ষে এইরূপ মূল্যগ্রাণ্ড দ্রুতবন্দীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া, আফগানিস্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাস করিত এমন হিন্দু প্রমাণ ছিল, যাহারা ভারতীয় দ্রুতবন্দীদের মতো মূলোৎপাতি হয়

নাই; এবং মূলদান তুর্কী শাসনের প্রথম যুগে এই হিন্দু প্রজাগণ, নিজের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। অহুমান করিতে পার। যার যে, ভারতীয় বুদ্ধবলী এবং আত্মগান্ধিনানের হিন্দু প্রজা, এই উত্তর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এইরূপ স্ববুদ্ধি লোক নিকটই মিলিত, যাহার। তাহাদের ধর্ম এবং চিন্তাধারার প্রতি সহায়কৃতিশীল তুর্কী রাজার জাতির একজন বিশিষ্ট এবং সম্মানিত পণ্ডিতের আগ্রহ মধ্যে দেখিয়া খুসীই হইত। সম্ভবতঃ গল্পনোক্তে বসিয়াই অল্-বীকুনী ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চর্চা আরম্ভ করিয়া। সেন, এবং গল্পনোক্তে তিনি সংস্কৃত এবং পশ্চিম পণ্ডাবের কথাভাষা (যাহা সম্ভবতঃ আত্মগান্ধিনানের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল) শিখিতে আরম্ভ করিয়া সেন। পণ্ডাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিম পণ্ডাবের কোনো-কোনো স্থানে গিয়াছিলেন, এবং এইসব স্থানে তিনি ব্রাহ্মণ এবং অন্ত পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, যাহারা তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকিবে। এই সময়েই মূলতান-নগরী হিন্দুদের একটা প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বহুদূর হইতে হিন্দু যাত্রীরা মূলতানের পূর্ণাম্বারে আসিত, এবং এতদ্ব একটা তীর্থস্থানে ঐশীয়া একাদশ শতকের প্রথম অর্ধে ধরিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের চর্চা কিছুটা থাক। সম্ভব ছিল। অল্-বীকুনী মূলতানে হইতো কিছুকাল অবস্থান করিয়া থাকিবেন।

অল্-বীকুনীর সংস্কৃতের জ্ঞান কি ধরণের ছিল, সে সম্বন্ধে ষা-বাউ তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জ্ঞানের প্রমাণ ও গভীরতা আনাদের সম্রাট, কিন্তু ইহা কাঙ্ক্ষক ছিল; এবং Charles Wilkins ও William Jones-এর সময় হইতে, ভারতে বসিয়া 'বে-সমস্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ গবেষণার কাণ্ড করিতেন, তাহাদের মতো অল্-বীকুনীও সম্ভবতঃ শাস্ত্রী বা পণ্ডিতের সহায়তা লইয়াই কাণ্ড করিতেন। অহুমান হয়, অল্-বীকুনী তাহার অহুমান-কাণ্ডের অন্ত বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক ব্রাহ্মণ সহায়ক বা শঙ্করীর উপর নির্ভর করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ পণ্ডিতগণ, বে-সমস্ত গ্রন্থপাঠ তাহার আবশ্যক ছিল সেগুলির অহুমান করিয়া লিখা তাহার সহায়তা করিতেন—এই অহুমান, উভয় পক্ষের পরিচিত কোনো ভাষাতেই নিকটই হইত, এবং সেই ভাষা নিকট ছিল, হয় পশ্চিম-পণ্ডাবের কথা ভাষা যাহা অল্-বীকুনী কিছুটা শিখিয়া লইয়াছিলেন, অথবা ফারসী ভাষা। ইহাই তাহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের প্রধান আধার ছিল। তবে তিনি নিজেও এইরূপ অহুমানের অথবা ব্যাখ্যার সাহায্য লইয়া কিছুটা সংস্কৃত শিখিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত বই পড়িয়া থাকিবেন, এবং এই সকল অহুমানের আধারে তিনি ফারসী বা আরবীতে তাহার মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষাতে কতগুলি পুস্তক অহুমান বা রচনা করেন, এবং এক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন—বিবরণ-বস্ত্র বা আশ্রয় মুখে-মুখে অনিষ্ট এই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত স্রোকে অল্-বীকুনীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। ষা-বাউ সংস্কৃত ভাষায় অল্-বীকুনীর রচিতদের অতি স্নন্দর আলোচনা করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত মূলের সহিত তাহার আরবী অহুমান বিশালাই অল্-বীকুনীর রচিত কত দূর এবং তাহার বিস্তার লীলা কত দূর ছিল, তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান জ্ঞান পণ্ডিত, যিনি একাধারে অস্তুতভাবে আরবী এবং সংস্কৃত দুইটাই বখলে আনিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে এইরূপ আলোচনা কম কথা নহে।

ইরানের ইতিহাসে, দাসানীর সম্রাটের যুগে (২২১-৬০২ খ্রীষ্টাব্দ) খানকয়েক সংস্কৃত পুস্তক অহুমানের ফারসী ভাষা পঞ্জরীতে অনূদিত হইয়াছিল। পরে এই-সব বই পশ্চিমের ভাষা সিরিয়া, আরবী ও গ্রীকে পঞ্জরী হইতে অনূদিত হয়। আরব মূলদান আলাস-বংশীয় খলীফা বা রাব্বাদের রাষ্ট্রকালে বগদাদ নগরে

আরবী ভাষায় যে পণ্ডিত, স্নোতিভ ও চিকিৎসা। সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়, সেই অনুবাদ এই-সকল সাসানী অনুবাদের দ্বারা অনুসরণ করিয়াই হয়। ভারতবর্ষের চিত্রায় ইরান ও পশ্চিম-এশিয়াতে প্রচাদের এই দ্বারা, গ্রীকদের যুগ এবং ভার আগের গিয়া পৌছায়। কমপক্ষে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চ শতক হইতে কতগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসী (ইহারা প্রায়ই সকলেই ভবদূর-প্ররক্তিক ছিলেন এবং বিশদকে ইহারা গ্রাহ করিতেন না—এই ধরনের সম্বন্ধীয় পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী এখনও মাঝে-মাঝে দেখা দেন) পশ্চিমের দেশসমূহে পর্যটন করিতে যাইতেন এবং গ্রীক পর্যটক গিয়া পৌছিতেন। ইহারা বিশেষ রূপক এবং সমানবর্ণী দ্বিজাত্য ব্যক্তিরের সঙ্গে মিলিতেন, এবং আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ব্যাপারে ইহারা নিজেদের বিচার-দ্বারা প্রচার করিতেন। এইরূপ অন্ততঃ একজন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের কথা গ্রীক-সাহিত্যে আমরা পাই। ইনি খ্রীঃ-পূঃ ৪০০-এর পূর্বে আবেস-নগরীতে গিয়াছিলেন এবং গ্রীক দার্শনিক সোক্রেতেস Socrates-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিদ্বদ্ভী বীর আলেক্সান্ডার Alexander ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে কালানোস Kalanos অর্থাৎ “কল্যাণ” নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে নিজের সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু এই পণ্ডিত বাবিলন পর্যন্ত যান, এবং সেখানে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় অশোক খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং অষ্ট্রিক-প্রাচ্যের কতকগুলি দেশে ভিক্ষু প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন—সিরিয়াতে, মাসিডনে, এথেন্সে, বিশেষ এবং উত্তর-আফ্রিকায় কেরেনে বা সাইরিন দেশে। সম্ভবতঃ এই-সকল ব্যক্তি ভারতীয় দার্শনিক বিচার লব্ধে বৌদ্ধিক উপদেশ দিতেন, এবং এই উপদেশেরই আধারে গ্রীক এতদ্ গিরিধান ভগতের দ্বিজাত্য দ্বারা ভারতীয় চিত্তাঙ্গণ লব্ধে অম-কিছু সংবাদ পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই-সকল পণ্ডিত, প্রাচীন পারসীক, সিরিয়ান অথবা গ্রীক প্রকৃতি পশ্চিমের ভাষায় সংস্কৃত অথবা অন্ত কোনো ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ অথবা রূপান্তরিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই; এইরূপ কোনো বই থাকিলেও তাহা চিকিৎসা হইতে পারে নাই, এবং এই প্রকারের কোনো বইয়ের উল্লেখও পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন ইরানে পরাক্রান্ত সাসানীয় সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষে ইহার সমসাময়িক আর্ঘ্যাবর্তের গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্য সাম্রাজ্যের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে, তখন হইতে পল্লবী ভাষায় রীতিমতভাবে ভারতীয় গ্রন্থসমূহের অনুবাদ, সাসানীয় সাম্রাজ্যের অধঃস্থল হইতে থাকে। (ইতিপূর্বে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের ডেয়ার মধ্য-এশিয়ার ইরানী ভাষায়—প্রাচীন খোতনী ভাষায় এবং চুলিক বা সোগ্দিয় Sogdian ভাষায়—বৌদ্ধধর্মের অনুবাদ-কাহা অনেকসং অংশের দ্বিগীত ছিল, কিন্তু তাহার প্রভাব ইরানের মধ্যে, বিশেষতঃ রঞ্জুরব-বে, তেমন করিয়া আসিতে পারে নাই)। বিরাট এবং শক্তিশালী সাসানীয় সাম্রাজ্যের পূর্বে গৌরবের দিনে, ইরান-দেশে মানসিক এবং সাহিত্যিক পুনর্জাগৃতি আরম্ভ হইয়াছিল; এবং ঠিক সেই সময়েই একদিকে গ্রীক ও সিরিয়ান ভাষা হইতে যখন চিকিৎসা ও স্নোতিভ প্রকৃতি বিজ্ঞানের ও বর্ণনের পল্লবী ভাষায় অনুবাদ হইতে থাকে, তেমনই অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের পুস্তকও অনূদিত হইতে আরম্ভ করে। পল্লবী গ্রন্থ D-in-kart সেন-কর্তৃ হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে গ্রীক হইতে দার্শনিক বা পণ্ডিত (pat Hrôm filisôkfây অর্থাৎ রোম বা বিজ্ঞানজ্ঞান হইতে আগত দার্শনিক) যুপ্রাচীন গ্রীক বা হেরা-এর এবং অর্ধাচীন রোমান-প্রভাবিত বিজ্ঞানজ্ঞান গ্রীকের বিভা (Vonâyik এবং Hromâyik অর্থাৎ রোম বা যখন বা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় বা অর্ধাচীন গ্রীক—এইভাবে সাসানীয়

যুগে ইরানীয়গণ গ্রীকবিজ্ঞান এই পন্থাপন্য নিদিষ্ট করিয়াছেন) ইরান-দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, ও এই উপায়ে ইরানের মন ও ইহাং সাহিত্য, এই উজ্জ্বল, তাহাদের ব্যাখ্যা এবং অল্পবাসের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন । অল্পরূপ ভারতীয় বিষদগুণ (pat Hindūkān dānāk) সাসানীয় রাষ্ট্রাসের সভায় তাহাদের গুণের এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের আসর প্রাপ্ত হন, এবং কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থের পল্লবী ভাষার অল্পবাসের কথা আমরা জানিতে পারি । (এ সম্বন্ধে ব্রৈয়া, H. W. Bailey কৃত বিশেষ উপায়ে গ্রন্থ Zoroastrian Problems in Ninth Century Books—Ratanbai Katrak Lectures, Oxford, 1943, পৃষ্ঠা ৮০-৮৬ ।) এই-সময় বইয়ের মধ্যে পল্লবের উপাখ্যান (Kalatak u Damnak অর্থাৎ করটক ও দমনক, পল্লবের উল্লিখিত এই দুই কৃষ্ণ কাহিনী) পাওয়া যায়, এবং trk' অর্থাৎ তর্ক-শাস্ত্রের বইয়ের অল্পবাসের কথা জানা যায় । যে-সকল ভারতীয় পণ্ডিত এই যুগে ইরান-দেশে আগ-বাওয়া করিতেন, তাহাদের পক্ষে ইরানের বাতাবরণ প্রতিফল ছিল না—ইরান-দেশের তখনকার দিনের ঋতুপঞ্জীয় ধর্ম এবং তাহার অধি-প্রভাবের মাধ্যমে উপাসনা, ভারতীয় হিন্দু অভিজ্ঞতার বা আচারের সঙ্গে খাপ খাইত । সাসানীয় যুগে হিন্দুদের মধ্যে ছন্দারের এত বাড়াবাড়ি হয় নাই, এবং অর্থ্য এবং শ্রেষ্ঠ, জাতিভেদ ও জাতিনাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা মূলদমানদের আগমনের পরে বড়ো কঠোর হইয়াছিল, তখনও ততটা কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই ; এবং এইজন্য অল্পবাস হয় যে, এই সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরা সহজে ইরানে বাইতেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আনিয়া হিন্দুনায়ে ঠেকা হইয়া থাকিতেন না । আনাদের ইহা নবো রাবিতে হইবে যে, ঐষ্টের জন্মের দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে ইরানীয় Magos নামধারী পুরোহিতগণ, ভারতবর্ষে নতুন করিয়া “মিহির” নামে সূর্য্যদেবের পূজা নইয়া আসেন, এবং তাহারা হিন্দুনায়ে “মণ-ব্রাহ্মণ” বা “শাকদীপীয় ব্রাহ্মণ” বলিয়া পরিচিত হন । (“মিহির” শব্দটি পল্লবী Mibr-এরই ভারতীয় রূপ, সংস্কৃত “মিহ্র” = অরৈক্য “মিথু”, এবং ইহা হইতে পল্লবী Mibr ।) ঐষ্টপূর্ব কালে প্রাচীন যুগে এ-বিষয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ আরও উদার ছিলেন । কিন্তু ইরান-দেশে ইসলামের মধ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, যে ধর্ম অল্প কোনো জাতির ধর্ম ও অল্পবাসের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি বা সম্মানের ভাব রাখিত না এবং ইসলাম-বহির্ভূত প্রায় ভাব্য ধর্ম ও বতবাসকে “কাকের” অর্থাৎ অবিবাসীয়ে ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করিত—তখন ইরানের অবস্থা অল্প প্রকারের হইয়া পড়িয়াছিল । যে বসন্তাখ্যক সংস্কৃত ভারতীয় পণ্ডিত বঙ্গার-এর মত মূলদমান-বল্ল হানে বাইতেন, সম্ভবতঃ তাহারা সেইখানেই থাকিয়া বাইতেন ; এবং আমরা এইরূপ ভারতবাসীর ইসলাম-ধর্ম গ্রহণের কথাও পাঠ করি । ইহা হইতে মনে হয় যে, তাহারা কোনো ক্রমে ইরাকের মত মূলদমান দেশে গিয়া পৌঁছিতেন, দেশে ফিরিয়া আনিয়া স্থানান্তরে তাহাদের পুনঃস্থায়িত হওয়ার বাধা ঘটত । বিশেষতঃ যখন সে সময়ে হিন্দুজরত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মূলদমান তুর্ক ও ইরানীয় সহিত জীবন-যরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল । গল্লনী-নগর ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ায়, এবং অল-বীজনের মতো জিজ্ঞাস্য পণ্ডিতের পক্ষে তাহাকে হিন্দু জ্ঞান ও বিচার দ্বারা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পাওয়া সহজ হওয়ায়, এই ইরানীয় মহাপণ্ডিত, আনাদের বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে, নিজে মূলদমান থাকি সবেও এবং সেই হেতু হিন্দুদের পক্ষে বাতাবিক তাহেই সম্বন্ধের পাঠ হওয়া সবেও, হিন্দু বিজ্ঞান ও দর্শনের কল্পনার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

অল-বীজনী তাহাং গ্রন্থে কুয়্যাপি “সংস্কৃত” এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি একবারও “প্রাকৃত” ও

“অপভ্রংশ” শব্দটির ব্যবহার করেন নাই। মধ্যযুগে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে যে পারদর্শী প্রচলিত ছিল, এবং বাংলা ভাষা পর্যন্ত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে বিজ্ঞান আছে যে, সংস্কৃত এবং কথ্যভাষাগুলি বস্তুতঃ পূর্বক ভাষা নয়, পরন্তু একই আধা বা সংস্কৃত ভাষার দুই বিভিন্ন “পাঠ” বা রূপ, অল্-বীরুনীও অস্বত্বপন্ন নত নানিয়া লইয়াছিলেন। কেবল ধনি বা উচ্চারণগত পরিবর্তন আনয়ন করিয়া ও “হৃৎ” “উ” ও বিভিন্ন প্রত্যয়ে এবং ব্যবহৃত শব্দে অল্পবল পরিবর্তন আনয়ন করিয়া, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষাকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা সহজ ছিল; এবং ইহার বিপরীতও অস্বত্বপন্নভাবে সহজ ছিল। অল্-বীরুনীর সূত্রায় শত বংশাবলি মধ্যে, উত্তর ভারতে—গুজবতঃ কাশ্মীরে—বসিয়া, লোকভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখাইবার চক্র বানোবার পণ্ডিত নামে এক আচাৰ্য্য “উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ” আখ্যা দিয়া যে একখানি বই লেখেন, তাহাতে তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন: যেমন “কৃতপ্রায়কিত্তা পতিতা ব্রাহ্মণী পুনরায় ব্রাহ্মণ্য কিরীয়া। পাম”, সেইভাবে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার শব্দ ও রূপ সংস্কৃতে পুনরায় উন্নীত হইতে পারে। এই যুগে প্রচলিত লোক-ব্যবহার ছিল, তদনুসারে শুদ্ধ ব্যাকরণগত সংস্কৃত, এবং লোকভাষার প্রয়োগ অনুসারে বিস্তৃত সংস্কৃত, ইহাদের মধ্যে পূরা পার্থক্য অল্-বীরুনী রক্ষা করেন নাই। স্থানে-স্থানে তিনি শুদ্ধ সংস্কৃত রূপের পরিবর্তে অথবা সৰ্ব-সঙ্গে প্রাকৃত বা ভাষার রূপও দিয়াছেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ সম্বন্ধে আবার তিনি সব সময়ে অবহিত হন নাই। তাঁহার উচ্চারণে বিভিন্ন বেশের গীতির ছাপ হ্রস্পট। ইহার একটা কারণ ইহা হইতে পাণে যে, তিনি যে-সকল সংস্কৃত-জানা লেখক অথবা সহকর্মীর সহযোগিতা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হ্রস্পট এক-ই প্রকারের সংস্কৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে ঋগ্বেদে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক ইহারা ছিলেন।

এর এই, এই-সমস্ত সংস্কৃত ব্যক্তি প্রধানতঃ ভারতের কোন্ অংশের লোক ছিলেন? ঋগ্বেদে অল্-বীরুনীর পুঙ্খক ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃত ও অল্প ভারতীয় “নাম ও শব্দের সূচী দিয়াছেন—যুগ প্রযুগে আরবী লিপিতে লিখিত রূপ, এবং লেগুলির মূল সংস্কৃত রূপ, উল্লেখ। সে যুগে যে হুকাঁ ছাঁদের আরবী লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহা নানা বিষয়ে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, অল্-বীরুনী এই অসম্পূর্ণ লিপির সাহায্যে সংস্কৃত শব্দের যে প্রতিলিখন দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে ঐষ্টীয় একাদশ শতকে পশ্চিম পঞ্জাবের সংস্কৃত এবং স্থানীয় লোকভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

অল্-বীরুনীর প্রতিলিখন বা প্রত্যাক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণের হ্রস্পট আদ্রা পাই। তাহাৎ প্রস্তুত শব্দগুলি হইতে আদ্রা বিশেষ এক স্থানের উচ্চারণের প্রমাণ পাই না—শুধু পশ্চিম পঞ্জাবের অথবা মধ্যদেশ অথবা অজমের উচ্চারণ ইহা নয়, কিন্তু ইহার মুখ্য আধার হইতেছে—সংস্কৃত বানানের অসহায়ী এক প্রকার উচ্চারণ, বাংলা সংস্কৃতের লিপির সঙ্গে এবং লিপির প্রত্যেকটী বর্ণের সাধারণ সম্বন্ধ-গৃহীত উচ্চারণের সহিত পরিচিত কোনো সংস্কৃত বিশেষ প্রত্যাক্ষ-করণের চেষ্টা, এবং এই বিশেষ বিভিন্ন প্রকার প্রাচীন উচ্চারণের দ্বারা সম্বন্ধে তেমন ওরাক্ষ-হাল ছিলেন না। শাক্যো ২৫০০-এরও অধিক ভারতীয় শব্দ অল্-বীরুনীর বইয়ে আরবী লিপিতে লেখা পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যাক্ষীকরণে দুই বিচ্ছিন্ন হ্রস্পট-চকের পথ মিলে। এক জো হুকাঁ ছাঁদে আরবী লিপির একান্ত অসম্পূর্ণতা; এবং দ্বিতীয়, Shefer শেকর পুণ্ডি, যেখানিতে অল্-বীরুনীর ভারতবর্ষ-বিষয়ক গ্রন্থ রচিত আছে, সেটা অল্-বীরুনীর নিজের হাতের লেখা পুণ্ডির ১১৬২ ঐষ্টাব্দে নকল করা প্রতিলিপি হওয়া সম্ভব (ঐষ্টীয় ১০৩১ সালের প্রথমে অল্-বীরুনী নিম্নের লেখা

সমাধি করেন), নকল-নবিশ সংস্কৃত শব্দগুলির সহিত অপরিচিত থাকার দরুন, মূল পুথির অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষের আরও তুল-স্রাষ্টি আনয়ন করিয়াছেন। আর্যকালকার প্রচলিত আরবী (এবং আরবী) লিপিতে নোক্ত। বা বিন্দু দিয়া বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য প্রকাশিত হয়; যেমন, একই অক্ষরে তলায় একটা বিন্দু দিলে “ব”, তিনটা বিন্দু দিলে “প”, এবং উপরে দুইটা দিলে “ত”। তদ্রূপ আরও একটা বর্ণে বিন্দু না দিয়া বধ্যবৎ লিখিলে “ঃ”-ধ্বনি, উপরে একটা বিন্দু দিলে উষ “খ”, নীচে একটা বিন্দু দিলে “গ”, ও তিনটা বিন্দু দিলে “চ”; তেমনি এই নোক্তার ব্যবহারের দ্বারা “ধ” এবং উষ “ধ”, তথা “ন” এবং “গ”—ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অল্-বীকুনীর সময়ে প্রচলিত কুবী ছাঁদের আরবী লিপিতে এইরূপ নোক্তা বা বিন্দু ব্যবহার বিরল থাকায়, বিশেষ নানের পাঠ অতি কঠিন হইয়া পড়ায়—যেমন পর পর লিখিত অক্ষর তিনটা, “হব্” পড়া যায়, আবার “জদ্”-ও পড়া যায়। অল্-বীকুনী, বতস্ব এই Schefer শেফর পুথি বইতে দেখা যায়, নোক্তা ব্যবহারের দ্বারা ও অত্র চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করিবার একটা প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু নমো হয়, তিনি “প”, “চ”, “ত”, “গ” প্রভৃতি কতগুলি ধ্বনির বধ্যবৎ প্রতিলিখন সম্বন্ধে তেমন অবহিত ছন নাই, এবং ভারতীয় ভাষার মহাপ্রাণ “ধ”, “ব”, “ব”, “ধ” প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ ব্য লন নাই। তিনি সাধারণতঃ আমাদের ভারতীয় মহাপ্রাণ “ধ”-এর মত আরবী “খাল” বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ এই আরবী বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী this, then, bathe প্রভৃতি শব্দের th বা dh-এর মতো উষ “ধ”-কারের উচ্চারণ। অল্-বীকুনী, কি ভাবে আরবী লিপিতে বিশিষ্ট ভারতীয় মূর্ত্ত বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির নির্দেশ করা যায়, তাহার পথ খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য তিনি “চ”, “ভ”-এর মত “ত”, “দ” ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যেখানে শব্দের অভ্যন্তরে অবস্থিত “ত”-অক্ষর “ড”-এর মতো উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি “র” ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন, krb=“কৃত্ত”, by’ry=“গ্যাতি”, drwr=“দ্রুতি”, drmr=“দ্রমিত”, n’ry=“নাড়ী”, byrwrj=“বৈকুণ্ঠ”, ইত্যাদি।

অল্-বীকুনী কিন্তু মুখ্য “ণ”-এর সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন, কারণ এই ধ্বনি এখনও পর্যন্ত সমগ্র পর্জাব—কি পশ্চিম-পর্জাবে কি পূর্ব-পর্জাবে—ও সিদ্ধ-প্রদেশে প্রচলিত আছে, এবং উপরন্তু ইরানী-গোত্রের অন্তর্গত পণ্ডিত ভাষাতেও ইহা বিদ্যমান। কখনো-কখনো অল্-বীকুনী আরবী লিপিতে u+r বা r+u ব্যবহার করিয়া এই “ণ”-এর ধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; যেমন p’urn=“পাণিনি” (দুই এক স্থলে এই শব্দ তুল্যরূপে p’urt লিখিতও হইয়াছে) এবং broj=“বণিজ, তণিজ”; এবং কখনো-কখনো তিনি সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ ধরিয়া দস্তা “ন” স্থানে মুখ্য “ণ”-এর প্রতিলিখন করিয়াছেন—যেমন bh’ur, bh’r=“ভাণ”, আবার bh’n, bh’aw=“ভাণ”। সংস্কৃত শব্দের ব্রহ্ম বা ঋষ

* আগোচর্য্য হুবিয়ার মত আমি এখানে বিবর্তিত পদ্ধতিতে আরবী লিপির যেমন প্রতিলিখন অসম্পূর্ণ করিতেছি—মূল আর্য্যতে যেমন “হরকৎ” অর্থাৎ ঘরটক সাংকলিতঃ দেওয়া হয় বা, এই প্রতিলিখনও তদ্রূপ ধর্য্য দেওয়া হইতেছে না: ‘=“অলিড”, বা “অলিড হরকৎ”; b=“বা (ব)”; t=“তা (ত)”; s=“সা (স)”; j=“জীড”, c=“চে”, h=“হা (বা হজ্জ-হে)”; x=“খা (বা খে)”; g=“গা (বা গা)”; d=“ডে”, e=“ঈ”, a=“আ (বা আয়া)”; d=“দা (বা আয়া)”; i=“ই (বা ইয়া)”; o=“ও (বা ওয়া)”; y=“যা”।

যিনি উভয়ই নিত্যম্ অবহেলায় সহিতই নির্বিশেষে করিয়া ছইয়াছিল, এবং বহুস্থলে ভ্রম্ বরননি দেখানোই হয় নাই যেনen b'r = "বাক" ।

অল্-বীজ্ঞানী তাঁহার প্রতিলিখনে বা প্রত্যাক্ষরে সাধারণতঃ যে উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা বাইতেছে । তিনি প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃত অক্ষরঃ "র"-এর স্থলে b-, -b-, -b নিদিষ্টাছেন ; শব্দের আদিতে কখনও w = "ৱ" লিখেন নাই, এবং এবং অতি অল্প কয়েকবার ঙ-কলা স্থলে অথবা শব্দের মধ্যে অবস্থিত "ঙ"-এর অন্ত w লিখিয়াছেন । ব-কলা বহুস্থলে আরবী প্রত্যাক্ষরে প্রদর্শিত হয় নাই, এবং ইহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রাকৃত বা ভাষার অনুসারে উচ্চারণ করিয়া লিখিয়াছেন, যে উচ্চারণে ব-কলা দ্বারা পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিধা-ভাব আদিয়া যায় ও ব-কলার উচ্চারণ হয় না । অল্-বীজ্ঞানীর প্রতিলিখনে "ব" = "ঙ"-এর নিবর্তন— blnb = "বিলবিন্", bykt = "ব্যাক", blbh = "ভলভ", prd অর্থাৎ brd = "বৃদ্ধি", prk অর্থাৎ brk = "বৃক", brn = "ব্রন" ও "ব্রহ্ম", bds = "ব্রিদিগ", b'lmyk = "ব্রাহ্ম্যকি", b'ma = "গ্রামন", b'adw = p'adw = "পাওর", plb = "ব্রত", byn অর্থাৎ byd-by'as = "ব্রেনগাপ", t'imbra = "ভায়বর্ণ" ; s'wyl = "বেত", bywsyt = "ব্রৈবন্ত" ; drs'dbd = "বৃষভ", rb = "ব্রি", k'b = "কাতা", ইত্যাদি । সংস্কৃত "সম্বতঃ" শব্দ দুই ভাবে লিখিত হইয়াছে—srst এবং srstt ; এবং "ব্রৈখানব" শব্দের প্রতিলিখন হইয়াছে bys'f'ar, এবং "নন্দিকের"-স্থানে লিখিত হইয়াছে undks'yfr, অর্থাৎ undkys'fr । এইখানে "ব" ও "ব"-তে যে অক্ষর "ঙ", "ব"-কলা রূপে আদিতহে, তাহার "f"-রূপে উচ্চারণ আশ্রয় দেখিতেছি— অর্থাৎ অযোষ, উষ "ন" ও "স"-এর প্রভাবে পড়িয়া, অক্ষর "ঙ" = v, অযোষ f-তে পরিবর্তিত হইত । ইহা একটু লক্ষণীয় ব্যাপার যে অল্-বীজ্ঞানী গাঙ্গেশ উপত্যাকার উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া অক্ষরঃ ঙ-কার (w, v) স্থানে বর্ণীয়-ব (b) লিখিয়াছেন । পণ্ডাৰে ও সিদ্ধ প্রদেশে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই অক্ষরঃ "ঙ", "ঙ"-ই রহিয়া গিয়াছে (v, w), ইহা বর্ণীয় "ব" অর্থাৎ b-তে পরিবর্তিত হয় নাই । অল্-বীজ্ঞানী কেন এইরূপ করিলেন ? তাঁহার মনে কি এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, পণ্ডাৰ ও সিদ্ধ প্রদেশের উচ্চারণ অপেক্ষা গাঙ্গেশ উপত্যাকার উচ্চারণ আরও প্রাচীন্য ছিল ? অথবা তিনি এমন কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এই বর্ণীয় ব-উচ্চারণই (b-ই) শুনিয়াছিলেন, যাহার পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার অন্ধা ভ্রম্মিয়াছিল ? ইউরোপীয় ভাষার দ্ব্যোচ্চ যিনি v-এর নির্দেশের অন্ত মিসর-দেশে ও অন্তত আমকাল তিনটা নোক্ত-সেওয়া "ক" বা "কে" অক্ষর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, এবং অল্-বীজ্ঞানীর পুথিতে এই বিশেষ বর্ণটিও দুই-এক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; দেখা myv'r = "মোড়" ।

মধ্যযুগের ভারতে, গ্রীক ভ্রম্ তাহা আদরা মানি না, কিন্তু লব্ধতঃ আধুনিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, যখন উত্তর ভারতের অনেকটা ভাষা দ্রুড়িয়া পাকিনী বা সৌরসেনী অপভ্রংশ সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তখন সংস্কৃতের মূর্ত "ব"-এর "ব"-উচ্চারণ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল । এই উচ্চারণ এতই সাধারণ হইয়া দাঁড়াই যে, বহু স্থলে উত্তর ভারতে দেখা "ব"-বর্ণটির ব্যবহার হইত না, মূর্ত "ব" দ্বারা "ব"-এর কাছ চালানো হইত । পণ্ডাবের গুরুদ্বী লিপিতে বেবনাগরী মূর্ত "ব"-ই, "ব"-এর অন্ত ব্যবহৃত হয় । এই উচ্চারণ অতি সাধারণ থাকার দরুন, শাহ-আহানের পুত্র রামচন্দ্রার দ্বারা শিকোহ যখন ফার্সী ভাষার সংস্কৃত উপনিষদের অনুবাদ করেন, তখন সেই অনুবাদ কার্যসীতে "উপনিষত" ('pukht) রূপেই লিখিত হয় । কিন্তু অল্-বীজ্ঞানী সাধারণতঃ সংস্কৃত মূর্ত "ব"-এর অন্ত ও s'-ই ব্যবহার করিয়াছেন ;

এবং “খ”-এর উচ্চারণ ধরিয়া আকবী লিপির “x” এবং “k”-“kli”-এ, অতি অল্প কয়েক স্থানেই ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন skht-“শিষ্টহিত” (উচ্চারণে “নিবাহিত”); এবং “নিবধ” শব্দ nxδu-“নিবধ” এবং usδ-“নিবধ” এই দুই প্রকার উচ্চারণ ধরিয়া দুইভাবে লিখিত হইয়াছে; তদ্রূপ ‘sryxyn-“ক্রিয়ণ” (‘ক্রিয়ণ’), glwκ-“ঘোষ” অর্থাৎ ‘ঘোষ’ bxw-“রিব্ধ” (উচ্চারণে ‘বিব্ধ’))। দর্শনার, pxkl’wt-“পুঙ্গাবতী”, pxkr-“পুঙ্কর”; এইরূপ বানান হইতে বুঝা যায় যে, অল্-বীজনী মূল-“ব”-এর বিভিন্ন প্রাচীন উচ্চারণ (অর্বাচীন “ব”-উচ্চারণ নহে) প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিলে। যথায় যে উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের তালব্য-“ব” প্রাকৃতের নব্য দিয়া দৃষ্ট্য “স”-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং সংস্কৃত ভাষার শব্দেও এই উচ্চারণ সংক্রামিত হয়। কিন্তু অল্-বীজনী মূল সংস্কৃতের তালব্য “ব”-এর উচ্চারণ বহু স্থলে s’ অর্থাৎ “সৈন্” অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একথা যেন রাখিতে হইবে যে হিন্দী, পঞ্জাবী, লহন্দী (বা হিন্দকী) এবং সিদ্ধী প্রভৃতি ভাষায়, তত্ত্ব শব্দে মূল মূর্ত্ত “ব”, “খ” হয় নাই,—দৃষ্ট্য “স” হইয়া গিয়াছে। গাধের উপত্যকার আদি-আধি-ভাবার বা সংস্কৃতের “ব”, “খ”, “স” প্রাকৃতের নব্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া সর্বদা দৃষ্ট্য “স” হইয়া গড়াইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবে ও সিদ্ধের ভাষায় এই দৃষ্ট্য “স”-এর স্থলে আমরা পাই “হ”; যেমন সংস্কৃতে “ত্রিংশতি”, “ত্রিংশ”-হিন্দী “বিশ” (bis), কিন্তু পঞ্জাবী “বিশ” (wih); সংস্কৃত “দশ”-হিন্দী “দেহ”, সিদ্ধী “ডেহ”; সংস্কৃত “বৃষ”-নারায়ণ “ব্রু”, পঞ্জাবী “ব্রু”; সংস্কৃত “অশ্বাৎ”-হিন্দী “অশাৎ”, পঞ্জাবী “হাৎ”; সংস্কৃত “জ্ঞান”-পঞ্জাবী “জাহ”; ইত্যাদি। অল্-বীজনীর প্রত্যক্ষকরণে তালব্য “ব” ও মূর্ত্ত “খ”-স্থানে s’ অর্থাৎ “সৈন্” অক্ষর ব্যবহারের পৃষ্ঠা: k’sy-“কসি”, k’ysb-k’syb-“কাতপ”; ts’-ভিত্তি; bbs, bbbs-“ভবিত্ত”, bh’rθbrs-“ভারতবর্ষ” (“ভারতবর্ষ” স্থলে); ks’yr-“কীর”; ks’knd-“কিচ্ছিয়া”; ks’-“কুম”; k’s’t-“কাঠা”; s’nk-“নখ”; s’nta-“নান্ত”; s’ys-“শেষ”; s’ylst’pt-“শৈলভূতাপতি”; s’kl-“নক্তি”; s’slks’-“শশিলক”; s’s’-“শিষ্ট”; s’sr-“শাহ”; s’q-“শক”; s’krb’r-“শক্কার”; s’-“ইবু”, “আশা”; s’r’bu-“শ্রাবণ”; s’rw-“শবত, শবর”; sj-s’c-“শুচি”; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কতকগুলি অল্প বানান পাইতেছি, যেমন tkrs1-“তক্ষীলা”; pywra-“পঘোকা”; rt-“অষ্ট”, m’nsrtg-“মাসাষ্টক”; pwr’rtk-“প্রাষ্টক”—এই শব্দগুলিতে s’ স্থলে r পাইতেছি, ইহার কারণ ঠিক বুঝা যাইতেছে না; সম্ভবতঃ ইহা মূর্ত্ত “ব”-এর বিকারজাত কোন ঘোষবৎ উষ্ম ধ্বনি নির্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকিবে—s’ (sb)-এর স্থলে z’ (zh)-এর মতন ধ্বনি, এবং এই ধ্বনি সহজেই r বা “র”-এর মতো শুনাইতে পারে। কতকগুলি স্থানে তালব্য “ব” এবং মূর্ত্ত “খ”, উভয়েই মূল s “সীন” অক্ষর অর্থাৎ দৃষ্ট্য “স” লিখিত হইয়াছে; যেখানে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ অনুবানত-বশতঃ ইহা হইয়া থাকিবে। mixrb-“নিবধ”—এখানে সংস্কৃত অথবা মহাপ্রাণ “ব” স্থলে অথোক উষ্ম “x”-ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অধিক যেমন সংস্কৃত অক্ষর “ভ”-এর বর্ণীয় “ব”-b-র উচ্চারণ পাইতেছি, সেইরূপ এদিকে অক্ষর “ব”-v (y-এর) বর্ণীয় “খ”-j-উচ্চারণ তেমনই হুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা লোকভাষার উচ্চারণের অঙ্গুলারী, এবং অল্-বীজনী সাধারণতঃ এই বর্ণীয় “খ” উচ্চারণ-ই মানিয়া লইয়াছেন। পৃষ্ঠা—jbn, j’w-“বহন”; j’ajblk-“বাহুব”; j’m-“বাসা”; j’dw-“বাহর”; j’wāhh-“অঘোষা”; j’ajw, j’ajwy-

"জ্ঞানো" (সংস্কৃত "জ্ঞানপত্নী" শব্দের পুরাতন পঠাবী রূপ); 'rjblar = "আরভী" (উচ্চারণ "আরভী"); 'rj'prt অর্থ "rj'bri, ও 'rj'vrt = "আর্যাবত" jst'ar = "বৃহত্তর" j'm = "বহু"; 'rjk = "আর্যক"; 'rjm = "আর্যম" jwz'u = "আর্যম" 'jrd = "আর্যদ" jwg = "আর্য"; 'j'rj = 'c'rj = "আর্য" njwt, nywtu = "নিবৃত্ত" p'z'rt = "পরিবৃত্ত" srjw = "সর্য", srw = "সর্য" ("সর্য" নামের প্রাকৃত রূপ); srj't = "সর্যত"। সংস্কৃত "সর্য" পর্বতের নাম s'j রূপে লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ অণু-বীজনী বাহালায় মতো "সর্য" এই প্রাকৃত উচ্চারণ জনিবা শিথিয়াছিলেন।

অণু-বীজনী সংস্কৃত "জ" এই সংস্কৃত বর্ণের প্রচলিত ভাষার উচ্চারণ "গ্য" অর্থ "গ্য" তথ্য ছিলেন, এবং এই উচ্চারণ এখন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত, ও দক্ষিণ-ভারতেও বহুস্থানে প্রচলিত লাভ করিয়াছে। তিনি "জ" শব্দ jgmu রূপে লিখিয়াছেন, এবং "জগদ্ব্য" শব্দ j'ajblk এবং j'gbulk এই উভয় পদ্ধতিতেই লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি সংস্কৃত "জ" = "জ" হলে nj লিখিয়াছেন, এবং একস্থানে s'm অর্থাৎ "স" ও লিখিয়াছেন, s'm = সংস্কৃত "জ"। বহু স্থানে তিনি "ত" = "t" হলে "n" = "d" প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—m'ds, m'ts = "মত" (উপরন্ত এই শব্দের প্রাকৃত "মজ" রূপও পরিচালন এবং এই রূপটির ক্ষমতা m'j অর্থ m'c লিখিয়াছেন); 'dr = "অত্রি" এবং "অত্রি", উপরন্ত "অত্রি"-র ক্ষমতা 'dr রূপও তিনি লিখিয়াছেন; 'dby = "অটরা (অজরা)"; bds = "বৎস" ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে এবং তদ্বিষয়ে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে, কোন রীতি অস্থানে অণু-বীজনী জাহার সমগ্র প্রচলিত হুকী শিপিতে সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাশ করা হইবে। আরও কতগুলি খুঁটিয়াটি বিষয় আছে, সেগুলি ভারতীয় ভাষার উচ্চারণের ধারা এবং শব্দ-সম্মে আরবী লিখন-প্রণালী, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিচার করিয়া ধরিতে হইবে। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর আগ-পাশে যেসময় নব্য-ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি আন্তঃপ্রকাশ করিতেছিল এবং বহন মধ্যযুগের এক অভিনব সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে ভারতীয় আর্য-ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির আলোচনায় অণু-বীজনীর পুস্তকে ভারতীয় শব্দের আরবী লিপিতে লিখন-প্রণালী হইতে, এই প্রণালী নানা ব্রহ্ম-প্রণালী এবং লিপিকর-প্রণালী ধাক্কা লবেও, বহু ভাষা আননা পাইতে পারি।

অণু-বীজনী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ প্রচলিত ভাষা, সাহিত্যের ভাষা হইতে পৃথক ছিল; অর্থাৎ লোকে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষার কথাবার্তা কহিত, কিন্তু উচ্চাঙ্গ-হিতো। সংস্কৃত ব্যবহার করিত। অণু-বীজনী বিভিন্ন প্রকারের নব্য-আর্য (অর্থাৎ প্রাকৃত বা অপভ্রংশ) অথবা নব্য-আর্য ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। তিনি সংস্কৃতের ভাষাগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পশ্চিম-পাঠ্য ও আফগানিস্থানের হিন্দুদের ভাষাই লিখিয়া থাকিবেন, এবং এই দুইটী এই যুগে সম্ভবতঃ একই ছিল, এবং সিদ্ধ-প্রবেশের ভাষা ইহা হইতে বেশী পৃথক ছিল না। আভ্যন্তর ভারতের অর্থাৎ "পছাই" বা পশ্চিম-বিন্দী প্রান্তের, তথা "পূর্ব" অর্থাৎ নব্য ও পূর্ব উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের জালাসুহ,

১ এ সম্বন্ধে খ্রীষ্ট আবার লেখা গেল—Sanskrit in Perso-Arabic Script—A Sidelight on the Medieval Pronunciation of Sanskrit in Kashmir and North India, *Indian Linguistics*, Quarterly Bulletin of the Linguistic Society of India, Volume VII, Part 3, 1939, Calcutta, pp. 131-166.

তথা গুহ্যগট-বাগ্‌দ্বানের ভাষার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঐ যুগে শৌরসেনী অশ্বমেধ সন্যাস আর্থা-ভারী ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পাশে একটা মুখ্য সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা পাইয়াছিল। অশ্ব-বীরের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার বইয়ের মধ্যে অপেক্ষিত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে উত্তর-পশ্চিমের কথা ভাষার রূপ ধরিয়াছেন, এবং তদনুসারে তিনি আরবী লিপিতে অক্ষরান্তর করিয়াছেন। এইরূপ শব্দের দুষ্টান্ত হইতে আমরা উত্তর-পশ্চিম সানাতনের ভারতীয় আর্থা-ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনি-বিষয়ক অভ্যাস ও প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ "স"-এর ধ্বনি (বাহা সংস্কৃত "স", "ব", "ন" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল) এই ভাষার "হ"-কারে পরিবর্তিত হইত—শব্দের মধ্যে, এবং কখনও-কখনও, আদিতে। অশ্ব-বীরের কবীকৃত এইরূপ কয়েকটা শব্দ—krw'h—"ক্রোহ"—সংস্কৃত "ক্রোধ"; by'h—"বিবাহ, বিয়াহ—ব্রিহা"—সংস্কৃত "বিপাশা"; āb'ry—"আবাহা"—সংস্কৃত "আবাচিকা"; bhud—"বহু"—"বহু"—সংস্কৃত "বহু"; lw'h'wr—"লোহার"—"লোহার"—সংস্কৃত "শালাহু"; dhyo—"দ্য"—"দ্য"—সংস্কৃত "দ্যমিকা"; y'hy—"এআহা"—"এআহা"—সংস্কৃত "একাদশিকা"; dw'ly—"দ্বা"—"দ্বা"—"দ্বা"; উদাহরণ urwhy, cwdhy, pac'hy "জিহ্বা, জোহা, পাহা"—"একাদশিকা", "চতুর্দশিকা", "পঞ্চদশিকা"। এই ভাষার, আন্ত-ভারতীয়-আর্থা অর্থাৎ সংস্কৃতের নাসিকা বর্ণ+বোধের অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, এই প্রকারের সংস্কৃত বর্ণ, নাসিকা+বোধবৎ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়; এবং নাসিকা বর্ণ+বোধবৎ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, দ্বিগুণ নাসিকা বর্ণে পরিণত হয়; যেমন, অশ্ব-বীরের উদাহরণ হইতে, সংস্কৃত "সংখ্য"—s'ng অর্থাৎ "গাং" বা "গাং"; "বসন্ত"—bhud "বহু"; "গাং"—s'mud "গামু" "ত্রিগাং"—trj'y "ত্রিগাং"; এবং সংস্কৃত "ভো"—dwm—"ভো"; সংস্কৃত "উদগুহা"—'dopr—"উদগুহা"; তুলনীয়, আধুনিক পাহারী "বহু"—সংস্কৃত "বহু"; "চো"—সংস্কৃত "চপক"; "রো"—"রো"; সিদ্ধি "কাও"—"কটক", ইত্যাদি। পাহারী "চো"—"চো"—প্রাকৃত চোহা, সংস্কৃত চোহা; "চোহা"—কারী "আব-জল", ইহা হইতে "চোব, নোব" নামের উৎপত্তি। ঐশাখ ১১০০-এর দিকে আমাদের মহাভারতের উপাখ্যান আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, এবং মহাভারতের এই আরবী রূপে "হুজা", qnd এইরূপে লিখিত হইয়াছে এবং এই qnd উত্তর-পশ্চিম সানাতনের ভাষার রূপ "হুজা"—বই প্রত্যক্ষ; তদ্রূপ সংস্কৃত "পাহু"—প্রাকৃত "পহু"—উত্তর-পশ্চিমের ভাষায় ছিল "পাহু", এবং এই "পাহু"—রূপ আরবী লিপিতে lūh-রূপে লিখিত হইয়াছিল। এই ভাষাতে উপরক্ত আদি-আর্থা-ভাষা বা সংস্কৃত সংস্কৃত "ক্র", "জ" প্রকৃতি বোধবৎ বস্তু হইয়াছিল; যেমন সংস্কৃত "ক্রোধ"—krw'h—"ক্রোহ", সংস্কৃত "ক্রোধ"—tryh—"ক্রোধ"—"ক্রোধ"।

এইভাবে দেখা যায় যে, অশ্ব-বীরের লেখা বইয়ের মধ্যে যে সব সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আরবী লিপিতে পাওয়া বাইতেছে, সেগুলি ভারতীয় আর্থা-ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন স্থানে এইভাবে কৃত সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দের আরবী প্রত্যক্ষীকরণ, সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু।

অশ্ব-বীরের সংস্কৃত হইতে আরবীতে কৃতকগুলি বইয়ের অধ্যয়ন করেন। কি কি বই তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়, এবং কোন্ পদ্ধতিতে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় জায়াউ নিগদে। তাঁহার নিজেই উক্তি প্রমাণে, তিনি উপরক্ত কৃতকগুলি আরবী বইয়ের সংস্কৃত অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতদের সাহায্যে খজুবান করায়াছিলেন। জাখাউ অল্-বীরুনীর মূল আদর্শ বইয়ের সংস্করণের ভূমিকায় ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ভারত-বিজ্ঞা বিষয়ে অল্-বীরুনীর কৃতি, সংস্কৃত হইতে আরবীতে কৃত অম্বাধ্য সনেত, জাখাউ উল্লেখ করিয়াছেন—এই-সমস্ত রচনা তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ “ভারত-বিবরণী” (অল্-তাহসীল অল্-হিন্দ)-এর বহির্ভূত। তিনি যখন: তিনখানি বইয়ের সংস্কৃত অম্বাধ্য করিয়াছিলেন—গ্রীক গণিতবিজ্ঞানি ইউক্লীড-এর জ্যামিতি শাস্ত্রের শূণ্য বৃত্ত (Elements of Geometry), জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রীক জ্যোতিষিক প্টোলেমির Ptolemy-র একখানি গ্রন্থ, এবং Astrolabe অর্থাৎ সপ্তর্ষে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের বিষয়ে রচিত তাঁহার নিজের একখানি পুস্তক। জাখাউ-এর কথন অনুসারে, “সম্ভবত: তিনি এই সকল বই-ত্রয়ের অর্থ পণ্ডিতদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহারা তাঁহার বক্তব্য সংস্কৃত শোকে গ্রন্থিত করিয়া দিতেন”। অম্বাধ্য হইলে, আরবী এবং ইসলামী বিজ্ঞানের এই-সকল সংস্কৃত অম্বাধ্যের দ্বারা, অল্-বীরুনী, কান্দার এবং আভ্যন্তর-ভারতের হিন্দু পণ্ডিতদের সহিত একটা যোগদ্বারা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সমস্ত সংস্কৃত অম্বাধ্যের অস্তিত্ব আর নাই।

একটা ক্ষুদ্র ব্যাপারে (ব্যাপারী ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অস্বাভাবিক ভাবনী বিশেষ মহৎপূর্ণ ছিল), আনানের মনে হয় আমরা অল্-বীরুনীর হাত দেখিতে পাই, এবং ইহার দ্বারা অল্-বীরুনী কি ভাবে সংস্কৃত অম্বাধ্য করিতেন তাহার একটা দিগ্‌দর্শন আমরা যেন পাই। উপরন্তু এই ব্যাপারের দ্বারা, ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অম্বাধ্য-রূপে, ও সমস্ত জাতির যে নিম্ন ভাগে নিরস্ত্র করার অধিকার আছে, এইরূপ বিচারের মামুল-রূপে, অল্-বীরুনীকে দেখা যাইতেছে।

১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান বহমুদ বখশ খিলা রাজ্য জয় করিলেন, তখন অল্-বীরুনী তাঁহার দেশের জামীন-রূপে গজনীতে আসিতে বাধ্য হইলেন। যেন হয় যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জ্ঞান সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, যদিও সম্ভবত: তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার কার্যের জ্ঞান তিনি সুলতানের দরবারে কোনেতপ পূর্ণপোষকতা বা দক্ষিণা বা অর্পণদ্বারা প্রাপ্ত হন নাই। সে বাধ্য হউক, তাঁহার সমসাময়িক এই পরাক্রান্ত সুলতানের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ হইবার কোনো কারণ তাঁহার ছিল না। উপরন্তু, তাঁহার গবেষণার কথা চালাইবার ক্ষমতা সমর এবং অর্থ-এর দুইয়ের-ই অভাব-হেতু যে প্রতিবন্ধক তাঁহার আসিত, সে সম্বন্ধে তিনি অস্তিত্বগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গজনীর সুলতান বহমুদের দরবারে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি ছিলেন কবি কিসরোসী, যিনি সুলতানের দক্ষিণা-শাস্ত্রের আশায় পারস্য-দেশের জাতীয় মহাকাব্য “শাহ-নামা” বা রাজকথা নামে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তিনি সুলতানের নিকট হইতে আশাহুয়ারী ও প্রতিশ্রুতির অম্বাধ্য অর্থ না পাইয়া বিশেষভাবে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আন্তরিক সাহায্যকৃতির অভাব এবং বহমুদের প্রধান মন্ত্রী বিরোধিতা, এই দুই কারণে সুলতান বহমুদ তাঁহার সমস্তের এই দুই মহান ব্যক্তির উপযুক্ত সমাধা করেন নাই, এবং অল্-বীরুনী ও কিসরোসী উভয়ের পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

সুলতান বহমুদ একজন কৃতকর্মী শাসক ছিলেন। তিনি উদার-স্বভাব এবং সত্যকার খুব-বীর ছিলেন, এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের একজন উন্নয়নের উৎসাহ-প্রদাতা ছিলেন। তিনি ইসলামের এবং তুর্কীজাতির

ইতিহাসের দ্বিতীয় বীরযুগের ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল, তাহাতে একাধারে ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আশ্রম এবং কাম্বের দেশ লুণ্ঠপাট করিয়া ধন-সংগ্রহের সংগ্রহ পথ, এই উভয়ই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তাঁহার এক শতাব্দী পরে পশ্চিম-ইউরোপের Frank বা ফ্রান্সীকী অর্থাৎ ফরাসী ও জার্মান জাতীয় ক্রীড়ান Crusader বা ধর্মযোদ্ধাগণ নিজদের সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য মনে করিত, মূলতান মহম্মদের মনে তদ্রূপ অস্বাভাবিক সংশয় ছিলনা যে তিনি এবং তাহার তুর্কী যোদ্ধাগণ ইরানের সম্বন্ধে উক্ত আধর্শের মাহুত্বই ছিলেন—তাঁহারা ছিলেন পরদেশের আশ্রমের নির্ধারিত পন্থা; বিশ্বদী হিন্দুদের সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া, তাহাদের ধনে-প্রাণে মারিয়া, লুণ্ঠপাট করিয়া ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মোন্মত্ত করিয়া এবং মুসলমানের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু মন্দির ও সেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, তাহারা ইরানেরই প্রত্যাদেশ বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছিল। আশ্রমের এই সেবার জন্য তাহারা ভারতবর্ষের বহুযুগের সঞ্চিত ধনসম্পদ এবং বিজিত হিন্দুদের যথা হইতে সহস্র সহস্র দাসদাসী পাইয়া ইহুজগতে পুঙ্খভূত হইত, এবং পরজগতে কোরানে বর্ণিত জিহাদ বা স্বর্গের সমস্ত স্বর্থ ও আনন্দের অধিকারী হইত। এই-সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া, মহম্মদ ইসলাম-ধর্মের প্রচারের উগ্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নীতিশালী হইয়া, তাঁহার অনুমিত তুর্কী এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের সাহায্যে, “খও, ছিহ, বিক্ষিপ্ত” এবং দুর্বল অধঃপতিত হিন্দুদের দ্বা করিয়া, নিজের দাসদাসকে আরও পরিবর্তিত করিতে পারিয়াছিলেন; এবং হিন্দুরা, তাহাদিগের প্রাচীন ও সে-যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বপ্নময়ী যুদ্ধের রীতি লইয়া মহম্মদের সম্বন্ধে কোথাও পাড়াইতে পারে নাই। অল-বীকনী এই ব্যাপারের সম্বন্ধে নিম্নে এইরূপ বক্তব্য করিয়াছেন : “মূলতান মহম্মদের বীর-কাণ্ড অস্বস্ত ছিল, এবং ইহার সম্বন্ধে হিন্দুরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার স্রাব হইয়াছিল; এবং তাহাদের কথা, মাহুত্বের মুখে প্রাচীন জনজাতির মতন হইয়া পাড়াইতেছিল”; এবং ৩০ বৎসর ধরিয়া মহম্মদ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে-সমস্ত ধর্ম এবং লুণ্ঠ-মূলক অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা, “দেশের সমৃদ্ধি একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। গজনির মহম্মদ কর্তৃক ভারতবর্ষের মধ্যে এই-সকল লুণ্ঠনের অভিযান, হিন্দুজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকর বিপত্তি-রূপে বোঝা গিয়াছিল; এবং হিন্দুদের মনে এই ভাব “হুজ-শিকন” অর্থাৎ মৃত্যুভয়কারী মহম্মদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা ক্রীতির ভাব থাকে সম্ভবপর ছিলনা। কারণ জাতি-হিলাবে তিনি তাহাদের ধর্মানাশ সাধন করিয়াছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবীবের মতন এ-যুগের একজন নিরপেক্ষ মুসলমান ঐতিহাসিক সেবাইয়াছেন যে, মূলতান মহম্মদের আচরিত এই “তুর্কী পদ্ধতি”তে ইসলাম-ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হইয়াছিল; এবং বরফ ইহার বিপরীত ফল-ই হইয়াছিল। এই “কল্যাণ আক্রমণের” এবং ধ্বংসের কাণ্ড বাহা ক্রীড়ায় বশত শতাব্দীতে আফগানিস্থানের তুর্কী হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, এবং পরবর্তী একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বাহা আরও প্রচণ্ডভাবে কার্যকর হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইরানের প্রখ্যাতনাশা হুকা দার্শনিক ও রহস্যবাদী কবি জলাশুদীন রুমী (মৃত্যুকাল ক্রীড়ায় ১২৭৪ সাল) এইভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন—

“হিন্দু-ই-কতী-রা তু তুর্কীনা নব্বা হন”

(যেভাবে তুর্কগণ অপরার্থ হিন্দুদের নিজের অধীনে আনে, সেইভাবে তুমি জীবনকেও নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনে।)

কিন্তু মুসলমান ইরানী ও তুর্কী মুসলমান জগতে অনেক স্থিতে পারিলেন যে, মহম্মদের এই তুর্কী

পদ্ধতি—“তুর্কানা তরীকা”—অন্যদিকে নৃপাট, হত্যা ও ধ্বংসের পথে ভারতবর্ষের লোকসে—কি অভিহিত্যে ক্ষেত্র এবং কি নিরস্ত্রের লোকসে—ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইবে না। অস্ত্র এক পন্থা এদিকে ইসলাম-প্রচারের কার্য করিতেছিল— সে ছিল শাস্তির পন্থা, সহ্যাহৃদতির দৃষ্টিতে হিন্দু জন-সাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা বাহ্যিক। সমাধের নিরস্ত্রের স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে, সহস্র সদল ভাবে ইসলামের মূল ভরকথা আনিয়া এবং নান্যগ্রন্থাবলীর অলৌকিক প্রক্রিয়া দেখাইয়া (অর্থাৎ কেদারভিত্তি জাহির করিয়া) ইহাদিগকে সমস্ত অথবা ইসলামের গভীর মধ্যে টানিয়া আনা। এই “মুহিবানা তরীকা” অর্থাৎ মুফী সাধকের পদ্ধতি, ইসলাম-প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছে। মুফী সাধক-গণ তাঁহাদের কোমল ভাব, সর্ব ধর্মবিত্ত সত্ত্ব উদ্বারতা, এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা লইয়া তাহাদের জীবন-ব্যাপন, এই-সব গুণ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করায়, মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল হইতে বহু দূর অকসে জন-সাধারণের মধ্যে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিতে এই রীতির শাস্তিপূর্ণ প্রচার বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল। এই ভগ্ন দিল্লী, আগ্রা, লখনৌ, জৌনপুরের আশ-পাশে যেখানে শতকরা ১৫ কি ২০ জন মুসলমান, সেখানে হুদ্র পূর্ব-বঙ্গে কোনো-কোনো জেলায় শতকরা ৮০ জনের উপর হিন্দু এখন মুসলমান ধর্ম স্বীকার করিয়াছে। হলতান মহম্মদ অবশেষে বর্ষ ১১৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের এক অকল পতাধি করিয়া গজদার সাম্রাজ্যের সহিত যুক্তি দিলেন, তখন পর্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান করা তাঁহার জীবনের যেন প্রধান ক্রম হইয়াছিল।

পতাধি করিবার পরে এবং তাহাকে গজদার সাম্রাজ্যের এক মংশে পরিণত করিবার পরে, হিন্দুদের এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রবল শত্রু, মলিহ-ও সেবমুর্তি-ধ্বংসকারী বিশেষ মুসলমান রাজা, তাঁহার অধীনে আগত এই নতুন ভারতীয় প্রবেশের হিন্দু প্রজাবর্গের দ্বারা এক নতুন ধরণের মুহাের প্রচলন করিলেন। এই মুহাের উপরে তিনি যে লেখ উৎকীর্ণ করাইলেন, তাহাতে এমন একটা অদ্বৈতপূর্ণ ব্যাপার ছিল, যাঁহা মুসলমান মসলেকের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কখনও হয় নাই, এবং ইহার পরেও আর কোনো মুসলমান শাসক কোথাও করেন নাই। ওমর Omayya-বংশীয় আরব মুসলমান শাসক বা সম্রাটের সময় হইতে যে বিশিষ্ট ইসলামী রীতির মুহা মুসলমান ভাষাতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই কয়টা বিষয় সব সময়ে পাওয়া যায়; [১] প্রথম থাকে, কলিমা বা কলমা অর্থাৎ আরবী ভাষায় রচিত ইসলামী ধর্মের আদ্য-মন্ত—“লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ, মুহম্মদ রসুল-ল্লাহ”, অর্থাৎ অল্লাহ বাতীত অস্ত্র কোনো উপাস্ত নাই, এবং মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ; [২] দ্বিতীয় প্রবর্তক রাজার বা শাসকের নাম ও বিবরণ; [৩] যে স্থানে বা ঠিকানাতে মুহাটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ, আরবী ভাষায় এই ভাবে লিখিত হয়—“মুদ্রিবা (বা ছুদ্রিবা) হাখা অল-মুদ্রিহ (অথবা অল-নীমার) ফী...” (অর্থাৎ এই মদ্রিহ বা গোপা মুহা অথবা নীমার বা ধর্মমুহা অদ্বৈত স্থানে আদ্য হইয়াছে বা প্রস্তুত করা হইয়াছে); এবং শেষে থাকিত—[৪] বিজ্ঞা সংবৎসর ধরিয়া মুহা-প্রবর্তনের বর্ষের উল্লেখ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত হলতান মহম্মদের মুহা আদ্য লেখি, দুইটা ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে—ইহাই ইহার প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। একদিকে মুসলমান রাজাদের মুহা আদ্য যেন পাই—উপরে লেখা এই চার দশা উল্লেখ, আরবী ভাষায়; এবং দ্বিতীয় অঙ্গদিকে পাইতেছি, এই সম্পূর্ণ আরবী লেখের ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে অল্লাহ বা—এক এই ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া প্রাধান্য করিবার বস্তু। একজন মুসলমান রাজা,

যিনি সারা জীবন বিধর্মী বলিয়া হিন্দুদের সহিত ঘৃণ-বিগ্রহ করিয়াছেন, এবং যে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনে; আস্থা বা ধরম থাকিবার কথা নয়, তিনি তাঁহার নিজ ধর্মের পবিত্র বীজ-ময়টী এই বিধর্মী ইব্রাহীমপুত্র জাতির সেবাচাে সংস্কৃত অহুবাে করাইলেন—ইহা এক অগােবনীয় ঘটনা। এই মূত্রার সংস্কৃতে আরবী কলমার এইরূপ অহুবাে করা হইয়াছে :—“অবাক্ব্ব একম্, মুহম্মদ অবতার।” ইহা অবশ্র আকস্মিক অহুবাে নহে, এবং পণ্ডিত মুসলমান এই অহুবাে সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইবেন না—বিশেষতঃ কলমার দ্বিতীয় অংশের অহুবাে। কারণ খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা যে ভাবে incarnation বা “অবতার” মানে, নবী মুহম্মদকে সে ভাবের “অবতার”-রূপে মুসলমানগণ কল্পনা করেন না। মুহম্মদ ছিলেন পুরাপুরি মাদ্রহ, এবং তিনি নিজেও সে কথা বার-বার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সবেও, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে ইসলামের দগতে, বিশেষ করিয়া ইরান, আফগানিস্থান ও তুর্কীস্থানে, নবী মুহম্মদের ব্যক্তিগত প্রায় দেবদে উদ্ভূত হইয়া গিয়াছিল—ইসলামের অনুখানের ৩৪ শত বৎসর পরে। কোরানের সরল সহজবোধ্য ধর্মত, নানাভাবে অলঙ্কৃত ও পল্লবিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছিল। হৃদয়গণের কল্পনা-প্রবণতার দরুন ইহা অনেকটা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে এবং অন্তর, নবী মুহম্মদের মানবাত্মিগতা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুবই লাধারণ; এবং বিলাস বা বৌদ্ধ শরীফের বক্তো ধর্মকথার আসরে, মুসলমান পুরাণ-অহুলােে সৃষ্টির কথা এবং মুহম্মদের আবির্ভাব ও জীবনীয় কথা, এবং তখনন্তর শেষে “রোম কিয়ামত” অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তিমের শেষ দিনের কথা, যখন “গুদাইম.” বা ধর্মোপদেশক বর্ণনা করেন, তখন ইহা প্রচারিত হয় যে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টির বহুপূর্বে, এমন কি পগমেশ্বরের সত্তার অংশ-রূপে, স্বর্গে আমা-ভায়ালা “নূ-ই-মুহম্মদী” অর্থাৎ মুহম্মদের জ্যোতি বলিয়া এক বিশেষ জ্যোতির্ধর শক্তি স্রজন করিয়াছিলেন, এবং তাহা ধূণ ধূণ ধরিয়া স্বর্গে অবস্থিত ছিল; পরে এই জ্যোতির্ধর শক্তির অংশ লইয়া স্বর্গের “কেরেতা” বা দেবত্ব এবং অন্ত নানাপ্রকারের প্রাণী সৃষ্ট হয়; এবং অবশেষে এই “নূ-ই-মুহম্মদী” ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মুহম্মদের মাতা মেবী আনিয়ার গর্ভে ভবিষ্যৎ নবী বা রমূল অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই কল্পনোচ্ছল পৌরাণিক কাহিনী ভারতবর্ষে নবী মুহম্মদের জীবনকথা-রূপে এক অদ্বুত রসপূর্ণ “ভক্তবাল” কথার স্রায় আশিয়া পৌছে, এবং বিশ্বাসী মুসলমান সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এই কাহিনী গ্রহণ করেন। স্বতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে, মুহম্মদকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করা তেমন অসঙ্গতি বল। যায় না; এবং ঐ সময়ে জনপ্রিয় হৃদয় প্রচারকগণ ভারতবর্ষের ধর্মোচ্ছিন্ন হিন্দুদের তথা বাহাদের ইসলাম ধর্মে আনা সম্ভবপর হইতে এইরূপ হিন্দুদের কাছে, মুহম্মদের ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কথা তাহাদের মানসিক চিন্তাধার অহুলােে এইরূপ উপাখ্যানের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছিল।

কলমা-মস্তের এই সংস্কৃত অহুবাে লইয়া শেষে আলোচনা করিতেছি।

রাজার ও টাঁকশালের নাম এবং সন-তারিখের কথা লইয়া আরবীতে এই মূত্রার বাহা লেখা আছে, তাহা বেশ স্পষ্ট সহিত বখাষখভাবে অনূদিত হইয়াছে (“অবঃ টকঃ মুহম্মদপুত্র ঘটে আহতঃ”— এই টক বা টাকা মুহম্মদপুত্র অর্থাৎ লাহোরের ঘটে বা টাঁকশালে আহত হইয়াছে অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়াছে); “রূপতি মহম্মদ”; “জিনারুন-সংবতি...” (“জিন” অর্থাৎ বিজ্ঞতা, অর্থাৎ নবী মুহম্মদের জন্ম অর্থাৎ নির্গমন বা দ্যাবার...বর্ষে)। মুসলমান অধের নাম “হিজরা” (অর্থাৎ “পলায়ন” বা “নির্গমন”), বিশেষ চিন্তার সহিত এই শব্দটার সংস্কৃতে অহুবাে করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিজরা অধের সম্পূর্ণ নাম হইতেছে “হিজরতুন-নবী”

অর্থাৎ নবী বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুঙ্খবের পলাদন বা নির্গমনের বৎসর—ইহার সংস্কৃত হইয়াছে “জিনের বা বিজ্ঞতা পুঙ্খবের অথবা ধর্মকর বা ধর্মোপদেশক মহাপুঙ্খবের অদন বা নির্গমন”। এই দুই ভাষার লেখ-সংশ্লিষ্ট দুই ভিন্ন ভিন্ন তারিখের অঙ্ক সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিভিন্ন প্রতি পাওয়া গিয়াছে (যথা ৪১২ হিজরী অঙ্ক, ৪১২ হিজরী অঙ্ক—যথা ক্রমে ১০২১ ও ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ), এবং এই বিভিন্ন প্রতিতে পাঠ্যভেদও কিছু আছে। এই দুই ভিন্নতার মধ্যে একটিকে “বিশ্ব-সাহা” এই বাক্যটি সংযোজিত হইয়াছে এইভাবে—“অবাক্ত-নাৎ” অর্থাৎ অবাক্ত পরবেশের নাম দিয়া।*

এইভাবে সংস্কৃত আরবী কলনার অম্বাবা বিধা দুই প্রকার প্রবর্তন, গোড়া মূলদানের দৃষ্টিতে “বিশ্ব” অর্থাৎ করপ্রদাতা বিধিত বিধনী প্রকার প্রতি অর্থে এবং অম্বচিত অম্বগ্রহ বলিয়াই মনে হইত। ঐ সময়ে যখন প্রায় গুরুত্ব সাধারণ বিধানী মূলদানের মনে একটা আরব-আতির গৌরব-বীকারের নোভাব বিদ্যমান ছিল, এবং আরবী ভাষার পাশে এইভাবে বিধনী হিন্দুর ভাষার স্থান দেওয়া অনেকেরই ভালো লাগিত না, তখন, আমানদে মনে আশ্চর্য লাগে, কেমন করিয়া গভীর অধিপতি মূলতান মহম্মদ, যিনি জীবনের ত্রিংশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের সহিত লড়াইছিলেন, তাঁহার নববিস্তারিত হিন্দু প্রজাদের প্রতি এই বিশেষ অম্বগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং ইসলামের মূল কথা তাহাদের নিকট তাহাদের আপন ভাষায় প্রচার করিলেন। কিন্তু সের-সেরে রাহোর দুই ভাষার ভাষাকে অগ্রাধিকার করিয়া, মনে হয় তিনি বেশ হিন্দুদের জাতীয়তাবোধের পরিপোষক কর্তৃক করিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে তিনি কৃৎ রাজনৈতিক চাল-চলিতে এই কার্য করিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ মহম্মদ তাঁহার সাম্রাজ্যের নববিস্তারিত হিন্দু প্রজাদের বিরোধী-করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, কারণ এই হিন্দু তাখন তাঁহার সাম্রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশেষ অঙ্গ ছিল না। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে, এই ব্যাপারে তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত উদারতার রাজনৈতিক ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু আবার ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না যে, এই সংস্কৃত অম্বাবা দুই অঙ্কিত করার পিছনে হিন্দু-আতির প্রতি যে মহামূল্যবোধী ও সংস্কৃতিপূর্ণ এবং বিশ্বজনীন মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, তৎসত্ত্বে অল-বীন্ননী আখ্যায়িক সাধুবাদের পাত্র। মূলতান মহম্মদের দরবারে অল-বীন্ননীর মতো ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। হিন্দুদের ভাষাকে রাজকীয় দুই ভাষার স্থান দিয়া ইহার প্রতি যে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদের বিজ্ঞা ও সংস্কৃতির প্রতি স্রষ্টার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনো জ্ঞান বা সংস্কৃত পণ্ডিতের এই ব্যাপারে যে কোনো হাত ছিল,

* এই দুই বাক্যের অর্থপত্রী : (১) Edward Thomas, 'On the Coins of the Kings of Ghazni, 951-1171 A. D.', London, 1848, p. 57; (২) Charles J. Rodgers, 'Catalogue of Coins collected by Chas. J. Rodgers and purchased by the Government of the Panjab', Part II, Miscellaneous Muhammadan Coins, Panjab Government Publication, Calcutta 1894, p. 28, coins no. 38 ff.; (৩) Stanley Lane Poole, 'Catalogue of Coins in the British Museum', referred to by K. N. Dikshit; (৪) K. N. Dikshit, 'A Note on the Bilingual Coins of Sultan Mahmud of Ghazni', JRASO, Letters, Vol. II, 1936, No. 3, issued 1938, Numismatic Supplement, p. 29; (৫) Stanley Lane Poole, 'Medieval India (Story of the Nations' Series), London, 1905, p. 27—৩১৮ বিজ্ঞা—১০২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের একটা দুই ভাষার আছে; (৬) মাজির বিজ্ঞানকার—‘ইতিহাস-অঙ্ক’ (দ্বিতীয় পৃষ্ঠা), প্রথম ৬৩, প্রথম, ১৯৩৬, পৃ. ২১০, ২১১।

তাছাড়াও মনে হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকবিগের করণ-অহুসারে, গল্পনীর স্থলতান মহম্মদ যে সকল প্রকার বিস্তার বিষয়ে গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। একবার কতকগুলি তুর্কী দৈনিক ভারতবর্ষে মনৈক রাসপুত রাজার রাজধানীতে কতকগুলি ছাড়া ছাড়া হাতীকে আয়ত্তে আনিয়া শৌর্যের পত্রিকা মিলাছিল, এবং তাহাদের এই সাহস ও শৌর্যের কথা, “হিন্দী” অর্থাৎ ভবনকার যুগের অপভ্রংশ ভাষাতে কবিতা রচনা করিয়া, প্রস্তুতিবাদ করা হইয়াছিল। এই কবিতাগুলি পরে ঐ রাজা স্থলতান মহম্মদের কাছে ডেট-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন; এবং মহম্মদ ঐ ভাষা বুঝিতেন না বলিয়া, কতকগুলি পণ্ডিত অর্থাৎ উচ্চ ভাষার সহিত পরিশীলিত ব্যক্তিকে দিয়া ঐ কবিতা অল্‌হুদা করাইয়া লন এবং পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি যে কোনো ভাষণ বা অল্প কোনো হিন্দুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, আপন মূলায় এই সংস্কৃত অল্‌হুদা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

এই ব্যাপারে যদি কেহ স্থলতান মহম্মদকে প্রেরণা দিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র অল্‌বীকুনী-ই হইতে পাবেন। এবং যে ভাবে কতকগুলি আরবী শব্দের সংস্কৃত অল্‌হুদা করা হইয়াছিল, তাহাতে অল্‌বীকুনী-ই চিন্তাধারা দেখা যায়। আরবী “নবী” বা “রহুল” অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বা ভাববাদী, সংস্কৃত “ব্রহ্ম” শব্দের দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাহার ভারত-বর্ষ প্রবেশ “ব্রহ্ম” শব্দ অল্‌বীকুনী দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তিনি এই শব্দটী “বৃহ” শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে ধরিয়াছেন (ব্রহ্ম বৃহত-অল্‌বৃহত্)। তিনি ধরিয়াছিলেন যে কাব্য-বস্তু পরিবর্তিত “সামানী” অর্থাৎ “জ্ঞান” বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন “বৃহ”, এবং সম্ভবতঃ তিনি নবন করিয়াছিলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রচলিত “ব্রহ্ম” শব্দ (যাহার এক অর্থ হইতেছে “বিজ্ঞতা”), অল্প কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে, আরবী “নবী” বা “রহুল” শব্দের কার-চালনা। প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করা হইতে পারে। কলবার প্রথম অংশের অল্‌হুদা অল্‌বীকুনীর হাত দিয়াছে। “অল্লাহ বাতীত উপাত্ত নাই”, ইহার অল্‌হুদা হইয়াছে—“অবাক্তম্ একম্”; অর্থাৎ যিনি অরূপ, তিনি এক বা অকর্তব্য। এই অল্‌হুদা একটু ব্যাখ্যাত্মক, কিন্তু অল্‌বীকুনীর মত-অল্‌হুদার ইহার উপযোগিতা আছে। আরবী ভাষায় “ইলাহ” শব্দের অর্থ “স্বাক্ষর কর্তব্য বা স্পর্শ করা যায় এমন কোনো স্থান বা পুণ্যের পাত্র; প্রতিমার আকারে কোনো দেবতা”—এই শব্দের দ্বারা কোনো দৈবী শক্তি বা ভাব আরবদের মধ্যে প্রকাশিত হইত না। কিন্তু “অল্লাহ” শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব একেবারে ইহার বিপরীত—“অল্লাহ” কোনো পুস্তকান “ইলাহ” বা দেবতানন, ইনি পুস্তকান দেহ-রূপের অভীত ঈশ্বরীয় সত্তা। এইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তি বা দেবতা, যাহার কোনো রূপ নাই, তিনিই একমাত্র সত্তা; এবং অল্প কোনো “ইলাহ” বা রূপ-বৃত্ত দেবতার কথা অল্লাহের সম্বন্ধে উঠিতেই পারে না। অতএব “অবাক্ত বা অরূপ দেবতাই এক”—এইরূপ অল্‌হুদা, কলম-নব্বের প্রথম অংশের অদ্বৈত অল্‌হুদা বা অপব্যাখ্যা নাহে, এবং এইরূপ অল্‌হুদাদের পিছনে আছে ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রধান মনোভাব, রূপ বা প্রতিমার বিরোধ। উপরন্তু এইরূপ অল্‌হুদা, হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ধর্মের ব্যক্তি-ভবীর অহঙ্কৃত, এবং এইরূপ অল্‌হুদাদের দ্বারা হিন্দু শব্দের “একং সৎ” এবং “একম্ এবাবিতীকৃতম্” প্রকৃতি কতকগুলি বচনকে মনে করাইয়া দেয়। অল্‌বীকুনী তাহার পুস্তকে “অবাক্ত” শব্দের আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“bykt 'y s'y' bl' s:wrtb অর্থাৎ “অবাক্ত, অর্থাৎ সত্য বা বিলাস পূর্ণ” (যাহার কোনোও রূপ বা আকার নাই, এইরূপ সত্তা)। “অবাক্ত” শব্দের নানা অর্থের মধ্যে এইটী একটা অন্ততম। মূল অর্থ অবশ্য “স্বাক্ষর বা প্রতিষ্ঠাতা হয় নাই”—কিন্তু এই “বাক্ত বা প্রতিষ্ঠাতা হওয়া”

কেবল রূপ-গ্রহণের মতোই সীমিত নহে, এক বা একাধিক ইচ্ছারের দ্বারা বাহ্য কিছু ধরিতে, ছুঁইতে, দেখিতে বা অর্হুত্ব করিতে পারা যায়, তাহার সবই “ব্যাক্ত”। “অম্মাহ” শব্দের অহুবা-রূপে “অব্যাক্ত” যে হুই অহুবা, তাহা বলা চলে না। কিন্তু “অম্মাহ”-এর “হুত” বা রূপের অভ্যন্তর থাকাই যদি এক মূখ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত “অব্যাক্ত”-শব্দের ব্যাপক অর্থ-সমূহ হইতে যদি কেবল এইটাকেই নির্বাচিত করিয়া লইয়া, ইহাকে রূপাতীত “অম্মাহ”-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হুই অহুচিত হুই না।

“অম্মাহ”-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ যিনিই নির্ধারিত করিয়া থাকুন, তিনি যে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা হুশুপ্ত। চীনদেশের বিখ্যাত দার্শনিক লাউ-ৎহু রচিত “তাও-তে-কিৎ” গ্রন্থের সংস্কৃত অহুবা-র চেষ্টা হুইয়াছিল খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর শতকে—মাদাম (প্রাগজ্যোতিষ)-এর দ্বারা। ভাষ্করবর্মার আগ্রহে চীনদেশের পণ্ডিতেরা চীনের সম্রাটের আশ্রমে এই কার্যে অর্হতীর্ণ হুইয়া। তখন চীনা শব্দ “তাও”, বাহ্য লাউ-ৎহুর দর্শনের মূখ্য কথা, তাহার অহুবা-র লইয়া হিউ-এন্-ং-গাও প্রমুখ সংস্কৃত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লাউ-ৎহুর বতাহুবা-র চীনা পণ্ডিতদের দ্বারা বিশেষ মতভেদ দেখা নিয়াছিল। আরম্ভকাল হুইটী বিভিন্ন ভাষার ও ধর্মের নিম্ন নিম্ন বিশিষ্ট ভাব ও শব্দের সামঞ্জস্য সাধন করা কঠিন ব্যাপার হুইয়া পড়ে। অল্-বীহীন যে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ আরম্ভাতে অহুবা-র করিবার কালে অর্হতীর্ণ হুইয়া, বহল অংশে কৃতকার্য হুইয়াছিলেন, তাহা তাহার সর্বাগ্রহীতার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে—গ্রীক, ইসলামী ও হিন্দু দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা তাঁহাকে এইভাবে দ্বারমুখ করিতে হুইয়াছিল, এবং সেজন্য Comparative Religion বা তুলনামূলক-ধর্মতত্ত্বের বিদ্যার অন্ততম পথিক হুইয়াছে বলা যায়।

অতএব অহুবা-র কল্পিত বাহ্য নাই, হুতলতা বহু-মুখের মূখ্য “অম্মাহ” শব্দের প্রতিশব্দ হিমা-বে “অব্যাক্ত” শব্দের ব্যবহার অল্-বীহীন দ্বারা হুইয়াছিল। এবং ইহাও অহুনিত হুইতে পারে যে, অল্-বীহীন হুই চেষ্টা এই মূখ্য আরম্ভী পেনের পূর্ণ সংস্কৃত অহুবা-র সেওয়া হুইয়াছিল। এই ব্যাপারে অল্-বীহীন বাক্তি-র বা চরিত্রের মধ্যে আদর। এক নুতন প্রকারের বহু দেখিতে পাইতেছি। তিনি সংস্কৃতের ও ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন—ই—পরন্তু উচ্চ সভ্যতার উত্তরাধিকারী মানব-মানব-সমূহ বাহ্যে নিম্ন নিম্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে হুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সব আভি-র পক্ষে আশ্বিনের পক্ষে অধিকার থাক। আরম্ভক, এই ভাবে ভাবুক ও তিনি ছিলেন। পৃথিবীর সর্বাভি-র মানব, নিম্ন নিম্ন ভাষায় তাহার শিক্ষা গ্রহণ ককক, ইহা হুই বহু-বে কামনা করিয়াছিলেন। একটী বিশেষ ভাষাকে ধর্মের ভাষা বা দ্বারমুখ, ভাষা বলিয়া, অত সন-র ভাষার দ্বাড়ে ইহাকে চাপাই-র চেষ্টা প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। ইহা এক অহুত-পূর্ব ব্যাপার যে, নিম্ন ভাষা-ই ইসলামের বীজ-মন্ত্রের সহিত পরিচিত হুইবার অধিকার, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পর্বে-র মতোই, পঞ্চা-বীজ-মন্ত্রের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হুইবার সন-মতোই, পঞ্চা-বীজ-মন্ত্রের ভারতীয় প্রাণ-পাইয়াছিল। বাহ্য গ্রাম-দিশার ফলে সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই মানব-শ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ অল্-বীহীন-র দ্বিতীয় প্রতি, তাহার আশ্রম-কালের প্রায় সন-র বৎসর পরে সন-র সভ্য অধিকারের প্রভা-নিবেশন করা কর্তব্য—তিনি তাহার কালের ও সর্বকালের বিশ্বমানবিকতার আদর্শের পুরোহিত ছিলেন, এবং মানবের মানসিক প্রশান্তির পথে এক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন।

[মন্তব্য—এই প্রবন্ধ রচিত হুইবার পরে বহু-র ভাষার খ্রীষ্টীয় বাহু-বেশন-র অগ্রদূতের নিম্ন হুইতে

জানিতে পারিলাম যে তিনি এই মূদ্রার সংস্কৃত লেখটার একটু অন্তর্ভাবে পাঠ করিয়াছেন। তিনি প্রায় সমস্ত লেখটার পূর্ব আলোচকদের দ্বারা নির্ধারিত পাঠ একরকম মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু “স্বিনধান-সংবতি” এই অংশটুকু “তাম্রিকীর-সংবতি” অর্থাৎ “তাম্রিক” বা আরব আড়ির সংবৎ বা অম্ব বলিয়া পাঠ করিতে চাহেন। এই পাঠে -“য়ের” অংশটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, কারণ -“য়ের” প্রত্যয়ের কোনও সম্ভব অর্থ মিলিতেছে না। ডাক্তার অগ্রহাসও মনে করেন যে এই সংস্কৃত অম্ববাম্ব অম্ব-বীজ্ঞানীর ইচ্ছাই সম্ভব। ইহার প্রবন্ধ Journal of the Numismatic Society of India, Vol. V, Part II-তে, ও পরে Journal of the United Provinces Historical Society, Vol. XVII, Part II, December 1944, Lucknow-তে প্রকাশিত হইয়াছে।]



আধুনিক ধাতুযুগ

শ্রীজগন্নাথ শুক্ল

ইউরেনিয়ম, বোরিয়ম, টাইটেনিয়ম ও জারকোনিয়ম এই চার ধাতুর এবং তাদের কয়েকটি যৌগিকের উৎপাদন ও জনকলাপে প্রয়োগ লক্ষ্যে আলোচনা করা হচ্ছে। এককালে এসের বিরল মনে করা হত বলে কৃষানের দ্বিধা এবং এর উল্লেখ ও আলোচনা বিরল—বৌদ্ধিকবলের মধ্যে বেশা দায়। কতকটা সেই কারণে বনিম্ব থেকে এসের উন্নততর প্রযোজ্যে নিকাশন এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ ইত্যাদি স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি অবস্থার বন্ধ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

লোহা এবং সোনার আয়র ধনি ও সিকালের, তবু সফলেই মনোনে এমন কাজও আছে যা শুধু লোহার জাগ্রা বা সোনার চাকতি দিয়ে সেয়ে ফেলা যায় না। সংসারে তামা, দস্তা, মাশামিষ, মিকেল ইত্যাদি ধাতুর ও উপযোগিতা আছে, বাবিক লক্ষ লক্ষ টন এসের বনিম্ব কুভাগ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সূজাতার বিস্তারের লক্ষ প্রয়োজনের বন্ধন এবং আরও বেড়েই চলেছে, উপরন্তু এক-একটা দৃষ্টান্তের লক্ষ অপরিমিত অপব্যয় আছে। এককালের বিশাল বহুদ্রব্য জনন: মাহুয়ের চোখে ছোট হয়ে আগছে।

যোটেম্টি হিসাবে দেখা যায়, গত এক শত বছরে ধাতুর উৎপাদন এবং ব্যবহার অতুতপূর্ণ বন্ধন বেড়েছে। যে পরিমাণ ধাতুর আয়র এই সময়ের মধ্যে উত্তোলন, নিকাশন ও ব্যবহার করা হয়েছে, পূর্বের হাজার হাজার বছরেও তা হয় নি। ধাতু, মিশ্রধাতু এবং যৌগিকের আকারে এসের প্রযোগক্ষেত্র রজনশালা থেকে বন্ধন পৰ্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি বছরেই আরও বনিম্ব সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং অবিরাম যোগান বে ওয়া চলছে।

পৃথিবীতে বনিম্বের জাগ্রা ধরিত্রীর আয়র লক্ষ, প্রকৃতির লক্ষ্যকৃত বান। এই জাগ্রা হুবহু কিন্তু অনন্ত নয়। লক্ষ থাকলে পরচ করা ভালো, কারণ লক্ষের উপরন্তু ব্যবহারেই দেশের লক্ষ ও শক্তির উৎকর্ষ। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি সঙ্গাগ থাকতে হলে সেই লক্ষের যোটে পরিমাণ লক্ষ ধারণা থাকা দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ আতির লক্ষ অনিবার্য, এ কথা তিন হাজার বছরের প্রাচীন কবিবাক্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধনিম্বের পরিমাণ করলে অনেক বিশ্ববন্ধন এবং আনন্ডজনক তথ্যের লক্ষ্যবর্তী হতে হয়। হিসাবে দেখা যায়, বর্তমান হারে নিকাশন চললে কয়েক শত বছরের মধ্যেই সীসা, দস্তা ইত্যাদি বন্ধন প্রচলিত ধাতুর আয়র নিশেধিত হবে। ততমিনে লক্ষের তলা থেকে নতুন আয়র আবিষ্কার ও উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি না জানি না, নতুন এসের পরচ কমাতে হবে, ব্যবহৃত কেলে-সে ওয়া অথবা থেকে পুনরুদ্ধার করেচালতে শিখতে হবে এবং লক্ষবন্ধন ধাতুর বন্ধন প্রায়শ্চৈক বা অন্ত কিছু দিয়ে কাজ চালাতে হবে। লক্ষের পিতল ও কাদার পাথর বন্ধন আয়ুর্নিধন, সীল ও পোশিলনের পাথর চলবে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে লক্ষের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠিষ এক বিশ্ববন্ধন গবেষণার লক্ষ তালিকার আকারে প্রকাশিত করেন, লক্ষের কতকগুলি বৌদ্ধিক লক্ষ্য বৌদ্ধিক ও বৌদ্ধিক অবস্থার লক্ষমেনে লক্ষকরা কতটুকু ভাগ বর্তমান। কুশল অর্থ লক্ষের উপরে ও নীচে যোটে প্রায় পঁচিশ হাইল পরিমাণ, লক্ষ ও লক্ষ লক্ষ। এর বাইরের লক্ষ মাহুয়ের আনন্ড-জাগ্রার মধ্যে এখনও আছে নি। গোষ্ঠিষের তালিকা

তার পরে অনেক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এই তালিকা দেখে অনেক প্রচলিত, অল্প-পরিচিত ও অপরিচিত ধাতু সমগ্রভাবে কতখানি প্রচুর বা অপ্রচুর তা জানা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবহার চলতপালট হয়।

জানা যায় ভূপৃষ্ঠে সব চেয়ে প্রচুর ধাতু হল অ্যালুমিনিয়াম, তার পর লৌহ, শতকরা আট ও পাঁচ ভাগ। দু-দশ হাজার বছরের মধ্যে এদের খনিজ স্রোতার কোনো আশঙ্ক নেই। তৃতীয় চতুর্থ পর্যন্ত হল ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম, এদের ধাতু আকারে আমরা বড় দেখতে পাই না, কারণ জলে বাতালে ও তাপে এরা সহজে বিকৃত হয় অর্থাৎ বৌগিক পরিণত হয়। ব্যবহারযোগ্য ধাতুর তালিকাধ তৃতীয় হল ম্যাগনেসিয়াম। এই লঘু ধাতু এখন সমুদ্রবারি থেকে তৈরি হয়, হুতরাং কার্ভ: এর ভাঙার অক্ষম বলা চলে। এর ব্যবহার এখনও অল্প, প্রধানত: অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে মিশ্রধাতু করে এরোপেন ও অন্ত আকাশযানের বহিরঙ্গ প্রত্নতি হালকা অথচ শক্ত জিনিষ বানানো হয়।

প্রাচুর্য অল্পদ্বারা ম্যাগনেসিয়ামের পরেই আসে টাইটেনিয়াম। তামা দস্তা ও স্নাং-এর মিলিত পরিমাপের আঠারো গুণ বেশি। অথচ পনেরো বছর আগে এই ধাতু তৈরি করার চেষ্টা কেউ করত না; ইউরেনিয়াম ধাতু আর স্বর্ণের চেয়ে দোভনী হয় উঠেছে, কিন্তু ১৯৪০ সালে যখন প্রথম এর প্রয়োজন পড়ে, তখন পৃথিবীর সব দেশের ভাঙার খোঁজ করে শুদ্ধ ধাতু কয়েক গ্রামের বেশি যোগাড় করা যায় নি। ভূপৃষ্ঠে এই ধাতুর পরিমাণ পারদের আট গুণ, রূপোর চল্লিশ গুণ। ইউরেনিয়ামের চেয়ে তিন গুণ বেশি থোরিয়াম পাথরে বালিতে ছড়ানো আছে। আরকোনিয়াম টাইটেনিয়ামের মত প্রচুর নয় বটে, তবু নিকেলের আটগুণ। ট্যাটালম নামে এক বিরল ধাতুর পাঁচ ও পাত্রে অ্যালিড গরম করা ইত্যাদি কারে অল্পত: জিন বহুর নিয়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, অথচ আরকোনিয়ামের অল্পতপ ক্ষরোধী ধর্ম এবং ভূপৃষ্ঠে তার পরিমাণ ট্যাটালমের এক সাত গুণ বেশি থাকে সযেও ব্যবহার নেই।

এমনি আরও উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে অপ্রচলিত অনেক ধাতু বিরল বলে মনে করা হলেও তারা আসলে বিরল নয়, এবং প্রচলিত কতক ধাতু যথা ক্যাডমিয়াম, বিন্ধ, পায়ল, অ্যান্টিমনি বরত: ধরাপৃষ্ঠে বিরল। বিরল ধাতু প্রচলিত হয়, আর প্রচুর ধাতু অপরিচিত ও অপ্রচলিত থাকে কি করে?

দুই কারণ থেকে এ রকম ঘটে। যে ধাতু বৌগিক অবস্থায় অল্প অল্প করে বহুর ছড়িয়ে আছে, তার সমগ্র পরিমাণ অনেকখানি হলেও তার নিষ্কাশনে কষ্টাট বেশি, হুতরাং তার উৎপাদন-শিল্প সহজে গড়ে ওঠে না। অপেক্ষাকৃত বিরল-ধাতু যদি উৎকৃষ্ট আকারে অল্প কয়েক স্থানে অথবা হয়ে থাকে, সেদিকে শিল্পব্যবসায়ীদের নজর আগে পড়ে। এ রকম বিরল-ধাতু যদি আকার থেকে সহজ প্রক্রিয়ার উৎপাদন করা যায় তা হলে আরও সহজে লোকে আকৃষ্ট হয়। বলা, পারদের আকরকে শুধু বাতালে পুড়িয়ে ধাতু পাওয়া যায়। দস্তা, স্নাং, ক্যাডমিয়াম এদের আকরকে শুধু করলা মিশিয়ে গরম করতে হয়। সীসার আকার গ্যালিনাকে সাব্বানে বাতালে পোড়াতে থাকলে গলা ধাতু বার হয়ে আসে। আবার কোনো কোনো বিরল-ধাতু মুক্ত অবস্থায় হুড়ি বা বালুকণার আকারে পাওয়া যায়, যেমন সোনা, রূপো। তাহার অপরিষ্কৃত চাপড়া আমেরিকার লেক সুপেরিয়ার অকলে দেখা যায়। এই ধরনের ধাতু প্রাচীন যুগেই অথবা তৎপরবর্তী কালে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা আরম্ভ হয়ে যায়। তামা ও স্নাং-এর মিশ্রধাতুর ব্যবহার অতি প্রাচীন। লৌহযুগের আগে এক রকমের কাঁসা থেকে অস্ত্রাদি তৈরি হত।

টাইটেনিয়াম হারকোনিয়ম ইত্যাদি পৰ্যাপ্ত ধাতু বিরল-ধাতুর পৰ্যায়ভুক্ত হওয়ায় দ্বিতীয় কারণ যে তাদের নিষ্কাশন সহজ নয়। উপযুক্ত চাহিদা ও ব্যবহারক্ষেত্র জানা না থাকলে বায়ুলাভ পদ্ধতিতে নতুন ধাতু উৎপাদনের খুঁকি কেউ নিতে চান না, অথচ নিয়মিত উৎপাদন না করতে থাকলে পদ্ধতির উন্নতিসাধন হয় না, এবং দশলা নতুন সিকে কেউ তাকে ব্যবহার করার শাহসও পান না। এই উদ্ভাষণ কটিবে উঠতে গেলে এক পক্ষের সাহস দরকার। আমাদের আলোচ্য ধাতু চারটির উৎপাদন-শিল্প আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেবেশের গডর্ডমেন্টের খনিষ্ঠ সহায়তার বলে।

অল্পকাল ধাতু অতীত যুগে তৈরি হত বটে, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠা করে এদের বিপুল পরিমাণে অবিসান উৎপাদন বৈজ্ঞানিক যুগের ঘোষনা। বিজ্ঞানের মূল কথা হল, কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর যদি নিজের ধারণা বা ধ্যানশক্তির মধ্যে না খুঁজে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মধ্যে খোঁজা যায়, তাহলে সে উত্তর বোম প্রকৃতির মান। সংক্ষেপে ধরা পড়ে। সেই সংক্ষেপে আশ্রয় করে গত তিন শত বছরের মধ্যে প্রকৃতিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, দৃষ্টিবিদ্যা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ক্রমশঃ অনেকেরই স্বপ্নের প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও শক্তির জাগর উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি হল এই বিজ্ঞান। তখন শাখা থেকে শাখারূপে মধ্যে উৎসাহ লভ্যবিত্ত হল, ততের সঙ্গে অর্ধের সহযোগে শিল্প গড়ে উঠল, এবং দেশে দেশে বিজ্ঞানচর্চা রাষ্ট্রাঙ্গগ্রহ লাভ করে হুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল।

বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বর্ণিগবৃত্তির সহযোগে আরও পাঁচ বরন উত্তমের সঙ্গে ধাতুশিল্পও আত্ম বিরাট আকার ধারণ করেছে। দিনে দিনে বেভাবে এক-এক ধাতুর নিষ্কাশন ও ব্যবহার বেড়ে চলেছে, ভারতে ধরপীর জাগর নিঃশেষ হওয়া আর দূরত্ববিদ্য কল্পনা নয়। একটা উদাহরণ হাতের কাছে রয়েছে। ১৯০০ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে যুদ্ধের তাগিদে আমেরিকায় দেশের আকর থেকে ৩৬ লক্ষ টন দস্তা আহরণ করেছিল। ১৯৪৪ সালে এই হিসাব উন্নয়ন করে মার্কিন সেনাভাষ্য-বিভাগের সেক্রেটারি টিঙ্গানী করেন, “আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে আর-একটা বড় যুদ্ধ আমাদের আর করা চলেবে না কারণ, এককথায়, আমাদের অত দস্তা নেই।” অবশ্য যুদ্ধ যদি কেউ করতে চায় তার দস্তার ক্ষয় আটকাবে না। তবু কথাটা উদ্বেগবোধ্য এইজন্য যে, এই ভাবী অবতনের ভয় থেকে, এবং আরও কতকটা আধুনিক যুগের নতুন নতুন ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে, অপ্রচলিত ধাতুদের নিষ্কাশন ও তাদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি ইবানী বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশ বছরের মধ্যে অন্ততঃ দুটি নতুন ধাতু শিল্পগতে হুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, টাইটেনিয়াম আর হারকোনিয়ম।

আর যে দুই ধাতু আমাদের আলোচ্য, তাদের ধাতু আকারে শিল্পে উন্নয়নবোধ্য প্রয়োগ হয় নি, তবে তাদের কোনো কোনো বৌগিক পূর্বে শিল্পে ব্যবহার করা হত। অথচ এই দুটি ধাতুর ক্ষেত্রে গগতে এখন হলুপ পড়ে গেছে। ইউরেনিয়াম থেকে আণবিক বোমা হয়, থোরিয়াম থেকেও একদিন কেউ করবে। দু-এক সের ইউরেনিয়াম পরমাণু কাটিয়ে বর্ণ-বিশ হাজার টন টি-এন্ট্রির সহপরিচয় প্রলয়শক্তি সৃষ্টি করা যায়, ইত্যাদি অনেক পিলে-চকানো বৈজ্ঞানিক সংবাদ অল্পবিত্ত এখন অনেকেরই শোনা হয়েছে। বা দোক প্রলয় হল চরম ব্যাপার, বোমা ফাটিবে তো দেশের নিত্যকার দুঃখ অভাব অক্ষমতা ঘুচেবে না। অতএব প্রলয়শক্তির মধ্যে শক্তি কথাটাই ভাবী মানবের কাছে লভ্য। আণবিক শক্তিকে তাপশক্তি বিদ্যুতশক্তির মত কাজে লাগানো চাই।

সমগ্র দেশের স্বল্পশক্তি বাড়াতে গেলে বায়ুদের কাছিক পরিশ্রমের সঙ্গে প্রকৃত অত শক্তির সহায়তা

লাগে। পূর্নাকাল থেকে গৃহপালিত পশুর দৈনিক বল কাজে লেগেছে, কিন্তু এ যুগে সে শক্তি ধ্বংসাত্মক, যদিও তুচ্ছ নয়। হৃৎকিরণে বিপুল পরিমাণ তৈর ও তাপশক্তি নিত্য পুষ্টিবার উপর এসে পড়ছে কিন্তু দুই সহস্র বর্ষের বাহুর এই শক্তি আহরণ ও নিরস্ত্রিত ব্যবহার করতে তেমন সক্ষম হয় নি। দুই প্রকারের শক্তিকে বাহুর যোটানুটি শব্দ ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবহার করছে, রাসায়নিক শক্তি আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কয়লা বাতাসে পোড়ালে অক্সিজেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, ফলে যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তাকে দিয়ে স্টীম উৎপাদন করে নানারকম বেশিন চালানো হয়, ধোয়া, রেলগাড়ির এটিন, স্টীম টারবাইন। অথবা উঁচু থেকে ধরা জলকে মাধ্যাকর্ষণের বেগে নাচে পড়তে দিখে তৎক্ষণাত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাতেও নানারকম বেশিন চলে এবং অস্ত্র কার্য হয়। যে দেশের এলাকার মধ্যে বড় নদী উৎস থেকে সাগরে এসে পড়ছে, সে দেশে দ্বিতীয় পন্থায় শক্তি উৎপাদন করার সুযোগ আছে, যেমন ভারতবর্ষ, আমেরিকা, রাশিয়া। অস্ত্র বেশ প্রচলিত: কয়লা, পেট্রোলিয়াম এমন কি কাঠ ইত্যাদি দাহ্য বস্তু বাতাসে ছালিয়ে মুক্ত রাসায়নিক শক্তিকে সর্বকালে ব্যবহার করছে।

ভূগর্ভে প্রোথিত বৃক্ষাদি কোটি কোটি বছরে কয়লায় পরিণত হয়। বিপুল শক্তির ঘনীভূত উৎস এই কয়লা। ভূগর্ভে কয়লায় ভাণ্ডার স্নুহুহু, কিন্তু স্থানে স্থানে নিবন্ধ, পরিমাণ কোথাও কম কোথাও বেশি। বছরে বহুগুণ কোটি টন কয়লা আত্মকল তোলা হয়। হিসাবে প্রকাশ যে, এতাবৎ ব্যয়িত কয়লার বারো আনা অংশ গুণ পকাশ বছরে তোলা ও বরচ করা হয়েছে। এভাবে চললে কোনো কোনো দেশে অল্প ভবিষ্যতে ব্যবহার্য শক্তির দৃষ্টিক দেখা দেবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এবং হৃৎকিরণের শক্তি আহরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বেলজিয়মের কয়লা এখনই প্রায় ছুটিয়েছে। ফ্রান্স ও ইটালির অথবা ও মধ্য ভূপ্রপাতের শক্তি সাধ্যমত কাজে লাগিয়েও কয়লার বাটতি পূরণ করা যাচ্ছে না। ভারতের পূর্ববাহিনী উত্তরবাহিনী ফলে যদি কয়লায় ব্যবহার আশঙ্কা ধন গুণ বেড়ে যায় তবে আগামী পকাশ বছরে তারও জানা সম্ভব বলির কয়লা নিঃশেষিত হবে, এই মত ভট্টের মেঘনাদ সাহা লোকসতার সমস্রদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভারতে অবশ্য নিষ্করণশক্তির উৎপাদন সম্ভব, সে চেষ্টাও চলছে। এর সুবিধা যে প্রথম যৌর ও হিমগিরির সংযোগিতার ফলে একে বার বার ক্রি়ে পাওয়া যায়, কয়লার মত ছুটিয়ে যায় না, অব্যয় যোটানুটি একটা বীণা পরিমাণ এবং সংকীর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র নিয়ে সম্ভট থাকতে হবে। ইংলণ্ডে জলশক্তি উৎপাদনের সুযোগ নেই, সে দেশ বার্ষিক বিশ কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে তার ঘর গরম ও শিল চালা রাখে। ইংলণ্ডের এখন কয়লার অভাব তত নয় বহুট। কয়লা জোলায় বহুতর। রাশিয়ার পবর আমার জানা নেই। রাশিয়ার বাস দিলে প্রাচ্যে একমাত্র চীনের ও প্রত্যাচ্যে বাকিন বৃক্ষরাষ্ট্রের কয়লার সম্পদ প্রায় অপরিমিত বলা চলে।

রাসায়নিক শক্তি হল দুই বা ততোধিক বস্তুর অণুদের ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন শক্তি। কয়লায় অণু অক্সিজেন অণুর সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে কার্বন মনো-অক্সাইড বা কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু হয়। পেট্রোলিয়মের অণু ও অক্সিজেন অণুর রাসায়নিক যোগে জলের অণু এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু সৃষ্টি করে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন কণা হল অণু, রাসায়নিক ক্রিয়াতে এরই ভাগ্যগড়া নিত্য চলছে। সেহেতবে পাত্তের অণু বিস্মিট হয়ে পেশিমধ্যে শক্তিকার্য করছে। সব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই যে শক্তি পাওয়া যায় এমন নয়, কোনো কোনো ক্রিয়া ঘটাতে তাপ বা বিদ্যুৎশক্তির প্রকাশ দিতে হয়। বর্ষা, বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন

-অণু ঘেষ থেকে বিদ্যুতের শক্তি শোষণ করে নাইট্রিক অক্সাইডের অণু গঠন করে, এবং পরে বারিগাতের লব্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড অবস্থায় অনিতে পৌছে নাইটেট সারে পরিণত হয়।

পরমাণুদের এক-এক ধরনের দলবন্ধনে এক-এক ধরনের অণুর তথা সমস্ত বস্তুসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। অক্সিজেনের দুই পরমাণু মিলিয়ে অক্সিজেনের অণু, কার্বনের এক আর অম্লপেরনের দুই পরমাণু মিলিয়ে এক কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু। পরমাণু সচরাচর মুক্ত অবস্থায় থাকে না, কোথাও থাকলে সেখানে পরমাণুকেই অণু বলা হয়, যেমন অ্যারগন গ্যাসের অথবা পারদ ধাতুর অণু। অণুর মধ্যে একাধিক পরমাণু রাসায়নিক শক্তিবলে যুক্ত থাকে। এক অণু অল্পে পরিবর্তিত হবার সময় তারই কিছু অংশ তাপ বা অপর শক্তির রূপে মুক্ত হয়, অবশিষ্ট অংশ নতুন অণুর মধ্যে পরমাণুদের যুক্ত রাখে। রাসায়নিক ক্রিয়ার আগে পরে সকল সময়েই পরমাণু সকল থাকে অক্ষত। শুধু ঘর বদলায়।

রাসায়নিক শক্তির পরিমাণ অসামান্য। এক সের কয়লাকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করলে সেই তাপে বারো সের বরফ-পলা কলকে স্ফীম করা সম্ভব, যদিও আগলে অটটা হর না কারণ তাপ চারদিকে ছড়িয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু এক পরমাণু যখন ডেডে অল্প পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়, তার ফলে দৃঢ় শক্তির মাত্রা রাসায়নিক শক্তিমাত্রার প্রায় বশ লক্ষ গুণ। এই শক্তিকে ধ্বংস পারমাণবিক শক্তি বলা উচিত, তবে চিন্তিত কথায় আণবিক শক্তি বলে। পরমাণু এত ক্ষুদ্র এবং তার সূত্রাতিক্ষুদ্র কেন্দ্রবল এত নিরেট যে মানুষের চোখ পরমাণুকে টুকরো করা অতি অসাধারণ ও অসম্ভাবিক ব্যাপার। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ডের এক পরীক্ষায় এই ঘটনা প্রথম ঘটে। প্রায় বিশ বছর পরে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ফার্মি, অর্মান বৈজ্ঞানিক হান ইত্যাদির গবেষণায় ইউরেনিয়ামের পরমাণু খণ্ডিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং তৎক্ষণাত শক্তির বিপুল মাত্রায় আশ্রয় লাভেরেটির সূত্র হয়ে ধরা পড়ে।

তার পর থেকে ক্রিপট্রায় বেগে অর্থশালী ও শক্তিকামী দেশসমূহে যে আণবিক গবেষণার গুপ্ত অধ্যায়ের আরম্ভ হয়, তার ফলস্বরূপ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংস। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। সকলে জানল আণবিক শক্তির ভাণ্ডার মানুষ খুলতে পেরেছে, সে ভাণ্ডার অপরিমিত। একটা অজ্ঞাত নতুন যুগে সভ্যে প্রবেশ করছি।

আপাততঃ শুধু ইউরেনিয়াম, আর সম্ভবতঃ থোরিয়ম, ধাতুর পরমাণু থেকে আণবিক শক্তি উদ্ধার করা গেছে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিকোরণজন্য শক্তিকে কিভাবে আণবিক চুল্লীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার্য তাপ অবস্থায় বার করে নেওয়া যায়, সে পন্থা অনেকখানি জানা হয়েছে। তাপ থেকে স্ফীম, স্ফীম থেকে বিদ্যুৎ এই ভাবে আণবিক শক্তি কাজে লাগবে। কয়লা অথবা জলধারা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের তুল্য অথবা কম ব্যয় পড়বে কি না, তা প্রমাণ্যাপেক্ষ। তবু ইংলও এখনই আণবিক শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদনে নেবে পড়েছে, কারখানা গড়ে তুলছে। আগামী বশ বছরের মধ্যে সেই কারখানা পকাশ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে বার্ষিক অন্ততঃ দুই কোটি টন কয়লার ব্যয় বাঁচাবে। এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি একটা বশ লাখ জনসংখ্যার বাতায়ি শহরের মোটামুটি সকল প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের দেশে আণবিক শক্তি উৎপাদনের ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, তবে এখনও খানিক অনিশ্চিত। ইউরেনিয়াম দেশে কত আছে জানা নেই। আণবিক শক্তির উৎপাদনে থোরিয়ম খাত কাজে লাগাতে আমরা পারব কি? কয়লার শীর্ণ ভাণ্ডার দেখে এই শক্তির এবং অজ্ঞাত সকল প্রকারের শক্তির

উৎপাদনে আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। ১৯৪৮ সাল থেকে গভর্নমেন্ট-মনোনীত এক আণবিক শক্তি কমিশন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন অগ্র সপেণ আছে। এই কমিশনের দায়িত্ব হল আণবিক শক্তির উৎপাদন, গবেষণা ও আনুষঙ্গিক সর্ববিধ প্রচেষ্টার উদ্যোগ এবং সহায়তা করা। একটা ছোট আণবিক চুল্লী প্রথমে দেশে বসাতে হবে, তাতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হবে তার সাহায্যে ক্রমশঃ বড় কাজ হাতে নেওয়া যাবে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাদের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ পথ। ফ্রান্স ইংলও ও আমেরিকা থেকে কিছু সহযোগিতা পাবার আশা আছে।

একটা ছোটখাট আণবিক চুল্লীতে কমবেশি দশ টনের মত অতিবিদ্যুৎ ইউরেনিয়ম লাগবে। ইংলওর দশ-বার্ষিক পরিকল্পনায় পকাশ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে বছরে ২০০ থেকে ২০০০ টন পর্যন্ত ইউরেনিয়ম লাগতে পারে। আমাদের দেশে ইউরেনিয়মের উৎপাদন বহু গুণ না বাড়তে পারলে এ রকম বড় পরিকল্পনা করা নিরর্থক।

ইউরেনিয়মের বসলে থোরিয়ম ধাতুর ব্যবহারের কথা দেশে ও অল্পর অনেক বলেছেন। আমেরিকায় এ সম্বন্ধে বা গবেষণা হয়েছে, অল্প দেশেও হবে থাকবে— তার প্রায় কিছুই প্রকাশিত হয় নি। থোরিয়ম পৃথিবীর কন দেশেই পাওয়া যায়, আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট আকর খণ্ডে পরিমাণে আছে। কিন্তু সেই আকর (নোবাইট) রপ্তানি করা গভর্নমেন্ট আইন দ্বারা বন্ধ করায় ইংলও আমেরিকা ইত্যাদি দেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমাদের পক্ষে জানা দুরূহ হবে বলে আশঙ্কা হয়। হয়তো নিজ চেষ্টাই সফল করতে হবে। সে চেষ্টায় সফল হলে অবশ্য ভারতবাসী আণবিক শক্তিতে প্রধান শক্তিশালী আভিদের মনো গণ্য হবে সন্দেহ নেই। আপাততঃ ইউরেনিয়ম-চুল্লী অপরিহার্য, কারণ ইউরেনিয়মের সাহায্যে বিনা নোবাইটি থোরিয়ম ধাতু থেকে আণবিক শক্তি পাওয়া যায় নি।



ঐজবুনির কাহিনী

ঐজবুনির সেন

বাংলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস অস্তুত পাঁচ শ বছর ধরে একটানা চলে এসেছে। এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বৈষ্ণব শ্রিতিকবিতা পাওয়া যাচ্ছে এবং ঐ শ্রিতিকবিতা-রচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হয়ে এসেছে প্রায় অক্ষর ভাবে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই বৈষ্ণব পদাবলীর রচনার আরম্ভ নয়, তারও অনেক আগে থেকে তা শুরু হয়েছে। কিন্তু কোনো নির্দর্শন হস্তগত না হওয়ায় সে সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভাড়া উপায় নেই। তবে সে অস্বাভাবিক একেবারে ঠিক নয়। বাংলা দেশের লাগোয়া উত্তরহত বা মিথিলায়—যা ছ-পাত শ বছর আগে লোকবাহার বাংলা দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না—সেখানে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ব-ইতিহাসের পরচিহ্ন রয়ে গেছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরানো বৈষ্ণব শ্রিতিকবিতা বা আনরা পেয়েছি তা মিথিলায় লেখা চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। মিথিলায় শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিহরসিংহের এক নৃত্য উদ্যোগিত ওয়া এই পদাবলী লিখেছিলেন। উদ্যোগিত প্রায় এক শ পচিশ বছর পরে মিথিলায় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি বিভাগতিক পাণ্ডি বৈষ্ণব পদাবলীর অস্তুত প্রধান রচয়িতা রূপে। বিভাগতিক কতগুলি পদ লিখেছিলেন তা জানি না, মনে হয় তা খুব বেশি নয়, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর পুরানো ইতিহাসে তাঁকে বেমবাসের আসন দেওয়া হয়েছে।

বিভাগতিক যদি বাস হন তাহলে বাঙ্গালি চণ্ডীদাস। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া অর্থাৎ ঐচ্ছিক্তের প্রকটকাল থেকেই বাংলার চণ্ডীদাসকে আদি কবির সমান দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর পরেই বিভাগতিক বসিত হয়ে এসেছেন। সেও ঐচ্ছিক্তের দরুন। চণ্ডীদাস বিভাগতিক এই নাম দুটি বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ ও রসায়ন স্ফোতন করে এসেছে তাঁর মূলে আছে ঐসের পানে ঐচ্ছিক্তের পরম শ্রুতি।

নাম দুটির আরও একটি বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। বাংলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়ে এসেছে তাতে পরম্পর সম্পর্কিত অথচ পৃথক দুটি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সোম্বাঙ্গি বাংলা, আর—একটি—ঠিক বাংলা নয় কতকটা যেন হিন্দীর হত। এই দ্বিতীয় ভাষাটি ব্যাকরণে ছন্দে বাংলা থেকে অনেকটাই বড়, তবুও ভাষা দুটির মধ্যে এতটা তফাত গোড়ার দিকে ছিল না যাতে পরস্পর অবোধা হয়। চণ্ডীদাস লিখেছিলেন প্রথম ভাষায় অর্থাৎ সোম্বাঙ্গি, বিভাগতিক লিখেছিলেন দ্বিতীয় ভাষায় যাকে আনরা এখন ব্রজবুলি বলে থাকি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে বিভাগতিক ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করেছিলেন, না, তাঁর মাতৃভাষা মিথিলী হত। এর উত্তর একটু পরেই দিলে।

ব্রজবুলি নামটি আধুনিক কালের। বঙ্গদূর যদে গুরুদেব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখায় এই নাম প্রথম পেয়েছি। কিন্তু নামটির ইতিহাস এত অগাধ নয়। শঙ্করদেবের শিষ্য কবি মাধবদেব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণব পদাবলীর এই বিশিষ্ট ভাষা বা ব্রাক্ষরীজকে বলেছেন 'ব্রজাঙ্গলী'। প্রাচীন অসহীয়া শব্দ 'সোনারলী' 'রূপালী' একরা বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত ছিল, পরে শব্দ দুটি বাংলার 'সোনারলী' 'রূপালী' হয়েছে। এই অসহীয়ার প্রাচীন বাংলার মতাবা শব্দ 'ব্রজাঙ্গলী' পরে হওয়া উচিত ছিল 'ব্রজালী'। তা হয় নি 'বুলি'

শব্দটির প্রভাবে অথবা সমাক্ষরলোপের স্বত্ব। প্রথমে যা ছিল “ব্রাহ্মণী বোলি”, পরে যা হওয়া উচিত ছিল “ব্রাহ্মী বুলি”, তা হয়ে পড়ল “ব্রহ্মবুলি”। প্রাচীন পদকর্তারা ভাষাটিকে ‘ব্রাহ্মণী’ নাম দিয়েছিলেন এই স্বাভাবিক ধারণাবশে যে, এই প্রাচীন ধরনের ভাষাই বুলি ছিল ব্রহ্ম রাধাকৃষ্ণের ভাষা। তাঁরা এটাও জানতেন, যা ব্রহ্মপুত্রের কথা ভাষা—অর্থাৎ ব্রহ্মভাষা—তার সঙ্গে এই পদাবলীর ভাষার বেশ খানিকটা মিল আছে—উচ্চারণে ছন্দে এবং কিছু কিছু ব্যাকরণে। কৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার যোগ ঘনিষ্ঠ হলে পর বোড়প শতাব্দীর শেষ দিক থেকে খান কৃন্দাবনের ব্রহ্মভাষাতত্ত্ব অল্পবল্প পদরচনা শুরু হয়। কিন্তু পদকর্তারা কখনো ব্রহ্মবুলিকে ব্রহ্মভাষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন নি।

এখন ব্রহ্মবুলি ভাষার কিঞ্চিৎ বহুপ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ধরা যাক এই পদটি—

কাকসের রুচিহারী রমনী বিলাস

তলু পর অস্ত্রিয়ার কক ব্রহ্মবাণী।

যর সঞে নিকসই বৈদন চোর

নিশবর পদপতি চলসিহে বোর।

অরক অতল হাসরে হার

নুগর কিচিশী তেলল হার।

লীলা-কদল উপেখলি হাখ

সহরলতি চলু বরি সখী সান্না।

• বতনহি নিসক নগর দুহুতা

শেখর অতল তেল সহুতা।

প্রথমেই লক্ষ্য করি উচ্চারণ। এখানে অকারান্ত শব্দের শেষে ‘অ’ লুপ্ত হয় নি। দীর্ঘস্বর পড়তে হয় টেনে টেনে। ছন্দে শ্বাসের বোঁক রয়েছে গ্রীবল। অনেক শব্দের চেহারা অপরিচিত, অ-বাংলা। যেমন—কাকস, রমনী, তলু, বৈদন, বোর। কক, নিকসই, চলসিহে, তেলল, উপেখলি, চলু, নিঃসক, তেল—এমন ক্রিপাপ বাংলায় অচল। শব্দরূপে কখনো বিভক্তি আছে, কখনো নেই। কেনন—বতনহি, বোর, যর সঞে নিকসলি, নিঃসক নগর দুহুতা। অরক—এমন সঘট পদ বাংলায় নেই।

পদটিকে যদি ঝাটি বাংলায় পরিবর্তিত করি তবে ব্রহ্মবুলির বিশিষ্টতা স্পষ্ট হবে—

কাকসের রুচিহারী রমনী বিলাস

তারপর (—সেই কালে) অস্ত্রিয়ার করে ব্রহ্মবাণী।

যর হৈতে যাহিরিল কেনন সে চোর

নিসাড়ে পথে গতি চলিয়াছে বোর।

দুহুতের আতল হাসে অতি হার

নুগর কিচিশী আর তেললি যে হার।

লীলা-কদল হাতে উপেখলি হাখ

সহরলদনে চলে বরি সখী সান্না।

সবতনে নিসকলি দুহুতা নগর

কেনন সে আতল যাহিরা চলে রে।

এখানে প্রথমেই লক্ষ্য করি যে ব্রহ্মবুলির দীর্ঘ স্বর বাংলায় ব্রহ্ম হয়েছে এবং তলু ক্ষতিগ্রস্ত করতে হয়েছে

অতিরিক্ত অক্ষর বা শব্দ যোগ করে। তা ছাড়া পরিবর্তন হলেও সবচেয়ে বেশি ত্রিাপদের, তার কিছু কম নামপদের। যানে সব না বুঝেও কানে এইটুকু ধরা পড়ে যে ব্রজবুলিতে বচনভঙ্গি ঋতুপট্টে ছন্দ বর্ষ-তাল, আর বাংলায় বচনভঙ্গি শিথিল ছন্দ ত্রিমা-তাল। ব্রজবুলিতে ঝংকার আছে, বাংলায় আছে বীড়। গুরু কবাবন্ধ ও স্থানিত ছন্দকাংকারের মতই কর্তনে ব্রজবুলি পদ যানে উঠত অন্যথাসে। একালে ব্রজবুলি পদাবলীর অক্ষয়মান জনপ্রিয়তার রহস্য এইখানেই।

এখন প্রায় চল ব্রজবুলির উৎপত্তি নিয়ে।

প্রায় বছর বৃদ্ধি আগে আমি যখন ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস লিখি তখন ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্বসম্মত গ্রন্থটির মতই সন্ধান করেছিলাম। সে মত হচ্ছে এই যে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলীর অক্ষররূপে পদ লিপিতে গিয়ে বাঙালী পদকর্তারা প্রাচ্যমানে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ মৈথিলী ভাষা ব্রজবুলির জননী এবং বাংলা ভাষা তার খাত্তী।

কিন্তু নানা কারণে এ মত এখন সন্ধান করতে পারছি না। 'প্রথমতঃ (বিদ্যাপতির সম্বন্ধে মৈথিলী ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সাদৃশ্য আছে সে কথা সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে যে কিছু কিছু অসাদৃশ্য আছে তাও সত্য। বিদ্যাপতির প্রায় এক শ পট্টিন বছর আগেকার কবি উদ্যাপতির পদাবলী আলোচনা করলেও সদৃশ্যময়িক মৈথিলী (পদ) ভাষার সঙ্গে পদাবলীর ভাষার পার্থক্য ধরা পড়ে)

দ্বিতীয়তঃ, মৈথিলী পদাবলীর অক্ষররূপে তীরহু-প্রত্যক্ষত বাঙালী কবির পদরচনার ক্ষেত্রে ব্রজবুলির সৃষ্টি—এটা নিছক অসম্ভব। পদবর্ষ পতাবীতে বাংলা-ভাষ্যতের সংযোগ নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। নিবিলাস কেন্দ্র বাঙালী ছেলে পড়ত যেত, বাংলায়ও তেমনি মৈথিল ছেলে পড়ত আসত। পদাবলী রচনার শৈলী দু দেশেই সমান ছিল, অক্ষত পক্ষে মধ্যমের বেশ বাংলায় তা কিছুতেই তীরহুতের চেয়ে কম ছিল না এমন মনে করা অসংগত নয়। এমন অবস্থায় মৈথিলী ভাষার ঠাট পুংপুং নিয়ে যে বাংলায় একটা নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি হল রূপ-বিশ-পকাশ বছরের মধ্যে—সে কথা স্বতঃসিদ্ধ মনে করবার কারণ নেই। বরং বিপরীত ধারণার বেতু কিছু আছে। ব্রজবুলি যদি মৈথিলীর অক্ষররূপ হত তাহলে প্রথম দিকের রচনার মৈথিলীর সঙ্গে মিল ঘনিষ্ঠতর হত এবং ক্রমশ সে মিল কমে আসত। আসলে কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। বাঙালীর লেখা সবচেয়ে পুরানো পদাবলীতে দেখি যে, লেখানে মৈথিলীর সঙ্গে মিল ভতটা ঘনিষ্ঠ নয় বরং। পরবর্তী কালের পদাবলীতে। গোবিন্দাসের পূর্বগানবের ব্রজবুলি রচনার বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান। এমন কি করে বলি যে ব্রজবুলির উৎপত্তি মৈথিলীরই অক্ষররূপে ॥

না হয় মৈথিলীর অক্ষররূপে না বলে বিদ্যাপতির অক্ষররূপেই বলা গেল। কিন্তু লেখানেও ঠেকা আছে। দু-চারটি ছাড়া বিদ্যাপতির পদাবলী সব বাংলা বেশেই নিলেছে। বিদ্যাপতির নাম ও কীতি বাঙালী বৈকুণ্ঠনাথান্নেরাই বাচিয়ে রেখে বর্তমান কালে পৌছে দিয়েছেন। তাঁরা বিদ্যাপতিক্তে বাঙালী বলেই জানতেন, এবং তাঁরা খুব সুল করেন নি। বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি পদাবলী লিখেছিলেন, আর ওদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি বৈকুণ্ঠ পদাবলীতে নতুন রূপ ও শক্তি স্কার করে গেছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে বৈকুণ্ঠ প্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে তার অনেকগুলিই এই বাঙালী বিদ্যাপতির রচনা মনে করতে বাধ্য নেই। ঐরা পুরানো বাংলা সাহিত্যের যৌথ যামনে তাঁদের কাছে এ কথা নতুন

নয়। 'বাঙালীই হোক তীরহুজ্জাই হোক, কোনো এক বা একাধিক বিদ্যাপতির পদাবলী অল্পসংখ্যক অঙ্কন করে পদ লিখেছিলেন গোবিন্দনাথ কবিরাজ হত ব্যাপকভাবে এমন আর কেউ নয়; কিন্তু তাঁর আশে বোড়শ শতাব্দীর বাঙালী কবির বিদ্যাপতির অঙ্কনও পদ লিখেছিলেন এই অহমানের সম্মুখে বিচারসহ প্রমাণ কই।

বৈক্য পদাবলীর বিষয় কুকলীলা, বিশেষ করে সাধাকুকলীলা। এ জিনিস মৈথিলী বা বাংলা কোনো বিশেষ একটি সাহিত্যের নিজস্ব দৃষ্টি বা ধার-করা সম্পত্তি নয়। দু'সাহিত্যেরই এ উত্তরাধিকারস্বত্বে পাওয়া। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কুকলীলাবিষয়ক কবিতা খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আধাবর্ত্তের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাংশে। এই চার-পাঁচ শ বছর ধরে আধাবর্ত্তে অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত আধাবর্ত্তী ভারতবর্ষের সর্বত্র সমানায়িক কথা ভাবার সর্বস্বয়িক সাধুত্ব অবলম্বন করে একটি সাহিত্যিক ভাষা প্রচলিত হয়েছিল। এই ভাষাকে সেকালের ও একালের পণ্ডিতরা নানা নামে অভিহিত করেছেন—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অপভ্রম, অবহট্ট, বৈশী, ভাষা, অর্ধাটীন অপভ্রংশ, ইত্যাদি। এর মধ্যে অবহট্ট নামটিই সবচেয়ে উপযোজী বলে মনে হয়। সমানায়িক রচনায়ও এই নামটি পাওয়া যায়। বৈক্য পদাবলীর অব্যবহিত পূর্বজন রূপ বিদ্যমান ছিল অবহট্ট—এ অহমান অপরিহার্য। অবহট্ট কবিতার আবহ। বৈক্য পদাবলীর বিষয়-বস্তুও পূর্বজ্ঞে পাচ্ছি। প্রাকৃত-পৈতৃক উদ্ভূত এই নৌকালীনার কবিতাটি সুপরিচিত। সাধা বন্দনা পাঠ হচ্ছেন ককের নৌকার। কাকনবীতে কক ভ্রম দেখাচ্ছেন নৌকাটিকে টলনল কুরিয়ে। সাধা ভ্রম পেয়ে বলছেন—

অরে যে বাহরি কাক নাম
হোড়ি ভলন কুণ্ডি ন গেই।
এই ইপি নহি সত্তার গেই
কো চাহসি মো গেই।

অরে কক, নৌকা টিকনত বাত, টলনলি হাড়, নবীতে কুরিয়ে আধাকে কুণ্ডি দিও না। কুণ্ডি এই নবীতে পাঠ করে গিয়ে তার পাথ বা গাও তা নিও।

এক প্রাচীন ছন্দোগ্রন্থের বাঙালী লেখক অপভ্রংশ ছন্দের উদাহরণ বলে একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এটিতে বাংলা দেশে অবহট্টে লেখা সাধাকুকলীলা-কবিতার সত্ত্বেরে পুরানো ও দ্রুত নন্দা পাই। কক এসেছেন সাধার কাছে তাঁর বাড়িতে। সাধা তাঁকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটলেন। তাতে জানিয়ে গিলেন কক বেন কুণ্ডাবনের কোনো একটি বিশেষ নিদ্রিত নিদ্রুতে গিয়ে অপেক্ষা করেন, তিনি একটু পরেই গিয়ে মিলিত হবেন।

রাই মোহরী পুন্ হনি হসি কাক মোঅল।
কুণ্ডাব বন কুণ্ডাব চলি কক কল।

রাইরে মোহা পল ভনে কাক মোহা কাকনবী আর কুণ্ডাবনের কোনো এক নিদ্রিত কুণ্ডাবের দিকে কেন্দ্র হলাস বন চলেস।

যে উদাহরণ ছুটি দেওয়া গেল তাতে বৈক্য পদাবলীর বস্তুর পূর্ব-ইতিহাসগুহ আছে, ঐতিহ্যবিশিষ্ট পরিপূর্ণ রূপ নেই। পশ্চিম সে ভ্রম যে অবহট্ট সাহিত্যেও দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ অহমানের পদাবলী। অহমানের পদাবলী সংস্কৃত লেখা কিন্তু তার ঠাট সংস্কৃতের নয়। সে ঠাট অবহট্টের ও প্রাচীন বাংলায়।

প্রাচীন বাংলা। চর্যাপীতিতে আর জগদেবের পদাবলীতে একই রূপ পাই। অবহট্টেও মিলছে তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সাধকের একরকম সাধনসংগীতে—বাকে তাঁরা ব্রজপীতি নাম দিয়েছিলেন। ব্রজপীতির একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি। এর মধ্যে বৈকব পীতিকাব্যের প্রেমরসাবেশের পাততা অঙ্কিত হবে। তবে নারক-নাটিকার ভূমিকা যেন বৈকব পদাবলীর বিপরীত।

বৈকব পদাবলীতে রাখা যোগিনী কৃষ্ণ অহনরক্ষী, ব্রজপীতিতে নিরঞ্জন শূত্র মহাপ্রহু নিদানিতর নৈরাক্ষা যোগিনী অহনরক্ষী। যোগিনী শূত্র নিরঞ্জনকে ভাগ্যক্ষেণ এই বলে—

কিচ্ছে নিরঞ্জন বিদ্যামণ্ড
লোক নিমিষেই কাই
তব বজাৎ রই সমুদ্রসি
উটুইহি সকল বিদাই।
কর অশুপাৎ বি করিম শিখ
যা কর হর বিহিত
জব তব পড়িয়া সকল জু
উটুইহি যৌনি-বিত।
পূর্ব শইজ্ঞহ সমুদ্রসি
যা কর কাঙ্ক্ষ-বিদ্যাত
তই-অথ নির সমল জু
পতিজট লব অবলোটে।
বিশ্ব' দাপ যা করহি শিখ
উটুই হর জ্ঞাব
কাহরি যৌনি-বিশ হুই
উটুইউ অরো জা।

বিত্যক্ততা বিদ্যাক্ত হলে কেন তুমি লোক নিরঞ্জন ক'রে, সে ধর যদি শুল না কর শকলে কিংবে উটুই থাকে। হে শিখ, নিজের কাম লো করত হবে, অতএব শূত্র বিধিত করেো না। সকল লোক ভবতরে পতিত। হে যোগিনী-সি, উটুই তুমি। পূর্ব অভিজ্ঞা দ্রব কর, কামে বিন্ধ হোয়ো যা। তোমার তরে সকল জব নিরঞ্জে, এখন জগতের অংগাং বুর হোক। শিখ, বিদ্যামি যান করেো না শূত্রজব অকলর ক'রে। যোগিনীককে কাম্য কর, অথবা ভাব বুর হোক।

এই অবহট্ট থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা মৈথিলী হিন্দী রামায়ানী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাগুলি অল্পবিস্তর পূর্ণপরিণত রূপ ধরবার পরেও অবহট্টের আদর করে নি ধরবারী সাহিত্যে, বিশেষ করে রাখার-পদাবলীতে। এই পরবর্তী অবহট্ট, বার উপর মৈথিলী প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাব অবতাই পড়েছিল, পঞ্চবন-বোড়প শতাব্দীতে ব্রজবুলি রূপ নিয়েছিল। স্বয়ং প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা-কবিরে মন্যবে যে অল্পবল অ-হিন্দী শব্দ ও পদ আছে তা এই পরবর্তী অবহট্ট বা প্রাচীন ব্রজবুলি যাই বলি-না কেন তার। স্বভাব্য ব্রজবুলি কোনো প্রদেশবিশেষের সম্পত্তি নয়, তা আর্ষভাষার সাধারণ সম্পত্তি এবং এক হিসাবে কবিদের সর্বস্বত্বের সাধু আর্ষভাষা।

বিদ্যাপতি অধীন অবহট্টে গদ্যে শব্দে একখানি বই লিখেছিলেন—কীড়লতা। তার মধ্যে এমন

অনেক অংশ আছে যা বহুদূরে ব্রহ্মলি বলে নেওয়া যায়। এর থেকে অবহুঁই ও ব্রহ্মলির মধ্যেকার অন্তর্যম
যোগাযোগের অসম্ভব প্রমাণ মিলাছে। যেমন—

পাএ' চানু দুখও দুখ, হরিহরি সব দুখ।
কখন হাড়লি পাউ পাউরে', কখন পাএল পাউরে পাউরে।
হুই হুইখ কেহে খাঙ্গে, তোখাই হুইখ বড়ি নাঙ্গে।
কেহে কাপরে কেহে খোয়, কেহে সখল কেহে খোয়।
(কাহ পাউ তেখি পৈই, কাহে সেবক লাগে তৈই।
কেহে খেগে খণ উখার, কেহে কলহি নই পায়।
কেহে কখনে তার খোয়, কেহে খাউ কখন খোয়।
কেহে আশিখ বিনয় কক, কতক দিবস খাউ সজক।

হুই দুখার পাতে বেটে খাতা করলেন। সকলে হরি হরি পঠন করলে। যত পঠন ও জ্ঞান হাড়লেন, হানে হানে বিগল
লেন। যেখানে যে পাতে যান সর্বত্র হুইখের স্মারক বড় নাম। কেউ কাশড় দিলে, কেউ খোড়। কেউ এতুই অর্থ দিলে, কেউ
অর্থ। কোথাও প্রকল করলে মাইন দিতে হয়, কোথাও সেখক ভেট দিতে লাগল। কেউ দিলে ভণ খার, কেউ করে দিলে নই
পায়। কেউ করে দিলে তার খোয়, কেউ বলে দিলে খাতা খোয়। কেউ বিনয়ে আশিখ জানালে। কতক দিলে পথ চলা
পথে হল।

[ব্রহ্মলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নেপাল তীরহতে মোরকের রাজসভায়। তুর্কি আক্রমণের ফলে
দক্ষিণ বিহার ও বাংলা বেশ কিছুকালের জন্ত রাজসভা-পুট্ট সাহিত্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।
কবিপণ্ডিতেরা আশ্রয় পেয়েছিলেন নেপালে তীরহতে মোরকে। তাই জমোদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে সাহিত্য-
চর্চায় খোদ এ সব দেশের রাজসভার কাহিনীর মধ্যে গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে গেছে। নেপালের রাজসভায় বাংলা
বিহার কান্ট ও অন্যান্য দেশ থেকে কবিপণ্ডিতেরা আসতেন এবং মাঝে মাঝে গৃহীত হতেন। তাঁদের দ্বারা
বিবিধ মেবলীলাসীতি পরিপুষ্ট হতে থাকে। (অনেকের ধারণা আছে যে কুঙ্কলীলা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।
সে কথা ঠিক নয়। তিন হাজার বৎসর আগে কি ছিল বলতে পারি না, তবে আজই হাজার বছর ধরে
কুঙ্কলীলা-সাহিত্যের যে ইতিহাস পাচ্ছি তাতে কুঙ্কলীলাসীতিক লোকসাহিত্য বলা যায় না। লোক-
সাহিত্য তাকেই বলি যা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নয় এবং যে রচনার কোনো রকম সাহিত্যিক ছাঁদ
অনুসৃত হয় নি। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসমাজে চলিত হলেই তা লোকসাহিত্য হবে এমন কথা
নেই। সাহিত্যে ও শিল্পে কুঙ্কলীলাকাহিনী বরাবর মুখ্যস্থান পেয়ে এসেছে। কুঙ্কর কামনিধন-কাহিনী
পাণিনি থেকে শুরু করে পতঞ্জলির সময় পর্যন্ত যে কথকতার ও অভিনয়ের একটি প্রধান বিষয় ছিল তার
প্রমাণ আছে। গোটা মহাভারতটাই প্রমাণ করছে সাহিত্যে কুঙ্কমাছাফের সর্বাধিশাসিত। গুপ্তযুগের
শিল্পে কুঙ্কর গোবর্ধনধারণ কাহিনী সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। কুঙ্কর গোপীলীলাও অর্ধাচীন নয়, ইন্দুতীর
বহুবর্ষ উপলক্ষ্যে কালিদাস যে তাতে কুঙ্কবনের ও গোবর্ধনগিরির উল্লেখ করেছেন তাতে দৃঢ় ধারণা হয় যে
কুঙ্কবনে গোপীসেয় সঙ্গে কুঙ্কর প্রেমকালীন তাঁর সময়ে অজ্ঞাত ছিল না।]

১১ জননা ইন্দুতীরে পুরসেনের রাধা স্নেহের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর গুণ বর্ণনা করছে—

সম্রাট কর্তব্যবহুঃ দুখানঃ দুঃখানোক্তকুঙ্কলেনা।

কুঙ্কবনে উল্লসিত-কুঙ্কর বিকিরিতাঃ দ্বন্দ্বরি যৌবনঃ।

এই বৃত্তকে পতি রূপে বলা হবে, যে বৃত্তটি, ভূমি চিত্ররূপের উদ্ভাবনের চেয়ে কোনো অংশে বাটো নয় যে কৃষ্ণান বৈশ্যে কোমল পদম আকৃত নৃশালব্যায় যৌনশ্রী সকল কর।

অত্যাচার চাণ্ডাল্যুৎপাদিতানি ঠেলেদেখানি দিশাতলানি।

কম্পিতাঃ প্রাণি পিতৃ দুঃখাঃ কাহাঃ গোবর্ধনকম্পিতাঃ।

করায় গোবর্ধনের রসীয় ভদ্রাভিহিত হলকপাসিত, দিল্লীমহুইর লক্ষ্যে দিল্লীমহুইর রসে ভূমি মহুইর শাচ দেখে।

গোবর্ধন পর্বতের যা অবস্থা তাতে সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছাড়া বাসযোগ্য গুহার কল্পনা কোনো কবির সাধ্য নয়।

বাংলা দেশে সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার বৃত্তপাত পাশ-রাষ্ট্রস্বাদের সময় থেকে। সে সময়ে শিল্পে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্যের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে পাণ্ডুরূপের মন্দিরের ভিত্তিচিত্রাবলীতে। সাহিত্যে তার সাক্ষ্য রয়েছে বহু প্রকীর্তি শ্লোকে এবং 'রাধা', 'সত্যভামা', 'উৎকলিত রাধা' প্রভৃতি অধুনালুপ্ত নাট্যরচনার নামাবলীতে।

সেন-রাষ্ট্রস্বাদের আমলে, বিশেষ করে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক রচনা সুবিশেষ উৎকর্ষ পায়। লক্ষ্মণসেন নিজ, তাঁর পুত্র ও আত্মীয়রা কবিতা লিখতেন, তাঁর সভাকবিরা কৃষ্ণলীলা-কবিতা লিপিতে উৎসাহিত হতেন। একজন সমসাময়িক বড় কবি উদাপতিধর, লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতা বল্লালসেন ও পিতামহ বিজয়সেন—এই তিন পুরুষের আশ্রয়ে দীর্ঘকাল ধরে স্ফাময়িত্ব করেছিলেন। বলতে গেলে সেন-রাষ্ট্রস্বাদের ঐশ্বর্যের মূল স্তম্ভ ছিলেন তিনি। এই উদাপতিধর অনেক ভালো শ্লোক লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা জানি যে ঐতিহ্যের রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীতে একটু বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন, রাধাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় করে ধরেছিলেন। মথুরা ও দ্বারকা লীলার অনেক উল্লেখ কৃষ্ণাবনলীল—এ তবুও তিনি (বা তাঁর মধ্য ভক্তরা) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উদাপতিধরের কবিতায় এই তবেরই নিশ্চিত প্রতীক রয়েছে।

রাজ্যস্বাদু হিতকল্যাণী নন্দিরে দারকা।

কৃষ্ণাঙ্গাঙ্গি একলপুঙ্খকাক্ষসংগানিহিতত।

বিক পাদম্বলনমহুইরাতীক্ষাভীক্ষিত

রাধাকলিতকপটিকল্যানন্দী হুইয়ে।

প্রায় আড়াই শ বছর আগে এক কবি শ্লোকটির এই অর্থবাদ করেছিলেন—

হয়াকর হাতে শায়ে দ্বারাবতী পুরী

নানোরহমর অতি পোতা নবাহারী।

তথি অতি উত্তরীণ নন্দিরে দ্বারান...

নানোচিত্রবর হয়ে নতুন দ্বারবতী।

সে নন্দির হাতে চিত্র পত্যা বিচিত্র

তথি বিলম্বেরে কৃষ্ণ রসিকী বহিত।

আগিরনে প্রবল পুনক আসে হয়

ভদ্রাঙ্গি কৃষ্ণের চিত্রে বহে হৃদোদার।

শ্রীকল ধনুভাটীর বানীর সুরভিত

রাধা বেশি ভর পরিকল প্রসন্নত।

কাঁচা আলিসিত সেই শব্দার উপরি
শব্দন বিরান দুর্দাপন্ন সে দুতায়ি।
উদ্যাপত্তির নাথ্য কবির রূপে
সেই দুর্দা কন বিশ্ববীৰ্য বন্দনে।

বৈষ্ণব পন্থাবলীর ভিত্তি স্থাপিত হইবেছিল লক্ষ্মণসেনের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁরই সভায়। গীতগোবিন্দ-পন্থাবলী যে তাঁর আসন্ন স্ববাস্ত সে কথা নিছক অহুমান নয়। লক্ষ্মণসেনের পুত্রের অহুশাগনে তাঁর কিছু সাক্ষ্য মিলবে। পিতার প্রাত্যহিক কার্যাবলীর প্রসঙ্গে বিশ্বরূপসেন বলেছেন—

প্রহ্মায়ে বিনয়বৈদিত্যবিত্তভ্যাবিশুভূজাঃ
কথ্যাহে লক্ষ্মণানয়নকরতিশোভনানকট্যাহৈঃ।
সাজঃ কেশকিলাপিদীক্ষনলক্ষ্মীরবলুপৈ
বোকাগিহি বিত্তিব্রবৎটনাবজাঃ সিন্ধ্যাঃ নভঃ।

প্রহ্মায়ে বনী বৈরা রাজাদের শুমলকুকারে, যথাক্রমে গঙ্গার লক্ষ্মণসেনের মন্ত খাবান হস্তিগণের উৎকট হস্তারূপে, সম্মান বটীয়ে কিত্তি-নুপুয়ের ন্যূন বিৎকশে মিনি তিন সন্ধ্যা আকাশকে বিচিত্রবর্ণধ্বনিত করে সফল স্বত্বতেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য নষ্ট হবার পরে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের এই সভাগিত প্রথা চলে আসে নেপালে তাঁরহতে ও অন্ত্যস্ত প্রান্তীয় রাজ ও সামন্ত-সভায়। নেপালে ব্রজবুলি পন্থাবলীর চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল। নেপালের রাজারাও ব্রজবুলিতে পদ লিখতেন। যেমন, ঐনিবাসনন্দের রচনা—

উপনিষ আনন ধীর-পদম শব্দর নিব-বসিনে
তোই অশুশন অধর মোহা-কন নবদ্রবত্বি ক্রিনে।
কন পেমসি কী মোর গরম গরম আগরায়
ময় ময়গনিষ মারকসেবর ন কন কনোবধ বাধে।

নেপালের রাজশব্দ্য যে ব্রজবুলির চর্চা হত তা বাংলার প্রভাব-বর্জিত ছিল না।^১ বোড়শ শতাব্দীতে লেখা এই পদটিতে এই অহুমানের সমর্থন মিলবে—

সদন বক্রিনে মেহা হুগরি হবন্ধ-মেহা
জীব হুইপুই নীল না আএ বিরহ কাম মেহা।
কন পঃখি হুগা হাইব মারো মিহা লোখ পাইব
হাতে ধরিতা পাএ পড়িতা দলার ভুলিরা নইব।
চর্কন চির ন ভাএ মূক-সার শুখাএ
অব মোরি মোরি আনন গাঁরি কন জৌমিক বাএ।

১. নিখিলায় ব্রজবুলি প্রথম পাণ্ডুর গেল চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় উদ্যাপতি ওয়ার লেখায়। রামা কুরিহু-
সিংহের স্বপ্নর উপলক্ষ্যে ইনি পারিভ্রাতামূল্য নামে একটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন সংস্কৃতে। তাঁরই যে কটি
গান বিয়েছিলেন তা সবই ভাষায় অর্থাৎ ব্রজবুলিতে লেখা পদ। পদগুলি সবই চমৎকার। তাঁর মধ্যে কয়েকটি
বিজ্ঞাপত্তির রচনায় প্রবেশ করেছে।

একটি উদাহরণ দিই। সখী সূদী কৃষ্ণের কাছে আলিনী সভাভার্যার বিরহাবস্থার বর্ণনা করছে—

কি কহব রাখন তনিক ক্রিশ্বে, অশনহ তনু বনি গাব কলশে।
অশনক আনন আরসি মেহি, চৈবক ভরন বীণ কত মেহি।



যাত্রা

রমেশনাথ চক্রবর্তী

ভরসে নিমকর উপর আনি, পরাই ভলস সয়ীসহ আনি ।
চিকুরিকর নিম নলস নিহাতি, ভলসরসলস আনি ছিৎ হাতি ।
আনস বনস পিকনস অণুবাসে, হুপ্তর তেব পিক্তকর পরাসে ।
বাসন আণস করিত সন্যাসে, হুপ্তর নিহুৎ ন হুৎ নিবাসে ।
হুৎকিত উদ্যাপতি জন পরাসে, বাসেপতি সেই হিন্দুপতি আসে ।

বালক, তার মধ্যে আর কি বেশি বল। আপনায় সেই দিয়ে ধনী কষ্ট পাচ্ছে। আরপিতে নিজের দুখ দেখে সে চার জন ক'রে কতবার বেশে বেশে ওঠে। নিজের হাত কুঁকর উপর পরসে পরসে ক'রে শর্শ দেন করে তার পায়ে। নিজের বেশপাশি ডোপে দেখে সে মেঘাতুর দল করে হুৎকনস বেশ করে। আপনায় বালক জনে কোকিল-বৎ অণুবাস করে এক প্রাণভাণ করতে থাকে। সে যখন, এখনি বীমাংসা কর। হুপ্তর কখনো শেষ পর্যন্ত নিহুৎ রয় না। হুৎকিত উদ্যাপতি অদ্যাপবাক্য বলত, তা জানে বাসেপতি যেইর পতি হিন্দুপতি।

উদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, বিভাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর। তাঁর কথা সুবিবিত। পুনরুক্তি অন্যবক্তক। এই তো গেল মিথিলায় ব্রজবলির কথা। ব্রজবলি পরাবলীর রীতি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় উদ্ভিষ্টার এক আদ্যানে পাওয়া বাচ্ছে। বাংলার এ রীতি যেমন স্থায়ী ও কলদান হুৎছিল এমন অস্তর নহ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বলে নিতে পারি পুরানো ব্রজবলি পর উদ্ভিষ্টার একটি স্মৃতি পাঠ। সেটি বোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখা এ হুতে পারে। উদ্ভিষ্টার রাজ্য প্রতাপরুদ্রের এক প্রধান কর্মচারী ছিলেন রামানন্দ রায়। কবি পণ্ডিত এবং রসিকভক্ত বলে ঐচ্ছিক এঁকে খুব সন্মান করতেন। রামানন্দ রায় দণ্ডগ্রন্থরসভ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। তাতে অনেকগুলি সংকৃত গান নিয়েছিলেন অপরূপের ধরনে। ইনি ব্রজবলি পরও লিখতেন। তার একটিনায়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত উদ্ধৃত করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে বাসের পরিচয় আছে তাঁর। সেই পরটির প্রথম দু ছত্র নিম্নরূপে জানেন—

পহিলি রাস রসভক্ত, কল
অনুগুন বালস অধর না খেল ।

রামানন্দ রায় ছিলেন রাজসভাপুট কবি তাই জনিতায় রাজার নাম—

বন্দ রজন্যবলি দান
রামানন্দ রায় কবি তাই ।

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন যে ব্রজবলি পদটি পাওয়া বাচ্ছে সেটি হুৎলেন সাহাবর এক কর্মচারী রসোদাস-খানের লেখা। পদটির দ্বোই কবির ও কবির বনিবের পরিচয় লভ। কৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে কিংছেন, রাধিক। উৎকণ্ঠিত হয়েছেন তাঁকে চক্ৰগাচর করতে। সব কৃষ্ণকে সে কথা বলছেন—

এক পরাবর	দেব-দেপিত	আর সন্মই গোর
হিম-বোর	কনকদূষ	কোসে মিলস মোর ।
	দাঘ হুয়া বরস-করে	
আবদ্যচারি	করিশ প্রবরী	হাতির দেহলী হাকে ।
বাহিন সোচন	কাজে রক্তিত	দলস রসল বাঘ
দীপদল	কলস হুৎসে	গুৎল কত কাম ।
ঐহুত জন	অনককৃৎ	সোই এ হল দান
গক সৌভদ্য	জোপপূরন	জনে রসোদাসদান ।

এক পত্রাখর চমকচটিত অশরট স্বাভাবিক সৌন্দর্য, বেন বিহাঙ্গ ও কনকচল কোলে জোড় ফিলেত্র। হে মাধব, তোমার দর্পনের দ্রুত দৃষ্টি রাখা আখ পাখসারি করছে বাহিরে খেউড়িতে। তার ভান চোখে কাজল বা চোখ পান্দা, বেন নীল মাখা দুই নয়ন দিগে কাসের কত পুষা হুতরে। অশ্রুত কৃষ্ণকর্ণণ ঐক্যে ইজ্জতুল্য পক্ষ্যযৌবন রাঙ্গা স্ত্রীকৃত রূপন, তিনিই এ রূপ ভাবনে। এ কথা বলছে যশোরাগন্যবান।

এই হাসেন শাহা ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহার দরবারে এক বড় কবিকে পাই, খ্রিষ্ট কবিশেষের ও বিদ্যাপতি জনিতা নাম দিয়ে করেকটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদ লিখেছিলেন। ১ ইনি দীর্ঘকাল গোড়-দরবারে সভাকবিষ করেছিলেন কেননা একটি পদে হাসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান, হাসেন শাহার এক পুত্র, গিয়াসুদ্দীন মাসুদ শাহার উল্লেখ পাই।

মোড়শ ও সুলতান সভাকবির সন্নিধ্যের ব্রজবুলি তথা বৈষ্ণব পদাবলীতে নূতন জীবন সঞ্চার করলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন—দীপ্রগোবিন্দী—গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি রচনাও দেখা গেল সুখ্যভাবে শঙ্কর-কবি ও ছন্দ-চপলতা এবং সেই সঙ্গে ভাবের সংহতি ও ভাব্যর গাঢ়তা। একটি পদের জনিতায় গোবিন্দদাস বলেছেন—

রূপারোচন প্রবলিলাস,
রচই রচির পদ গোবিন্দদাস।

এ কথা এঁর রচনাও দর্শনা বখার্ববাদ। গোবিন্দদাসের দুটি পদ উদ্ধৃত করছি। বর্বার কঙ্কাকৃত রজনী, রাখা অভিসারে উদ্ভত। সখী নিবেদন করলে—

বহিরে বাহিরে কটন কপাট, চলেইতে পড়িল পড়িল রচই।
তরি অতি দুঃখের বাদলযোগ, বাহিরে কি বাহিরে নীল নীচোঙ্গ/
দুঃখের কইরে করবি অভিলার, হরি হই মানস-স্বয়ম্বী পার।
কনকন কনকন বহিরে নিশাত, শুনইতে প্রবাহনর জরি যাত।
কপিলি দাক্ষিণী-বহন বিহার, দেইইতে উচইতে সোচন-তার।
ইংগে বহি দুঃখী তেমনি দেহ, প্রেমক মালি উপেখবি দেহ।
গোবিন্দদাস কহ ইংগে কি ফিচার, ছুটল বাণ কিয়ে ঘটনে নিহার।

ফরের বাহিরে গেতে কটন বরষা, চলতে গেলে রাখায় কান। তাতে অত্যন্ত কণ্ঠবাহন। নীল দিগোলে কি জল আটকাবে! দুঃখের অভিলারে দুহি বাবে কি করে। কৃষ্ণ জো রূপরূপ মানসসঙ্গার ওপারে। কনকন কনকন শব্দ বাণ পড়ছে, শুনেলে কাসের মর্দনে হয়। কপিলিকে যিহ্মাতের আভন যিহ্মত, বেঞ্চলে চোখের তার টিকরে পড়ে। প্রত্যেক বহি দুঃখী দুঃখত্যাগ করিল তাহলে প্রেমের দ্রুত দেহত্যাগ করি। প্রাবলিলাস বলছে—এতে বিচারকিয়দবার কিছু নেই। যে বাণ হোঁড়া ছেয়েছ অশ্রুত জোঁ কহলেও তা আর ফেরে না।

উত্তরে রাখা সখীকে বলেছেন—

কনকরিয়া-কপাট উলখাটপু তাহে কি কাটকি বাণ,
নির হরিয়া-লিঙ্গ সকে পড়লু তাহে কি তলিবি অবাণ।
সহচরি নহু পড়িল কর দুঃ,
কৈছে জ্ঞান করি পথ দেহত হরি গোপরি গোপরি নহ দুঃ।
কোট দুঃখের বহিরে বহু পার তাহে কি কলসজল দাণি,
প্রেমকনকন দাক জ্বর সহ তাহে কি বলকব দাণি।

কহু শ্রুতনে নির বীক সৌন্দর্য ভাবে কি তনু অঙ্গবোষ,
সৌন্দর্যবাস কই বনি বিরহ সহচরী পাওল বোষ ।

কুলদ্বারোপকণাট উৎখাচন করেছি আমি, তার কাছ কি কার্ত্তের বাধা লাগে ? বিরহব্যাধিগ্রস্ত নহু পেরিয়েছি আমি, তার কাছে কি ছোট নদী অগার ? সখি, আবাক পূরব করা হাড় । কেমন মন নিজে কুক আবার পথ এবে আজেন সে কথা ভেবে ভেবে মন ঠাণ্ডা । কোটি কোটি হৃদবন বার উপর বসিত হৃদে তাকে কি কেবের মল লাগে ? প্রেমের লালসাহ বার জন্ম সেইহু তার কাছে বজ্রাঘি কিছু না । বার পদতলে নিজের জীবন নৈগেছি তার কাছে কি শরীরের দায় ? গোবিন্দবাস বলত— লামো রাধা, সখী হৃদে পেরিয়ে ।

আলাপে শংকরদেব ও তাঁর শিল্প শাসনদেব বোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি পদাবলী রচনা করে কাব্যতঃ- কাব্যরূপকে ব্যাভিবেছিলেন । আসামের প্রথম বৈক্য-পদকর্তা শংকরদেব । এঁর রচনার উক্তির প্রকাশই মুখ্য । শংকরদেবের ব্রজবুলি পরে ভাবার বিস্তৃতির সঙ্গে ভাবের গাঢ়তা আর ছন্দের দৃঢ়তা পরিষ্কৃত । যেমন এই পদটিতে—

সেই সেই	গাঁহুর সেই	কো হরি পরকাশ,
হাস মরত	রূপ বরত	চাকেরি হানু দাশ ।
পতিতে পড়	পায় বার	সার ভকতি নিজে,
অন্তর মল	হুটর কল	মুখ মূকর পিছে ।
জাহে ভকতি	তাহে হুতি	ভকতে তব মান
মৈত্র বনিক	চিত্তবনিক	হানি তপ বনান ।
কুককির	কব শবর	তব গোবিন্দক শ্যামি
সোহি পতিত	সোহি দ্বিগত	যো হিতল যামি ।

সেই— সেই আবার গাঁহুর, যে হরি স্তম্ভ একানিত । নাম শ্রব করি রূপী ধাব করে আমি গাঁহই দাস । পতিতে ওহু পায় পড় ; সার নিতে হু ভক্তি । কলের মধ্যে কলম কোটে, সে মূখ বার মূকত । যাতে ভক্তি তাতেই মুক্তি—ভকত আসে এ ভব, যেমন বনিক চিত্তাননি জেনে তার তপ বনি করে । কুককির শংকর কলে— গোবিন্দের চরণ ভজনা কর । সেই পতিত, সেই সৎসজীবন যে হরিভল গায় ।

(শাসনদেবের কোনো কোনো ব্রজবুলি পরে হিন্দীর ছাপ পড়েছে) এই প্রার্থনা-পদটি বীরাবাসীদেবের রচনা স্বরূপ করায়—

গোবিন্দ বীনমাল বাবী, তুই বেরি সাহেব চাকর হানি
কাহু করিয়ে তুয়া চরণে লাগো, মরণ চরণ চাকেরি হানো ।
তৌরি চরণ বেরি পরকাশ, চাকেরি মাথো-নাহি আন কাহ ।
আপ্নর করম জন বাধি হোই, তাই তুয়া চরণে চাকর রই হোই ।
নাথনাম কহর মতিহীন, পতি বেরি নাহি তুয়া পদ বিনা ।

আলাপে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ব্রজবুলি একটু বাঁকা পথ নিলে পদ ও ইতিহাসের ব্যবহারে নিষিদ্ধভায়ে । এর মূলে অবশ্যই ঐতিহাসিক ছিল নৃত্যনৃত্যের প্রয়াস আর ঐতিহাসিক ছিল অনভিজ্ঞতা । মল কিস্ত খুব খারাপ হয় নি । পদাবলীর ধারাবাহিক একচেয়েমির মধ্যে ভাবায় ও ছন্দে একটু তরলতার নবীনত্ব আনিলে । তার সাহিত্যিক মূল্য বেশি কিছু নয়, তবে কীর্তনগানে নৃত্য রূপ সজীবিত হয়েছিল । যেমন শশিশেখরের এই পদ, কুকবিরাহিনী রাধার বশন দশার বর্ণনা—

অতিশীতল	মলয়াবিল	মন্ড-মধুর-বন্দনা,
হরিবৈদ্যুতি	হাথারি অক্ষ	মহাবানেন-বন্দনা ৭
কোকিলমুখ	কুহকুহরী	অনি কাকর মুহুরে,
হরিনাদসে	তরু তেজস্ব	পাণ্ডব আনন বলসে ।
সব মঙ্গিনী	যেরি বৈদ্যুতি	পাণ্ডব হরিনাদে,
বৈকুণ্ঠে	উতক্কে উচ্চ	মহাবাদিনী গানে ।
ললিতা কোরে	করি বৈদ্যুতি	বিপাখা বয়ে নাটোল,
পরিপেক্ষর	কহে গোচরে	পাণ্ডব জিউ যাত্রিরা ।

অতিশীতল মলয়াবিল মন্ডমধুর বইছে, তাতে হরিবৈদ্যুত আনার অন যখনবলে বেশি করে গুরুত্ব । কোকিলমুখ কুহকুহরী, অনি কাকর করছে । কুলাসায় আনি তসুতায় করল এক অল্প সময় পান গীর সঙ্গে দিল্লার জন্ত । এই কথা বলতে বলতে রাধা হুঁহু খেলল । মঙ্গিনীরা সব দিগে বসে হরিনাদ গাইতে লাগল । সেই কুলাস কানে ধায় অথনি বন্যাসুরসের উল্লাসে রাধা উচ্চ কহতে চায় । ললিতা কোলে করে বসে আছে, বিপাখা নাড়ী টিপছে । পরিপেক্ষর সবর বেচেরে বসছে—প্রাণ হুঁহু খেটে যায় ।

রাধার প্রাণরক্ষার অন্ত্রে সবীসের একজন দূতী হয়ে চলল মধুরায় কুম্বক থেকে খুঁজে বার করে আনতে । গোকুশানন্দেয় এই পদে তার বর্ণনা—

হাই, বৈকুণ্ঠ	বৈকুণ্ঠ	মন্ড: মধুরায়ে,
হুঁড়ল পুতী	পতি সেক্ষক	বাঁহা রহন পাণ্ডবে ।
অতি স্তম্ভ	অতি স্তম্ভ	শ্রী: কু কন্দা,
অবিলম্বে	মধুরাপুতী	প্রবেশ করিল মন্দা ।
এক বকী	অরবলী	নির অরোহণ পূর,
মন্ড-মাত	কুক খ্যাত	কাহার ভরন আছে ।
তবিরি সো ধনী	কহই বাণী	সো কাহা ইহা পাণ্ডব,
কহবৈবকী-পুত	কুক খ্যাত	কালিঙ্গু দাংব ।
সোই সোই	কই কই	বকসন মধু আশা,
যোকুচক্র	কহে পাণ্ড পাণ্ড	ওই যে উচ্চ বাসা ।

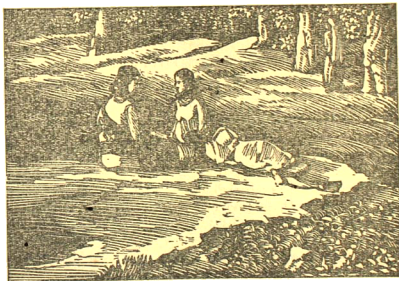
হাই, বৈকুণ্ঠ বর বর, আনি মধুরায় বাণী । সেখানে বাড়ি বাড়ি গির খুঁজে দেখে সেখানে যদি মন্ড পাই । দূতীর কথা শুনে রাধা বললেন, খুব ভালো খুব ভালো, শ্রী দমন কর । দূতী অবিলম্বে মধুরাপুতীতে গির হাঙ্গির হল । এক অরবলী সেক্ষক দেখে দূতী নিজের আশ্চর্যকর জিজ্ঞাসা করলে, রাতের মন্ডল বিভাতি কুক কার বাড়িতে থাকেন । শুনে তরুণী বললে, সে এখানে কি করতে আসবে । এখানে থাকে সেই বিভাতি কুক বিনি বহসেন-বৈবকীর পুত্র, বিনি কলমাতী, বিনি মাল । দূতী কহে উঠল, সেই বটে সেই বটে, তার মন্ডবই আমার আশা । গোকুচক্র তরুণীর হস্তে বলছে—পাণ্ড, পাণ্ড, যি যে উচ্চ বাসা বাড়ি দেখা থাকে ।

ব্রজবুলি পদাবলীর ইতিহাসের আর সেরা টেনে লাভ সেই । শতাব্দী শতাব্দীর রচনার অইকুতি অটোশ শতাব্দী পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌছেছে । সে কেবলই রসদীন গুরুপত্রের বর্ষর । তবে ব্রজবুলি পদাবলীর ইতিহাসে বিনি সমাপ্তির ঠাড়ি টেনে দিলেন তিনি শুধু বাংলা দেশের নয়, কেবল ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর স্রষ্টা করি । তাঁর ব্রজবুলি কবিতার কথা বলে আনার বক্তব্য শেষ করি ।

রবীন্দ্রনাথ বালককালে বৈকুণ্ঠ পদাবলী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর অল্পকরমে ব্রজবুলিতে কয়েকটি গান ও কবিতা লিখেছিলেন । অনেকগুলি রচনা প্রথম বর্ষ ভারতীতে বার হয়েছিল (১৮৮৪) । তার প্রায়

বছর পাঁচেক পরে 'ভাঙ্গুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয়। ভাঙ্গুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সবই বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচে লেখা, মাঝ ভনিতা পর্যন্ত। ভনিতায় কবি "ভাঙ্গু" "ভাঙ্গুসিংহ" নাম নিয়েছেন। ভাঙ্গু রবির সর্বার্থক শব্দ। সেকালে তাঁর কোনো কোনো গদ্য রচনাও থাকার আছে "ভ"। এটি ভাঙ্গুরই সংক্ষিপ্ত রূপ। "সিংহ"টুকু নিয়েছিলেন অজ্ঞাতসারে কবি শিতার বন্ধু ও নিকের গীতগুণক শ্রীকৃষ্ণ সিংহের নাম থেকে, এইরকমই আবার মনে হয়। অথবা কষ্ট করনা করলে বলতে পারি বিদ্যাপতির পরে যেমন কবির নাম ও শিবসিংহের নাম আছে—তেমনি রবীন্দ্রনাথ সেই নামটিকে যোগ করে ভাঙ্গুসিংহ তৈরী করেছিলেন। ✓

ভাঙ্গুসিংহের পদাবলী বালকের রচনা, কুটিন রচনা, গ্রাম্যীন অমার্জিত রচনা—এ কথা কবি নিয়ে বার বার বলে গেছেন এবং আশঙ্কাও তা মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু শ্রদ্ধে বৈষ্ণব পদাবলীর নত এগুলিও হরের অভিনবক পেনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিছুতেই মনে হয় না যে, বহুকালান্তরিত ভাষায় বালকের লেখা নকল রচনা। যে কারণেই হোক ভাঙ্গুসিংহের পদাবলীর অনেকগুলি গানের মধ্যে গ্রাম্য আছে, সে ছাড়ে ১৫০০ সালের ভাষায় ১৮৭৬ সালে পনের-ষোল বছর বয়সের ছেলের লেখা গানগুলি এখনও কিছুমাত্র সজীবতা হারায় নি।)



কাঁচোবাঁই

ব্রজবুলির চরিত্র

‘প্রমেথিউস’-কাহিনী

ত্রিনিদাদীকান্ত ভট্ট

গ্রীক দেবতার বিচিত্র—গ্রীকদের কথা বলি কেন, ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা, কি দেবতা রাজাই, যে দেশের হোম-না, সকলেরই দীনা প্রায় একরকম। তা বাহুবেরই মতন, সবচেয়ে লম্বা বাহুবেরও অধম—বাহুবের যে সব হীনতর প্রাকৃত প্রকৃতি তাই দিয়েই যেন গড়া দেবতারের স্বভাব। ঈর্ষা, ঘেঁষা, অশ্বিনতা কি কম দিয়েছে দেবতারের পরিচয়? স্রেষ্ঠ তাই কবিরের উপর এত বিরূপ ছিলেন (যদিও তাঁর নিষেধ ছিল এক গভীর নিবিড় কবিত্বকল্পিত)—হোমর এত বড় কবি, দেবতারের কি প্রকৃতি দিয়েছেন তিনি?

প্রাচীন গ্রীসের প্রবীণতম নাট্যকার এএস্কিলস তাঁর সুবিখ্যাত “দৃশ্যলিত প্রমেথিউস” নাটো পাঠকদের ব্যাখ্যাকারদের কাছে অস্বাভাবিক সনাতা তুলেছেন। সনাতা এই, প্রমেথিউস নিজে দেবতা, কিন্তু দেবরাজ জিউস তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন—কারণ প্রমেথিউস হর্তানাহুবের সাহায্য করেছে, বাহুবকে আগুন এনে দিয়েছে; বাহুব আগে আগুন বসটিকে চিনত না জানত না, প্রমেথিউসই বাহুবকে এই আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে সংস্কৃত মাজিত শক্তিমানে করে তুলেছে। পৃথিবীর নবর জীবটির উপর তার বড় অহুসাগ। এই অহুসাগই জিউসের আবার বিরাগের কারণ। জিউস বাহুবকে দেবতায় পায়ের না। এ কি ব্যাপার? দেবরাজ তিনি—যার কাছে আশা করি নব্বই ঔষধ দিব্যদ্রুতি, তাঁর এ কি ক্ষুদ্রতা? কথাটা তা হলে বৃষ্টি একটু।

প্রমেথিউস-কাহিনী একটা সুপ্রাচীন পৌরাণিক গল্প। কিন্তু পৌরাণিক গল্প আজকাল আর নিচুক গল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তার মধ্যে সেবা হয় সেকালের বাহুবের প্রকৃতি স্বভাব চরিত্র আর তাঁর স্নানকের আলোবা বা ইতিবৃত্ত। তাছাড়া অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে এলব কাহিনী একটা রূপক, তার পিছনে রয়েছে বাহুবের বাহানীবনের ইতিহাস নয়, তার অন্তরের অভিজ্ঞতার, একটা নিগূঢ় জ্ঞানের চিত্র। Mythology একদিকে history হয়েছে, কিন্তু আরো সত্যাতর ভাবে হল mystery—

* ইংরেজিতে আবার কবি “প্রমেথিউস”, “এএস্কিলস”—অনেকটা গ্রীক শব্দের ও উচ্চারণের কাহাকাহি। তবে গ্রীক ও লাতিন ভাষার অন্তর এই অস্, উস্, এস্ সত্যতর বিন্দু (অস্ ভাবাত্ত থাকে বলে)। কবীরা তাই যেন হয় অত্যন্ত সত্যসত্যত ভাবে এই প্রত্যক্ষ পরিচয় করেন। তারা “প্রমেথিউস” (প্রমেথিউস) না বলে বলে “প্রমেথ” ও উচ্চারণ তারা করতে পারে না, “এএস্কিলস” (গ্রীক আইস্কুলস) না বলে, সন্ন্যাসির বলে “এস্কিল” (Eschyle)। সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, হেরোডোটাস না বলে বলে সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, হেরোডোটাস। বাংলায় আবার কি কবি? কবীর অস্বাভাবিক বাংলায় আজি সিন্ধেলিয়ার একলম্বের সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, এস্কিল। কবি সত্যসত্যত বসই হোমর প্রমেথিউসকে “প্রবাবী” করেছিলেন সর্বপ্রথম। ইংরেজিতে যদি আবার স্রেষ্ঠ, গ্রীক ও লাতিন, কবীরা বানিয়েছেন স্রেষ্ঠ। বাংলায় আদি করতে চেয়েছিলেন “সত্য”। কবীরাতে বাহুবের অস্বাভাবিক স্রেষ্ঠকে বলা হয় ইক্সট্রা, আর আইস্কুলসকে আবিষ্কৃত। বাংলায় আদি করতে চেয়েছিলেন “সত্য”। কবীরাতে বাহুবের অস্বাভাবিক স্রেষ্ঠকে বলা হয় ইক্সট্রা, আর আইস্কুলসকে আবিষ্কৃত। বাংলায় আদি করতে চেয়েছিলেন “সত্য”। কবীরাতে বাহুবের অস্বাভাবিক স্রেষ্ঠকে বলা হয় ইক্সট্রা, আর আইস্কুলসকে আবিষ্কৃত। বাংলায় আদি করতে চেয়েছিলেন “সত্য”। কবীরাতে বাহুবের অস্বাভাবিক স্রেষ্ঠকে বলা হয় ইক্সট্রা, আর আইস্কুলসকে আবিষ্কৃত। বাংলায় আদি করতে চেয়েছিলেন “সত্য”।

কি রকম? বৈদিক সরস্বতী শুধু একটা নদী নয়, তা ছিল আবার সভ্যজ্ঞানের ধারা (‘স্বনুতান্যং চোপসিহ্রী’)। জনশৈক ভিনটি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যুগকাঠে বন্ধনদেবের কৃপায় তাঁর মুক্তি হল—এ কেবল ঘন্টার গম বা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়—এর সত্যীকরণ অর্থ আছে। মর্ত্য মানুষ, মনোবল জীব, আবদ্ধ নিয় প্রকৃতির কঠোর বন্ধনে। প্রকৃতির ভিনটি পাশ—সেহ, প্রাণ আর মন। বন্ধন হল বৃহৎ চেতনা—মানসাতীত বৃহত্তর উপলব্ধিই মানুষকে এনে দিল মুক্তি। এই হল জনশৈক-কাহিনীর মৰ্মকথা।

আমাদের বিখ্যাত দ্বিউস-প্রমেথিউস কাহিনীর পিছনেও রয়েছে একটা অল্পরূপ আত্মর তত্ত্বকথা। বলি সে কথা, তবে আমাদের মত অর্থাৎ আধুনিক মনের মত করে। মানুষ আগে, গোড়ায় আগুন বা অগ্নি কি বস্তু জানত না—বর্ণ হতে তাকে নানিয়ে আনলে প্রমেথিউস। অগ্নি বর্ণের জিনিস—অগ্নির যে বর্ণ যে ছোঁতি তা ঘর্মান, তা কেবল সেবতোয়া। সেবতোয়া সেবতা—ছোঁতিন্দ্য বৈষম্য—কারণ তাঁরা অগ্নিব্য। আনন্ডা বেদের আদিময় স্মরণ করতে পারি এখানে—অগ্নিনীলে পুরোহিতঃ বেবন্—অগ্নিকে পূজা করি সেবতা তিনি রয়েছেন সকলের পুরোহাণে। প্রথমই তাই প্রশ্ন ওঠে মানুষকে এ জিনিস সেওয়া কেন? গ্রীক কবি সেই প্রশ্ন তুলেছেন—ভারতীয় কবি বা কবি কোনো আপত্তি তোলেন নি; ব্যাপারটিকে সহজ সত্য বলে গ্রহণ করে তার নিসূত অর্থ আবিষ্কার করেছেন। অগ্নি শুদি মানুষের অধিকারে আসে, তবে সেবতা-মানুষে কোনো পার্থক্য থাকবে না, মানুষ হয়ে উঠবে সেবতা। আমাদের বৈদিক ঋষির সেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বলেছি আপত্তি করাও চলতে পারে—একটা বিপদের বিভ্রান্তের সন্ধানও আছে। সেই দিকটাই গ্রীক কাব্যে ও নাট্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আনন্ডা এখানে বিশেষভাবে বলেছি সেবাত্ম-সংঘর্ষের কথা, ওরা পাশ্চাত্যে বলেছে সেবতা-মানুষে সংঘর্ষের কথা। প্রথমতঃ গ্রীকদের ধারণা ছিল, স্বর্গীয় কস্তকগুলি দ্বল নিয়ম, বিধি বা ধর্ম আছে (nomoi)—তা লঙ্ঘন করলে হয় প্রভাবায়, নহাপাপ; ফলাভোগ করতে হয় নিদারুণ। এ হল বেন উৎকট কর্ম এবং তার উৎকট ফল। নিয়তি হলেন দেবী আনাফে (Anagke—অনিবার্যতা); আর তাঁর দত্তবিধাতৃ সান্দোপাথ এটী (Ate), এরীনিয়স (Erinyes)। সেবতার ধর্ম ও নিয়তি এক, মানুষের ধর্ম ও নিয়তি ভিন্ন। প্রমেথিউস চেয়েছে দ্বিটির মিশ্রণ—অর্থাৎ আনন্ডা থাকে বলি, বা এক মুণে থাকে বলা হত “বর্গস্বর”, দ্বার কল সমাজের স্বর্গীয় উৎসাহন, ধর্ম সাধন।

কারণ আরো নিবিড়ভাবে একটু খেললে আমরা বুঝতে পারি এবং ধারা চক্ৰমান তারা বলে থাকেন—মানুষকে সেবকের গুণ গ্রহণ ও ধারণ করতে হলে, তার অধিকারী হওয়া চাই অর্থাৎ চাই স্বভাবের পরিমার্জন, প্রকৃতির একটা পরিবর্তন। মানুষ হল সূত্র-চেতন, অস্বাভাব্য দাস, সে কি রকমে অনবচ্ছিন্ন তার গ্রহণ করতে পারে? সে তার চাপিয়ে দিলে তার উপকার হবে না, সে ভেঙেচুরে পড়বে। প্রমেথিউসের মাগুন নিয়ে মানুষ আজ কি খেলছে? মানুষ আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে—চলেছে নাকি আত্মবিস্ফোপের পথে?

উপনিষদের সাধক নচিবেত্তা অগ্নিবিদ্যা চেয়েছিলেন, কিন্তু তা অধিগুত করবার ভ্রমে তাঁকে বিশেষ বোধ্যতা অর্জন করতে হয়েছিল, একটা শিক্ষা বা সাধনা বা তপস্তার ধারা অহুসরণ করতে হয়েছিল। ঋষিরা বলতেন অগ্নিকভাবে তাঁর সোবদ্রা স্বাধা ধার না—ভেঙে দ্বার, গলে দ্বার। মাটির পাত্র—মানুষ মাটির পাত্র বই কি—তাকে পুড়িয়ে শক্ত সমর্থ করতে হয় আগে।

কিন্তু প্রমেথিউস কি করলেন? তিনি কেন বাস্তবিকতার করলেন না—উপকার করবার আবেগে, থাকে

বলা হয় অগ্রপঞ্চাং বিবেচনা, তা করলেন না, যদিও তাঁর নামের অর্থ “অগ্রবিবেচক।” তাঁকে বিভ্রালা করা। হল—তোমার এ দুর্বলা কেন, তুমি কি পাণ করেছিলে যে দেবরাজ তোমার উপর এমন কঠি ? তিনি বললেন, বাহুবলকে তিনি আঙন এনে দিয়েছিলেন তাই—বুদ্ধির আঙন, যান্ত্রিক চাতুর্ধের আঙন, হাতের দানিত কৌশল—যার ফলে শিল্পকলা, শিক্ষাসত্যতা বাহুধের। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আর কি করেছিলেন ? আঙন এনে দিয়েছিলেন কিরকম ব্যবহার মধ্যে ? চারদিকে শুকনো ধড় বিছিয়ে দিয়ে ! কি রকম ? বাহুধের দৃষ্টি হরণ করলেন—দৃষ্টি থাকলে বাহুধ হহতো ভয় পাবে, কি নিজাও নিজের হয়ে পড়বে, এইরকম ধারণায়। লাক্ষ্যজ্ঞানের পরিবর্তে অন্ধ আশা ! অন্ধ আশা আর প্রাণে আঙন—এই তো লক্ষ্য বাহুধ ; এইভাবে হুমাক্কর অগ্নি বাহুধের বুকে প্রজ্জ্বলিত হল। কিন্তু উচিত ছিল না কি আগে বাহুধের অন্তর-বেদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, প্রশান্ত নির্মল করা, অগ্নি সন্নিবিষ্ট হলে যাতে ক্রমে ধূমপূত হয়ে বিস্তৃত ঔজ্জ্বল্যে, জ্যোতির্ময় তেজে পরিণত হয় ?

ফল হল তাই বিপরীত। প্রেমেথিউস ডাঙলেন সনাতন অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম, লক্ষ্য করলেন বিধির লিপি। তাই তিনি নিজে এসেন স্বাধীনচিত চরন-করা ঔপনিষদিক অগ্নিসেব নয়, কিন্তু পাথিবে আহুত আঙন—একটা খাণ্ডব দাহন, তাতে নিজে দগ্ধীকৃত হলেন, বিশ্বও হল দগ্ধীকৃত। এসকিলস এইভাবে দেখালেন উৎকট কর্মকল—poetic justice।

তবে বলা বাহুলা, এতখানি তব ভেবে চিন্তে যে এসকিলস তাঁর গল্পটি রচনা করেছেন তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু গল্পটির অন্তরালে এইরকম একটা উপলব্ধি আগে হতেই ছিল বা এইরকম একটা উপলব্ধিকে মূলতঃ আশ্রয় করে গল্পটি প্রথম রূপ গ্রহণ করে—এ অহুমান আদার করতে পারি—পরে কথটি পাশা-প্রশাখায় পড়ে-পড়বে অলংকৃত, বিকৃষিত পরিবর্তিত হয়ে বিশাল কাহিনীরূপে দেখা দিয়েছে। আমি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি অন্তরের হৃদয় স্মৃতি।

সে যা হোক—প্রেমেথিউসের নিক থেকে তাঁর কর্মের পক্ষে যে সঙ্গুতিক নেই তাও আবার নয়। আদরা বলেছি যাটির পাত্র পুড়িয়ে শুদ্ধ করা। শক্ত করা দেরকার—তার অন্তেই তো আঙনের দেরকার আগেই। কিন্তু এ জবাব হল আধুনিক মনের। এসকিলস তাঁর আর-একখানি নাটকে বন্দী প্রেমেথিউসকে মৃত করেছেন—কিন্তু সে নাটকটি আমাদের কাছে পৌছয় নি, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে তার মূল ভাবটা অহুমান করা হয়েছে। প্রেমেথিউস মুক্তি পেল, যেহায সেবে জিউসের অঙ্গুগত হয়ে। কিন্তু এ পরিণাম আধুনিক মনের অহুমানচিত নয়। প্রমাণ ইংরেজ কবি শেলী।

২

প্রেমেথিউসের কথা বলতে গিয়ে শেলীর নাম না করলে চলে না। এই ইংরেজ কবি এসকিলসের অভাব পূরণ করে দিয়েছেন, অবশ্য তাঁর নিজের জ্বলিতে। শেলীর “শূখলমুক্ত প্রেমেথিউস” বিখ্যাত নাটক এবং অনেক দ্বিলাবে একখানি বিখ্যাত স্মৃতি। এখানে যে আশার আশুহার দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন কাব্যগত চর্যকারিত্বের সঙ্গে, তাতে আরো এই ভারতীয় সিদ্ধান্তটির প্রমাণ হয় যে, কবি আর ঋষির মধ্যে নিবিড় মিল রয়েছে কোথাও—যদিও সনাতনী মতে শেলীকে পাথগের দলে (Satanic poets) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শেলীর পাণ্ডুর অর্থ আধুনিকত্ব : এককিলস্‌ যে দৃষ্টি দিয়ে সেবতাসের দেখেছেন, জিম্বলকে প্রমেথিউসকে চিত্রিত করেছেন, শেলীর কাছে তা মাথা করতে পারি না। সেবতা বা জিউল অর্থ তাঁর কাছে অত্যাগার উৎপীড়ন প্রাচীরের প্রতীকশ্রিত্য। আর প্রমেথিউস হল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য, শাস্তির প্রেমের বিদ্রোহ। পাণ্ডুরা— আধুনিকেরা— অনেক সময়ে সেখি পুরাতন পরিচিত সজ্জাগুলির অর্থ বদলে, উল্টে নিয়েছেন। তাঁদের হতে সেবতাই অমর, আর অমরই হল সেবতা। এইরকম একটা কচিবৈপরীত্য নিস্তিক কবি ব্রেক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন— স্বর্গ হয়েছে নরক আর নরক হয়েছে স্বর্গ।

পুরাতন-সনাতন-বিরোধী, সংস্কার-প্রহারী প্রাণ-প্রবেগ মানের মধ্যে এই রকম একটা মূল্য-বিপর্যয় ঘটা। দামিক আন্তিক কবি নিলটন পঞ্চম এই রকম প্রভাবের ছাত থেকে উদ্ধার পান নি— তাঁর কবিপ্রাণ শরতানকে ঘটখানি জীবন্ত, স্ফাহুজুতিবোগ্য করে ধরেছে, কোনো একেল এমন কি ভগবান স্বয়ং সে আহুতুল্য লাভ করেন নি। আনাসের মধুদ্বনে যেমনার প্রতীল বা রাষণ বে পতা ও সৌন্দর্য নিয়ে ছুটে উঠেছে, রামসীতা তাঁর কাছে মান হয়ে পড়ে নি ?

বা হোক আমি বলছিলাম সেবতার বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। সেবতা ভগবানকে কল্পনা করা হয় এই ভাবে যে তাঁরা রয়েছে উর্ধ্ব, স্বর্গে, এবানকার ছুঃ সৈন্ত মালিত তাঁদের স্পর্শ করে না— তাঁরা আনন্দ করেন, মজা করেন মর্ত্যজীবের শোক কষ্ট বেগে, বেগে শুধু মর আবার, শোক কষ্ট দিয়ে। এ ছেন সেব বা পানবীর শক্তির অল্পগত কোনো বীরজয় হুর্ন্ত পারে না— তাঁর একমাত্র ভ্রত বিদ্রোহ।

আমি চিরবিদ্রোহী বীর—

আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !...

আমি ছর্ব্বা

আমি ডেঙে করি সব চুরমার !!

প্রমেথিউস এই বিদ্রোহী বীর। সে নিজেই শেষে ডেঙে চুরমার হয় কি না, সে যেহাল তাঁর নেই।

স্বস্তির একটা নিম্নমই কি এই ? অত্যাচারী শালকের, একচ্ছত্র প্রভুর বরাবর থাকবে স্বঃ-পরম্পরা কি স্বঃ-পরম্পরা আর তাঁর বিরুদ্ধে থাকবে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ-পরম্পরা ? প্রমেথিউস পাঁড়ালেন চার বিরুদ্ধে তিনি হলেন জিউল (মহ-শালিত এক-এক মনস্তরের কল্পনা তারতবার্য করা হয়েছে— তবে বলা চলতে পারে সে কল্পনা খণ্ডালব্ব সাধিক প্রকৃতির)। এই জিউল নিরেও তাঁর পিতা ক্রনসকে (Cronos) পদচ্যুত করে তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন। এই ক্রনসও আবার ছিলেন তাঁর পিতা— আউট্রানস-এর (Ouranos) বিদ্রোহী পুত্র। এ ধরনের দীর্ঘকাল আধুনিক চিন্ত যে সেবতা বলে মনে নিতে, পূজা করতে পারেন নি, তা স্বাভাবিক।

এই রকম একই বা বিঘাতার কবলে পড়ে পৃথিবী হয়েছে নরক অর্থাৎ অজ্ঞানের স্বার্থপরতার ক্রুরতার প্রাণ, লকলরকম বীনতার বীনতার গীটহান। পৃথিবীর এ রকম থাকা চলবে না, তাকে হতে হবে স্বর্গকৃত্যি। মানুষকে তার সবরকম কারিক মানসিক সৈন্ত দূর করে হতে হবে স্রোতির্ময় জীব। মানুষ বদলে যাবে, তার সেহ হবে স্বন্দর, তার মন হবে স্বন্দর, তার প্রাণ হবে স্বন্দর— সে হবে সৌন্দর্যময়। এমন কি মূল প্রকৃতি অবধি— নলনী, প্রান্তর-পর্বত, তরলতা— সব নতুন একটা জীবনে সম্বীত হয়ে উঠবে। সব হবে প্রেমের স্রীতির আলোর আনন্দের প্রকাশ। এই হল শেলীর স্বপ্ন।

এ কাম সংসাধিত হবে প্রমোথিউসের আদ্যানে ও আত্মনিষ্ঠিতে। কে এই প্রমোথিউন্? শুধুই তিনি বিদ্রোহী ধংসকারী নন,— আসলে তিনি একজন ষট্টা। প্রমোথী হলেন অগ্নিধারী, অগ্নিবাহক। বাহু অগ্নি বটে— বে অগ্নি অগ্নি-মহনের রুল— তার গান হল যন্ত্রপাতি এবং মাহুয়ের সজাত। কিন্তু বাহু অগ্নি একটা আন্তর অগ্নির বিগ্রহ বা প্রতীক— তা হল চিরম অগ্নি, উর্ধ্বগতির ক্রমারোহণের আশুহার অগ্নি। এ অগ্নির আদিনিবাস উত্তরলোকে, সেখানে, তুরীয় চেতনায় (তুরীয় অর্থ চতুর্থ— বেহ, প্রাণ মায় মনের ওপারে)। তবুও পৃথিবীর সঙ্গে এর নিবিড় সম্বন্ধ। প্রমোথিউন্ সেবতা বটে, কিন্তু তাঁর মা হলেন পৃথিবী (হয়তো এর অর্থ অতিচেতনায় অন্তর্নিহিত যে পৃথিবী বা কিত্তিত্ব, আর তার গর্ভস্থ শক্তিই হল অগ্নি)।

তাই পার্শ্বীয় মায় মাহুয় তাঁর সহোদর। এই ক্ষুদ্রই মাহুয়ের উপর তাঁর আকর্ষণ। মাহুয়কে তিনি যে অগ্নি-সম্পদ দিতে চান তাও স্বাভাবিক।

অগ্নির শিখায় ভর করে মাহুয়কে উর্ধ্ব উঠে চলতে হবে, তার চেতনাকে প্রকৃতিকে সমুদ্রত সমুদ্র করে তুলতে হবে, মাহুয়কে তেজোময়, জ্যোতির্ময় এবং আনন্দময় হতে হবে। কিন্তু উঠতে হবে বাধা ভেদ করে। বাধা হল অতীত নিয়মের ব্যবহার অত্যাচার, গতানুগতিকের উৎপীড়ন— রবীন্দ্রনাথ তার ক্ষমার নাম দিয়েছেন “অচলারতন”। এক গভীর অর্থে কেবল অতীত নয়, উর্ধ্ব অর্থাৎ উর্ধ্ব সেলোক পর্যন্ত এই অচলারতন। কি রকম? সেবতারিও হলেন— এক-একটি অহং। তাঁরাও এই হিসাবে অহংই— উর্ধ্বতর স্তরের অহং। বৈদিক সেবতারের একটি বিশেষণই হল অহং, যদিও তার অর্থ হল বীর্ঘবান্ (কথ্যটির ব্যুৎপত্তি অহ+ঃ; অ+হুয়-নয়)। প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ ধর্মকর্মের বিগ্রহ। সেবতারিও যেখানে ভগবানের, সজ্জানদের একান্ত অঙ্গীকৃত সেখানকার কথা আলাদা। কিন্তু নিম্নতর লোকে সেবতারিও গ্রহণ করেছে স্ব-স্ব-প্রধান মূর্তি। এই সব স্বর্ণলোকে— মৃত্যু-সেবতা নচিকৈতাকে যেখানকার লোভ দেখিয়েছিলেন— অপরিবর্তনীয় বিধীন। সেখানে উন্নতি নেই, অবনতিও নেই। প্রত্যেকে এক-একটি নির্দিষ্ট গভীর সিদ্ধি। কিন্তু মাহুয় অপরিবর্তনশীল, তার উন্নতির সীমা নেই, তার গতির সীমা নেই। বৃত্ত অতলে পড়ে থাক, উর্ধ্ব উঠবার ক্ষমতা তার আছে, বৃত্ত উচলে উঠে থাক, আরো উঠে ঘাবার সম্ভাবনা তার আছে। তাই এমনও বলা হয় ভারতীয় শাস্ত্রে যে সেবতারিও যদি চার মুক্তি তবে তাদেরও মাহুয় হয়ে ভ্রমগ্রহণ করতে হয়।

উর্ধ্ব যে সেবতারিও নিজের নিজের কোট বজায় রাখতে আগ্রহী, তাঁদের রাজ্য মাহুয়ের নত চিরগতিমান্ চক্কল বিদ্রোহীকে খ্রীড়ির চক্ক দেখতে পারেন না। শেলী এই লড়াইয়ের দিকটা এবং তার পরিণাম মাহুয়ের ভয় দেখিয়েছেন যে চিত্র বা রূপকের আশ্রয়ে তার মধ্যে একটা-নিমিত্ত তবের ছায়া লক্ষ্য করে আনন্দা বিস্তৃতই হই— বলতে ইচ্ছা হয় কবি তিনি, কবি হতে হতে খেমে গিয়েছেন।

সেবলোক মাহুয় অধিকার করবে কি রকমে? অল্প কথায় সেব-পতির পতন ঘটাবে কি উপায়ে? সেব-পতির পতনে হবে প্রমোথিউসের মুক্তি। প্রমোথিউসের মুক্তি অর্থ মাহুয়ের নব স্রষ্টি— পৃথিবীতে স্বর্ণরাজ্য। সেবপতির পতন হবে সেবপতির আপন সম্বানের হাতে— যেমন পূর্বাগর বটে এসেছে, নৃতনের বীজ পুরাতনের মধ্যেই। পুরাতন স্বর্ণের মধ্যে নৃতনের বীজ উদ্ভূত হল— জিউন্ উদাহরণে আবহু হলেন সমুদ্রতনয়া বাকশী খেলি—এর সঙ্গে। এই সমুদ্র ও সমুদ্রতনয়াকে আবহা এইক বা তুল ভৌতিক আবহেটনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। উর্ধ্বের ও নিম্নের, স্বর্ণের ও মর্ত্যের উদাহেই তো নবতর স্রষ্টি।

কিন্তু শেলী এখানে গভীরতর গুরুতর একটি রংয়ের কথা বলেছেন। তাঁর ডেমোগগন (Demogogon) তত্ত্ব। সেবলোকের উর্ধ্বে যে ভবিষ্য-মৌল বা সত্তা জন্মাল তাকে তো রূপ গ্রহণ করতে হবে, তুলসেই ধারণ করতে হবে, নতুবা পৃথিবীর রাজ্য তার কি রকমে হবে? আর সে রূপ সে যেহ এমন হওয়া চাই বা শব্দরূপ পক্ষে চূড়ান্ত অচেতন—টিক আত্মারই মত হবে অজ্ঞেয়োহীনবাহোহঃ। তোমার সে উপকরণ? শেলী তো পেয়েছেন ডেমোগগন-এর কাছে। ডেমোগগন অর্থ “বহুং বন্ধ”, উপনিষদিক ভাষায়—ভাইবোন+গরগন+ (গ্রীকে গরগন অর্থ বহুং বিপুল বহুং আর ভাইবোন অর্থ অশৌকিক সত্তা, সেবগতি ইত্যাদি)। এই বন্ধের স্থান পৃথিবীর অন্তর-গহ্বরে, অভ্যন্তরে পাতালে। সেখান থেকে উঠে সে চলবে উর্ধ্বে স্বর্গে জিউসের লোকে। আমি ব্যাখ্যা দিই, ডেমোগগন বহুং বন্ধ হল অচেতন বা অবচেতন, সূত্রের তুল প্রকাশের প্রতিষ্ঠা বা, বাক্যে ধরেই দৃষ্ট সব এখানে। এ হল স্বয়ং প্রকৃতি—তুল প্রকৃতির নিরবগতি, জড়ের নথো নিহিত লুচ্ছাষিত যে চিরন্তন শক্তি। মাহু যে এতদিন মাহু করে এসেছে, সে যে আপনার মুক্তি সাধন করতে পারে নি, পৃথিবী যে মৈত্রেয় দুঃখের পীড়ার অজ্ঞানের পাপের অপার হয়ে আছে, তার কারণ মাহু স্বর্গে পার নি, আশ্রয় করে নি, প্রয়োগ করে নি এই তার অবচেতন শক্তিকে, বা হল শৌকিক বা প্রকট প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাশক্তি। এরই একটু কথা বা ছায়ায় আভাস পেয়েছে জড়বিজ্ঞান দ্বারা, যখন সে আবিষ্কার করেছে এই তথ্য যে জড়কণা ক্রমাগত শক্তি বা তেজ ছাড়া আর কিছু নয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং গুহ্যবিজ্ঞা বলেছে উর্ধ্বতমকে পূর্ণ আবিহূত* করা যেতে পারে এই এখানে, নিম্নতমের পূর্ণ প্রকটনে ও উল্লীহনে। দার্শনিকের ভাষায় বলব, জড় যেমন হল, স্থির শক্তি, অচেতন (বা অচিৎ) হল আবার তেমনি অবচেতন মাত্র— অর্থাৎ চেতনার (চিৎশক্তির) সংগতি, আশ্রয়গ্রহণ, বা আশ্রয়গ্রহণ। পৃথিবী যদি স্বর্গ না হয়ে থাকে, তার কারণ পৃথিবীকে আমরা সংস্কার করতে চেয়েছি মনের বুদ্ধির শক্তি দিয়ে—মনের বুদ্ধির শক্তি অতি সীমাবদ্ধ, তার সামর্থ্য সেই মাহুয়ের স্বভাবকে জগৎ-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে পারে। সে সামর্থ্য এক আছে পৃথিবীর নিজস্ব শক্তির, পৃথিবীর বেহাভাভের নিম্নজিত যে বহুং বন্ধ তার। এই পার্থিব সত্তার উঠে এসে পৌছিয়ে সেবলোকে, সেখানে যে সেবশিত সত্তা তাকে সেবে প্রকট রূপ, করবে শরীরী—এই অপরূপ শব্দলগ্নে গঠিত যে নবজীব নবলতা সেই জিউসের স্থান অধিকার করবে। পুরাতন বিধানকে পণ্ডিত করবে, যে বিধানকে বলা হত অলম্ব্য নিয়তি, ধার স্বাধি নিদেশ করা হত দাবজ্ঞদ্বিধাক্রো তার পরিবর্তে আসবে নববিধান, সংস্কারের নয় মৈত্রীর, মৈত্রীর নয় প্রেমের, অজ্ঞানের নয় আলোর সাম্রাজ্য—সেই নবনবতাই পৃথিবীতে জিউসের দাদরাজ্যের পরিবর্তে স্থাপন করবে ধর্মরাজ্য, সত্যস্বর্ণ। ডেমোগগনের এই হল অপরূপ সৌভাগ্য।

প্রমেথিউস তখন হবে নবশরীরী। প্রমেথিউস অর্থ ভাবীহুই বা মন্তা (প্রো, পূর্ব হতে, মাহানো, আমি মন করি—সম্ভবত নতু, হুইও নতু, খাতুর সঙ্গে একটা সাক্ষ্যও থাকতে পারে)। সে হল মাহুয়ের নথো, শরীরের নথো যে তেতোমহ অন্তর্ধানী প্রচ্ছন্ন, ধার দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে স্বপ্ন জবিত্তে, ভাবীশক্তি সার্বভারত উদ্বোধ, ছিদি চলেছেন, চলিয়ে নিতে চেয়েছেন মাহুকে শরীরীকে।

* কোনো কোনো টাকাকার কল্পনায় ডেমোগগন = বহুং + জন বা লোকসমূহ। কিন্তু এখানে ডেমোগগন মন হুই “ভাইয়ে”র অর্থলগ্ন।

কিন্তু বর্তমানে এই শরীরের মধ্যে, বর্তমানের বাবদ্য মধ্যে তিনি স্টিম নিপীড়িত। তিনি হলেন জড়ের যুগকাঠে আবদ্ধ জীবপুরুষের প্রথম প্রতিরূপিত—ক্রুশবদ্ধ ক্রীটের আদি স্বরূপ। মাহুকের মধ্যে ভগবানের আত্মাহুতি, মর্ত্যের মধ্যে অমৃতের মরন—তারই আলোখা এ, যাতে মাহুধ ভগবান হয়ে ওঠে, মর্ত্য হয়ে ওঠে মৃত্ত অমৃত।

বলেছি, এককিলসের অবন্ত দৃষ্টি ছিল ডির, উদ্বেজ ও জির। তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন নি—সৃষ্টির জটিলবিহুতি, মাহুকের সংজ্ঞায়সূহা, এ সব জিনিস আলোচনা করতে তিনি যান নি। তার বিবর ছিল “ধর্মরাক্ষ” বা “সনাতন ধর্ম” অর্থাৎ যাকে যেন বেঙা সনাতন ধর্ম বলে তার মহিমা কীর্তন—যে অলিখিত বিধি সৃষ্টির লগাটে লিখিত।

কবি স্যাক্সার্লিও ঠিক এই কথাই বলেছেন—

সেব-অহুশাসন অলিখিত অবিচল—

এ জিনিস আজকের নয়, কালকের নয় রয়েছে চিরকাল, কেউ জানে না

কবে থেকে তা দেখা দিয়েছে।—আমিগোনা

আমাদের ঋগ্বেদীয় ঋষি বলছেন অহুহুগ ভাবে “অবধানি বরুণস্ত ব্রতানি”—বরুণদেবের অলজ্ঞা বিধান—এই বরুণদেবের নিকটেই পাপনৃতির প্রার্থনা করছেন জনশেব।

কুহু ব্যক্তির—সেবতার ব্যক্তিত্ব হোক আর মাহুকেই হোক—ইচ্ছা বা বাসনা এই মহাবিধানকে ব্যাহত করে না, টলায় না—তার বিরুদ্ধে নাড়ালে সেই ব্যক্তিকে চূর্ণ হবে যায়। স্তব্ধতা, বিজ্ঞতা হল তাকে যেন নেওয়া, তার অহুগত হওয়া। তা ভালো কি বন্ধ্য বিচার করবার অধিকার বা সামর্থ্য কোনো সৃষ্ট জীবের নেই। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব স্থান, বিশ্বব্যবস্থার আছে স্থানের উপযোগী কর্তব্য, তাকেই বলে স্বাধিকার। স্বাধিকারের অগ্রনস্ত থাকে—বা গৃহ: কস্তবিশ্বনঃ—এই ছিল প্রাচীনের অহুশাসন। নিয়ম-নৃশলা, বাধ্যতা-আহুগতা—কর্তা যিনি নেতা যিনি তার ইচ্ছা বা বিধি অহুগারে। এই সত্যের ব্যাখ্যা তা এককিলস্। এই সত্যটি জারুল্যমান করে ধরবার মত্রেই কর্তা জিউসকে যেমন একান্ত অত্যাচারী করে সেবিরেছেন, অস্তমিকে বিরোধী প্রোথিউসকেও তেননি উগ্রতার পরাকাষ্ঠায় নিয়ে ধরেছেন। আমাদের দেশেও একযুগে এইরকম একটা সমস্তা যেন দেখা দিয়েছিল, বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল বলা উচিত, কারণ এ সমস্তা যুগে যুগে দেখা দেয়—ঐক্য যখন এলেন তার যুগান্তকারী নববিধান নিয়ে। কৌরব ও পাণ্ডবের হুত পুরাতনে আর নৃতনে ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌতুহলের বিষয় আরো এই যে ভীষ্ম বা দ্রোণের বত জ্ঞানী বিজ্ঞ মহাপুরুষও ছিলেন সনাতনী—ঐক্যকে যেমন মেনেও তার পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে পারলেন না। ঐক্য কি নৃতন জগৎ কি নববিধান নিয়ে এলেন তা আলোচনা করবার স্থান এখানে নেই, তার প্রয়োজনও নেই।

এককিলস্ যে শিক্ষা দিয়েছেন তা এই—বিশ্বের বিধানকে যে যান না তারই মহদত্ত বহুতী বিনষ্ট হুটে। সোব বিধানের নয়, সোব আপন কর্তব্য। কেউ কাকেও বিপদের মধ্যে ফেলে না, সেবারজ্ঞেও ক্ষমতা নেই—প্রত্যেকেই যেজ্ঞার ঠাঁদের মধ্যে পা দেয়—নিজের নিজের দুর্গতি জেতে আনে। শেলী সেবিরেছেন কিন্তু এই দুর্গতি থেকে একটা মুক্তি পথ।

বাংলার নবজাগরণে বিশ্বং-সভার দান

রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ

বিলম্ব ঘোষ

সভা-সমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি-অ্যাসোসিয়েশন হল এ দু'গের মাৎসের সামাজিক জীবনের অত্যন্তম অঙ্গ। শুধু অত্যন্তম নয়, অপরিহার্য সহচর বললেও ভুল হয় না। আদিম মানবসমাজেরও ক্লাব সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন ছিল দেখা যায়। কোথাও বয়স-ভেদে, কোথাও স্থি-পুরুষ-ভেদে, এমন কি কোথাও কোথাও বর্ণাশ্রম-ভেদেও সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একটা স্থানিষ্ট সামাজিক কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথাও কোথাও। ব্যক্তি পরিবার ও 'ক্লান', প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে।^১ সভাসমাজের সভা-সমিতির বৈশিষ্ট্য হল তার গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত স্বাভাব্যতা। এই স্বাভাব্য সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তার প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার স্বাভাব্যতাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত ক্ষত বললে বাজে।^২

বিশ্বং-সভা কেবল বিশ্বং-জনের সভা হলেও, সনাতন-জীবনে তারও প্রভাব আছে। সমাজে সভা-সমিতির প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর, বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বিশ্বং-সভা সম্পর্কে আলোচনার আগে সে-সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের সভা-সমিতি প্রাচীন বা মধ্যযুগে ছিল না, আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, সামাজিক অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তা না থাকলে সভা-সমিতির বিকাশ হতে পারে না। টেলেনিদের যুগে (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) আলেকজান্ডার মিউজিয়ামে পণ্ডিতেরা যে বিদ্যাচার গুলি মিলিত হতেন, অথবা বৌদ্ধ আচার্যরা যে সভা করতেন, তা প্রধানতঃ রাজার আমোদে ও বিশেষ প্রয়োজনে হত, স্বাধীনভাবে হত না। মধ্যযুগের রাজসভার কবি-পণ্ডিতদের যে সভা বলত, তা 'রাজসভা' হলেও, আধুনিক যুগের বিশ্বং-সভা বা অন্য কোনো সভা-সমিতির সঙ্গে তার কোনো মিলগত সাদৃশ্য নেই। আধুনিক সভার প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনভাবে আগ্রহ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের জন্ত মিলিত হন। বিশ্বং-সভার বিশেষ উদ্দেশ্য হল, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনা। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজের শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্ত, বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রশ্নের জন্ত, যে সভা স্থাপন করেন, তাকেই "বিশ্বং-সভা" বলে। রাষ্ট্রনৈতিক সভা, বাণিজ্যিক সভা, অন্যান্য সাধারণ সভা-সমিতি বা ক্লাব-অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার আদর্শগত পার্থক্য আছে, কিন্তু গড়নের পার্থক্য নেই। মূল

১। Robert H. Lowie, *Primitive Society* (London, 1949), ১০ ও ১১ অধ্যায়, ২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠা।

২। *Encyclopaedia of Social Sciences* (1951 print), vol. 6, "Family" by Margaret Mead and Carl Brückmann; এছাড়া J. C. Fliegel এর *The Psycho-analytic Study of the Family* (London, 1926) এবং *The New Generation*; ed. by V. F. Colverton and S. D. Schmalhausen (New York, 1930), এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আছে ব্যক্তিগত-নৈতিক ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি, স্বাধীন চিন্তার ও বুদ্ধির স্বাধিকার। এসব আধুনিক যুগের দান।

আধুনিক যুগের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যে সব শক্তিশালী শ্রেণীর আবির্ভাব হল, তার মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্তর্ভুক্ত। সমাজে মধ্যশ্রেণী আগেও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার রূপ ছিল অস্পষ্ট। সমাজে তার কোনো স্বাধীন গতিশীল শ্রেণীগত স্বাভাব্য ও সত্তা ছিল না। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই স্বাভাব্য ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে এল। সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ধেয়ে আসল। রিনেসান্স ও রিকর্ভোর আন্দোলনের এবং আধুনিক জেনেরাশ্যের আদর্শের প্রবর্তন করলেন তারা।^১ রিনেসান্সের আদিকেন্দ্র ইটালিতে “অ্যাকাডেমি” কয়েকটি স্থাপিত হল, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ১৪০৩ সালে অ্যাক্টিনিও বোভাসেরি প্রতিষ্ঠিত “অ্যাকাডেমিয়া পন্টানিয়ানা” (Accademia Poutaniana), ১৪৭৪ সালে লরেন্ডো প্রতিষ্ঠিত “অ্যাকাডেমিয়া প্লেটোনিকা” (Accademia Platonica), ১৪৮২ সালে সাহিত্যের “অ্যাকাডেমিয়া দেলা ক্রাসকা” (Accademia della Crusca), ১৬০৩ সালে বিজ্ঞানের Accademia dei Lincei (গ্যালিলিও এই সভার সভ্য ছিলেন), ১৬১৭ সালে ফ্লোরেন্সের Accademia del Cimento, ১৭১৭ সালে Reale Accademia delle Scienze ইত্যাদি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইটালির এই সব অ্যাকাডেমির মধ্যেই ইয়োহান্নেস সর্বত্র (বলকান অঞ্চল ছাড়া) বিশ্ব-সভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৬০৪ সালে রাষ্ট্রকীয় পোষকতায় ফ্রান্সে Academie Francaise প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই শাখা হিসেবে ১৬৬৩ সালে Academie des Inscriptions et Belles-lettres স্থাপিত হয়। ১৬৬৬ সালে Academie des Sciences প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭২০ সালে সর্বত্র অ্যাকাডেমির কার্যকলাপ আইনভুক্ত করে দেওয়া হয়। তার দু বছর পরে Institut National স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অ্যাকাডেমিগুলি তারই বিভিন্ন শাখা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।^২ জার্মানিতে ও ইংলণ্ডে এই ধরনের সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি একসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নব্যযুগের কর্মমুখর প্রত্যেকটি শহরে ও বন্দর-নগরে সভা-সোসাইটি গুলন শোনা যায়। কলরব নয়, বৃহত্তর।

নতুন বাণিজ্যিক মূলধনের অবাধ প্রসারের সঙ্গে নতুন শিক্ষালব্ধ চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবাসের অবাধ অগ্রগতি হতে থাকে। নতুন সমাজে ‘Money’ ও ‘Intellect’-এর মর্যাদা প্রায় অস্তিত্ব হারায় গঠে। সেকালের কলকৌশলের বদলে নব্যযুগে অর্থকৌশল ও বিজ্ঞানবুদ্ধির কৌশলই সামাজিক শ্রেণীনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তিশালী বিজ্ঞানবুদ্ধিবাহী (Intelligentsia) উপশ্রেণী গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো প্রত্যক্ষ স্পর্শ না থাকলেও এবং সেসবের কোনো স্পর্শ অভিজ্ঞতায় বিশ্ব-জ্ঞানের স্বীকার না করলেও, রিনেসান্স আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানবাদের মধ্যে অনেকে ‘ইন্টেলিজেন্সিয়ার’ অস্তিত্ব ছিলেন দেখা যায়।^৩ আমাদের বাংলা দেশের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। সভা ও সোসাইটি প্রধানতঃ তাদের উদ্ভাবনগেই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নতুন শিল্পবাণিজ্যের যুগেই

১। A. F. Pollard, *Factors in Modern History* (London, 1932) Chapter 3, “The Advent of the Middle Class”.

২। *Encyclopaedia of Social Sciences*; vol. 9, “Learned Societies” by Frederic A. Ogg.

৩। Alfred Von Martin, *Sociology of the Renaissance* (1945 reprint): ২৭-৪৬ পৃষ্ঠা।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হইল। এই মধ্যবিত্তের বিকাশ যদি না হত, তাহলে রিনেসান্স বা বিকর্ষণ কোনোটাই সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন :*

Without commerce and industry there can be no middle-class ; where you had no middle-class, you had no Renaissance and no Reformation.

নতুন যুগের বিকশিত মধ্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রসারের ফলে, নগরে নগরে সাহিত্যসভা, দর্শনসভা, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্বৎ-সভার প্রতিষ্ঠা হতে থাকিল। বিত্তবান্ ও বিদ্বান্ এই সব সভার নিশিত হয়ে নবযুগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। লাইব্রেরি ও বিতর্ক-সভার বিস্তার হতে লাগল। নবজাগরণ ও নতুন সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠল এই সভাসমিতি।

Closely connected with the growth of education and enlightenment among the younger generation of merchants is the creation of Literary and Philosophical Societies in the leading mercantile towns—societies of this type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination*.

রবার্ট ওয়েন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, বোম্বেতে “ম্যাক্লেটর সোসাইটি” গ সভা ছিলেন তিনি এবং এই সোসাইটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে। রসায়নবিদ জ্যাকব ও ওয়েন ছিলেন ম্যাক্লেটর সোসাইটির সভ্য। ম্যাক্লেটরের মতন স্টিভারশুল শহরেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশেও নবযুগের জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা শহরে অনেক অ্যাকাডেমি, সোসাইটি ও সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলকাতার বেথোবী ক্লাবকাফি বহিষ্কৃত স্থানে (বেঙ্গল বর্ধমানে, কলকাতায়) কয়েক সভাস্থাপনের একটা ঢেউ এসেছিল একসময়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রিনেসান্স ও বিকর্ষণ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সব সভা-সমিতি। প্রথমে দেশীয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকে এসেঞ্জের ইংরেজ শাসক-বণিক্‌বাই উদ্ভব হয়ে এই ধরনের সোসাইটি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। তার পর নবযুগের আদর্শে উদ্ভূত বিত্তবান্ ও শিক্ষিত বাঙালীরা উদ্ভব হয়ে সভাস্থাপন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই আসল আদর্শ-সংগ্রাম শুরু হয় এবং জাগৃতি-আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলার সমগ্র-জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

পলাশির জুদ্ধের পরে বে-ইন্ডিয়ান্স বণিকের মানন ও ছেড়ে এদেশে বাসন ও ধরতে আরম্ভ করেন, তাঁরা আমাদের চেয়ে বিশেষ কোনো উন্নততর সামাজিক আদর্শের ধারণ ও বাহক ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার উচ্চশ্রেণীর, শিক্ষা বা জীবন দিক দিয়ে, কোনো পার্থক্য ছিল না তখন। এসেঞ্জের নবাগত ইংরেজদের প্রদর্শন এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ

*। পোলার্ডের পূর্বোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। “Middle Class” by Alfred Meusel in *Encyclopaedia of Social Sciences*, vol. 10.

১। *Johnson's England: An Account of the Life and Manners of his Age*; Turberville (Oxford, 1933); vol. 1, pp. 210-211.

অনেক সময় আমরা এসেই ইংরেজের আবির্ভাবটাকেই নবযুগের ও নবীন আদর্শের আবির্ভাব বলে মনে করি। তা একেবারেই সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মধ্যযুগের অবসান হলেও, প্রকৃত নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্লবের পরে। আমাদের দেশেও তখন নতুন শিক্তি স্বাধীন মনো যুগচেতনার বিকাশ হচ্ছে। দুই শতাব্দীর নতুন বহিষ্কৃত শিক্তি মধ্যবিত্তশ্রেণীর নবজাগ্রত চেতনার মিলন প্রায় একই সময়ে হয়েছে। হেষ্টিংস-ফ্রাইড-কর্নওয়ালিসের যুগে বোড়দৌড়, জুয়াখেলা, মত্তপান, ডুবলিং ইত্যাদির রেওয়াজ ইংলণ্ডের অভিজাত ও নতুন বণিকসমাজে ছিল, এবং আমাদের বাংলা দেশের নতুন রাজা-মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের সমাজে তারই সংক্রমণ হয়েছিল।^১ দীর্ঘকাল পর্যন্ত অভিজাতের উপসর্গরূপে এগুলি বাঙালী সমাজের নতুন অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ১৮৩০-এর সময়েও বাঙালী বণিকশ্রেণীর মধ্যে বোড়দৌড় ও জুয়াখেলার কি রকম রেওয়াজ ছিল, সে-সময়ে একজন ইংরেজ লিখে গেছেন :^২

The native merchants are now commonly seen on the race-course, booking their bets, and acting like 'knowing ones'. This is a practice of very modern introduction, but has become so common as to be noticed even in newspaper doggerels.

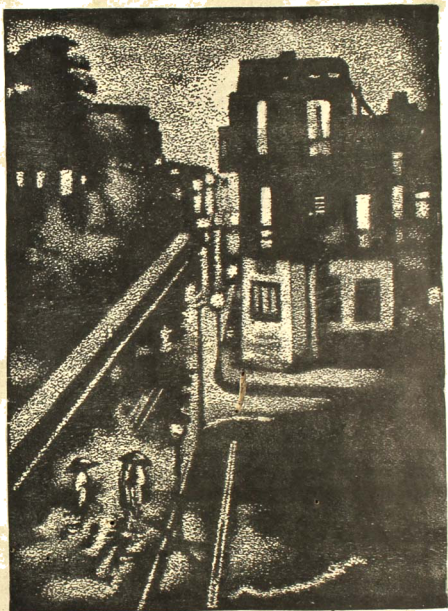
একটি ছড়া লেখক তাঁর বৃত্তিকথার উদ্ভূত করেছেন। তার মধ্যে রামাদম্ব (?) ও মতিলাল শিরের নাম আছে :

Sugar is rising
Silk is likewise
So now let us ba¹poos the joys of sport feel ;
I'll not a ledger look,
But take my betting-book,
Like Radamadub and Muttyloll Seal.

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর “পুরাতন প্রদর্শন” এ-সময়ে অনেক কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের দেখামেধি বাঙালীরা তখন আলোচনা রেসকোর্স করেছিলেন। উত্তর-কলকাতায় পোস্তার রাজাদের বাগানে বোড়দৌড় হত। অহুতাদের কোনো জট ছিল না। Starter ছিল, Jockey ছিল, Booking Betting সবই ছিল। ছাত্রাবাস মোহিত শরৎবাবু, লাটাবাস শৈলেশ্বর মল্লিকবাবু, হাটখোলার দস্তাবাবু বোড়দৌড়ের বোড়া আনতেন। শরৎবাবু নিজে Jockeyও হতেন। শীতকালে ছাত্রাবাসের মাঠে বুলবুলির লড়াই হত। অনেক তাঁর পড়ত মাঠে। পোস্তার রাজা নরসিং ও ছাত্রাবাস প্রভোকে সেদ ন করে বুলবুলি আনতেন। লড়াইয়ে হেরে গেলে বুলবুলিরা উড়ে যেত এবং বিজয়ীদের লোকেরা

১। G. M. Trevelyan, *English Social History* (London, 1918) ; Chapter 10, pp. 293-338.

২। George W. Thomson, *The Stranger in India, or Three Years in Calcutta* (London 1843), vol 2, pp. 67-68. অর্ধ টপ্পন কলকাতার দ্বিতীয় কোর্টের একজন জ্যাজকে ছিলেন।



in the rain

Richardson

কলকাতায় বর্ষা
উচ্চ-এনএলসি

উম্মানে ঠেঁচিয়ে উঠত 'বো নারা' বলে। হুপুয়বেলা, বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত বুলবুলির লড়াই হত। এত আশ্রয় হবার কিছু নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডও তাই হত। ট্রেভেলিয়ান দুয়গির লড়াই সম্বন্ধে লিখেছেন—At cock-fighting all classes shrieked their bets round the little amphitheatre—এবং যোড়সোড় সম্বন্ধে বলেছেন—“Horse-racing presented much the same spectacle in a more open arena: the spectators, most of them on horse back, galloped up the course behind the race, yelling with excitement”^{১০}

দুই দেশের মধ্যেই নব্যযুগের এই বিকৃত কালচারের সেনসেন হয়েছিল প্রথম যুগে এবং আনাদের দেশের নতুন ধনিকসম্মানে তার ক্ষেত্র ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। ধনিকরা বা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন, আসলে তা আপত্ত্যাত্যের লক্ষণ। কিন্তু তা সবেও, প্রবেশের মতন এসে দেশের ধনিকদের মধ্যেও অনেক প্রত্যক্ষভাবে বিনোদ্যন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সভা-সমিতি, সোসাইটি আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কম উদ্যোগী ছিলেন না। রক্ষসঙ্গীত সভা নয় শুধু (‘ধর্মসভা’ বেনন), প্রগতিশীল সভাতেও ধনিকদের একাংশ বেগ দিয়েছিলেন। “আম্বীয়া সভা”, “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা” (Society for the Acquisition of General Knowledge), “তত্ত্ববোধিনী সভা” প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সকলে সব সময় যোড়সোড়, বুলবুলির লড়াই আর গাধার খিচোড়ার মধ্যে জুবে থাকেন নি। তা ছাড়া, এইসব বিদ্য-সভার প্রভাবে, শিক্ষার ক্রম-বিভাগের ফলে, শহরের নতুন অভিজাতশ্রেণীর বংশধরেরা ক্রমে পূর্বপুরুষদের নবাবী কালভাবের বোহ থেকে মুক্ত হয়ে উঠছিলেন।

উনিশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে, প্রধানতঃ কলকাতা শহরে, সভা-সমিতির যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা যায়, তা সভাই বিশ্বদ্বকর। কেবল এই সব সভা-সমিতির বিকৃত বিবরণ দিয়ে নব্যযুগের বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। স্বতরাং সমস্ত সভার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় এখানে। দরল প্রকারের সভাও আমার আলোচ্য নয়। ধর্মসভা, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সভার কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করলেও, বিদ্য-সভাই আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিদ্য-সভার বর্ম রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, হয়েছেও, কিন্তু তা হলেও অস্ত্রাত সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। ইংরেজিতে Learned Society বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে আরও ব্যাপক অর্থে আমি “বিদ্য-সভা” কথাটী ব্যবহার করছি। অবশ্য সম্প্রতি Learned Society কথাটিও অস্ত্রাত দেশে অনেক ব্যাপক ও ‘পপুলার’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগের বিদ্য-সভা, সেকালের আকাদেমির সংস্কৃতি কাঠির অনেক বেশি উদার হয়ে উঠছে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র শিক্ষিত বাঙালীদের যেকোনো সভাকে আমি “বিদ্য-সভা” বলে গণ্য করছি। উনিশ শতাব্দীতে দ্বিতী পর্বে ভাগ করে (১৮০০-১৮৫০ এবং ১৮৫০-এর পর), প্রত্যেক পর্বের প্রধান সভাগুলির বিবরণ দিয়ে, বাংলার বিদ্যোদ্য-আন্দোলনের গতিপ্রাঙ্গণ উপর তার প্রভাব বিচার করাই আমার লক্ষ্য। আলোচনার

স্ববিধার জন্ম প্রথম পর্বকে ছুটি 'হুগ' ভাগ করেছি—একটি রানবোহন-ভিরোজিগর হুগ, আর-একটি ইং-বেবলের হুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রধানতঃ ইংরেজরা উন্বেগী হয়ে ক্লেব বিষয়-সভা স্থাপন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না, কারণ তখন বাঙালী সমাজের সম্বন্ধে তার বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এইসব সভার মধ্যে সর্বপ্রথম উন্বেগযোগা—“এশিয়াটিক সোসাইটি”। স্থাপিত তার উইলিয়াম বোনপের উন্বেগে ১৭৮৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম যে সভা হয় (১৪ জানুয়ারি, ১৭৮৭), তাতে—“Thirty gentlemen attended...and they represented the elite of the European community in Calcutta at the time”. এই সভার বোনপ সাহেব তাঁর ভাষণে বলেন—“Whether you will enrol as members any number of learned Natives you will hereafter decide.” ১৮২০ সালের ১ই জানুয়ারির এক সভায় (অর্থাৎ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৩২ বছর পরে) উইলসন সাহেব সর্বপ্রথম করেছিলেন এসম্প্রদায় লোকের নাম প্রস্তাব করেন, সোসাইটির সমস্তপদের জন্ম এবং তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়।^{১১} এদিকে ১৮২০ সালের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীরা নিম্নেরাই উন্বেগী হয়ে অনেক সভা-সমিতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন। রানবোহন রায়ের “আত্মীয় সভা”, “ক্যালকাটা হুল বুক সোসাইটি”, “ক্যালকাটা হুল সোসাইটি”, “হিন্দু কলেজ”, “ম্যাকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন”, “সংস্কৃত কলেজ” ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাহরাদী ইংরেজ ও বাঙালী উভয়েই উন্বেগী হয়ে এই সব সভা সোসাইটি ও শিক্ষাযতন স্থাপন করেন। তারপর “এশিয়াটিক সোসাইটির” সম্বন্ধে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার আগে হয় নি।

রানবোহনের “আত্মীয় সভা”

বাঙালীর উন্বেগে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয়, ১৮১৫ সালে স্থাপিত রানবোহন রায়ের “আত্মীয় সভা”। প্রথমে রানবোহনের মানিকতলার বাড়িতে আত্মীয় সভার অধিবেশন হত, পরে তাঁর সিমলের বাড়িতে সভা স্থানান্তরিত হয়। প্রধানতঃ ধর্মসাধকের আদর্শ নিয়ে এই সভা স্থাপিত হলেও, পরবর্তীকালের “ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি” (সেপ্টেম্বর ১৮২১) অথবা “ব্রাহ্মসমাজের” (আগস্ট ১৮২৮) সঙ্গে “আত্মীয় সভার” পার্থক্য আছে। আত্মীয় সভা কেবল ধর্মোপাসনার সভা ছিল না। যদিও সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদপাঠ হত, তন্ত্রশাস্ত্র হত, তাহলেও কেবল তাতেই সভার কাজ শেষ হত না। আত্মীয় সভার বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি বিবরণ, বা প্রাচীন সংবাদপত্রাদিতে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে সভার অধিবেশন কেবল রানবোহনের গৃহেই হত যে তা নয়, যোগদানকারী সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত। অধিবেশনে কেবল বেদপাঠ ও তন্ত্রশাস্ত্র হত না, নানা রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হত। ইংরেজি “ক্যালকাটা মার্শাল” পত্রিকা থেকে আত্মীয় সভার বৈঠকের দ্বারা একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি। বৈঠকটি ১৮১০ সালের ২ মে, রবিবার, ব্রহ্মবোহন

১১। Centenary Review of A. S. B. from 1784-1883: Part 1: History of the Society: By Rajendra Lal Mitra.

মহানারের গৃহে হয়েছিল। ১৮ই মে, “ক্যালকাটা জার্নাল” পত্রে এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় এই মর্মে :

At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions on diet, etc was *freely discussed*, and generally admitted—the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy—the practice of Polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned—as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters……— *Calcutta Journal*, vol 3, Tuesday, May 18, 1819, No 89 (Italics লেখকের)

এই একটি স্বাভাবিক বিবরণ থেকে “আত্মীয় সভা” যে কি ধরনের সভা ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। যে-সভায় নানাবিধ “was freely discussed”, সে-সভা কেবল উপদেশ-সভা ছিল না, পরিপূর্ণ আলোচনা-সভা ছিল (আধুনিক অর্থে)। আলোচ্য বিষয়গুলির বৈচিত্র্য ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। জাতিভেদে সন্যাস, নিবিদ্ধ বাস্তবসত্য, বালবিধবাসের সন্যাস, বহুবিবাহের সন্যাস, সর্ভসাহ-সহস্রণের সন্যাস, পৌত্তলিকতার সন্যাস ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয় সভার অধিবেশনে স্বাধীনভাবে আলোচনা হত। যদি আত্মীয় সভার অধিবেশনের কোনো মুহুর্ত Proceedings পাওয়া যেত, তাহলে আমরা যেতে পেতাম, “ইং বেঙ্গল”-গুণের ভিত্তর দিয়ে একেবারে বিদ্যাসাগর-গুণের প্রান্ত পর্যন্ত, বাংলার রিনেস্যান্স ও রিকর্ডেশন আন্দোলনের ধার। যে-পথে পরিচালিত হয়েছে, যেন তার একটা মোটামুটি স্বতন্ত্র রানমোহনের “আত্মীয় সভার” অধিবেশনেই রচিত হয়েছিল। নবগুণের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আত্মীয় সভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মীয় সভার সভাসদের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। সভায় সকলেই রানমোহনের আদর্শ মন্ত্রী ও বন্ধু ছিলেন। সংস্কার-আন্দোলনের সময় কেউ কেউ ভয়ে তার দল ত্যাগ করলেও, অধিকাংশই তার অসুযোগী সহচর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—বর্ণনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর, তাঁর পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জনিয়ার অজ্ঞাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার জনিয়ার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ হারকানাথ ঠাকুর, রাধেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্রমহ কৃষ্ণবন মিত্র, কুঠিলালের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জাষ্টিস অরুণচন্দ্রের পিতা বৈদ্যনাথ বৃন্দোপাধ্যায়, আব্দুল রাজবশের রাজা কালীনাথ গ্রন্থ আরও অনেকে। ইয়ারোগে নবগুণের আবির্ভাবের প্রথম পর্বে, প্রগতিশীল ডাবকারার মুখপাত্ররূপে, নতুন বিজ্ঞানশ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিবীজশ্রেণীর যে ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল, বিস্ত ও বিস্তার যে অসুতপূর্ব সময় ঘটেছিল, বাংলার নবগুণের ইতিহাসেও ঠিক তাই হয়েছিল দেখা যায়। নবগুণের বাঙালী বিস্তাবনেরা বিধ্ব-সময়ের সঙ্গে প্রথম একত্র মিলিত হয়েছিলেন আত্মীয় সভায়। বিস্তের সঙ্গে বিস্তার শ্রেণীগত বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি। বাংলার নবগুণের এই উন্মেষপর্বে বিস্তের সঙ্গে বিস্তার ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল আত্মীয় সভায়। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) নতুন ধনিকশ্রেণীর এই সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে

হলেছেন— “...it is essential to note how with the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life.”^{১২}

“হিন্দু কলেজ” স্থাপিত হয়, ১৮১৭ সালের ২০ জাহুয়ারি, সোমবার। ‘স্বাধীন সভা’ কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল। শিকলবন্দের সংহার ও নতুন শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার ক্ষেত্রে “ক্যালকাটা ছুল বুক সোসাইটি” (জুলাই, ১৮১৭) ও “ক্যালকাটা ছুল সোসাইটি” (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) স্থাপিত হল। বাঙালী ও ইংরেজরা একত্রে উৎসাহী হয়ে এই সব সোসাইটি ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষার প্রসার হতে লাগল, নতুন শিক্ষার। নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সভা-সমিতি ও সোসাইটিও এই সময় স্থাপিত হল অনেক। ক্রমে শিক্ষিতশ্রেণীর মন সভা-সমিতি-সচেতন হয়ে উঠল। প্রধানতঃ ইংরেজদের উদ্বোধনে এই সময় (১৮১৮-১৮২৮) ফেলব সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— Literary Society, Oriental Literary Society, Phrenological Society, Agricultural and Horticultural Society, Commercial and Patriotic Association (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়, রানবোহন রায় এই অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন), Ladies’ Society (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়—রাণা বৈষ্ণবাণী রায় ও কান্টিনাথ মল্লিক এই সভা প্রতিষ্ঠায় উদ্বোধনী ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে), Calcutta Medical and Physical Society ইত্যাদি। বাঙালীদের উদ্বোধনে প্রতিষ্ঠিত এই সময়কার সভা-সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল “গৌড়ীয় সমাজ”।

“গৌড়ীয় সমাজ” স্থাপিত হয় ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি বাসে। সেকালের প্রতিপত্তিশালী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে উদ্বোধনী হয়ে “এতদেশীয় শৌক্যেরদের বিভ্রাহুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে” এই সমাজ স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজে সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রধান যে সভা হয়, তাতে দেখা যায় যে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলের লোক যোগদান করেছিলেন। রানবোহনের দলভুক্ত দায়কনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারানাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে ছিলেন, আবার শুদিকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ দে, কান্টিনাথ তর্কপণ্ডান, এরাও ছিলেন। এই বিচিত্র সমাবেশের কারণ হল, ১৮২০ সালে রানবোহনের আন্দোলন নবান্নে এমন তরলবিক্ষোভের সৃষ্টি করেনি, যার ফলে সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দলাদলির উৎপত্তি হতে পারে। ১৮২০ সালে বেকির ধরন সূতীদাহ ও গহনরণ বিধিবিহীন বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৮৩০ সালে সনাতনপন্থীরা ধরন ধর্মকর্মে “ধর্মদভা” স্থাপন করলেন, নবান্নের সংঘাত ও দলাদলি তখন থেকে তীব্রভাবে আরম্ভ হল। তার আগে, বিশেষ করে গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠার সময়, বাঙালী সমাজে প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী এবং উভার প্রগতিপন্থী, বোটার্মিট এই তিন দলের লোক থাকলেও, তাঁদের মত ও পথ নিয়ে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়নি। গৌড়ীয় সমাজে তাই সকলের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। সভা-স্থাপনের সময় উদ্বোধনীদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তা লক্ষ্য করার মতন।

১২: Karl Mannheim, *Man and Society, Studies in Modern Social Structure* (London 1940); P, 84 footnote.

স্বাধায্যেব বন্যোপাধ্যায়ঃ বসেন, আবাসের দেশে যে সভা-সমিতি সেরকম স্থায়ী হয় না, তার কারণ কি ? তাই নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন। ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায় বলেন, সভা স্থাপন ক'রে আমরা যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার ও আলোপ-আলোচনা করার সুযোগ পেলাম, তাতে যে কতটা আমরা স্থায়ী হয়েছি তা বিবেচনা করা প্রকার। রামধন তর্কালঙ্কার বলেন, সভাই এখানে আমরা আজ এমন সব লোকের সঙ্গে সেবালাস্কাতের সুযোগ পেয়েছি, যাদের সঙ্গে হয়ত এক বছর কি ছ মাসের মধ্যেও একবার দেখা হয় না। কান্দীনাথ মল্লিক সভার এই প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। ক্রমশঃ বস্তু বলেন, সভায় যদি বিজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি এর মধ্যে আছি, আর যদি রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয় নিজে, কি ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি নেই। এই বাক্য সব আলোচনা চলেতে থাকে।^{১০} 'সাম্রাজ্য সভার' বক্তন 'গৌড়ীয় সমাজের' অবিবেশনও মধ্যে মধ্যে সভাস্থের ব্যক্তি হত। গৌড়ীয় সমাজের সভাস্থের মধ্যে যে কোনো আদর্শগত ঐক্য ছিল না, তা বেশ ব্যোম্বা যায়। কিন্তু তা না থাকলেও, বিদ্বৎ-সভার সভাস্থের যে উদারতা থাকার প্রয়োজন, তা তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল। সমাজের উন্নতি করা যায় কি করে, তাই নিয়ে সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। সভায় রচনাও পাঠ করতেন, রচিত গ্রন্থের অংশ পর্যন্ত পাঠ করে শোনাতেন। গৌড়ীয় সমাজ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল সঠিক বলা যায় না। প্রবীণবর সভার বরলে স্বনন নবীনদের সভাস্থাপনের যুগ এসে, তখন বিদ্বৎ-সভার রূপও বদলে গেল।

ডিরোজিওর "অ্যাক্যাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন"

এর মধ্যে হিন্দুকলেজের বয়স দশ বছরের বেশী হয়ে গেছে। হিন্দু বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যদের অনেকে মহাবিজ্ঞানকে নতুন উদ্ভৃষ্টিকা পেয়ে, বালাকাল থেকে যৌবনকালে পরীক্ষণ করেছেন। বেকন, লক্, হিউম, কনো, টম্ পেইন প্রমুখ নব্যযৌবন চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে। নবযুগের আদর্শগত উন্নতি, কেবল ইংলণ্ডের বা ইরোপোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের। হাতে-লিখা পুঁথিতে তাঁদের ব্যাপী আর পুঁথিহিত-বাক্যের স্তম্ভিত হয়ে নেই, মুদ্রিত গ্রন্থাবলি সেই ব্যাপী দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম থেকে পূর্বেও ছড়িয়ে পড়েছে, বাংলা দেশের কলকাতা শহরে পর্যন্ত।^{১১} বাংলার নতুন শিক্ত নৃবর। সেই ব্যাপী তখন অসুপ্রাপ্তি হয়েছেন। Age of Reasonএর স্বত্বার হয়েছে। কুলাস্বায়ের মেধাচ্ছন্ন নবযুগের আকাশে প্রথম উদার আলোকরেখা দেখা গেছে। বিজ্ঞানের আলো, স্তম্ভিত আলো। ন্যূনতম নন নতুন গ্রন্থ, নতুন মূল্য-বোধের বিকাশ হচ্ছে। প্রগতি সমাজবিজ্ঞানী অ্যালেক্সান্ডার মার্টিন নবযুগের ন্যূনতম এই অসুপ্রাপ্তি ও মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন :^{১২}

Men felt that they had at last attained their majority in matters economic, political and intellectual. The new conditions of life brought with them new attitudes and new valuations. The assertive self-consciousness of the *novus homo* made him reject any power which would impose limits.

১০ এই বাণ্যাবলি বোধ হয় সুবোধিত ইংরেজী doggerelএর 'Radamadu'।

১১। সভাস্থার বর্ণনা, ৮ মার্চ ১৮২০। ক্রমশঃবাণ্য কন্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্র বেকালের কথা", ১২ খণ্ড, ২-১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১২। Martin, *Sociology of the Renaissance*, pp. 39-40.

"ইফ বেকল" ও হিন্দু কলেজের তৰুণ ছাত্ৰদের সন্মুখেও এই কথা বলা যায়। সমস্ত ব্ৰহ্মবৈষ্ণৱ বন্ধন ও কৰ্ত্তব্য থেকে তাঁরাও মুক্তি চেয়েছিলেন। স্ববিধ ও প্ৰবীণতায় যখন ব্ৰহ্মচৰ্য্য বেলে সেই বন্ধন আৱোণ কৰতে চেয়েছেন, তখন তাঁদের "assertive self-consciousness" তা প্ৰত্যাহ্বান ক'ৰে, তাঁৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰেছে। বাৱা বেকল পড়েছেন, লক্ষ পড়েছেন, হিউব পড়েছেন, তাঁরা কৰ্ত্তব্য মানবেন না, শায়েৰ বিধান প্ৰভাতীত ব'লে স্বীকাৰ কৰবেন না। তাঁরা কেবল সংশয় প্ৰকাশ কৰবেন, প্ৰশ্ন কৰবেন, স্কন্ধিৰ অৱতাৰণা কৰবেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ৰরা তাই কৰতেন :

The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkley, of Hume, of Reid, and of Douglas Stewart. A thorough revolution took place in their ideas... They began to reason, to question, to doubt.^{১৭}

জিৰোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি নিজে ছিলেন কলকাতার "ধৰ্মতলা আকাদেমি" ছাত্ৰ এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কৰা প্ৰকৃতিৰ কুঁচো স্বচৰ্চান জেভিট ড্ৰামণ্ড। অভিভাবকেয়া ড্ৰামণ্ডের কাছে ছেলেদের শিক্ষার ভৰ্ত্তা পাবিয়ে নিচিহ্ন থাকতে পায়তেন না। দাৰ্শনিক হিউয়ের শিষ্য ড্ৰামণ্ড ছিলেন সৰ্ববিষয়ে ঘোৰ সংশয়বাদী এবং শাসিত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাত নিৰ্ভীক সমৰ্থক।^{১৮} গুৰু ড্ৰামণ্ডের স্বেচছা শিষ্য তৈরি হয়েছিলেন জিৰোজিও। চোদ্দ বছৰ বয়সে আকাদেমিৰ শিক্ষা শেষ ক'ৰে তিনি কিছুদিন বাইৰে চাকৰি কৰেন। তাঁর সাহিত্যিক প্ৰতিভা ছিল অসাধাৰণ এবং তৰুণ বয়সেই কাব্য ও অতীত ৰচনাৰ মধ্যে তাঁর পৰিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। পতুগীৰ পৰিবাৰের সন্তান হয়েও, এদেশকে তিনি স্বদেশ ও মাতৃভূমি ব'লে মনে কৰতেন। এদেশে তিনিই বোধ হয় প্ৰথম প্যাট্ৰিষ্টিক কবিতা লেখেন। ১৮২৬ সালে, বাত্ৰ পাঁচতৰো বছৰ বয়সে, তিনি হিন্দু কলেজের চতুৰ্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। গৱানহাটায় (চিংপুৰে) হিন্দু কলেজের প্ৰতিষ্ঠা হয় যখন, তখন আট বছরের বালক জিৰোজিও ধৰ্মতলা আকাদেমিৰ ছাত্ৰ ছিলেন। তখন কে জানত, এই জিৰোজিওই আট-নয় বছরের মধ্যে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হবেন এবং সেখানে তাঁর ছাত্ৰদের মনোভগতে এক বৈশিষ্ট্য আলোড়নের সৃষ্টি কৰবেন !

তাই কৰেছিলেন জিৰোজিও। উচ্চশ্ৰেণীৰ ছাত্ৰদের মধ্যে অনেকে তাঁর সমবয়স্ক ছিলেন। ভাবী 'ইফ বেকল' হলের নেতৃস্থানীয় সকলেই প্ৰায় তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। ৱানগোপাল ঘোষ, ৱানতল্লা লাহিড়ী, ৱাধনাথ ঈকনাৰ, ৱক্ষিণাৱতন স্বেচছাপাধ্যায়, প্যাৰিটায় মিত্ৰ, সকলে তাঁর ছাত্ৰ ছিলেন। কুৰ্মনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৱসিককৃষ্ণ বৰ্মিক, হুচত্ৰ ঘোষ, এয়াও জিৰোজিওৰ অধ্যাপনাকালে হিন্দুকলেজের ছাত্ৰ ছিলেন। কাৰণ, ১৮২৬ সালে জিৰোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকৰূপে যোগ দেন এবং ১৮২৮ সালে কুৰ্মনোহন ছিলেন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, ৱসিককৃষ্ণ বিতায় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। একজন তৰুণ শিক্ষককে বিৰে প্ৰতৰুণ ছাত্ৰদের এৱকম সমাবেশ আৰ কোথাও কখন হয়েছ কিনা জানি না। কেবল পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষকৰূপে নৱ, নবযুগের আদৰ্শ শিক্ষকৰূপে জিৰোজিও নব্যবিশ্বের তৰুণ ছাত্ৰদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক

১৭। Rev. Lal Behari Day, *Recollections of Alexander Duff* (London 1879), Chapter 3, p. 28.

১৮। Thomas Edwards, *Henry Derosio* (Calcutta 1884), Chapter 1, pp. 1-9.

উপস্থিত হবনি, যেন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ছাত্রদের নন ধারতীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে, বিদ্যেদের মতন উদার চিন্তার আকাশে স্বতন্ত্র ভাব। মেলে যাতে অবাধে বিকাশ করতে পারে, এই ছিল তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য। মনোবী বেকন ছিলেন তাঁর আদর্শ। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। প্রত্যেক প্রশ্নের ও বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত বক্তব্যটিকে পেশ করে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার স্বযোগ বিতেন এবং তার ভিতর থেকে আসল বৈজ্ঞানিক হুক্তির পথটি তাদের সম্মান করে নিতে সাহায্য করতেন। ক্লাসের মধ্যে এক বিচ্ছিন্ন যৌসাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হত এবং ছাত্রদের কাছে জিরোজিও যেন তার নামক হতেন। ময়নুদের মতন ছাত্ররা তাঁর কথা শুনত। জিরোজিওর এই ক্লাস সম্বন্ধে রেভারেন্ড লালবিহারী বে তাই বলেছেন :

"...it was...more like the Academus of Plato, or the Lyceum of Aristotle."^{১১}

বিভাগ্যের ক্লাস বিতর্ক-সভায় পরিণত করা সম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষক জিরোজিও এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্ররা তাতে এমনভাবে উষ্ম হত যে, শিক্ষক-ছাত্র সকলের নন বিতর্কের ক্ষমতা উন্মূখ হয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক ও আলোচনা-সভা হত জিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানায়। সভার নাম হল "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন" (Academic Association)। মনে হয়, ১৮২৭-২৮ সাল থেকেই এই অ্যাকাডেমির নিয়মিত অধিবেশন আরম্ভ হয়। জিরোজিওর বৈঠকখানা থেকে এই বিদ্যুৎ-সভা পরে ক্রীষ্ণকৃষ্ণ-হের বানিকতলার বাগানবাড়িতে (যেখানে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়) স্থানান্তরিত হয়। এই অ্যাকাডেমি ও তার অধিবেশন সম্বন্ধে রেভারেন্ড লালবিহারী বে'র একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি :

Derozio's drawing-room proving too confined a place for these discussions, the young men got up, about the year 1828, a debating society, which they called the Academic Association, or the Academy. In this grove of Academus—and the debating society had a garden attached to it, it being held on the premises now occupied by the Ward's Institution—did the choice spirits of of Young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions—'The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!'...^{১২}

"পাথিনন" (The Parthenon) নামে সভার মুখপত্র প্রকাশিত হল, কিন্তু হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ অগ্রদিকের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ায় হুমকি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। সভার কাজ তাতে বন্ধ হল না। কেবল অ্যাকাডেমিতে নয়, জিরোজিও অত্যন্ত শিক্ষাদানের ছাত্রদের সভায় (যেমন পটলভাটায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে) বক্তৃতা দিতে লাগলেন। জিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমির আদর্শগত তত্ত্ববাদের কাছে বাস্তবতা লাগল। কলকাতা শহরের শিক্ষিত তত্ত্বগত জিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমির সংস্পর্শে আসার ক্ষমতা হয়ে উঠলেন। তাঁদের জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে লাগল অ্যাকাডেমির উদার পরিবেশে। তত্ত্ববোধন

১১। লালবিহারী বে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২২ পৃষ্ঠা।

১২। ই, ওর অর্থায়।

বন্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, সকলেই এই অ্যাকাডেমির সভ্যতাই বক্তৃতা দিতে শিখলেন এবং বক্তা হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে “হিন্দু প্যাট্রিষ্ট” পত্রিকা লিখলেন : Krishna Mohan was the readiest and most effective speaker, unaffected in manner, calm and unimpassioned, though sometimes bursting into vehemence... কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর খুব প্রিয়ও ছিলেন।^{১২} অ্যাকাডেমির বিতর্ক-সভায় রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতার বিকাশ হয়েছিল কিভাবে, সে সম্বন্ধে অন্ততলাল বহু লিখেছেন : “It is said that this debating club was to him what the Oxford club had been to many an English orator. Raungopal continued to shine as a speaker at the Academic. He was an eloquent speaker, but not so close a reasoner as his colleague Babu Russick Krishna Mullick.”^{১৩}

মানিকভট্টাচার্য বাগানবাড়িতে তরুণদের এই বিতর্ক-সভায় প্রবীণ ও বিচক্ষণেরাও যোগদান করার সোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। হুগলীকোটের বিচারপতি এডওয়ার্ড রাহান, জেভিড হেয়ার, ডেপুটি-সকনের বার্ড সাহেব, প্রায়ই যেতেন অ্যাকাডেমির অধিবেশনে। তরুণ বাংলার প্রতিভার দীপ্তি দেখে তাঁরা এতদূর চমকিত হতেন যে সভায় না গিয়ে থাকতে পারতেন না। অ্যাকাডেমির তরুণ সভ্যদের মধ্যে মুখে মুখে হিউন, বেকন, লঙ্কর বাগী শোনা যেত। শানিত যুক্তি তরবারি নিজে সত্যিই “The young lions of the Academy roared out, week after week...” এই সময় তাঁর ছাত্রদের, অর্থাৎ অ্যাকাডেমির তরুণ সভ্যদের বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার ক্রমোন্নয়ন লক্ষ্য করে, নবযুগের বাংলার শিক্ষাণ্ড ডিরোজিও অগ্রপ্রাণিত হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য দেখেন :

“Expanding like the Petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like young birds in soft summer hours),
Their wings to try their strength.”

পরবর্তীকালের কোনো-কোনো সভার মূহুর্তি বিবরণী যেমন পাও। বায়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সে রকম কিছু পাওয়া যায় না। পরে যেমন সমসাময়িক পত্রিকায় এই সব সভা ও সোসাইটির অধিবেশনের বিবরণ দখো দখো প্রকাশিত হয়েছে, অ্যাকাডেমির সেরকম কোনোবিবরণ পাওয়া হয় প্রকাশিত হয় নি। অনেক অহলস্কান করেও, বা পাওয়া যায় এরকম কোনো সেকালের পত্রিকাতে, আমি কোনো বিবরণ পাইনি। যদি পাওয়া যেত, তাহলে “ইন্ডা বেকন” নামের উদ্দেশ্যপূর্ণ ইতিহাস আমরা আরও সবিতরে জানতে পারতাম। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই ছিল ইন্ডা বেকনের আসল ট্রেনিং স্কুল। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব তাই খুব বেশি।

^{১২} 1. *Bengal Past and Present*, vol. 36 (Part II), 37 (Parts I & II), Rev. Krishna Mohan Banerjee, by Harihar Das.

^{১৩} 1. *Amrita Lal Basu, Speeches of Babu Ram Gopal Ghose, with a Biographical Sketch* (Calcutta, 1885), p. VII.

বাউল-পরিচয়

শ্রীকিৰ্ত্তিমোহন সেন

পূর্ণাহুতি

জাতিপাক্তি

“প্রেন ও অহরাণ-পথের সাধকদের যে জীবন্ত ভাবধারা প্রবহমান, তাহাতে নিজেকে সহজে ছাড়িয়া নিজের সাধনার ধারা তাহাতে বুকু করাই হইল গভীরাধনা। কৃত্রিম শাস্ত্রে বা মিথ্যা আচারে নিজেকে বদ্ধ না করিয়া সেই জীবন্ত প্রবাহে নিজেকে হারািতে হইবে। বাউল মন বলেন—

সেই সহস্র বার,

তাতে আশ্রয়ধাম

গায় যদি শুনে।

বাউলের মধ্যে নানা জাতি আছে। হিন্দু মুসলমান দুই শ্রেণীরই নানা নিম্নবর্ণ আছে কিন্তু সবাই ‘বাউল’। আর কোনো পরিচয় নাই। “গঙ্গার ধারাতে বসে ধারা পড়ে সবই আপন পূর্বপরিচয় হারাইয়া গঙ্গা হইয়া যায়। তাবের জীবন্ত ধারাতে ভেদনি আপনাকে হারািতে হইবে। নহিলে ভাবধারাটি যে জীবন্ত অর্থাৎ পরকে আপন করিয়া লইতে সমর্থ তাহা বুঝা গাইবে কেমন করিয়া?” বাউলরা এই বলিয়াই সব পরিচয়-বিজ্ঞানসার মূল উচ্ছেদ করিয়া দেন।

বাউলরা যেমন করিয়া সকল দর্শন সকল জাতিকে নিজের অঙ্গভুক্ত করিয়া লইতে পারেন বৈষ্ণবরা তেমন করিয়া পারেন নাই। এরূপ বৈষ্ণবরা বাউলদের উপর নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন—“এদের আচার-বিচার নাই।” আবার বাউলরাও মনে করেন যে বৈষ্ণবরা একান্ত কৃপার পাত্র। বাউলদের উপর বৈষ্ণবদের অবজ্ঞা যে-কোনো মেলা বা মহোৎসবে গেলেই ধরা পড়ে। তবু বাউলরা গম্বিয়ার নহেন। বাউলরা বলেন, “বৈষ্ণবদের যদি বোধ থাকিত তবে তো বৃষ্টিতে পারিত। গোটাঁকরের শুক শাখ ছাড়া এদের ছিল কি? চণ্ডীদাস বিভাগতি প্রভৃতি কবিতা তো সহস্র মত ভাঙাইয়াই কবির করিয়াছেন। তাহাদের বাণীই কি এই সব বৈষ্ণবেরা ঠিকমত বুঝিয়াছেন? এদের যে প্রেদের গুণ রাখা তাঁকেও তো সহস্র মতের কাছেই ঠরা পাইয়াছেন। এদের ছিল বাহ্য বৈষ্ণব মার্গে ঐশ্বর্যলোকের লক্ষ্য, কল্পিত প্রভৃতি বিকৃত পন্থা। অহরানন্দমার্গে রাখাকে তো এরা পাইলেন আমাদের কাছে! কিন্তু শাস্ত্রবদ্ধ জড়জিহ্বা এমন খন পাইয়াও তাহাকে বলিল করিয়া ফেলিল। সহস্রের জ্ঞান না থাকিলে এমন রত্ন পাইয়াও লাভ নাই। প্রেমে কামে, অস্তিত্ব ইচ্ছায় গোল পাকাইয়া গেল। জাতি-পাক্তি লোপ করিয়া সহস্র হওয়ার কথা শুনিব বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে সাহসে ফুলাইল না। তাই বড়জোর ভজন কীর্ত্তন মহোৎসব তক সহস্র হইবার চেষ্টা হইল কিন্তু ভোজননে তখনে জীবনে যন্ত্রির পূজার সাধনা হইয়া শাস্ত্র ঐক্যভাইরা হইলেন। সর্বত্রই যে ভগবান, সব অর্থেই যে তাঁর মহাপ্রসাদ, সবাই যে জাতি-পাক্তি লোপ করা মহোৎসব চলিয়াছে, এ কথা জীবনে স্বীকার করার মত সাহস এদের কই? তাহা মুখে উচ্চারণ করিলেও জীবনে ধারণ করার মত সাহস নাই এদের। অর্জুনের ধনু শিবগীর হাতে গহিবে কেন? সহস্র যে হয় নাই তার কাছে এতটা বীর্ণ আশা করাই চুরাশ।”

বাউলদের মধ্যে উচ্চ জাতির মানুষ বড় নাই। যদি বৈবাহিক কেহ আসেন তিনিও সকলের গুণে সমান হইয়া যান। ইহারা বলেন, “আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ কিছু নাই। নৌকার উপরের তক্তার চেয়ে নীচের তক্তার কি কিছু কম দৌরব?” একবার এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা গেল, “তোমরা শাস্ত্র মীনা না কেন?” বাউল বলিলেন, “আমরা কি কুকুর যে পুরাতন এঁটো পাতা চাটব?”

আমরা নবাই হুতা নি ভাই
যে আইসা পাত চাটি?

“দশর্ঘ সাধকের। নিজেদের ঐশ্বর্য মুক্ত ক’রে নহোংসব করেন। বেসব কাপুঙ্ঘের উংসব সৃষ্টি করবার মত শক্তি বীৰ্য সাহস নেই তাঁরা সাহস ক’রে উংসব সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁরা কেবল কুকুরের মত উদ্ভিষ্ট পাতা সংগ্রহ করে রাখেন ও তাই বিধিযত চাটেন। তাঁদের মধ্যে আবার ধারা বিধারা তাঁরা ভাবেন ভবিষ্যতে যদি আর মানবের মধ্যেংসব না হয় তাই তাঁরা এঁটো এই সব পাতা সংগ্রহ ক’রে ভবিষ্যৎ কালের জন্য বিরাট সঞ্চয় রেখে যান, তার নামই শাস্ত্র। এই দকম করেই এঁটো পাতা ফুড়িয়ে চার ভাগ করে হল চার বেদ। তেমনি করে পরবর্তী দীর্ঘকালের ছোট ছোট উংসব ফুড়িয়ে ফুড়িয়ে তাঁরা করলেন আঠারো ভাগে আঠারো পুরাণ। আজকার এইসব কুকুরনতি কাপুঙ্ঘেরাই সেই সব এঁটো পাতা চেটে চেটে পূর্বপুরুষদের নামে ধস্ত ধস্ত করেন—তবু মানবের নিত্য উংসব সৃষ্টি করবার মত সাহস এঁদের নেই।”

এমন মতিগতি ঠাহাদের তাঁহারা কি আবার ইতিহাসের দ্বার ধারিবেন? সে সব এঁটো পাতের নিল-অমিল তুলনা অগ্রপণ্ঠাং আলোচনা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

তবে ইহারা যে নাস্তিধর্মাত্মক সাধনায় নিজেদের ভাসাইয়া সেন নাই তার প্রধান প্রমাণ হইল ইহাদের অপূর্ব ভাবপ্রকাশ। নাস্তি বস্তুর প্রকাশ সূত্রেই না। ইহাদের গান রচনা জীবন সবই সূচনা করে ইহাদের নাস্তিধর্মাত্মক মূলকে। ‘নাই-বস্তু’কে স্থলর করিয়া দেখানো অসম্ভব। অন্ততঃ সে সৌন্দর্য স্থায়ী হয় না।

দাদু বলিয়াছেন,

হুই নহি কা নাই ন্যা মো বরিরে সে হুই।—সাত অন্ন, ১০০ গল

“কিছু নাই”—এই আবার নাম কি? তাহাকে যে নামই দিবে সে নামই নিখা।”

শাস্ত্র

বাউলদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁহাদের ধর্ম কত কালের—কোন ধর্মের পরে বা আগে? তবে তাঁহারা বলেন, “জগতের বস্তু ক্রিয় ধর্ম সে সব আগে বা পরে কালের শৃঙ্খলে উদ্ভূত। যে সব ধর্ম সহজ তাহা অল্পকাল বস্তুবস্ত, তাহা কালের শাসনের বাহিরে—‘অকাল’।” তাঁহাদের ধর্মও সহজ কিনা, তাই তাহা নিত্য কালের। তাহার আর আদি অন্ত নাই। তাঁহাদের মতে “পুরাণ স্মৃতি এমনকি বেদও ক্রিয়, সহজ ধর্ম আরও আগের।” এ কথাই মধ্যে একটু সত্য যে না আছে তাহা নয়।

বেদ

তাঁহাদের মধ্যে যে দুই-একজন বেদের নামমাত্র জানেন তাঁহারা বলেন—অন্ত যেসে কতিং সহজের কথা আছে। কিন্তু অধর্মে নাকি সহজের কথাই সব। তাঁরা বলেন, “বেদও নাকি বাউলের উল্লেখ

আছে— সেখানে বাউলদের নাম “নিবর্তিয়া” বা নিবর্তিয়া। তাঁহারা কিছু মানেন না অঞ্চল সহজ সত্য। পাইয়াছেন বলিয়া সর্ব চর্য্যচর, সকল মিক তাঁহাদের আয়ত্ত। বাগবত প্রভৃতির বাঁধন তাঁহাদের নাই। সহজের ঐশ্বর্যে তাঁহারা সর্বজগতের সঙ্গে যোগযুক্ত, তাঁহারা নিত্য সচল।”

অর্থ

এই লক্ষণযুক্ত অর্থের সেবিলান ত্রাতোর প্রেরণ আছে। পঞ্চমশ কাণ্ডে। তাহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্বায়ে আছে—

তাতা আশীং ইয়মান এব

ন এম্মাপতিঃ সৈবেরং ১—১৫, ১, ১

তাতা ছিলেন সমাসচল, তিনি প্রজ্ঞাপতিক্কেও সচল করিয়া তুলিলেন।

দ্বিতীয় পর্বায়ে আছে— তাতা চারিদিকে গমন করিলেন।

তৃতীয় পর্বায়ে আছে— তাতা এক বৎসর উড়ে পাড়াইয়া গহিলেন। সেবতারা কহিলেন, “হে তাতা, বসিবে না?”

ন সবেংসমুদ্রার্জিতং

কং বেগা অত্রবন্ তাতা কিং হু ভিত্তীতি ১ অর্থ, ১৫, ১, ১

তাতা কহিলেন, “বসিবার মত আসন বাঁধ-না!”

আশনীঃ মে সত্তরত্ব ইতি ১—১৫, ১৫, ১, ১

সেবতারা তাতাকে আসন দিলেন। সেই আসনের দুই চরণ হইল গ্রীষ্ম ও বসন্ত, ও আর-দুই চরণ হইল শরৎ ও বর্ষ।

তত্বা গ্রীষ্মক বসন্তক যৌ পাল্যুযাঃ

শরৎ চ বর্ষক যৌ ১—১৫, ১

তাতা তখন তাহাতে বসিলেন।

ষষ্ঠ পর্বায়ে আছে— তাতা সর্বদিকে চলিলেন। সবই তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পর্বায়ে আছে— তাতা শরৎ চকল নিরবলম্ব হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, সেই রস-উজ্জ্বল সেখানে তরঙ্গময় অপার অগাধ সমুদ্র হইয়া গহিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বায়ে আছে তাতা মানবের মধ্যে তখন চলিলেন— তাঁর সঙ্গে সত্য সন্নিতি, সেনা ও হুয়া সবই চলিল।

এই অর্থের বহু হেয়ালি আছে, সে সব ঠিক বাউলদের হেয়ালির মতই।

“যে মনোবী ত্রাষিৎ সেই জনই সম্পূর্ণ বাক্যকে জানে। সাধারণ মানুষ সেই বাক্যের অংশমাত্র ব্যবহার করে।”

তত্বা গ্রীষ্মক বসন্তক যৌ পাল্যুযাঃ

শরৎ চ বর্ষক যৌ ১—অর্থ, ১, ১৫, ১

“অগতের মধ্যে কি এক সভ্য নিহিত আছে যাহা না পাইয়া মন কিছুতেই আনন্দ পায় না, তাহাই খোঁজে মল লমাই প্রবহমান।”

কথ্য: বাস্তব সেমন্তি কথ্য: ম রূপে মন্য:।

কিমাণ: মত্যা শ্রেণ্যগৌরবগতি কবান:।—অর্থ, ১০, ৭, ৩৭

“বিশ্বরূপে বৃত্ত সপ্তরশ্মি কাল-অক্ষ লমাই ধাবমান। সকল ভুবন সকল লোক সেই রথেরই চক্র।”

কালো অগ্নি বহতি সপ্তরশ্মি।

তন্ত চক্রা ভুবনানি বিয়া:।—অর্থ, ১২, ৫৩, ১

“পূর্ণবস্ত্রপ হইতেই অগতের দ্য পূর্ণতা।”

পূর্ণাং পূর্ণি ট্যজতি।—অর্থ, ১০, ৮, ২২

অবশেষে দেখি (১১শ, ২য়), “বাহ্য উজ্জ্বল অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহা হইতেই অগতের সর্ব সমৃদ্ধি। সমস্ত সৃষ্টিই এই উজ্জ্বল হইতে।”

“ঋত, সভ্য, তপ, রাষ্ট্র শ্রম, ধর্ম, কর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বীর্য, লক্ষী, বল—সবই উজ্জ্বলের বলে।”

ঋত: সভ্য: তপো রাষ্ট্র: শ্রমো ধর্ম: কর্ম: ভূত: ভবিষ্যৎ: বীর্য: লক্ষী: বল:।—অর্থ, ১১, ২, ১৭

ভূতং ভবিষ্যৎ: বীর্যং লক্ষী: বল:।—অর্থ, ১১, ২, ১৭

“আনন্দ, মোহ প্রমোদ ও অভিযোম প্রভৃতি সবই উজ্জ্বল হইতে উদ্ভূত।”

আনন্দা মোহা: প্রমোদা অভিযোম:।

উজ্জ্বল: মজিরে সর্ব বিধি মেবা বিবিধিত:।—অর্থ, ১০, ২, ২৩

“এই মানব এক বিচিত্র মন্দির। এই মন্দির রচিত হইলে পর সেবাতা ইহাতে আশ্রয় করিয়া গহিলেন।”

গৃহ: কৃষা মর্ত্য: মেবা: পুরুষাবিকল:।—অর্থ ১১, ১০, ১৮

বাউলস্বরূপ বলেন, “সেহে পূর্ববীতর্য এবং সেই মহীতেই সর্বতর্য।” অর্থ বেসের ১২, ১ মহীসূক্তে মহীর অপার রহস্ত বৃত্তিবার চেষ্টা চমৎকার দেখা যায়। তাহা ছাড়া অর্থ বেসের ৫, ১; ৬, ১; ৮, ২—১৫; ২, ১৫; ২, ১৫ প্রভৃতি সূক্তের হেয়ালি ঠিক বাউলদের হেয়ালির মতই। ১০, ২, ১১, ১০ সূক্তে মানব-সেহ সূক্তে যে বর্ণনা আছে, তাহার সঙ্গেও বাউলদের বর্ণনার সঙ্গতি আছে। ১০, ৭ স্বস্ত সূক্ত, ১০, ৮ ও স্বস্ত সূক্ত। ১১, ৬ তে প্রাপ্তসূক্ত ১১, ২ সূক্তে উজ্জ্বলহিনা বর্ণন প্রভৃতি প্রকরণে বাউলদের অনেক সভ্য ধরিতে পারা যায়। প্রোহিত বর্ণনায় (অর্থ ১০, ঐতরেয় ৫য়), ত্রাতা বর্ণনায় (অর্থ ১৫), মহীসূক্তে (অর্থ ১২, ১) ও অস্তান্ত অনেকস্থলে বাউলপন্থীদের সঙ্গে বেসের বিস্তার সামঞ্জস্য ধরা পড়ে। পরেও এই অর্থ হইতে অনেক একতাবাস্তব বাস্তব পাওয়া যাইবে।

যে পুরুষে ব্রহ্ম নিহতে বিদ্ব: পরব্রহ্মিন:—১০, ৭, ১৭

অগ্ন: বা: পুণ্য: পৃথ্বীনি ধম তদায়:।—অর্থ, ১০, ৮, ৩৫

কোন মায়াতে জলের মধ্যে ফুটে এই পুন্স ? তাহার রহস্তই তোমার কাছে জানিতে চাই।

অটচক্র: নববারা মেবানা: পুরুষাণা:।

তন্তা: হিরণ্যক কোণ: বর্গ: স্যোতিবাত:।—অর্থ, ১০, ১, ২, ৩১

অষ্টচক্রা নবগায়। এই দেবতাদের অবোধা।পুরী। ইহাতেই আছে সেই হিরণ্য কোশ বাহা স্বর্গলোকে যায়, বাহা মোতিতে আবৃত।

তদ্বিন্দু পদ্মশাখ্যং তৎ ১৫ ব্রহ্মবিশো বিদ্যঃ ১—৩, ৩২

তাহাতে যে আত্মবান্ অপর জীব থাকে তাহার খবর ব্রহ্মবিশেরাই জানেন।

পুওরীকঃ নবায়ঃ প্রিতিভগোত্তরাত্মকঃ।

তদ্বিন্দু পদ্মশাখ্যং তৎ ১৬ ব্রহ্মবিশো বিদ্যঃ ১—৩, ৮, ৪০

নবগায়। এই পুওরীক, ত্রিগুণে আবৃত। ইহাতে বিদ্যামান অপর জীবের খবর ব্রহ্মবিশেরাই জানেন।

ইহঃ কলাগী ময়রা মর্ত্ত অদ্বতা গুহ্যঃ ১—১০, ৮, ২০

মর্ত্তের গৃহে এই কলাগী ময়রা অদ্বতা বিরাজমান।

সবাতনেনমাধকতাক্তাং পুনর্ব্বাঃ ১—১০, ৮, ২০

সবাই ইহা কেই বলেন সবাতন আত্ম ইনিই পুনর্ব্বা হউন।

অতি সত্যঃ ন মহ্যতি অতি সত্যঃ ন পতিতি ১—১০, ৮, ৩২

নিকটস্থ সত্যকে ছাড়িয়া ধরি গুনে না। বাইতে পারে তবে তাহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

উর্দ্ধঃ ভবঃ মুখকঃ কুঙ্কনবোহাঃ ১—১০, ৮, ৩৩

পশ্চি সর্বে চতুর্বা ন সর্বে মর্য্যা বিদ্যঃ ১—১০, ৮, ৩৩

ভল ডরিবার মত হুস্তে বিনি উর্ধ্বে মল ভরেন তাহাকে সকলে চক্ষু দিয়াই দেখে, নন দিহা তো চেনে না।

আবিঃ সখিহিতঃ ভয়া ১—১০, ৮, ৩৪

বাহা সমুখে বাহা প্রত্যক্ষ তাহার যৎসই যুগভীর।

অদ্বিত্যঃ চ ব্রহ্মাক পুরুষনি জাহ্বিতে।

সংস্রো ব্রহ্ম বাভাঃ ১—১০, ৮, ৩৪

এই ব্রহ্মবিশের মধ্যেই অদ্বত ও ব্রহ্মা সবাহিত। ইহারই নাজীতে গম্ভীর বহমান। ইত্যাদি

✓ বাউলরা বলেন, "নিত্যকালের অবিবর্ত্ত সহস্র মত হইতে বেলে এই সব সত্য গৃহীত হইয়াছে। এমনি ভাবে পূরণে তত্ত্ব ও সংকলতা এক-আখটুকু নেওয়া হইয়াছে। তা বলিয়া ইহা যেন কেহ না মনে করেন যে, আনন্ডা সেই সব স্থল হইতে ওগব সত্য গ্রহণ করিয়াছি। আনন্ডা তো মূর্খ। শাস্ত্র বা বেদের কি ধার আনন্ডা ধারি?"

ইহার বলুন, "বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি ষড়্গিরাও সেকালের সহস্র পদের সাধক ছিলেন। সহস্রসত্য যে সর্ব বেষে ছড়াইয়া আছে তাহা হইতেই সর্ব তত্ত্ব ও সর্ব সম্প্রদায়ে অনেক সত্য প্রবেশ করিয়াছে। চৈতন্য-মতে যেমনি নিত্যানন্দ আদিয়া যোগ দিলেন সেমনি তাহার সবে সহস্র পদের অনেক মতবাদও বৈষ্ণবদের মধ্যে আদি।" কারণ নিত্যানন্দ কোনো কোনো বিক দিহা সহস্র মতেরই লোক ছিলেন। এই নিত্যানন্দ-শাখার বীজপ্রাপ্ত কৃষ্ণবাসের চৈতন্যচরিতামৃত্তে এমন অনেক কথা আছে বাহা বাউলরাও সর্বদা ব্যবহার করেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বাউল ছিলেন। কৃষ্ণবাস গেলেন শাহাংগত বৈষ্ণব ভাব ব্যাখ্যা

করিতে, কিন্তু তাহার ভাবের মধ্যে যে সহস্র মত প্রবেশ করিয়াছে, তাই তিনি অনেক কথা বলিলেন বাহ্যিক বৈকল্যের কাছে আশা করা যায় না। পরে প্রসঙ্গক্রমে এই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতে হইবে।

মহা গোবর্ধ প্রভৃতি বৌদ্ধ, লঙ্কাত্রেয় রামানন্দ প্রভৃতি সাধক, কবীর রবিদাস দানু নানক প্রভৃতি ভক্ত এই সহস্র মত হইতে অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গস্থলে তাহা বলা যাইবে।

গুরু

সহস্রপট্টার শাস্ত্র মানেন না। তাই মাহুষের জীবনে যে সত্য উপলব্ধি হয় তাহা তাঁহাদের কাছে অতিশয় মূল্যবান। সত্যের দুই রূপ—জড় ও জীবন্ত। সত্য তাহার আপনার সত্যতে যখন বিরাজিত তখন তাহার কোনো মূল্য সাধারণের কাছে নাই। এই সত্যই যখন মাহুষের জীবনে সূত্রীত হইয়া জীবন্ত হয় তখন সেই জীবন্ত সত্যের মূল্যের আর অবধি নাই। ইহারা তুলনা। যেন—গাভী যেমন ভূণ খাইয়া দ্বুত ঘেহ, বৃক যেমন অখাত 'ভূ-রস' খাইয়া খাত ফল ঘেহ, সাধক তেমনি জড় সত্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলে। এই সত্যকে যিনি জীবনে জীবন্ত করিতে পারেন তিনি গুরু। শাস্ত্র মানেন না বলিয়াই ইহাদের কাছে গুরু এত মাত্র। সর্বকালের সর্বদেশের সত্য মাহুষের সাধনার মধ্য দিয়াই মানবের জীবনে প্রবেশ করে। যে সব মাহুষের জীবনে জীবন্ত হইয়া প্রাণহীন তত্ত্বগুলি সর্বসাধারণের অধিগম্য হয় তাহারাই গুরু। নহ্ম দিলে বা দীক্ষা দিলেই গুরু হয় না।

বাউলদের যতে গুরু হইলেন দূত কাল, শিল্প ভবিষ্যৎ কাল, দীক্ষা হইল বর্তমান, কারেই গুরুশিয়-সনাগমে ত্রিকালের স্থানগতি ঘটে।

✓ প্রত্যেক মাহুষের মধ্যেই তাহার সূর্য জ্যেদ আছে। সেখানে মাহুষও পশুর মতই খায়-পায় এবং কান-কোখানির বন্ধীত হয়। আবার মাহুষের সেই সঙ্গে চিত্তের জীবনও আছে। সেখানে মাহুষ সত্যকে পায়, সত্যকে সাধনা করে এবং সত্যকে বেধ। এখানে মাহুষ সেবহুলা। প্রতীপের যেনন মাটির পাত্র ও দীপ্ত শিখা দুইই আছে তেমনি মাহুষেরও পত্ৰ ও যৈব এই দুই স্বরূপই থাকে। গুরুও দুইটি স্বরূপ। এক চিত্তের শিবস্বরূপ ও অন্ত সূর্যের জীবস্বরূপ। শিত্তেরও এই দুই স্বরূপ। শিত্তের চিত্তের অংশ গুরুচিত্তের অংশের সঙ্গে যুক্ত হইলেই তবে সত্য দীক্ষা হয়। ✓ দীপ্ত প্রতীপের দীপ্তিহীন সূর্য অংশের সঙ্গে অদীপ্ত দীপের সূর্য অংশ যুক্ত হইলে কিছু হয় না। অদীপ্ত দীপের দীপ্য অংশটুকু গুরু দীপ্ত শিখার ধরিলে তবে শিখা জলে। তাই ভক্ত নারী কেমা বলিয়াছেন—

কোটি বরষ বরি হাকিয়ে চিং মেয়াড়ি যতপাস।

ভুল্য নহি এসদিয়ে জান তক্তি বিবাস।

চিং ছাড়িয়া স্তম্ভ-এর কাছে যদি কোটি বংসর ধরিয়া রাখ তবু জান-ভক্তি-বিবাস জীবনে প্রকাশিত হইবে না।

✓ গুরু যদি শিখা একবার জালাইয়া যেন তবে জীবনের তৈল অমনি উর্দগামী হইয়া বিদ্যু বিদ্যু রূপে সেই যোজিতে আন্দান করিতে থাকিবে। ইহাই বাউলদের যতে ধারাকে সহস্রভাবে উলটাইয়া বেওয়া, নহিলে এক-একটি বিদ্যু যদি চেটা করিয়া উপরে উঠাইতে হইত তবে কি আর উপায় ছিল ? ✓

মাদুর কড়া নানীমাতাও এই সভ্যটি বলিয়াছেন—

কৈলৈ নিব দীককা ক্রিষ্ট অক-বার উৰ' হু' ঘর ।

দীপ দ্বৈল তেল ছা' চৈৎ ভবনী তুল্য নগর ।

প্রথ, কেমন করিয়া শিব দীককে কর করিবে ? অযোগ্যদ্বী দারা উৰ্জগানী হইবে কেননে ? উত্তর, দীপ অগ্নিতে দোহন করিয়া তেল সহজেই উৰ্গে উঠে, বেহের তুল্য তেমনি সহজে নষ্ট হইবে! ধার ।

ইহাই হইল "সহজ"ভাবে ধারা উলটানো ।

✓ গুরুকে ভক্তি করিতে হয়, কারণ গুরুতে যদি গৌরব না থাকে তবে তাহার প্রভাবে শিষ্যের জীবন বনলায় না । অহরাণীদের ভক্তি মিথাই গুরুর এই গৌরব ।

বহু গুরু

✓ সাধারণতঃ আবারের বেশের সমাজে গুরু একজনই হন ; আশ্রিকদের মধ্যে গুরু শিকা ও দীক্ষা ভেদে দুই জন । তাহা ছাড়া পটল গুরুও আছেন । কিন্তু এক বা দুই জনে মন একান্ত বদ্ধ করিলে দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া পাইতে পারে । তাই ধারা এক গুরু বানেন তাহারও সংকীর্ণতা হারাতে না আসে তার ভক্ত নানা উপায় করিয়াছেন । ✓

প্রতি অকবাণীর পূর্বে দাদুর গুরু-নমস্কারটি এই—

দাদু নামো বিজ্ঞানঃ নমস্কার গুরুপেতাঃ ।

নমঃ সর্গসাধনাঃ নমস্কার পাঠনতঃ ।

প্রথম নমস্কার নিরন্তর পরত্নরূপে, তাহাকে বৃত্তিমায় উপায়যুক্ত গুরুকে তার পরে নমস্কার, কিন্তু সেই এক গুরুতে যদি সংকীর্ণ হইয়া যায় মন তাই সকল ভাবের সকল শাবকদের নমস্কার ; তবেই আমাদের নমস্কার সকল সীমায় পারে চলিয়া যায় ।

✓ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনিই আপনার গুরু ।"

আজ্ঞানো গুরুমহেশ্বর ।—ভাগবত, ১১, ৭, ২০

সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের বাণী, পৃথিবী বায়ু আকাশ জল অগ্নি চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি চন্দ্রিণজন গুরুই আছেন । ✓

এতে যে ভরসা রাখুন চতুর্বিংশতিশাখকঃ ।

✓ বাউলরা তাই বহু গুরু মানেন । চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রথমেই বন্দনায় দেখি "বন্দে গুরু"—গুরুত্বের নমস্কার করি । ✓ কৃষ্ণাঙ্গ, আশ্রমীনার প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর ছয় গুরুকে প্রণাম করিয়া কহিয়াছেন—

হর চক দিল্লাজর যে আবার ।

তাঁহার মতে ডগদানই—

শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যসে আশ্রমী দাবান—চৈতন্যচরিতামৃত, বদ্যপদ, ২০ পদিশ্রবণ,

এই সহস্র ভাব হইতেই তত্ত্ব লেখা হইয়াছে—

মধুসূতা বধা ক্লমঃ পুষ্পাং পুষ্পাংকঃ ক্লমঃ ।

জানমুহুরথা নিদ্রা জয়োত'ধ্বজঃ ক্লমঃ ।

—খটক বিরশং, ৪৪ চৌক টীকাহৃত বচন

ভূমি বেনন মধুসূত্রে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যায়, শিখাও তেমনি জানলোতে গুণ হইতে অস্ত গুণতে গমন করিবে ।

নিভাদীক্ষা

বাউলদের মতে বতদিন জীবন ততদিনই দীক্ষা চলিয়াছে, তাই কর্তৃত্বদ্বারা বলেন 'বোল আনা' দীক্ষা একদিনে হয় না । কখনো এক আনা, কখনো দুই আনা, কখনো চার আনা—এমনি করিয়া বহু কালে বোল আনা পূর্ণ হয় ।

একবার ময়সেব কেন্দ্রীক এক বাউল-মহোৎসবে গিয়া একটি বাউলকে আমার এক বন্ধু প্রণাম করেন, "তোমার গুরু কে ?" বাউল অবনি গাহিলেন—

ভর বলে কারে প্রণাম করবি মন ?

তোর অধিক গুরু পথিক গুরু ভর অদ্যব ।

কারে প্রণাম করবি মন ?

ভর যে তোর বরনভাশা, ভর যে তোর বরন-আলা,

ভর যে তোর মল্লভাষা, যে বস্ত্রায় হু মান ।

কারে প্রণাম করবি মন ?

তখন আমার বন্ধুটি ব্যর্থকাম হইয়া আবার প্রণাম করিলেন, "কবে তোমার দীক্ষা হইয়াছে ?" বাউল গাহিতে লাগিল—

বেদিন জনন বেদিন আদি দীক্ষা পেরেছি ।

এক অক্ষরের ময় মায়ে ভিক্ষা পেরেছি ।

দীক্ষা দিবা চলে না যে একটি প্রাণের বাস

এই কথাতে গভীর আমার রক্তে দিবাশ

(মায়ে) নীর পেরেছি ক্ষীর পেরেছি পরান পেরেছি

ভাতি সাথে সাথে মায়ে দিক্ষা পেরেছি ।

সকল বস্তুর কাছেই সকলের কাছেই বাউল তার জ্ঞান পায় । তাই বলিবে অসংখ্য অন্তরকে সম্বোধন করিয়া বাউল বলিতেছে—

কিঞ্চিৎ ময় ভর করি তোমার নববার !

দ্রবতে দ্রবতে বাও উপদ্রব, দিক্ষা তোমার নেতরা ভাৱ !

বলন বলে তোমার মেহ, তখন যদি গুণায় কেহ,

বল পারম হুখে আছি, দিক্ষা তোমার চমৎকার !

তুমি ভর পরমভর, কে তোমারে কর অ-ভর,

কেমনে বুঝবে বরম তোমার, ভরন দীক্ষা চমৎকার ।

সর্বত্র গুরু

গুরু যে জীবনে কোন্ পথে আলিবেন তাহারও ঠিক নাই, তাই সর্বদিকে ভক্তিতে তাঁহার স্তম্ভ প্রশংসা
প্রদিয়া বিতে হয়—

কেন্ বা পুত্র আল তক তোবার অত্ন নাহি পাই।

তাই তাইবা সখি প্রাণ আবার বাইবা দিব কোন্ বা টাই।

অন্তরে গুরু

গুরু আনন্দের অন্তরের নগোই আছেন— তাই নানা শাস্ত্র বাঁটিয়া সত্যকে খুঁজিতে গিয়া মত্ত হুল করি।
তার চেয়ে যদি সেই গুরুর বাণী অনিত্যম ভবে জ্ঞান অনেক সহজ হইত।

তর আপন পর বিগ্রহ করে গুরু জ্ঞানের হুল।

ধীন দুনিয়ার জ্ঞান গুণি। করি বস্তু হুল।

আনন্দের নিজের কোলাহলে গগণোলে মানরা সেই গুরুর শাস্ত্র বাণীকে জুঝাইয়া দিই। তাই জ্ঞান
আর সহজ হয় না—

অপাধ মত্ত কহে তক মানস চিত্তকমল।

ওয়ে পাশল কহিল বা গোল

সেবার আশ্রয়-বরা দ্যোতি কল।

তাই কবীরও বলিয়াছেন—

পরমাত্মন তক নিকট বিরামে

জাগ হাগ মন মোর।— কবীর ১, পৃ ২০

পরমাত্মা গুরু নিকটেই বিরাজমান— হে আমার মন জাগো জাগো।

কবীর বলেন, গুরু অন্তরেই আছেন, যেন কখনো দ্যোতির অভাবে বিশাহারা না হইতে হয়। কবীরের
তিনিই গুরু—

সো গুরু গীর হযার।— কবীর, পৃ ৩০

বাহ্য গুরুর বিপদ

বাহ্য গুরুরও যে প্রয়োজন আছে তাহারে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপকারের সঙ্গে সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনাও
বিস্তর। গুরু যদি শিষ্যের নিজ স্বত্বকে জাগ্রত না করিয়া তাঁহার স্বত্ব শিষ্যের উপর চাপান তবে শিষ্যকে
আধ্যাত্মিক ভাবে হত্যা করা হয়। দৈহিক হস্ত্যার চেহেও তাহা জ্ঞানক। কারণ, তাহা বাহির হইতে
অহমভব করা যায় না। অথচ তাহা একেবারে জীবনের মূলকে বিনাশ করে। তার পর সত্যাহীন বেহ
থাকারও কোনো অর্থ নাই। তাই বাউলরা বলেন, গুরু সঙ্গে প্রয়োজনমত দ্বন্দ্ব থাকা চাই। গুরু যেন
দীপ্তি যেন, তাপ ও চাপে যেন নষ্ট না করেন। তাই তাঁহারা বলেন—

হুয়ে হৈলা কলেন গীরা, দূর আয়সা হুয়ে।

কিনা তাগে চাপে তক কলেন সত্যপুরে।

ওক তাঁর আপন সত্যপুত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন দেন, ভারে পিষিয়া মারেন না। দীপ ও কূর্ষ অতি নিকটে আসিলেই বিপদ। ✓

হিন্দুস্থানী পাঠকরা বলেন পাখি নিম্ন ছানা পাখার তুলে পোষে, মাছ নিম্ন লইয়া ফিরিয়া ছানা পোষে, কূর্ষ দূর হইতে মাছ ধ্যানের দ্বারা ছানা পোষে। সংস্কৃত বোণশাহে ও নানা তরঙ্গ এ কথা আছে। বাউলরা বলেন—

পাখের তলে পোষে নইব, সাধে নইয়া মাছ।

দূরে পাইকা পোষে কাছিয়, নবজন্ম হইল আছে।

সংস্কৃত জ্ঞানেন কৃত দূরে থাকিলে শিক্তকে চাপিয়া না মারিয়া তাহাতে জীবন লগান করা হয়।

শূন্য

✓ বাউলদের মধ্যে তাই গুরুকে শূন্যও বলে। শূন্য "না-বস্তু" নয়। ইহা আমাদের জীবনের বিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক বিরাট মুক্তি। পাখের তলে বাটি জীবের পক্ষে প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মাখার উপরের অনন্ত শূন্য আকাশ। নালি মধ্যে জীবনহীন ঢোলা-পাখার থাকিতে পাখি কেবল একটুখানি অস্থিরকে জাগ্রত করিতে, প্রাণ ও চৈতন্য জাগ্রত রাখিতে মাখার উপর নিত্য এই অপার আকাশ চাই। এই অসীম শূন্যত। এত বড় "অস্তিত্ববাদ্যক" যে, পরব্রহ্মকে ইচ্ছার 'শূন্য' বলেন। ✓

সন্তোষা বলেন, শূন্য আকাশের নত গুরু নালি, সব বীজকে প্রাণে বিকশিত হইবার সহজ স্বাধীন অবকাশ দেন। শূন্য না হইলে গুরুর ভাবে শিথের সাধনা পিষিয়া মরিভ—

ভর আকাশ শূন্য বস।— ব্রহ্মবরী

দাদুও বলিয়াছেন—

এক গুণিতই তুমি হৈ নিরন্তর নিরাকার।

নূর ভেদে তই স্রোতি হৈ দাদু দেখন হার।— দাদু পণ্ডা, কোঁ অল ১০০

সেই এক শূন্যে বসে নিরাকার নিরন্তর এক বিরাগমান। সেখানে যে দীপ্তি যে ভেদ যে স্রোতি দাদু তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সহস্র ভবি যে স্রমি রহা জগৎ ভরাই সব ঠার।— দাদু পণ্ডা, অল ১০

সেই সহস্র শূন্যে বসে তত্ত্ব সর্গত পরমানন্দে বিহার চলিয়াছে।

ভক্ত হুম্মারদাসী শূন্য অর্থে পরমা শাস্তিকে বুঝিয়াছেন। যে শাস্তিতে ভক্ত প্রেমযোগে আপনাকে সমাহিত করেন (জানসমুদ্র ১২)।

✓ উৎসবে নৃত্যের মত একটি শূন্য প্রাঙ্গণ চাই। বাউলরা বলেন, স্থান ও কালের শূন্যতার মধ্যেই হইল প্রেমলীলার প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের মুক্তভূমি না থাকিলে লীলানৃত্যের উপভুক্ত অবকাশ থাকিত না। তাই প্রেমলীলার মত ভক্তের দ্বারে ভগবান একটি শূন্য রাখিয়াছেন। এখানেই বাহুব শূন্য। তার শূন্য ইচ্ছা শূন্য চিত্ত চৈতন্য আছে। ইহা যদি বন্ধ হইত তবে কিছুতেই ভগবানের সঙ্গে প্রেমের লীলাটি জীবন্ত হইতে পারিত না। ✓

✓ শূন্য আকাশ হইল জীবনের অসীম আধার, কায়ার আধার হইল নাট্য, চিরদ অধ্যাত্মজীবনের আধার হইল শূন্য। গুরু ও অধ্যাত্ম আধার বলিয়া তাহা শূন্যস্বরূপ হইতে হয়। মহিলে গুরু পিসিয়া মারিতেন—

শূন্য বস্ত্রপ ভর, পোষে কিন্তু শেষ না।

গুরু ও ব্রহ্ম থাকিতেন সাধকের ভিতর বাহির সর্বদিক সদা পূর্ণ করিয়া, শূন্য আকাশের নত। তাহা নিজকে একান্ত নিঃশব্দ ও নিঃশব্দ রাখিয়া সকল গুণ ও ঐশ্বর্য প্রকাশোচিত অবকাশ ও মুক্তি নিয়াছে সাধকের। তাই তাহা বায়ুর দ্বারা শক্তিময় স্রোতির দ্বারা বীজিন্য ও নয়, তাহা কেবল মুক্তিময় অবকাশময়। তাহা ভিতরে বাহিরে সর্বদা সথে সথে থাকিয়া কেবলই মুক্তি দিতেছে। গুরুর ইহাই হইল সবচেয়ে বড় লক্ষণ। কাহেই গুরুকে বাউলরা বলেন শূন্য। ব্রহ্মকেও বলেন শূন্য।

সাধকদের মধ্যে শূন্তেরও আবার নানা ভাবে পরিচয় আছে। গোবিন্দা মোগিনের মধ্যে শূন্তস্বরূপের বহু আছে। নধ্যাক্ষরিক হিন্দুধর্মী সাধকদের মধ্যে শূন্যনাথি নানা ভাবে আছে। স্বন্দরদাস তাঁহার জ্ঞানসমুদ্রে চারি প্রকার শূন্তের পরিচয় দিয়াছেন। বাউলরাও নানা ভাবে শূন্তের মহিম। প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মকে শূন্য বলিয়াছেন। গুরুকেও শূন্য। সমাধি ও নির্বাণও শূন্যময়। শূন্তের মধ্যে জীবন ও লীলা তাহারে আপন শূন্য অবকাশ ও হ্রোগে পায়।

অবশ্য তত্ত্বনিরূপণ এইরূপ হইলেও বাউলদের মধ্যে গুরুর প্রতি ভক্তি ও আহুগত্যা অতি গভীর।

[ক্রমশঃ]

আমার ডুবলো নদন রসের তিমিরে—
কল যে তার গুটালো দল আধারের তীরে।
গভীর কালোয় কুনাতে চলছে লহরী,
রসের লহরী।
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাশরী!
শাইয়ের বাশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পানদরি
ঘর ছাড়িয়ে।
ওখু কৈসে বসি— ভাগাই হুস্ত রসের নীরে।
আমার চোখ ডুবছে রসের তিমিরে!

—বাউল

টমাস মান্

জন্ম ৬ জুন ১৮৭৫ । মৃত্যু ১২ আগস্ট ১৯২৫

ঈশ্বরব্রত মুখোপাধ্যায়

টমাস মান্-এর মৃত্যুর সঙ্গে যুরোপের সাহিত্যে ক্লাসিক ঐতিহ্যের বোধ করি অবগান হল। আন্তরিক সাহিত্যিকার জীবনকে রূপ দেন, ডাক্তার দেন না। তিনি কর্মযোগী, একাগ্র শিল্পগাথার তুরায় লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো। অবকাশ তাঁর নেই। প্রাণের তাগিদ তাঁর কাছে অনেক বেশি অযোগ্য, দৃষ্টির আবেদন গৌণ। তাই যে অর্থে ভক্তগণ টলটল বা ছোবেদের, প্রেত, বা জীন্ শ্রষ্টা, সে অর্থে আন্তরিকের কোনো লেখককে মঠা বলা যায় কি না সম্ভব। টমাস মান্ সেই পুরোনো ধারার শেষ লোক। তাঁর লেখায় একটা সমগ্রতা, এমনকি একটা মহত্ব আছে, যা আধুনিক সাহিত্যে দুলভ।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে তাঁর 'ডেব্ টোড ইনভেনেডিশন্' (ডেনিয়েল মৃত্যু) গল্পটির কথা স্বতঃই মনে পড়বে। তার নাটক গুণ্ডাভ, কন্ আশেনবাখ-ও প্রচীণ রূপ লেখক, ফ্রেডরিখ, মি থ্রেইকে নিয়ে তাঁরও মহৎ শিল্প-দৃষ্টি। গল্পের শেষে যখন তাঁর মৃত্যু হল, 'তাকে ঘরে নিয়ে আসা হল। এবং সেইদিনই সমগ্রতায় বিখ্যিত রূপে তাঁর মৃত্যুসংবাদ গুনল।'

আর, ননাবিকারটাই বাব মিলে, তাইই সঙ্গে সেই মাহুঘটির সৌন্দর্য্যধার মতো মান্ কি নিজেদেরই প্রতিকূলিত করেন নি? যেখানে প্রসাধনচর্চিত তাঁর শিথিল ঠোট দুটি অর্থহীন মনের বিচিত্র যন্ত্র হৃদয়ময় অঙ্গের শব্দগুলি আঙড়াচ্ছিল—

"তবে যাঁহো ফেড্রা, একবার সৌন্দর্যই একাধারে স্বর্গীয় অর্থ দৃষ্টগোচর। তাই সৌন্দর্যই ইন্দ্রিয়বীর্য পথ। কিন্তু একথা কি তুমি মানো, বন্ধু, যে ইন্দ্রিয়ের পথে যারা আত্মকে পেতে চায়, তারা কখনো জ্ঞানের বা সত্য মানবিক বর্ধনার অধিকারী হতে পারে? না তুমি মনে করো যে এ পথ মধুর কিন্তু বিপজ্জনক—তুল পথ, গোবের পথ, মাহুঘকে বিপাহারা করতে বাধ্য। কারণ তুমি নিশ্চয় জানো যে, আমরা কবিতা সৌন্দর্যের পথে চলতে পারি না অনেকে সঙ্গে না নিয়ে, তাকে মারক না করে। আমাদের পথে আমরা বীর হতে পারি, দৃষ্ট বোঝা হতে পারি, কিন্তু তবুও আসলে আমরা রমণীয় মতো, কারণ হুবহুবেগই আমাদের উদ্ভীষ্ট করে, আর প্রেমই আমাদের চিরকালের স্থাননা—আমাদের আনন্দ আর অগৌরব। বুঝতে পারছ, নর কি, যে আমরা কবিতা জানী হতে পারি না? আমরা পথেরই হতে বাধ্য, স্বাভাবিক হতে বাধ্য, আবেগের পথে আমাদের দ্রুতগতির অভিমান? আমাদের নিপুণ ন্যাককার তবু মিথ্যা মৃত্যু ও ছলনা, আমাদের মান-ধন সব গ্রহণ, আমাদের উপরে জনগণের অগাধ আস্থা হস্তচর। শিল্পকলার মধ্য বিধে জনগণধারণকে, বিশেষ ভক্তগণের, শিক্ষাদান অভি বিপজ্জনক, তা বড় করে দেওয়া উচিত। কারণ অতল গল্পের বিকে দার স্বাভাবিক বোঝ, সে কী করে শিক্ষাদানের যোগ্য হবে? এ পিপাসাকে অধিকার করে আমরা নামের বিকে, জ্ঞানের বিকে হাত বাড়তে পারি, কিন্তু যে দিকেই যিবি, তার দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে। ধরা থাক, জানকে আমরা চাই না, কারণ শুধু জ্ঞানের মর্মান নেই, ফীড্রা ;



টমাস হান্

নেই কোনো শক্তি। সে সচেতন, সে বোধে, ক্রমা করে, কিন্তু তার স্ববদ্য নেই, নেই রূপ। গুরুত্বের প্রতি তার সহানুভূতি আছে, কারণ সেই তো অতল। তবে এসো তাকে গুঁড়ভাবে জাগ্রত করা যাক— এখন থেকে আমাদের সব চেঁচাই বিচার করা হবে কেবল সৌন্দর্য্যবস্তুর ক্ষমতা নিয়ে, স্বর্বাং সরলতা, মহিমা, রূপ, স্ববদ্য, আর নতুন এক স্পষ্টতা নিয়ে। কিন্তু রূপ আর স্পষ্টতা, মনে প্রেমে। কীভূত, নিয়ে যাবে মাদকতা ও কামনার দিকে, মধ্যস্থ নিয়ে যাবে করাল আবেগের দিকে— যে আবেগ আপন স্ববদ্য স্ববদ্যকে অন্যদিকে ছেড়ে যায়; নিয়ে যায় অতলের পানে, হ্যাঁ, সেই গুরুত্বের দিকেই টেনে নেয়। আর আমরা কবিতা সেইদিকে খেয়াল চান, কারণ আমরা নিরন্তর প্রতি হৃৎকল, অকাতরে গা জাপিয়ে দিয়ে যাই।— এখন তবে আনি চলি, কীভূত। তুমি থাকো। স্ববদ্য আমাদের আর বেঁধেতে পারে না তখন তুমিও বেঁধে।”

প্রেমের ভাবীতে যিনি শিল্পাধার এই নতুন ভাষা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই স্নানিকপণী। যে টমাস হান্ বিশ্বাস করতেন যে ‘শিল্পই আশা’, তার প্রথমতম গ্রন্থকার ছিলেন পাব্‌লো আর ভল্টের, গোটে, নীচের আর পোপের হাউস, এ সেই হান্। তাঁর হৃদয়ে ভগ্ন বোধ হয় তার শেষ গ্রন্থপত্রী সাহিত্য-সাধককে হারাণ, তার মধ্যে আছে (তাঁর নিবন্ধ ভাষায়) একটি ‘অস্বনিহিত চিরত’।

১০৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন জর্মানির লুবেক শহরে তাঁর জন্ম। বাবা জোহান্ন হাইনরিক্‌, হান্‌ গণ্যাত্ত নাগরিক ছিলেন, পেনেটের শুল্ক হয়েছিলেন, দু বার বৈয়গ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর না ছিলেন জর্মানিক-ক্রিষ্টাণ বংশের মধ্যে— রূপী, গুস্তরসিকা। মায়ে, কথা বলতে টমাস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন, বলেছেন কল্পনাগ্রন্থকতা। তাঁরা মায়ে কাছের পেয়েছেন। হুজো ভাই হাইনরিক্‌-এর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিলেন না টমাস। তার উপরে আবার ‘বদন্তের কড়’ নামে এক পত্রিকা প্রকাশ ক’রে— ‘পল টমাস’ ছদ্মনামে ‘বদ্য তার সম্পাদক— এক ভাতে গল্প কবিতা নাটক লিখে শিক্ষকের বিরোধভাজন হতে সময় লাগে নি।

১০৮০ সালে জোহান্ন হাইনরিক্‌-এর মৃত্যু হল। তাঁর পাত ভাইবোনকে নিয়ে যা লুবেক থেকে নিউনিখ শহরে বাসা বাঁধলেন। এ ভাতের ছবি তাঁর প্রথম উপন্যাসে কিছু কিছু আছে। কিছু পড়া-শুনো ক’রে টমাস বীমা-ব্যবসার স্বাগ্বে নামলেন। বেশদিন তা ভালো লাগল না। রোমে গিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখা লিখলেন। উপন্যাসখানির নাম দিলেন ‘বুন্ডেসকুন্ড’— একটি লসারের ইতিহাস। ১০৮১ সালে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হল। প্রকাশকের মতে বইখানি অতিক্রম হয়ে পড়েছিল। তাঁর ইচ্ছে ছিল লেখক বইখানিকে ছোট্ট অর্থের ক’রে বেন। হান্‌ সম্মত হন নি। ফলে মাত্র হাজার সংখ্যা ছাপা হল।

প্রথমে বইখানি সে বকন সাড়া মাগায় নি। কিন্তু শিল্পগিরই একটি মূলত সংস্করণ ছাপা হল এক বেঁধেতে বেঁধেতে বিক্রি হয়ে গেল— জর্মানিতে দশ লক্ষের উপর, হুয়োপের অন্তর্ভুক্ত লক্ষাধিক। সাধারণ বছর বয়সে টমাস হান্‌ সাধারণ হুয়োপে ব্যক্তিমান হলেন।

তার পর কিছুকাল ছোট্টা গয়ের চর্চা চলল। অনেকগুলি সার্বিক গল্প— ট্রিষ্টাইন (১০৮২), টোনিও ক্রোপার (১০৮৩) এবং সবচেয়ে স্বরস্বী ডেব্রোডাইন্‌ জেনেভিগ্‌ (১০৮২)। একবার তাকে প্রর করা হয়েছিল তাঁর প্রেত স্রষ্টা কোনটি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : ‘প্রেত ? আনি না। তবে ভেনিসে মৃত্যু

গল্পটী আবার সবচেয়ে পছন্দ ।' এ সময়ে একখানি নাটক 'কিংডেম্‌স্‌' (১২০২) এবং একখানি উপক্ৰান্তও 'কোনিগলিশে হোয়াইট্‌' (মহারানী, ১২০২) তিনি লেখেন ।

জীবনের ধারাও এগিয়ে চলে । ইহুদি এক অধ্যাপকের কন্যা কাটিয়া প্রিন্সাইম্‌কে বিয়ে করলেন, ছুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নিউনিখ্‌-এ সংসার পাড়লেন । বড়ো ছেলে ফ্রাউন্‌ আর বড়ো মেয়ে এরিকা-ও আশ্চর্য সাহিত্যিক ।

১২১৪ খ্রিস্টাব্দে কাইসারের সাত্তাভাব্য মরণ তুলল । অর্থানির পক্ষে সেদিন মান্‌-এর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল । তখনও তিনি নীট্টবে আর স্নায়ুনাথ্‌-এর সাক্ষাৎশিষ্ট—শক্তির পূজারী । সফ্রাট্‌ ফ্রেড্রিক্‌ দি গ্রেট্‌-এর মহাব্যোমবাণী ক'রে এক প্রবন্ধ তিনি লিখলেন এই সময়ে । আর 'বেট্টাখট্টংগেন্‌ আইনে উন্‌পলিটিশেন্‌' (একজন অ-স্বাধীনতার চিন্তাবলী) নামে আত্মজীবনীতে তাঁর রাজনৈতিক মত খুলে বলবার চেষ্টা করলেন—সবাই তা স্পষ্ট বুঝল না ।

দুইয়ের শেষদিকে তিনি লিখতে শুরু করলেন তাঁর প্রসিদ্ধতম উপক্ৰান্ত— 'ডেরংসডিবেরবের্গ্‌'— 'জাহ্‌পাহাড্‌' । রপস্ব্যত্ব দুরোপের পটভূমি । সুইৎসারল্যান্ডের ভাডন্‌-ব্রাউন্‌-এর একটি স্বাধীনবিলাস 'বের্গ্‌হুফ্‌' (শৈলাচল) । কণ্ণ নায়ক হাল্‌ কাষ্টপ্‌ সেখানে জীবনজিজ্ঞাসায় মগ্ন । তার মধ্যে মান্‌ নিজেকে খুঁজে পেলেন ; দূর সন্নিবেশ দিলেন :

'অনেক কিছু, যা একদিন আমি ভালোবেসেছিলাম— অনেক বিষম অনুরাগ, মোহ এবং আকর্ষণ তার প্রতি দুরোপের আত্মা লুপ্ত ছিল এবং আশ্রয় রয়েছে ।'

এইখান থেকেই তাঁর জীবনে মূল্য পরিবর্তন হল । নাটকের ভাষায় এইখানেই 'ফ্রাইমার্শ্‌' । বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগৎ, সমাজ আর ব্যক্তি, নৃতন আশোষ বিদ্রুত হয়ে দেখা দিল । জীবনে এবং সৃষ্টিকার্যে প্রকট হল একটা দ্বন্দ্ব । তাঁর সহস্রাভ্যাস আত্মবিশ্বাস ও মানবিকতাবোধ রুখে পাড়াল আত্মশব্দ তিনি যে শক্তির উপসর্গের দীক্ষা পেয়েছিলেন, তার বিকসে । "মারিও উট্‌, ডেরংসডিবের্গ্‌' (মারিও এবং জাহ্‌কর) কাহিনীটিতে তার প্রতিফলন ।

কর্মজীবনেও সেই একই সংঘাত সমান্তরাল হয়ে দেখা দিল । আডল্‌ফ্‌ হিটলার তাঁর নাৎসিবাদের তরল আশ্রয় ছাড়াতে লাগলেন । শান্ত মনে জের্মাণ্ডা আবার উদ্ভূত হল, মারগারেথ সজ্জিত হয়ে বিন গুনতে লাগল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের । শুরু হল ইহুদি-নির্গাভন । আইন্‌স্টাইন্‌ প্রথমে গুটীজার্মানী তার কবলে সঞ্চার হলেন ।

এবার মান্‌-এর কর্তৃত্ব অস্ত্র হার খনিত হল । 'মাইন্‌ কাম্পফ্‌'-এর আদর্শবৃত্ত বিলুপ্ত নিম্নের আদর্শকে তিনি অকুণ্ঠভাবে তুলে ধরলেন । এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দিলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং অগ্রদূত হাইন্‌রিখ্‌ ।

অর্থানি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান দিয়েছিলেন । কিন্তু সোনার শিকল তাঁকে ধাপড়ে পালে নি । ১২২২এর নোবেল পুরস্কারও অন্ততঃ সহজভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন । আর ১২৩৬এ ইহুদি-নির্গাভনের স্বতীর্থ সমালোচনা করলেন তাঁর 'নয়ৎসুইথেরংসাইট্টং' (নব জুরিবার সংবাদপত্র) প্রবন্ধে । মনে রাখতে হবে, ইহুদিদের নিয়েই তিনি এই সময়ে স্বদীর্ঘ উপক্ৰান্ত লিখছিলেন বাইবলের কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে ।

হিটলার এর উত্তর দিলেন মান্‌-এর বই পুড়িয়ে । ১২৩৭এ বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পূর্বে যে সম্মান দিয়েছিল তা কেড়ে নিল ।

অতি সংকট ভাষায় মান্ তার উত্তর দিলেন এক খোলা চিঠিতে— 'আইন্‌ ব্রীক্‌ওয়েথসে' (একটি পত্রালাপ)। নিজেকে তিনি খাটে। করেন নি। বড়োডাই হাইনরিখ্‌ও বোর নাথসিবিয়োই ছিলেন। তিনি যখন ছোটোডাইকে এক নাথসিবিয়োই সংকলনগ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করতে বললেন, টমাস্‌ কিন্তু রাহি হলেন না। তিনি লিখলেন :

'রাজনীতির চেয়ে বিজ্ঞ, সার্থক শিল্পসৃষ্টি দিয়ে সংস্কৃত জীবনের সেবা করাই আমার কাছে বেশি কার্য।'

অবশেষে তিনি স্বীকৃতি নিয়ে জর্বারি ছাড়লেন খেচ্ছায়। আর বেশি করলে প্রাণসংশয় হত। যুরোপ ও আমেরিকার নানা ভ্রমণায় বহুতা দিলেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে— 'বে মারায়ক চিকিৎসাধার। জীবন ও বুদ্ধিক, শির ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দেখে।' ১৯৩৮-এ আমেরিকায় 'গনতন্ত্রের আগর গ্নহ' নামে বক্তৃতা প্রদানে বললেন গনতন্ত্রটো সেই 'সমাজব্যবস্থা' যা আর সমার উপরে বাহুবের নীতি। সম্পর্কে সচেতন।'

সেই বছরেই আমেরিকাকে তিনি নূতন স্বরূপে বর্ণন করলেন। প্রথমে কিছুকাল নিউ জার্সির প্রিন্সটন্‌ শহরে বসবাস করেন, ওমানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, পরে সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টো মনিকায় উঠে যান। সেখানে লেখাপড়া ও সংস্কৃতচর্চায় দিন কাটাতে ভালোবাসতেন—বিশেষতঃ সংস্কৃতচর্চায়। ত্রান্‌ থেকে ট্রান্সিভি পর্বত বহু স্বরকারই তাঁর প্রিয় ছিলেন, তবে হ্যাগনারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি কোনদিনই।

১৯৩৩-এ ওল্ট্‌ টেটানবেরের জেকব্‌ আর রোসেন্‌কের কাহিনীকে তিনি উপক্ৰাসরূপ দিতে শুরু করেন। ১৯৪২ সালে চারটি স্বদীর্ঘ খণ্ডে এ উপক্ৰাস— 'জোসেফ্‌, উল্ট্‌, সুইনে জেরে' (জোসেফ্‌ ও তার ভাইদের) শেষ হয়। খুব আকর্ষণীয়ভাবে এর ঘটনা। ১৯২৬ সালে মিউনিখের এক চিকিৎসক রোসেন্‌কের গল্প অবলম্বনে কতকগুলি ছবি আঁকেন। মান্‌কে তিনি অস্বরোধ করেন এই ছবিগুলির একটি 'হুমিকা' লিখে বিতে। এর থেকেই গড়ে ওঠে সেই 'হাফাফা, যা আমার জীবনের' পরম সাধনা। হয়ে উঠেছে, যাতে তিনি অস্বত্বব করেছেন 'মাতুলিক ন্যাবিস্ত জীবনকে বহু পিছনে ফেলে আমার কাহিনীকে মানবচিত্তের অতল গহনে ন্যাবিস্তে দিতে কী মায়কতা!'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। তাঁর 'শটি ইন্‌ জ্বাইনার' উপক্ৰাস তখন সত্ত প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের এ উপক্ৰাস ঘুচ্ছে মধ্যে ও সুইই সমাদৃত হল, বিশেষতঃ ইংরেজ পাঠকসমূহে। স্তর হিউ ওয়ালপোল্‌ বইশানিকে সে বছরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে অভিহিত করলেন। সেই সনয়ে ভারতবর্ষের এক শোকপ্রস্রাবিত কাহিনী নিয়ে একটি ছোট্ট কথিকা লিখলেন মান্‌। আর বি. বি. সি. থেকে পঁচিশটি বেতার-বক্তৃতায় জর্বারিকে তার সর্বনাশের পথ সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করলেন। 'জয়েট্টেণে হোয়েরের' (জর্বারি শ্রোতা) নামে বক্তৃতাগুলি সংকলিত হয়েছে।

'হুৎ থান্‌গু।' ১৯৪৮-এ মান্‌ জর্বারির বৈরাচারকে কটাক ক'রে 'ওল্টর ফন্‌টাস্‌' লিখলেন। আর ১৯৫১ সালে তাঁর শেষ উপক্ৰাস বেয়োল 'পুণাপাপী'। ছিহান্তর বছর বয়সেও তাঁর বলম্বের হোর বে কবে নি তার পরিচয় পাওয়া গেল পোপ গ্রেনগিরি জীবনী অবলম্বনে লেখা এই উপক্ৰাসবানিতে। টেটিপুৎ-এর আখ্যানের সঙ্গে গ্রেনগিরি জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল। তাকে উপলক্ষ্য ক'রে মান্‌ সার্থক শিল্পসৃষ্টি করেছেন। বিঘড় সমালোচকরা তাঁর স্বচরিত্রীত্ব সন্দেহ বলেছেন: 'একালে এর চেয়ে সং গল্পভাষা আর লেখা হয় নি।' শেষ এবেও মান্‌ এ উক্তি সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

মান্ন-এর না শত্রু বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। ছেলের নাকি বিশ্বাস ছিল, তিনিও তাই যাবেন— ১৯৩১-এ। বেদান্ত দশ বছর বাড়িয়ে ১৯৪১ সালের ১২ আগস্ট ছুরিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মনোবিদ্ কার্ল য়ং যথার্থই বলেছেন যে 'প্রত্যেক শিল্পীই বিরোধী প্রকৃতির দ্বন্দ্ব অবধা সম্বন্ধে গঠিত।' একদিকে বিদ্ভূত জীবনের সীমা, অন্যদিকে বহির্বিষ থেকে আপনাকে সবলে দূরে সরিয়ে কেবলমাত্র স্বস্তির ব্যাকুলতা। এই বিখার বোলায় সমস্ত মহৎ শিল্পীকেই আন্দোলিত হতে হয়। যেমন টলস্টয়। শেষজীবনে যিনি শিল্পকে উপেক্ষা করে জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন।

মান্নও এর ব্যতিক্রম নন। প্রথম যুগে তিনি জীবনকে ছেড়ে শিল্পকেই বরণ করেছিলেন। আর শেষ-জীবনে সাধনা করেছেন দুয়ের সম্বন্ধে। তাঁর নিজের ভাষায় :

'আমার তরুণ বয়সে অগ্নি সম্বন্ধে একটা দুঃখবাসী এবং যোনাতিক দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাতে পরম্পরবিরোধী ছিল প্রাণ এবং আত্মা, ইন্দ্রিয়মুখিতা এবং মোক্ষ— তার থেকে শিল্পকলায় কতগুলো বেশ বোহম্যর আবেদন বেওয়া যায়— বোহম্যর, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগত নয়, সত্য নয়। অর্থাৎ এক কথায় আমি ছিলাম স্মার্তনারের শিক্ত। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ পরিণত বয়সের ফলে আমার অমুরাগ এবং আকর্ষণ উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত হয়েছে অনেক বৃহৎ ও বাতাবিক এক আদর্শের উপরে— গোটের আদর্শ, যার মধ্যে অস্পষ্ট সম্বন্ধ হয়েছে প্রতিভা এবং সংস্কার।'।

বোধ হয় এই কথাগুলির মধ্যে টমান্ন মান্ন-এর সমগ্র সাহিত্যজীবনের একটা বিকিনির্ঘ হবে। তাঁর প্রথম দিকের রচনার বিষয় হল 'স্নেরফাল্'— একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের চিত্রণ।— ইংরেজিতে বাকে বলে 'ডেকাডেন্স'। 'বুডেন্সক্' উপন্যাসখানি তারই উপায়ন— কী ক'রে একটা পরিবারে ধীরে ধীরে ভাঙন ধরল তারই ইতিহাস— যেমন গল্‌সওয়ার্দের 'ফর্সাইট' পরিবার, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'তিন পুরুষ'। তাই বুডেন্সক্ -এর আরম্ভে আমরা দেখি, সজ্জনতার যোশনাই ভরা ঘরে শাল। এনামেল রঙের পোকা। আর হলদে গদি— তার মাথায় সোনালি সিংহের মূর্তি। সেখানে আট বছরের ছোট্ট মেয়ে আনুটোনি রেশমি জক্ প'রে মায়ের কাছে ধর্মতত্ত্ব মুখস্থ বলছে : 'আমি বিশ্বাস করি যে মহান্ন ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন— দিয়েছেন জাতি আর জাতো, আর আর জল, ঘর আর বাড়ি, স্ত্রী আর সম্বান, কনি আর গোক'— আর বুড়ো ঠাকুরনা বোহান্ন বুডেন্সক্ হাসতে হাসতে নাতনিকে জুখোচ্ছেন তার কত জমি আর গোক আছে, এক বস্তা গমের গাম সে কত নেড়ে ? সবাই সে হাসিতে যোগ দিচ্ছে।

আর শেষে বেরতে পাই বেরাশ্লিশ বছর কেটে গেছে। ছোট্ট হানো টুইকয়েডে ভুগে মারা গেছে। সংসার বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গারিস্তোর ছাত্রা বিয়েছে। কেউ বা বাস ভুলে হলোও চলে বাচ্ছে—আর ঘরের এক কোণে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে আনু জপাউ টোনি হ'য়ে বসে আছে। 'তার গিছনে কঁলে আসা জীবনের বহু বড় কাপট। আর তার দুর্বল পাকবস্ত্র সম্বন্ধে তাকে পকাশ বছরের বুড়ির মতো বেবাজিল না। রুটো একটু ময়লা হয়েছে, আর টোটেব উপর দু-চারগাছি চুল— টোনি বুডেন্সক্‌কেই ইকটুকে টোটেব ভগায়। কিন্তু শোকের পোশাকের তলায় তার পরিপাটি ঝোঁপার একটু চুলও পাকে নি।'।

এ শুধু একটা পরিবারেরই কাহিনী নয়। শতাব্দীর শেষে সমগ্র প্রাচীন জর্মান 'কুলটুর'-এর সম্বন্ধ-সংগীত।

আর এই গুণগতির পটভূমিকায় শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নিবেদন মন-এর বিশ্লেষণ। টোনিও ক্রোগার গল্পটিই যদি ধরা যায়। হাম্, আর টোনিও— দুই বন্ধু দুই জাতের মানুষ। হাম্, স্বদেশী, কিছুটা বুল— আর টোনিও দুর্ভাগ্য, ভীক, শিল্পীমূলক হুম তার মনের প্রতিটি তন্ত্রী অল্পবয়সের জন্মে আত্ম। বাইরের পৃথিবী তার কাছে তাই নির্ভর, কঠিন, অস্বাভাবিক। তার দৃঢ় প্রত্যয় যে 'শিল্পী হবে অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক। যে দুহুর্থে সে বাহ্যিকের মতো অস্বাভাবিক করতে সক্ষম করবে, শিল্পী হিসেবে অমনি তার শেষ।' সে তাই বলে:

'আমি দুই অগতে পা দিয়ে থাকি যে আমি, কোনোটিতেই আমি পাই না, যেমন পাই বাহ্যিক বাহ্যিক। তোমার শিল্পীরা আমার বলে বুর্জোয়া, আর বুর্জোয়ার চাষ আমাকে বেঁধে রাখতে— আমি না কেন। আমার বেশি খারাপ লাগে। বুর্জোয়ার নিবেদন; কিন্তু তোমার স্বপ্নের উপাসকেরা বাহ্যিক আমাকে নিজেই বল, নিরুপস্থিত বল, তোমাদের বোঝা উচিত যে শিল্পী হওয়ার একটা পথ এত গভীর উৎসের নিকটে গেছে, আর সে পথ এমন দুর্বার যে অতি-সাধারণ বিষয়ে আনন্দ পেতে চাওয়ার থেকে বঞ্চিত। আর কোনো বাহ্যিক তার কাছে নেই।'

টোনিও ক্রোগার মন স্বপ্ন। আর তার যে স্বপ্ন— শিল্প আর জীবন এ দুয়ের মধ্যে বেছে নেওয়ার পদ্ধতি— তা মনকে বিচলিত করেছে বাহ্যিক বাহ্যিক। প্রথম গুণে স্বপ্নের শিল্প মন জীবনকে ত্যাগ করে কল্পনারেই বরণ করে নেবার পক্ষপাতী। তাই তার এ গুণের রচনার কিছু অস্বাভাবিকতা, কিছু বিবাদের আভাস। আর ফুটার ছায়া দেখানো গল্প— 'ভেনিসে বৃষ্টি' আর 'মাদ্রিদে বৃষ্টি' তার গুণের। একদিকে বিশ্বব্যাপী গুণের আভাস, আর-একদিকে ভাস্কর্য-মানুষ-এর স্বাধীনভাবে মুহূর্তের ভিত্তি— যেখানে 'স্বাভাবিকের শক্তিও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই তার রোগকে অতিক্রম করে ওঠবার; সে সারা পৃথিবীকে দেখে ঐ রোগের চিহ্ন আর প্রতিবিম্ব রূপে।'

কিন্তু এই গুণ-উপত্যকা থেকে শেষ পর্যন্ত মন বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন, যেমন করে তার মারিও জাহ্নকের ভীষণ মাথা থেকে নিজেই মুক্ত হয়েছিল। আবার আলোর মধ্যে এসে তিনি দেখা করলেন পূর্বজার, সামন্তের। স্বপ্নের পথ ছেড়ে গেলেন পোটেমেক।

এই পরিচয় জোসেফের কাহিনীতে। যে জোসেফ, 'উপেক্ষা' স্বপ্নের, নিয়ে অতলের কল্যাণস্বপ্নে পূর্ণ। পিতা জেফের তাই পূর্বকে আশীর্বাদ করল সে নিশাপ হোক এই কামনার নয়, সে অপাণবিত্ত এই গ্রন্থে বিবাসে।

'মাছের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ— আমি যেমন পূর্ণা ভেমন পূর্ণা হও; এ আদেশ মাছের মধ্যে সেবতার মঙ্গলকায় মনে নিচ্ছে। এর প্রকৃত অর্থ— তোমার মধ্যে আমাকে পবিত্র হতে দাও, নিজেও তত্ব হও। জ্বর কঠিন সেবতার যুগ থেকে পরমকালিক ঈশ্বরের যে বিবর্তন, মাছেরও ঠিক তাই। মানববংশের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তার সত্য মর্যাদা লাভ করেন।'

এ কথা পিতা জেফের চেয়ে পূর্ব জোসেফ, গভীরতরভাবে বুঝেছিল। তাই তার তাইয়েরা যখন তাকে যাবত যথেষ্ট দিয়ে গেল, নিজের ছাংয়ের কথা তার মনে এল না, নিজের মুক্তি উপায়ই তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিল না। সে তখন আরও হ্রস্ব চিন্তায় মগ্ন ছিল, ভাবছিল তার আকস্মিক পতনের কথা, তার অতীত কালের কথা, হয়তো সেগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটেছিল, জ্বর তার। কথ গুরুতর, কথ দুঃখসাধ্য হয় নি।' তাই এই ধারণা থেকে কিয়ে বাবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করল— বৃত্তাকে বরণ করতে তার ভয় হল

না, কারণ সে বৃকেছিল মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়—‘পাখি আঁর অপাখিদের ডের তার কাছে আঁর রইল না, মৃত্যুর যন্ত্রণা রুপিতে সে দুইয়ের মিলন দেখতে পেল। খাদ অতলগভীর; আঁর পুরোনো জীবনে কিরে দাবার আঁরা হুঁপপাহাত। অন্তরিত সন্ধ্যাতারার আঁর উল্লের মতো, ছায়াগ্রস্ত চাঁদের আঁর পূর্ণ হবার নতো অগস্তব এ কল্পনা। কিন্তু এই উষ্মান্তের মধ্যেই তো আঁর আঁকিডাবের, নব আলোক-পাতের, পূর্ণরঙ্গের চিত্তা নিহিত আছে! এই কথা ডেবই জোগেজের আঁরা ধত্ত হল।’

টোনি ফোগার বা জ্যাক্ কাস্টপের মতো ছোঁসেককে দিয়েও মান্ আপন অন্তরের কথাই বলিয়েছেন। ‘আঁর বিখাস’ প্রবন্ধে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

‘এই আঁর আঁর্ষ মাহু। যেখানেই চিত্তার ও ব্যক্তিরের মনতে আঁমি এই আঁর্পের প্রকাশ দেখতে পাই—আলো, জাঁদারের, মন ও অহুত্বের, আঁমি ও সংস্কৃতির, জাঁদের এবং আঁনের এই মিল দেখতে পাই—সেখানেই আঁর অন্তরত্ব ডক্তি, সেখানেই আঁর জ্বর তার নীড় খুঁজে পাথ। খুঁলে বলি—কোনো রোনাস্টিক স্বেচ্ছতা, কোনো পালিগধরা বর্বরতার কথা আঁমি বলছি না। চাই প্রকৃতির দবার্ পন্নিবার্ণন, চাই সংস্কৃতি; চাই শিল্পী মাহু; চাই আঁকোপলঙ্কির কট্টন পথের বিশারী হিসেবে শিল্পকে।’

তাই শেষ পর্যন্ত এই জ্বর শিল্পরঙের প্রভাব ছিল যে ভবিষ্যতে সুদিন আসবে, যেদিন শিল্প কেবল অন্ধপ্রকৃতির উৎগিরণ হবে না—বুদ্ধির শুভ্র আলোয় স্নিহ হবে। হবে প্রাণ এবং আঁতার মধ্যে সৌচুত্ব।

স্বীকৃতি

এই সংখ্যায় মুদ্রিত ঐযুক্ত নন্দলাল বহু অমিত চূর্ণাচিত্রের রক আঁকডেমি অব ফাইন আর্ট-এর পৌরুতে প্রাপ্ত; মূল চিত্র কলিকাতা রাজডবনে রক্ষিত। সেবতাস্তা হিমালয় চিত্রের রক শাস্ত্রনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ও কলিকাতা সরকারী শিল্পবাহিগালয়-মহুত আচাৰ্ নন্দলাল বহু মহাশয়ের চিত্রপ্রাণনীর্ আরকগ্রহ হইতে গৃহীত। ‘কলকাতার বর্গ’ ঐযুগিল গুণ্ড প্রকাশিত Woodcuts পুত্কে প্রকাশিত।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রমেন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ স্ফূর্তি ও প্রেরণায় কলাভবনে শিল্পশিক্ষা দ্বন্দ্ব পূর্ণোদ্ভবনে চলছে সেই সময়ে রমেন্দ্রনাথ আনাথের সঙ্গে ছাত্ররূপে এখানে ছিলেন। তখন আশ্রমে শাস্ত্রীত নৃত্য নাটক কবিতাপাঠ আর নানা ঋতু-উৎসবের বিয়াম ছিল না। বারো বাদে তের পার্বণ চলতেই থাকত তখন। এই সব উৎসবে ও অভিনয়াদিতে রমেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উৎসাহী শিল্পী। তিনি আমাদের খেতে সাহায্য করতেন এই সব কাশে। সেই সময়ের এই আবহাওয়ার মধ্যে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রমেনের শিল্পশিক্ষা হয়। পঞ্চাশের, আশ্রমের চতুর্নিকের শিল্পাহুলা নবোদয় পরিবেশ সহজেই উৎকৃষ্ট শিল্পী গড়ে ওঠার সহায় হয়েছিল। আশ্রমের বহু বৃক্ষ ও ফলাফলের গাছ সব সময় ফুলে পরবে শোভায় গড়ে ভরে থাকবে। আর আশ্রমের বাইরে সুবৃষিভূমি প্রান্তর ও লাল কাঁকরের খোঁড়াই, আর কিছু দূরে ছোট নদী কোপাই।

কলকাতা থেকে আসবার পর এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রমেন্দ্র ক্রমশঃ নিসর্গচিত্রাশ্রমের দিকে ঝুঁকছিলেন। পরেও বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিশেষতঃ শান্তিনিকেতনের দৃশ্যই তাঁর অধরের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। বরীনাথ ষাণ্ডার পথে তিনি হিমালয়ের দৃশ্য অনেক এঁকেছিলেন। সেই সময় আনাথের আশ্রমে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ একজন কলাী মহিলা এসে প্রবর্তিত করলেন। রমেন বিশেষ উৎসাহে কাঠ-খোদাইয়ের আনন্দ স্বাস্থ্য করেছিলেন। পরে দেখা গেল, নানা রকম কারুকার্যেও তাঁর বিশেষ প্রীতি। যুগের বিলেত থেকে লিথো শিখে এসেন। তাঁরই কাছে লিথোগ্রাফিও শিখি নিয়েছিলেন; লিথোতে অনেক ছবিও তিনি করেছেন। এর পরে রমেন যখন বিলেতে যান দেখান থেকে তিনি এচিঙের বিদ্যাও ভালো করে শিখে আসেন। ছবি আঁকা ছাড়া তিনি অনেক ক্রাফটসও আয়ত্ত করেছিলেন।

গুরুদেব তাঁর গান কবিতা ও নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সব গুণ সব মনের কথা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর রচনায় যৌনী প্রকৃতি মূগ্ধ হয়ে উঠেছে। এমন কোনো নিসর্গচিত্র নেই যা রবীন্দ্রনাথের রচনা পাওয়া যায় না। মানবচিন্তার পরিপূর্ণ 'ভাব' সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। ফলে আমাদের আধুনিক জীবনের আরম্ভ ও উন্নয়ন রচনা থেকেই পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎবাসীরও এই সম্পদের অধিকার নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। কবিগুরু এই সব অমূল্য সম্পদ এখানে সমাধৃত হওয়াতে শান্তিনিকেতনে ধারাই আসবেন তাঁরই ভারতবর্ষের পুরাতন ভাববাহ্যের সজ্জিত সম্পদ, নানা প্রদেশের সংস্কৃতি ও ভারতের সঙ্গে বিশেষ সংস্কৃতির মিলন, সব্বেরই পরিচয় সহজেই পেতে পারেন। এই আশ্রমে ধারা আসেন তাঁরা সহজেই এখানে শাখা ভারতবর্ষের চেহারা দেখতে পান। বহু বিংশ শতাব্দীর—এই বহু শাবক এখানে। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক চিন্তাবাহিনী বহির্ভূত ভাবের ভিতর দিয়ে আধারা এখানকার সকলেই সব সময় পেয়ে এসেছি। গুরুদেব তো শুধু নৃত্য গান অভিনয় দেখান নি, অধ্যাত্মচিন্তার ধারাও প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ভাষায়, গানে ও নাটকে।

এই পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিলেন রমেন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন কলাভবনের একজন কৃতী ছাত্র হয়েছিলেন। তাঁর এগানকার শিক্ষা সফল হয়েছিল। তিনি যে-সকল স্থানে গিয়েছিলেন এগানকার শিক্ষার বিশেষত্ব ও গৌরব বহন করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অকালে চলে যাওয়ায় আশ্রয়ের গুরুত্বের প্রচারের এই বকলম্বর প্রচেষ্টা অসময়ে ব্যাহত হয়ে গেল।

সেই সময় ছাত্র দ্বার! এসেছিলেন তাঁর। ও অধ্যাপকেরা মিলে গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একমন একপ্রাণ হয়েছিলেন। গুরুদেব উপরে থেকে বে আমাদের চালনা করেছেন তা নয়। সকলেই আমরা এক আদর্শে গড়ে উঠছিলাম; একই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও ধরন ছিল সকলের। তাতে তখন কাজও বুঝে ভালো ভাবে চলেছিল। তখন সফল হয়েছিল কাজের ভিত্তি। তখনকার কাজ কোনো কঠোরপন্থের ভাগিদে হত না। নিজেই ইচ্ছাতেই আমরা সবাই কাজ করতাম। নিজেরাই প্রস্তুত করতাম কাজ করতে করতে সমন্বয়যোগ্য নিয়মপত্র।

গুরুশিষ্যে সন্তান ও সহায়ত্বভূতি, পরম্পরের সুখে দুঃখে সহযোগিতা, সেবা-ভক্তিয়া এ-সবই স্বভাবসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ ছিল; আর আপসে বিপদে ছাত্রেরা সব সময় প্রাণপণে কাজ করত। স্বাভাবিকতার গুণে সে একটা মহাপ্রতি গড়ে উঠেছিল। তখন অবশ্য ছাত্রসংখ্যা কম থাকায় এটা সহজ হয়েছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে কর্তব্যের পরিধির প্রসার হওয়ায় সকলে এক সঙ্গে মিলে-বিশে কাজ করার অনুবিধা হয়েছে। পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও দ্রুততাও কমে আগছে বলে আশঙ্ক। হয়। এই অবস্থায় পূর্বের নতুন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে কিরূপে কাজ করা ক্ষেত্রে পারে সেটা বিশেষ চিন্তার বিষয়।

শিক্ষকরূপে রমেন্দ্রনাথের কাজের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আজ কেবলই মনে হয়, কলাভবনে ছাত্ররূপে রমেন যখন শ্রুতান্তের সঙ্গে ছিলেন, তখন শিক্ষক ও ছাত্রেরা মিলে শিল্প বিষয়ে আলোচনা ক'রে, এক ঘোটে কাজ ক'রে, নানা স্থান থেকে আগত শিল্পী ও কাকশিল্পীদের সাহচর্যে, আমরা কী আনন্দই না উপভোগ করেছি। এমনভাবে মিলে-বিশে তখন এক ঘোটে কাজ করেছি যে, আজ বুঝে উঠতে পারছি নে কে কাকে কতটা শিখিয়েছি। গুরুশিষ্য অনেক সময় এক সঙ্গে শিল্পচর্চা করেছিলেন বলে ছাত্রদের শেখানোতে আর নিজেদের শেখায় কারো কোনো বিয় বা পরিশ্রম হয় নি; শেখানো ও শেখাটা আধাগোড়াই ছিল একটা খেলায় মগ্ন। কে কাকে শিখিয়েছে, কখন কে শিখেছে, অনেক সময় আমরা টেরও পাই নি।

রমেন্দ্রনাথ কত বড় শিল্পী ছিলেন, আগামী কালের শিল্পরঙ্গিক ও শিল্পদর্শনালোচকেরা তার বিচার করবেন। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের কলাভবনে থেকে গুরুশিষ্য এক সঙ্গে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিল্পশিক্ষায় যে রস পেরেছি বাইরের কেউ তার বর পাবেন না। সে আনন্দ লিখেও বোঝানো যাবে না।

শ্রীমঙ্গলাল বসু



গুরুপ্রণাম

ব্যক্তিনিকেতন আশ্রমিত সংঘ কর্তৃক আচার্য নন্দলাল বসুকে অর্থালান-অঙ্কঠান, পৌষ ১৩৬০। বসেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই অহুসানে অঙ্কঠান প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সংঘ কর্তৃক অহুসিত আচার্য নন্দলালের চিত্রপ্রদর্শনী বসেন্দ্রনাথের পরিচালনায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

কোটো : শ্রীধরেন্দ্র দিহ। মানসবাণীর পত্রিকা



বনেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কোঠা : শ্রীধরেন্দ্র সিংহ । আনন্দবাজার পত্রিকা

রমেন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা

শিল্পী রমেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। যার সঙ্গে পরমাছায়েঁর বড় এককাল কেটেছে তাঁর সম্বন্ধে নিরাসক্ত নির্বিকার মনে কোনো আলোচনা করা অত্যন্ত দুঃস্থ।

ছাত্র-অবস্থা থেকেই রমেন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা বীকৃত হয়েছিল। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষত তাঁকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি। রমেন্দ্রনাথের ভ্রম নব্যভাবাপন্ন সংস্কারপ্রবণ অতি-আধুনিক সনাতনের বাইরে, দেশের দূরপ্রান্তে; পণ্ডিত পিতার একাগ্রতা ও জ্ঞানসমূহ্যর মধ্যে নিষ্ঠাবান্ ত্রাশ্বণ-পদ্বিবারের ব্রত-পার্বণ ও শুচিতার মধ্যে তিনি বাসো ও কৈশোরে লালিতপালিত, এইসকল তাঁর প্রথম-জীবনের মানসিক গঠনের প্রধান উপাদান বলা যেতে পারে। আধুনিক শহরবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে এখন যা চূর্ণত সেই পরিবেশই তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তাঁর শিল্পদৃষ্টিও এই বিশেষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত। শিল্পের বিষয়বস্তু, ব্যক্তিগত নন্দন-আদর্শের গতি-প্রকৃতি, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, কোনো বিষয়েই রমেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে শহরবাসী শিল্পী হয়ে ওঠেন নি। পূর্বোক্ত সহজাত বুদ্ধি ও শ্রেয়ণা তাঁকে বতস্বর চালনা করেছে ততই তাঁর শিল্পকৃষ্টি সার্থক ও সত্য হয়েছে।



গোয়ামনি

"Habu and Gabu" (1928) ব্রহ্ম হরিভট

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রমেন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষায় গোড়াপত্তন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে, পরে তাঁর শিক্ষা শান্তিনিকেতনে কলাভবনে। অধ্যাপক ছাত্ররূপে আচার্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রমেন্দ্রনাথের বিলম্ব হয় নি। শিল্পী-জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান অধ্যবসায়, কিন্তু শিল্পের সাধনার সিদ্ধিলাভের জ্ঞান আরও প্রয়োজন শিল্প-প্রেরণার। রমেন্দ্রনাথের জীবনে সে প্রেরণা যে ভীষণভাবেই বর্তমান তা সর্বসন্দেহে প্রকাশিত হল একটি তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করে।

১৯২১-২২ সালের কাছাকাছি কোনো-এক সময়ে কলাভবনের আচার্যের ছাত্রদের নিয়ে কোনো উৎসব উপলক্ষে কলকাতার গিয়েছেন; উৎসব থেকে বঞ্চিত বেঙ্গ-একটি ছাত্র আছেন তাঁরা কলাভবনের হাবুর-

চৌকি-ছড়ানো শূন্য ঘরে অবকাশ যাপন করছেন। সেই সময় রমেন্দ্রনাথ একটি ছোট্টো ছবি শুরু করলেন— ছবির বিষয়, একটি বেয়ে ভোতাপাখিকে নানাপানি দিচ্ছে। সম্ভবতঃ কাল পরে আচার্যেরা ফিরে এলেন উৎসব শেষ করে, রমেন্দ্রনাথের ছবিও তখন শেষ হয়েছে। আচার্যেরা ছবি দেখে বিমিত্ত হলেন— একজন অর্ধাচীন ছাত্র এমন ছবি আঁকল কী করে!



জিয়ারার রামা

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"পাণ্ডুরে বীরর রান্ধাস" (১৯০৪) এর ছবিতে

জীবনে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। নানান কার্পেলেস্ কার্খোনাই ছবিতে পারদর্শিনি; রমেন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর শিল্প গ্রহণ করলেন, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুরু-শিল্পের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে গেল। আঙ্গিকের দক্ষতা, বিদ্যককরকে কার্খোনাইয়ের বৈশিষ্ট্য অমুখ্যারী আঁকতে পারা, এই-সব বিষয়ে রমেন্দ্রনাথের দক্ষতা শিক্ষার্থীর দীনা ছাড়িয়ে উঠল অতি দ্রুত। এর পর রমেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনা 'গ্রাফিক আর্টস্' বা ছাপের ছবির ক্ষেত্রে।

প্রথম-জীবনে রমেন্দ্রনাথের অন্তরের আকর্ষণ ছিল জাপানী শিল্পী হোকুসাই-এর প্রতি। হোকুসাই-এর অসাধারণ পর্বেক্ষণ-দক্ষতা এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও শিল্পীজীবন ধাঁড়িয়ে রাখার মতো অম্মা প্রাণশক্তিতে রমেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ইংরেজ শিল্পী ম্যুরহেড বোন্স-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য, হোকুসাই বা ম্যুরহেড বোন্স-এর শিল্পদর্শন অপেক্ষা, এই দুই জনের কর্মফল জীবনই মূলতঃ রমেন্দ্রনাথকে অহুপ্রাণিত করেছিল—এই অহুপ্রেরণা জীবনে দৃঢ় করে তুলতে রমেন্দ্রনাথ আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন।

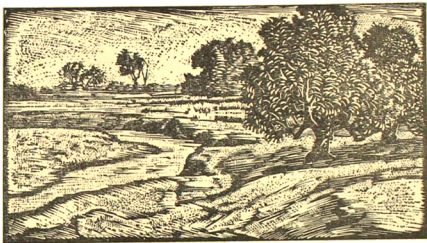
অর্ধাচীন ছাত্র এমন ছবি আঁকল কী করে! মোগল-সংস্কৃতির স্ববিস্তার, রাজপুত ছবির যথাযথ, এ-সকল শিক্ষা পায় হয়ে রমেন্দ্রনাথ নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার 'ভাষা'ই বা পেলেন কী করে! রমেন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে এই-যে নূতন চেতনা, পরে বাইরের প্রাণসংসার তা বিকল্প হতে পারে নি।

এর পর থেকে রমেন্দ্রনাথ ধারাবাহিক ভাবে যে-সব ছবি আঁকলেন তার বিষয়বস্তু ও ভাষা সবই ঘরোয়া, একান্তভাবেই তা। রমেন্দ্রনাথের আপন স্বপ্ন—গ্রামের বাম্বার, মুদির সোফান, গ্রামের পুকুর ইত্যাদি ছবি, যেখানে মোগল-রাজপুতের কোনো প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত ভালো-লাগাকে আড়ষ্ট করতে পারে নি। বলা যেতে পারে, আধুনিক কালে ও এদেশে রমেন্দ্রনাথের ছবি genre-চিহ্নের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শাস্তিনিকেতনে ঘরানী মহিলা-শিল্পী আয়ে কার্পেলেস্-এর আগমন রমেন্দ্রনাথের শিল্পী-

কতকবার বিশেষবরণের স্বযোগে রমেন্দ্রনাথ 'গ্রাফিক আর্টস্' বিশেষ করে এটিং-এর আঙ্গিক, পুখুপুখু ভাবে আয়ত্ত করেন। এশিয়ার মধ্যে তাঁর মতো ওস্তাদ এটিং-এর কারিগর দু-একজনের বেশি পাওয়া যাবে না।

রমেন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কোথায়, সে-স্বত্বে বাংলা দেশ হুতট। সচেতন, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রদেশ ততটা নয়। তেলরঙে আঁকা ছবির বাহ্যে তিনি অন্তর প্রদেশে পরিচিত—ছাপের ছবির প্রবর্তন,



কাঠোবাঘি

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রচার ও পরিণতির সঙ্গে রমেন্দ্রনাথ কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এ ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য দান যে অল্প লোকেরই আছে, অন্য প্রদেশে এ সম্পর্কে ব্যোচিত প্রত্যক্ষ পরিচয় বা বীজতি নেই।

এ স্বত্বে শেষ জীবনে তাঁর মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে করা কতকগুলি কাঠোবাঘি দেখে। অনেকগুলি অসমাপ্ত তৈলচিত্র-ছড়ানো ষ্টুডিয়োতে বসে রমেন্দ্রনাথ বিক্ষিপ্ত মনকে স্বহাসে কিরিয়ে আনবার জন্য এগুলিতে মন দেব—সেই তাঁর অতীতের বৈশা, অতি ঘনিষ্ঠভাবে জেনা পরীজীবনের দৃষ্ট। এই শেষ দিকের এন্ড্রেজিঙপিতে রমেন্দ্রনাথ যেন মৃত্যু করে নিজেইকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কিছুকাল ধরে কেবলই উভ-এন্ড্রেজিঙ করবার। সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি, কিন্তু তাঁর এই শেষ ইচ্ছা মানতে পেরেছিলাম। তিনি মৃতি খুঁজেছিলেন তাঁর চিরদিনের পরিচিত সাধনার ক্ষেত্রে।

রমেন্দ্রনাথের অসংখ্য স্কেচ, খগড়া, স্টাডিজ ও সেই সঙ্গে তাঁর অগণিত ছাপের ছবির বহি পর্গোলোচনা করা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে তাঁর কালের ঐতিহাসিক মূল্য, শিল্পী হিসাবে তাঁর অতুলনীয় সার্থকতা।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চিত্রগ্রন্থাবলী

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র বাংলা ও ইংরেজী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে। কাঠখোদাই, এঁচি প্রভৃতি 'ছাপের ছবি' দিয়ে তিনি কয়েকখানি চিত্রসংগ্রহ এবং গ্রন্থও সংকলন করে গেছেন, বীচে তার তালিকা দেওয়া গেল।



বাহকি

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"পাথুরে বাদর রানদাস" (১৯০৪) গ্রন্থ হইতে

WOODCUTS। ঐশ্বর্য চক্রবর্তীর ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক ঐশ্বর্য গুপ্ত।

আঠাশখানি ছবি আছে—পাঁচখানি রঙিন কাঠখোদাইর এঁজিলিপি।

রমেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পুস্তক চিত্রিত করেছিলেন—তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঐশ্বর্যসিতকুমার হালদার প্রণীত 'পাথুরে বাদর রানদাস'; প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অনুদিত 'মেঘদূত', 'প্রথম সংস্করণ; ম্যাকমিলান-প্রকাশিত [ঐতিহ্যমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত] Tales of India series-এর কয়েকটি বই।

বিষভারতী গ্রন্থবিভাগ সর্বদা তার কাছ থেকে অল্পই সাহায্য পেয়েছেন—বিশ্ববিজ্ঞান-গ্রন্থ গ্রন্থালায় ও রবীন্দ্রনাথের গল্পের গ্রন্থের মলাট-চিত্র রমেন্দ্রনাথের কৃত—এই পত্রিকার কাঠখোদাই মলাটটিও তাঁরই স্বত্ব বহন করছে। রমেন্দ্রনাথের ছবি উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যে দুটি কবিতা ('বরষ' ও 'দ্বাত্রা') লিখেছিলেন, ছবি দুটি সহ তা 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। তারই একখানি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

WOODCUTS। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক ঐতিহ্যমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ১৯৩১

শিল্পের নিম্নের হাতে ছাপা ও স্বাক্ষরিত ছবিখানি original print দিয়ে এই চিত্রসংগ্রহে এঁকিত।

এর কিছুকাল পরে তিনি বারোখানি অসংখ্য ছাইপয়েন্ট প্রিন্ট, এবং দশখানি রঙিন কাঠখোদাই ছবি দিয়ে ছবিখানি চিত্রসংগ্রহে প্রকাশ করেছিলেন।

CALL OF THE HIMALAYAS। প্রকাশক ঐশ্বর্য সাহা, কলিকাতা। ১৯৩৩?

১৯২৩ সালে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করতে যান, সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে ও পটচিত্রখানি উচ্চ-এনগ্রেভিং চিত্রে তা এই গ্রন্থে বর্ণিত।

SKETCHES OF EUROPE BEFORE THE WAR। ঐশ্বর্য কেশোর ভূমিকা-সংবলিত।

প্রকাশক লংমানস্, গ্রীন অ্যান্ড কোং। ১৯৪৪।

লণ্ডন, অ্যামস্টার্ডাম, প্যারিস প্রভৃতির সাতাশখানি স্থানচিত্র।

স্বরলিপি

বাংলায় স্রুত বে-সকল বাংলা গান সবীজনাথকে শেষজীবন পর্যন্ত আবিষ্কৃত করিয়াছে বর্তমান গানটি তাহার অন্ততন—
তাহার রচনায় বদ্যায় এই গানটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা “রামচন্দ্র বসু। হাবড়ার নিকটবর্তী
শালিখা ইহার জন্মভূমি। ১১২৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাকাল হইতেই ইহার লকীতরচনায় অহুযোগ,—
পাঠশালা বসিয়া কলাপাতে গান লিখিতেন,— আর কেলিয়া দিতেন। একদিন কবি ওয়াল ভবানী এইরূপ কয়েকটি গান
কুড়াইয়া পান,— গান পড়িয়া রামচন্দ্র কবিত্বশক্তি বৃদ্ধিতে পারেন। সেই সময় হইতে রাম বসু, ভবানী বেণের দলে গান
বাধিয়া দিতে আরম্ভ করেন। শেষে নিজেই কবির দল করেন। ১২৩৬ সালে ৪২ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।
বিরহের সর্বাঙ্গীণ স্থপরিপাটী ভাব-বর্ণনাঃ রাম বসুই অনেকের নতে অধিষ্ঠার।” —‘বঙ্গভাষার লেখক’ (১৩১১)

নিম্নে সনগ্র গানের স্বরলিপি দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন সংকলনগ্রন্থে গানটির বহু পরিভেদ দেখা যায়— স্বরলিপিকর্ত্তা
ইহার ঘেরপ পাঠের সহিত পরিচিত তাহাই স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হইল।

মনে রইল, মই, মনের বেদনা।

প্রবাসে যখন যায় গো সে

তারে বলি বলি আর বলা হল না ॥

যখন হাসি হাসি সে আসি বলে

তার হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে—

তারে মন চায় রাখিতে, প্রাণ চায় সঙ্গে যেতে,

লক্ষ্য বলে ছিছি ছুঁয়ো না ॥

কথা : রাম বসু

স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

মা পাঃ -দপঃ II { ^১পা -। ^২জা। -রা মা -পা I সা ^৩জা -। জমা -পা মা I
ম নে র ই ল ম ই ম নে ব্ বে

I পা I (-। -। -দপা I -দপমা -জা -। মা পা -দপা),
না ম নে

জা মা I পা
প্র বা সে

পণা দপা I
দ থন

মা -গা পা । মা -১ -পমা I -গা -১ -১ । -১ গা মা I
 যা -য্ গো সে তা রে

I না । সী সী -রী I না -সী সী -না । দা পা -দপা I
 লি ব লি ব লি . .

I মা -পা জা । জমা -পা -দপা I -মপমা -জা -১ । মা পাঃ -দপঃ II
 হ . ল না "ম নে" . .

II [মা গা গা । মা মা পমা I গা গা পা । মা পাঃ পধঃ I
 য থন্ হা লি হা শি . সে আ লি ব লে তাহ

I মা যা পা । পা পা ধপা I মা গমা -পধপা । মা গা (-১) } I পধা I
 হা লি সে যে তা লি . ন য জ লে তারে

I { পধা -নরী সী । সীঃ সীঃ সী I নরী -রী সী । সীঃ সীঃ সীঃ সী } I
 ন চা হা বি তে প্রা চা গ পে যেতে .

I ধরী সীনা নরীনা । ধন^১পা মপমগা I গমপা -১ -দপা । -মপমা -জা মপা II II
 লজ্জাব লে ছি ছি ছি ছি "মনে"



ଶ୍ରୀମତୀବିଜୟାବତୀ

ସଦ୍ୱା ୧୨ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୬

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাব-চৈত্র ১৩৬২

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

কল্যাণীয়াহ,

না, তোমরা আসতে পারবে না শুনেই আমি ঠিক করেছিলুম নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে তোমাকে একখানি পত্র লিখব। ইতিমধ্যে আর তোমার স্তি পেয়ে বড় খুশি হলাম।

তোমাকে আমি অতি অল্পকালই ভেবেছি কিন্তু এমন যতাবতই তোমার প্রতি আমার গভীর স্নেহ রয়েছে যে তোমার মঙ্গলসাধনের বিশেষ অধিকার আমি লাভ করেছি বলে আমার মনে হয়। তাই আমি আর সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তোমাকে নববর্ষের আশীর্বাদ প্রেরণ করছি।

তোমার মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তার একটা মূল্য আছে জানবে। যে সত্যকে আমরা স্বার্থ পাই তাকে সহজে পাইনে। তোমার অন্তঃকরণ সত্যের পিণাহ বলেই সত্যকে সম্পূর্ণ চিনে নেবার ক্ষমতা তোমার মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা রয়েছে। সত্যের প্রয়োজনবোধ ঘাসের মধ্যে প্রবল নয় তারা কাঁ-তাঁকে গভীর বলে অন্যায়ের গ্রহণ করে— কিন্তু সে তাদের স্বার্থ কোনো ক্ষতি লাগে না।

এই ক্ষমতাই যে কোনো বড় জিনিষকে আমরা সত্যরূপে পাই তাকে বেদনার মধ্যে নিয়ে পাই— বেদনার মূল্য না দিয়ে তাকে আমাদের আপনায় করতে পারিনে। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে সেই মূল্য নিচ্ছেন, এর পরিবর্তে তিনি তোমাকে শূন্যতা দিয়ে ভোলাবেন না।

সেখ, না, এই যে অগ্নি সংসারকে আমরা দেখছি জানছি, একে ত আমরা Reason দিয়ে দেখছি-জানি। আমাদের চোখ যদি সহজে না দেখে, কান যদি সহজে না শুনে, তাহলে কোনো ক্ষুদ্র দ্বারা আমাদের কেউ কিছু দেখাতে শোনাতে পারত না। ভাল করে যদি ভেবে দেখ তাহলে জানতে পারবে যা আমাদের দেখার অতীত তাকেই আমরা আমাদের চোখ দিয়ে অতি অন্যায়সেই দেখতে পাচ্ছি। তোমরা ত Science পড়— তোমরা ত মান আশ্রয় পরমাণুসহ সহজে যে সকল সত্য ঠাড়িয়েছে তাতে বস্তুর বস্ত্ব আর থাকে না— শেষকালে রূপহীন শক্তিতে গিয়ে সমস্ত পৌছ— সে যে কি তা ত আমরা কল্পনা করতে পারিনে। কিন্তু সেই কল্পনার অতীত শক্তির দীপাই ত আমাদের চোখে এমন করে ধরা দিয়েছে যে সে নিত্য আনন্দের সান্নিধ্য হয়ে পড়েছে। বস্ত্ব Reason দিয়ে যদি আমাদের বিচার করতে হত

তাহলে আমার বাইরে যে কিছুই আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না— কিন্তু আমরা বলি আমার সামনে যে বস্তু আছে সে reason-এর দ্বারা জানব কি— সে ও আমার বোধের দ্বারাই জানি।

যেমন আমাদের দৃষ্টিবোধের দ্বারা দেখবার জিনিষকে জানি নইলে কোনোমতেই জানতে পারতুম না তেমনি ঈশ্বরকেও আমাদের আত্মার সহস্র বোধের দ্বারাই জানতে পারি তর্ক করে কোনোমতেই জানা সম্ভব নয়। রিট জিনিষ যে মিষ্ট তাও তুমি reason-এর দ্বারা জানতে পার না রসনার দ্বারাই জান— পরমাশ্বাই যে আমার আত্মার ধন সেও আমরা আত্মার ভিতর থেকেই জানতে পারি তর্কদ্বারা পারিনি।

এই এককে, সত্যকে, আনন্দকে সমস্তের মধ্যে ধারা অনায়াসেই দেখতে পান তাঁদের সেই অধ্যাত্মবোধ উন্মোচিত হয়েছে। তাঁরাই মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চস্থানে দাঁড়িয়েছেন— আমাদের দৃষ্টির অভাব থাকলেও আমরা তাঁদের দেখার ভিতর থেকে অনেকটা দেখতে পাই। সেই ধারা পরম সত্যকে সকল সত্যের মধ্যে পরম জ্ঞানকে সকল জ্ঞানের মধ্যে, পরম প্রেমকে সকল প্রেমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন— ধারা জগতের সমস্তকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থহীন করে দেখছেন না, সমস্তকে আচ্ছাদ্য পরিপূর্ণতার মধ্যে দেখছেন তাঁরাই কি ঠেকেছেন? আর আমরা যখন অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে হাফড়ে বেড়াচ্ছি, হাতে বন বেটা ঠেকে সেইটেকেই খও খও করে দেখছি, আলোর অভাবে সমস্তকে একেবারে এক করে দেখতে পাচ্ছি— আমরাই কি ঠিক দেখা দেখছি?

না, না, Reasonকে দিয়ে হাফড়ে বেড়ালে ষড়কেই পাবে— কিন্তু তোমার যে আত্মা অতি সহজেই বিনা তর্কে তোমার এক দিনের সঙ্গে আর এক দিনকে গাঁথচে, তোমার এক জ্ঞানের সঙ্গে আর এক জ্ঞানকে যোজন করচে, তোমার অন্তরের সঙ্গে বাহ্যিককে, তোমার দূরের সঙ্গে নিকটকে অহিনিশ সমগ্রভাবে এক করে তুলচে বলেই জগৎ তোমার কাছে জগৎ হয়েছে, এবং তুমি আপনি তোমার নানার মধ্যে তোমাকে এক বলে জানচু সেই আত্মাকে প্রসারিত করে ধর তাহলেই সর্বত্রই আত্মার পরমাত্মার পরমাশ্বাকে সকল সত্যের অন্তরতম সত্য বলে সহজে জানবে।

চিঠিতে তোমাকে বেশী লেখবার সময় নেই। আশা করি মাঝে মাঝে বন তোমার সঙ্গে দেখা হবে আলোচনার অবসর হবে।

আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ করি নববর্ষ তোমার নবজীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ বহন করে আবির্ভূত হোক। তুমি দৃষ্টি লাভ কর, বল লাভ কর, আনন্দ লাভ কর— তোমার সংসারবুদ্ধিকার অন্তরালে ধীর চিরদীপ্তি অমানভাবে বিরাম করতে থাকে তুমি তোমার ক্ষমতার মধ্যে এবং জগতের মধ্যে প্রত্যেক দর্শন করে থাও হও। তোমার হৃদয়ের পবিত্র জীবনটিকে এখনো স্ফুটন বস্ত আপনাতে আপনি আবৃত হয়ে আছে— নববর্ষে ঈশ্বরের জ্যোতিতে তার আবরণ দূর হয়ে যাক, তুমি তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে সংসারকে বধূম্ব করে বিরাম করতে থাক। তোমার চিত্তহীন যে তাঁরই পূজার সামগ্রী, তিনি নিজেই প্রত্যেক প্রস্তুতি করে নিজের হাতেই একদিন তাকে শুদ্ধরূপে গ্রহণ করবেন তাতে মনের মধ্যে লেগেবাক সংসার রেখা না। নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস রেখো— জীবনের সার্বক পরিণামের উপর বিশ্বাস রেখো— এবং এই সার্বকতার পথে যিনি তোমাকে সকল সংসারের মধ্য দিয়ে চালনা করছেন তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখো।

[বৈশাখ ১৩১৮]

একান্ত ভক্তাকাজী

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

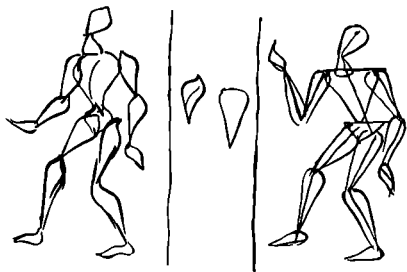
কল্যাণীয়াহ

মা, আজ জের তিনটের সময় উঠে আমি বাইরে বসে ছিলাম। তখন আকাশের এক প্রান্তে গুও একটি চাদের বেধা; তারই অনতিদূরে একটি উজ্জল তারা জল্ জল্ করছিল। পূর্বদিকে কালো জটাপকানো মেঘ জমে ছিল। অন্ধকারের তলে তলে আলোর একটি লাগবা ছুটে ছুটে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়তে লাগল। আমার স্থিরদৃষ্টির উপরে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। জগৎ জুড়ে আমাদের চারিদিকে এই যে সব প্রকাত ব্যাপার চলেছে— ঘর মধ্যে অনায়াসে আমরা ঘুমুড়ি এবং জাগুটি— তার মধ্যকার অনির্বচনীয় একটি বিপুল সৌন্দর্য্যবিকাশকে আজ আলো এবং অন্ধকারের দাক্ষ্যানুজিতে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়ে আমার সমস্ত অস্তঃকরণ অভ্যন্ত একটি নিম্ন নির্ঝল আনন্ডে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজকের প্রভাত আমার উপরে আশ্চর্য্যদ্রুপে অবতরণ করেছিল।

তারপরে সকাল বেলায় কাকের প্রয়োজনে বাহিরে চলে গিয়েছিলুম, নানা কথাবার্তায় ভোরবেলাকার বাগীচ চাপা পড়ে গিয়েছিল। এমন সময় বাড়ি ফিরে এসে দেখি কি অজস্র মাধুর্য্যরাশি আমার ঘরের আকাশ এবং বাতাসকে মিষ্ট করে তুলে আমার ক্ষন্তে অপেক্ষা করে রয়েছে। তোমার ফুলগুলি পেয়ে আমার সেই ভোররাত্রির অবাচিত আনন্দ উপহারটির কথা আমার মনে জেগে উঠল। তোমার এই স্ফুটপূর্ণ ফুলের দান আমার কাছে সেই উপর থেকে অভাবনীয় আশ্চর্য্যদের নতই এসে পৌঁছেছে। আমার অন্তরের আশ্চর্য্যদ্রুপে আমি তোমার কাছে এমন স্বপ্ন করে পাঠাতে পারলুম না কিন্তু আমার সর্বাঙ্গঃকরণের শুভ কানন্য এর মধ্যে প্রাক্কর রয়েছে। ইতি এই তার ১৩১৮

সত্যজ্যোতী
শ্রীযুক্তনাথ ঠাকুর

জন্মের মতো, পঁচের মতো, পাতনের মতো পেন্সিল



ছবির ছড়া

শ্রীমঙ্গলাল বসু

এগুলি ছড়া, কবিতা নয় বা রসাত্মক বাক্য নয়। নির্দোষ উপমা অলংকার ছন্দ কেউ আশা করবেন না। তবে, শিল্পীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে পূর্বগামী শৃঙ্গীর্ণত্বেরও, সোচ্চার-সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে— যদি কখনো কারও কাছে লাগে। কিছু হরতো পূর্বপ্রচলিত 'বচন'-ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে, বলা যায় না। বিষয়টি এমন যে, ছড়া-কার অনুকোষ। নৃতনত্বের কোনো-প্রকার দাবিদাওয়া রাখেন না।

গড়নের ছড়া

পিঠ ঠুঁটা, পেট ধস্যা—
গড়নের এই ভাষা।
সিধা সাধা নথর বা
চুই ক'রে ভাঙে তা।
পিঠ গাট পাক্তাছুঁয়া^১
তারে তবে ঘম-বুঁয়া^২।
গদার মতো, শাঁপের মতো,
পাখনার মতো পেন্সি
আঁকে তো ভাই বর্সি।
উঠ হুঁ ঘোড়া^৩
ভিন আঁকার সারা
ঠার-ঠোর ভর-ভাবনা
রাগবেষের ভরী
আঁকে তো ভাই লরী।
ওঠা-পড়ার ভরী মেলা,
নাচা চলা কথা-বলা—
কোনু ঘোড়ালের কেন্দন খেলা
নধন মেলে তাব্-রে ভোলা,
আঁক্ রে ভোলা।

১ পাকানো। পেন্সিবিদ্রি।

২ পূর্বপ্রচলিত পার্যাক্তর :—

হু হুঁ ঘোড়া

ভিন পিয়ার সোড়া।

রঙের ছড়া

তিন হল মূল রঙ আর তিন বিশাল,
তারই মধ্যে মূল বরন হলো নীল লাল ॥
মিত্ রঙ সবুজ বেগুনি আর কমলা
মূল রঙের মাঝে থেকে দিটার ঝামেলা ॥
হলদি আর লাল মিলে কমলা মনোহর,
নীল হলুদের যোগে হল সবুজ বতস্তর ॥
লালে আর নীলে মিশে উপজে বেগুনি—
কোন্ রঙের কত বিশাল নিজে বুন গুণী ॥

মিত্ রঙ নারী নয় মিলেও না খেলে
কোলে কাঁখে বাঁধা রঙ একটু না পেলে—
হাসি-খুশি ছেলে ॥

একা একটি রঙ
তার নাই যে কোনো চঙ,
সে বেড়ায় ঘন সঙ ॥

কেবল কালোর ঝাঁকন ভালো,
নানা ভাবে পর্যা* তোলা—
জীব্য হাতের গুণেই বীণা বাজবে ভালো ॥

পাটকিলে—
কালো রঙ, নীল রঙ, লাল রঙ মিলে ॥
তুলনা তার তেঁতুল-বাঁটি আবুশোলা আর গিলে ॥
ধূসর বরনে মেলে কালো আর সাধা—
হুলে-বাঁটি তুলনা, কুলো না গাপা ॥
সবুজ ঘাসে অরুণ আভা বলে,
ধূপছায়া রঙ তারেই বলে ॥

০ মিত্, রঙ : সন্ধ্যারী রঙ বা দিও বর্ণ ॥

বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে, পরস্পর সম্পর্কের বিবেচনায়, সন্ধ্যারী, বাঁধা, বিবাহী, উগ্রবিবাহী এরূপ নানা পর্যায়ে ভাগ করা চলে ॥

১ মূষ বা গুরের বৈচিত্র্য ॥ অত্ পক্ষ, ঘবির টোন্ ॥



বিবাহী ৪৬

সাম্না-সাম্নি মূল রঙ সবাই ঠোকে ভাল
সবুজ* দেখে রুখে হঠাৎ চোখ রাঙায় লাল* ।
লাল নীলের আড়া-আড়ি না বললেও চলে ।
হলধে দেখেই বেগুনি বে তেলে-বেগুনে ছলে ।
অপরাক্রান্ত রাঙা-জবা সবুজ-বিষদলে
পুঁজ, ও ভাই, জামা মায়ের বাতুল পদতলে ।

উপবিবাহী

কুঁচের কালো দেখে
আড়িচোখে লাল
রেগেই আরও লাল ।
আঁধার রাতের দাবানল দেখিতে জ্বাল ।

সদ্যবাহী

বেগের বৃকে বকের মালায়, •
নীল আকাশ আর মেঘে,
জুড়ারে দেয় চোখের জালা—
কুমরে রয় লেগে ।
কালার বাধা স্বর্ণধটা
রাখায় নীলাবরী—
মৃগল রূপের কী শোভা, তার
বালাই লয়েই মরি ।

কবি বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমখণ্ড বিশেষ

শলীকচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, লেখকের প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু গৃহিণীপনা থাকি আবশ্যিক। এই গৃহিণীপনার অভাবে প্রতিভা যথোচিত ফল ফলাইতে পারে না, কিম্বা যে ফল ফলিয়াছে তাহাও খাড়াইয়া গুচ্ছাইয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারে না। এই গৃহিণীপনা থাকিলে কেবল একটিনাত্র রচনার জোরেও লেখক টিকিয়া থাকে, যেমন ফিট্‌জেরাল্ড ওয়র-থৈরামের অস্থবাসের জোরে টিকিয়া আছেন। আবার এই গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক লেখক তলাইয়া যান। যেমন ওয়েলশ ল্যান্ডের, এসেলে রবীন্দ্রনাথের মতে শলীকচন্দ্র। আমরা সেই সঙ্গে তাঁহার অগ্রজ বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে পারি।

✓ বিজেন্দ্রনাথের সমালোচক-ভাগ্য অশানান্ত। তৎকৃত নেবনুতের পঙ্খাবস্থায় পড়িয়া যদুন্দন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।^১ আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যুগ্মবর্ণনা সমালোচক ছিলেন, অথবা প্রশংসা করিবার শোক তিনি ছিলেন না; তিনিও যন্ত্রপ্রমাণ কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।^২ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থতিতে যন্ত্রপ্রমাণের ভূমণ্ডী প্রশংসা করিয়াছেন। এ সব ছাড়া আরো তিনটি রচনা আমার চোখে পড়িয়াছে।^৩ কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত, সান্নাৎ কম এক শতাব্দী, প্রায় তিন প্রজন্মকাল বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব ঘটে নাই। নাইকেল ভাড়া আর সকলেই তাঁহার যন্ত্রপ্রমাণের ওয়াহুকীর্জন ও বিশেষণ করিয়াছেন—সকলেই একব্যাক্যে এই কব্যকে অমরতার আশা দিয়াছেন।^৪

কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে বেশা যাইতেছে যে উচ্চ আদ্যাপনের যাত্র কাব্যের অহুকুলে হওয়া সম্ভবও কবির বিশেষ লাভ হয় নাই। তিনি নামে যাত্র ধাতিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের নামটাও বোধ করি অনেকেরই মস্তিষ্ক অতীত! এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? গৃহিণীপনার অভাবেই কি ইহার কারণ? আমার মনে হয় একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আরো কিছু কারণ আছে,

১ "আবার বাংলা দিম যাবার ভাস কবিতা রচিত হ'তে পারে না; যেমত প'ড়ে দেখি, সে যাবা কুল।"

—পূর্বাতন এসল, ২য় পর্বা

সম্মানে যে 'যেহে ঠাকুরের মোট পুরের কবিতা' বৃত্ত ছিলেন এখন সম্ভব অজ্ঞাতও দেখিয়াছি।

২ "আমকালকর জেসো শ্রুতক বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যন্ত্রপ্রমাণ' গ্রন্থানির সহিত কিনে পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ট্য আমি আর কুশাণি দেখি নাই। তাব সকল বেব luscious! যদি কেহ যাত্রায়া সাহিত্যের অথ্য সৌন্দর্য আখাণ পাইতে চায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থানির হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে Somehow or other it never came to the surface."

পূর্বাতন এসল, ১য় পর্বা

৩ প্রিন্সাণ সেন, প্রিন্সপ্যালটি; সতীশচন্দ্র মায়, রচনাধী; শ্রীকানাই সায়ক, বিদ্যারত্নী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪২

৪ যন্ত্রপ্রমাণ গ্রন্থাকারে ১৮৭৪ (৫) সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৭০ সালে অনন্তর বহুবর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭০ হাইকেন্সের দুহাং বসল। হাইকেন্সের চোখে পড়িলে এই অপরূপ কাব্যের তিনি প্রশংসা করিভেন বলিয়াই আবার থাকে।

আর সে-কারণ কালধৰ্মে ও পরবর্তী কাব্যধৰ্মে নিহিত। অগ্রপ্রয়াণের মতো অমর কাব্যের বিস্তৃতিতে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যেরও পরিচয় নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এক বিষয়ের অঙ্গসন্ধানে নামিলে একাধিক বিষয়ের সম্ভাব্য পাওয়া যাইবে তরলার অঙ্গসর হইতেছি।

২

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনকথা তাঁহার রচনার চেয়ে অধিকতর বিবিত, খুব সম্ভব রবীন্দ্র-গ্রন্থরূপে যে কোতুলক তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কলেই এমনটি হইয়াছে। নতুবা নিম্নে বিবিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার কোঁক তাঁহার ছিল না। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা বলা হইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল তাঁহার জীবন নয়। এখানে কেবল সেই সকল তথ্যেরই উল্লেখ করিব বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে যাহা প্রাসঙ্গিক।

১৮৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তিনি মেঘবৃত্ত কাব্যের বাংলা অংশবাদ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে ও আগ্রহক্লে যে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে অন্ততম অগ্রণী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, বেঙ্গল বিদ্যাদিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ডারউ, তববোদিনী প্রভৃতি পত্রিকার সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মহর্ষির জীবিতকালে তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন। তার পরে মহর্ষির মৃত্যু হইলে ১২০৫ বা ১২০৬ সালে তিনি স্বাধীনভাবে শান্তিনিকেতনে-আসিয়া বাস করেন। সেখানে ১২২৬ সালের ১২শে আশ্বিন তারিখে এই মহাহৃদয় বনীবী লোকান্তরে প্রয়াণ করেন। পঁচাশি বছরের বেশি এই দীর্ঘজীবনের তথ্যপুঞ্জ একমুদ্রিত অধিক নয়। তাই বলিয়া তাঁহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ গ্রন্থাবলী-আকারে ছাপিলে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের বৃত্ত রচনাসমূহকে অতিক্রম করিবে বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ সরেছমিনে সে পরীক্ষা না হওয়া অবধি প্রতিকূল মত প্রকাশ করিবার পথ বদ্ধ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা দিতেছি।—

১ মেঘবৃত্ত	১৮৫০
২ তববিজ্ঞা ৪ বৎ	১৮৫৬-১৮৫৯
৩ বঙ্গপ্রাণ	১৮৭৫ ✓
৪ পটু ব্রাহ্মণ	১৮৯৮
৫ বেঙ্গল কবিদা	১৯১২
৬ গীতপাঠ	১৯১৫
নানা চিত্রা	১৯২০
৭ গ্রন্থমালা	১৯২০
৮ কাব্যমালা	১৯২০
১০ চিত্তাধনি	১৯২২

১ পূর্বতর তালিকার মত ঐতিহ্য, ক্রমক্রমে কল্যাণাশ্রম, “দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর”, সাহিত্যসংস্কৃতমালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় নয়। কেননা, গল্প ও পদ্ম ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি নিজেকে নিশ্চিত করিয়াছেন। জ্যামিতি, ব্রহ্মলিপি উদ্ভাবন, কাগজের বাস্তব রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন ও বাংলা শব্দভাণ্ডার অক্ষর রচনার প্রচেষ্টাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার সঙ্গে গৃহীণপনা থাকিলে ইহাদের যে-কোনো একটি দ্বারাও অসুসরণ করিয়া লোকে চরিত্রার্থতা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই ছিল না। তিনি অনেক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু কোনো পথেরই চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌঁছিব্যার চেষ্টা করেন নাই; শক্তির অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহীণপনার অভাব। জীবনব্যতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের প্রতিভার প্রাচুর্যের উল্লেখ করিতে গিয়া উপাসীনতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন।—

✓ বসন্তে আমার যোগ যেন অকালে অগ্রসর ঘরিয়া পড়িয়া গানের তথা হাইদা যেনে তেবনি বরষাঘণের কত পরিত্যক্ত পত্র ব্যক্তিগত হুড়াহুড়ি ঘাইত তাহার প্রকাশনা নাই।

এই উপাসীনতা তাঁহার স্বভাববিশিষ্ট, ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধর্ম। গল্প পদ্ম ও বিভিন্নমুখী রচনার কোনোটারেই তাঁহার প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় নাই। তাঁহার রচনা পড়িতে শুক করিলে মনে হয় ভাণ্ডারের চরম রত্নগুলি যেন তিনি হাতে রাখিয়া দিয়াছেন, তাই একপ্রকার অশ্রুত অস্তিত্ব পাঠকের মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এ হেন লোকের পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠকসমাধে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। বিবেচনায় কিংবদন্তীতে ছাড়া আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কি?

এ উপাসীনতাকে দার্শনিকের চরিত্রগত লক্ষণ বলিলে ভুল হইবে, ইহা নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত স্বভাব। তিনি দার্শনিক না হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি তাঁহার স্বভাববিশিষ্ট ছিল। তাঁহার সাংসারিক অনাসক্তির একটি উদাহরণ বিতেছি। সরলা দেবী লিখিয়াছেন—

শিবুর বাসহায্যর সবটাই স্মৃতিসুখ গীশেন্দ্রনাথের হাতে বেশ, নিজে কিছুই রাখেন না। গীশেন্দ্রনাথই পরিবারে তা ধাপধাপ ভাবে বসেন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহাতিবস্ত্রের বস্ত্রনা অঙ্গহীন হ'ত না। কিন্তু একটি কাপড়বস্ত্র অভাব কথা কথা অসুজন করতেন, সেটি লেবার মস্ত ও বাস্তব তৈরির মস্ত কাপড়। একদিন শুনি সোড়ানীকোতে তাঁর চাকরকে কাহুতি-নিমিত্ত করে বসতেন, গীশুকে পিতা বলিদ আমা বনি আবার একটি বোয়ানি যেন তবে আমি একবারি খাতা মানাই। একটি সোয়ানির ভিয়ারী লক্ষণটি।

যে উপাসীনতা তাহাকে একটি বোয়ানি সঞ্চয় করিতে দেয় নাই, সেই উপাসীনতার উত্তরে ব্যক্তাসে “ব্রহ্মপ্রণাথের কত পরিত্যক্ত পত্র ব্যক্তিগত হুড়াহুড়ি ঘাইত।” আবার, সেই উপাসীনতাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এই উপাসীনতা ও রবীন্দ্রনাথ-কথিত গৃহীণপনার অভাব এক কি না, ভাবিয়া দেখিবার মতো। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একটুখানি নারীস্বভাব নিহিত থাকে, সেটি গৃহীণপনার ভাব লয়। এখন, পুরুষ যোগ আনা পুরুষ হইলে গৃহীণপনার স্ববিধাটুকু হইতে সে বঞ্চিত হয়। তাঁহার অস্ববিধার অন্ত থাকে না। একটি অস্ববিধা আত্মপ্রতিষ্ঠার অক্ষমতা। সংসারে যেখানে যে-কোনো প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে প্রথম ক্ষমতানি ইট তাহাকে বহুতে প্রোথিত করিতে হইয়াছে, তার উপরে অপর ইয়ারত তুলিয়াছে। নিজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার মত বিবেচনায় প্রথম উপাসীনতা উপাসনা ছিল না। এ দুগে এ রকম মনোবৃত্তি একান্ত বিরল।

৩

বিবেচনায় প্রতিভার ধর্ম কি? তিনি মূলতঃ কবি না দার্শনিক? এ তর্কের সীমাংসা করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুশাশ পরিকার হইয়া বাইবে। প্রথম-দ্বিতীয় তিনি কিছুকাল

কবিতা লিখিয়াছেন, তার পরে আর কাব্যরচনা করেন নাই, তত্ত্ববিজ্ঞান কাছে আশ্রয়পূর্ণ করিয়াছেন। কোলরিঞ্জের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যজীবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোলরিঞ্জের বা-কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য তাহা প্রথমজীবনের রচনা, শেষজীবন ধর্ম ও সমালোচনাতত্ত্ব লিখিয়া তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। আবার, দুজনেরই কবিকল্পনা কিঞ্চিৎ উদ্বারগামী, অলৌকিকের পাড়ায় তাহাদের গতিবিধি। কোলরিঞ্জের 'এনশেণ্ট ম্যারিনার', কুব্জা খাঁ ও ক্রীস্টাবেল, দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ। বাহিরের এই মিল সবেও দুজনের প্রতিভার ধর্ম ভিন্ন, কোলরিঞ্জ মূলতঃ কবি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ গার্হস্থ্যিক।

স্বপ্নপ্রয়াণের শুরুই এই যে, এ গ্রন্থ কবি ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে গ্রথিত; ইহার কদলটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের, আর প্রাণসজীবন নয় কল্পনার।) স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার বৎসর পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আপেক্ষিক তত্ত্ব, পরেও তত্ত্ব, মাত্রখানে একবারের মাত্র কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রথিত বোধি। গিয়াছে— আবার তার পরেই বিজ্ঞপিত বেগে তত্ত্ববিজ্ঞান প্রবাহ ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সনাশ। এই একটি কারণে-মাত্র তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে আমি মূলতঃ তাত্ত্বিক প্রতিভা বলিতে চাই।

আরো কারণ আছে। কাব্যে ও তত্ত্বে তিনি একই ভাব্যরীতি ব্যবহার করিয়াছেন, সে ভাব্যরীতি সর্বত্র গভীর, অর্থাৎ যুক্তি, মূল্য ও প্রাঞ্জলতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত কাব্যে ভাব্যরীতি বা ঠাইল যুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া, মূল্যের ছত্রভঙ্গ করিয়া উড়াও হইয়া যায়, তাহার প্রাঞ্জলতা মেঘলোকের প্রাঞ্জলতা, যজ্ঞ সরোবরের প্রাঞ্জলতা নয়। কাব্যের এই ধর্ম দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে যুক্তিতে মিলবে না, মিলবে স্রেষ্ঠ গভীরতার ধর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন স্রেষ্ঠ গভীরতার জনক।)

এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া দাইতে পারে।

কবির কথার সুধির বর্ম
বসিল' যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি আমিহীন ধর্ম,
তবু নিতে রূপে
পারি বা কেমনে ?
অন্তএব দেখে মোর সাহসের বর্ম।

কিংবা—

সেই বর্ণা করেছ আবার; চাই রাখো চাই থাকে।
অসম্য কি আছে যাহা হৃদয়-বাণ করিতে না পারে
বহন-ভরিতে! কর্ম হলো তাই কি করিয়ে দিন
ভরিতে অহু, আই চাহনির কর্মজলী কল।

আর—

এ শান্তিনিকেতন। আবার সুধিরে বিনা-তরল একটি দীপ প্রস্তুত, তপস্বীতা। আবারের দেশের মস্তকের উপর নিম্ন এত যে ব্যত্যার উপর ব্যত্যা চলিয়া গাইছে, কিন্তু আদর্শ ইকনের সহিত, উহার অটল জ্যোতি পোকাল হইতে একাল পল্লব সমান বহিয়াছে, অপর্যায়ের মতো সুখ বা দুঃখ হয় বাই।

আরও—

কপিল সুনি জিহ্বা লবের করিয়া বলিতে পারিতেন যে, 'বধ্যপঙ্ক্তি' হইলে 'জিহ্বাসার বিঘ্ন' কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল

নুনি হইতেন না, তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারবিশেষ বলিতক হইতেন। একালের গ্রন্থলেখকদের ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই ন্যায়।

এই চারটি অংশ, দুটি গানের দুটি পদের, একই ধর্মবিশিষ্ট, কেবল ছন্দের গুণে একটি পদ, ছন্দের অভাবে একটি গদ্য; কিন্তু তৎসংগেও তাহাদের সৃষ্টি যেমন, সে-মন গদ্যলেখকের ও ভাবিকের, সৃষ্টি শৃংখলা ও প্রাণলতার ধাপ কেলিয়া যে-মন অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত।

এখানে একবার অল্পে অল্পে তুলনার সোড সংবরণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তবপ্রবন্ধ

৭৩ গল্প বাহাই লিখুন-না কেন সর্বত্র তাহার কবিত্বই ছুটিয়া বাহির হয়। ছিন্নেন্দ্রনাথ কাব্যেও ভাবিক, রবীন্দ্রনাথ তবুও কবি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির গদ্য। ছিন্নেন্দ্রনাথের পদের বুনন যেমন গদ্যাক্ষর, রবীন্দ্রনাথে ঠিক তাহার বিপরীত, তাহার গদ্য গদ্যাক্ষর। সংকৃত অলংকার ও ইংরেজি বাক্যের পাটোনে রবীন্দ্রনাথের গদ্য গঠিত, ছিন্নেন্দ্রনাথের গদ্য অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার পাটোনটা একেবারেই বেশী রকম, কিছু চলিত বাংলা ইতিহাস, কিছু সংস্কৃত ভাস্কর্যের গম্বুজীতি। আবার দুজনের প্রতিভার ধর্মও ভিন্ন, একজন শৃংখলা, সৃষ্টি ও প্রাণলতার পথিক, অপরজনে এসব গুণ তেমন লক্ষণীয় নয়। ছিন্নেন্দ্রনাথ একটি রূপকে কাব্যে পরিণত করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ রূপকের আদিকের কাছে কখনো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই।) রবীন্দ্রনাথ ও ছিন্নেন্দ্রনাথ একই বাড়ির এ-বারান্দা ও-বারান্দার অধিবাসী; এমন ক্ষেত্রে আশা করা অসম্ভব নয় যে, অগ্রজ প্রকৃত পরিমাণে অল্পমাত্র প্রভাবিত করিবেন। কিন্তু তেমনটি যে ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রতিভার ঐকান্তিক পার্থক্য।) অপেক্ষাকৃত নিম্নতম ঐতিহাসিক বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বাৰা বিহারীলাল স্রষ্টব্য হইয়া রহিয়াছেন, আর অধিকন্তর শক্তিমানু ছিন্নেন্দ্রনাথ তিরকালই বিশ্বস্তির ধার খেঁচিয়া রহিয়া গেলেন। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, ছিন্নেন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাই; আঁবনের ক্ষেত্রে তার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময় উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে স্রষ্টব্য করিয়া রাখে। উত্তরপুরুষহীন সাহিত্যিক সভাই ভাগ্যহীন, ছিন্নেন্দ্রনাথ সেই দলের একজন।) অনেকে স্বপ্নপ্রমাণ কাব্যকে এক খণ্ড বীপ বলিয়াছেন। আমি তো বলি ছিন্নেন্দ্রনাথ নিজেই এক খণ্ড বীপ। প্রাচীর ধারায় সন্দেশ ও তাহার বোণ ছিন্ন, আবার নূতন ধারায় সন্দেশ বোণ গড়িয়া ওঠে নাই আবার তৎকালে প্রচলিত রীতিনীতিরও তিনি বড় ধার ধারেন না। তাহার উত্তরপুরুষ নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষই বা কে? বাইবেল, দৈবর গুণ, ভারতব্রহ্ম কাহারও সঙ্গে তাহার শক্তির সাধর্ম্য আছে কি? পূর্ণাঙ্গরহীন তিনি নিঃসঙ্গ একক, বীপ-খণ্ড বলিলেও খণ্ডেই বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তাহা মুক্ত। ছিন্নেন্দ্রনাথ কেন গ্রন্থসমূহের উচ্চাখণ্ড, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে নিত্যস্থায়ী প্রসিদ্ধ।)

আবার সিদ্ধান্ত এখন ছিন্নেন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমি তিরকাল বসেছি। বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদ তাৎক্ষণিক আঁবর দু-চক্ষের আলোই। এই মন্ত অনেক সময় আঁবর আঁবরদের সঙ্গে আঁবর সত্তার বিরোধ হইয়াছে। ...আমি গোড়া থেকেই সেই বিশেষ culture খরিদা বলিয়া আছি; আমার মধ্যেই বলিয়া আছি। ...কখনও আমি বাস্তব বাস্তবের কোন একটা বড় কাম করিতে পারিলাম না। বহুলা বিলাস, কিন্তু কাহারও মন তিষ্ঠিল না। ...যে, একরকম কখনই আঁবরের দেশের স্থাপনা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাসিতা গদ্য ছিল। হকালোই বল আর রাজবাল্যবাহুই বল, ওঁহাদের Patriotism বার আঁবা বিলাসিতা চার আঁবা দেখে। ইংরেজ যেন patriot

আমিও সেই রকম patriot-ক, এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল? ~

আত্মপ্রতিষ্ঠার ওঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকিলে বিজ্ঞেন্দ্রনাথ 'আমার মত patriot' না হইবার চেষ্টা করিয়া 'তোমার মত patriot' হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল জিনিস দেবন চলে আসলে তেমন ^{বিশুদ্ধ} ^{জগৎ} ^{চলত} না। কালের সহিত আপস করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তিনি আপস করিলেন না, কাল-স্রাবধী নৃতন পথে চলিয়া গেল; তিনি শুকনা বালুর চড়ায়, মৃত প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন; তবে পুরাতন সেই শেতপাথরের ঘাটটি দেখিয়া মন্থনান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ স্থলেই নদী বহিত, এখন ^{বৈচিত্র্য} ^{স্ব} সব পরিত্যক্ত। ~

হিন্দু মেলা প্রসঙ্গে বিজ্ঞেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

বঙ্গদেশে একটা দলদল হুয়া তুলিয়া; আমি আগাগোড়া তার কথা মিলান। সে খুব কাল করিতে পারিত; হুঁখি দ্রিষ্টান্ত ঈশ্বর-অর্চনার অচল করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে মিলত। একটা মেলা হুয়াইবার কথা বলিল, তাঁতি কামার কুমোরে ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম— ওসব তো দেশের সকলের জানা আছে; দেখি painting দেখাতে পার? দেখার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, একাও ছবি। ব্রিটানিয়ার সমুখে ভারতবাসী হাতলোড় করিয়া বলিয়া আছে। আমি বলিলাম, 'উটে রাখ, উটে রাখ; এই তুমি দেখি painting করাইয়াছ? আর আমাদেব প্রাণবান দেবার এই ছবি রাখিয়া?' ছবিখানা মারাইয়া উড়াইয়া রাখা হইল।

ব্রিটানিয়ার সমুখে ভারতবাসীকে করছোড় বসাইয়া ছবি আঁকিতে সেকালের পেট্রিষ্টদের বাধিত না, পেট্রিষ্ট না হইয়াও বিজ্ঞেন্দ্রনাথের বাধিত। এই গেল সেকালের গৈকে প্রভেদ। একালের সঙ্গেও যে খুব বেশি মিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। একালের আমরা ব্রিটানিয়ায়ক সিংহাসনে বসাইয়া ছবি আঁকিতাম না সত্য, কিন্তু সেই সিংহাসনে ভারতমাতা যে বসিতেন তাহাতে তুল নাই। ইহাও তিনি বরাবর করিতে পারিছেন না, কারণ তাঁহার মতে ইহাও 'আমার মত patriot' হওয়া নয়, 'তোমার মত patriot' হওয়ারই রকমকের। শকুন্তলা যদি ভেনাসের ভকীতে ধাঁড়ায় তবে সে ভেনাসই হইল; ভারতমাতা যদি ব্রিটানিয়ার ভকীতে বসে তবে সে ব্রিটানিয়াই হইল— এই ছিল বিজ্ঞেন্দ্রনাথের অভিযন্ত, ইহাও সেই তিনি বলিতেন 'তোমার মত patriot' হওয়া। সেদিনের মতো ছবিখানা উল্টাইয়া রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাবৎকাল রূপান্তরে সেই ছবিই চলিল, অচল হইলেন তিনি নিজে। পরবর্তী কাল কালক্রোদী বিজ্ঞেন্দ্রনাথের ছবিখানাই উল্টাইয়া রাখিয়াছে। এই কল্পই যুগজীবনে তাহাকে নিত্য প্রকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এ হেন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাব্য স্বপ্নপ্রদানের স্রষ্টা— দুই-ই নিজ নিজ পরিবেশে প্রকৃষ্ট। *

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ যুগপ্রয়াণ-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, আর অল্পই বাকি আছে, সেইটুকু আমি ওছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রিয়নাথ সেন যুগপ্রয়াণের সঙ্গে স্পেন্সরের কোয়ারী কুইন ও বানিয়ারের পিসগ্রিম্ প্রোগ্রেসের তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাব্যের সঙ্গে ^{কুইন} ^{কুইন} ^{কুইন} তুলনা করে চলে— সেখানি ধারের

ভিত্তাইন কমেডি। অবশ্য কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তিনখানির কোনোটির সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের একাদন নয়। আবার তিনখানির কোনোটির দ্বারা যে দ্বিভ্রমপ্রদান গচেভন তাহে প্রভাবিত হইয়াছেন এমন প্রমাণও নাই। তৎসঙ্গেও দুখানির সঙ্গে যদি তুলনা চলে, তৃতীয়াখানির সঙ্গে না চলিবার কারণ নাই। পূর্বেই কাব্য দুখানির সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের মিল যদি আকস্মিক হয়, তৃতীয়াখানির সঙ্গেও তাই। কিন্তু তৃতীয়াখানির সঙ্গে আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্মাতের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভিত্তাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং রাষ্ট্র। তাঁহার পথপ্রদর্শক মহাকবি ভাদিমিল। তাঁহার পরিচালনায রাষ্ট্র নরক ও Purgatory-র ব্যবতীয় রহস্য দর্শন করিয়া অবশেষে বিধাতার দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। এখানে তাহারই অস্তিত্ব। এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অস্ত্র কোনো কবি নয়, স্বয়ং কবিকল্পনা। তাঁহার পরিচালনায কবি মনো-রাসো প্রবেশ করিয়া নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিবাহপুর, রসাতল, শরৎপুর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে পৌঁছিয়া গন্তব্যে গন্তব্য ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন। ভিত্তাইন কমেডি শান্তিপুরে পায়গাড়ীসে এবং স্বপ্নপ্রয়াণ শান্তিপুরে উপসংহত। এ দুই কাব্যে তুলনার ইহাই একমাত্র হেতু নয়। ভিত্তাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং রাষ্ট্র। স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কবিতা কে? প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন—“একজন কবি বা কবিপ্রকৃতি লোক।” আমার ধারণা, স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক স্বপ্নপ্রয়াণের কবি স্বয়ং, দ্বিভ্রমপ্রদান ঠাকুর। প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রহিয়াছে। বিলাসপুরের ভূপতি কতৃক মিত্রাসিত হইয়া কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাতে বেগা সত্য হয়, রাতে বেগা ধীর;

জগৎপ্রতি করে বেগা মনের তিরিহ।

কর পোজা করে বেগা লোব আর রহি,

সেই বৈকুণ্ঠজন আসো করে কবি।

ইহা—শ্রীমতঃ ই মোড়ানার ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।” এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্নপ্রয়াণের নায়কের বর্ণনা পরিচয় সম্বন্ধে আর সংশয় থাক। উচিত নয়। ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আর-একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়—স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য কবি দ্বিভ্রমপ্রদানের অস্ত্রস্বীকৃতি, তৎপক্ষে এই কাব্যে তিনি তাঁহার জীবনের ও তথা কবিত্বজীবনের বিকাশ বিবর্তন পরীক্ষা ও চরিত্রার্থতা বিহীন করিয়াছেন। স্বয়ং কবির নায়ক্য পর্যন্ত ভিত্তাইন কমেডির সঙ্গে মেলে। এ মিল আকস্মিক কিংবা অকস্মাতের সীমা-অতিক্রমকারী, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়া এই কাব্যের অমিলের কথা তুলিব। স্বপ্নপ্রয়াণ লেখকের মানসজীবনের ইতিহাস। ভিত্তাইন কমেডিতে তৎকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি রাষ্ট্র মোক্ষকারী মানব-মাত্রেরই ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্যাপকতায়, গভীরতায়, কাব্যোৎকর্ষেই তুলনা করাই অসংগত। সে চেষ্টাও করি নাই, কেবল কাঠামোর অতি প্রকট মিলটা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এবারে আর-একটি কথা। নানা কারণে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য শরীত। যেমনাধবকাব্যানুসারে বায় মিলে। বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্বক দীর্ঘকাব্য। বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্বক তৎপককাব্য।

১ সত্য—সত্যজন্য ঠাকুর, হয়—হয়েজন্য ঠাকুর, জগৎ—জগৎজন্য ঠাকুর, জ্যোতি—জ্যোতির্জন্য ঠাকুর মোক্ষ—মোক্ষজন্য ঠাকুর, রহি—রহিজন্য ঠাকুর, প্রবিন্দকন—প্রবিন্দকন্য ঠাকুরের বালকন, কবি—কবিজন্য ঠাকুর।

মধুসূদন কাব্যরীতি ও রবীন্দ্রকাব্যরীতিকে পাশ কাটাইয়া ইহাই একমাত্র সার্থক বাংলা কাব্য। আবার রসের বিচারেও ইহার স্থান কাব্যরীতি ও ক্যাশন-পরিবর্তনের উপরে অবস্থিত। তাই বলিয়াছি যে, কি বাংলা সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যত্নপ্রাণ কাব্য নানাভাবে অবগীর্ণ। এসব কথা অব্যবহিত সবাই জানেন, অনেককেই বলিয়াছেন। (আরো একটি কারণে ইহার অনতলাষাধার আছে। বাংলা সাহিত্যে কবিত্ববন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়।) প্রায় সমসাময়িক সারদামঙ্গল কাব্যেও কবিত্ববনের ইতিহাস আছে, কিন্তু কবি সেখানে শিল্পী নয়, সাধক; তাছাড়া “বৈদ্যবিরহ প্রীতি-বিরহ সুরম্যবিরহের” সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এমন এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার মধ্যে কবিত্ব-জীবনকে সঠিকভাবে ধুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। কাব্যোৎসর্গেও দুই ভেদ আছে। সারদামঙ্গলের বর্ণ ও রেখা দুই-ই অস্পষ্ট, যত্নপ্রাণ স্পষ্টতায় ও বৈভবে স্বেতপাথরের মূর্তি, সারদামঙ্গল কাব্যের নীহারিকা, যত্নপ্রাণ গুরুত্বের দ্বার উন্মুল ও অচল। রবীন্দ্রনাথের ‘কবিকাহিনী’তে কবির অস্বাভাবিকের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাব্য যত্নপ্রাণের পরবর্তী রচনা। কবিত্ববনের দ্বয় সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যের মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা বিজ্ঞেন্দ্রনাথের একটি প্রধান কৃতিত্ব। আর, নিজের অজ্ঞাতসারে এই কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যরীতিতে তিনি নূতন প্রাণ ও বেগ লগান করিয়া দিয়াছেন।

(তার পরে যখন মনে পড়ে যে, বিজ্ঞেন্দ্রনাথ কল্পনাকে পথপ্রদর্শক করিয়াছেন তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের সাহিত্যভাবের সঙ্গে ইহার সাহিত্যভাবের সম্যক প্রেক্ষা হইয়া ওঠে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ সর্বপ্রথমে কবি ও কবিকল্পনাকে নূতন পদবী দান করেন। তার আগে কবি শিল্পীমাত্র ছিল, কবিকল্পনা একটি মনোরম কৃত্তিমাত্র ছিল। রোমান্টিক কাব্যের পুরোধায় কবিকে প্রায় বোশি ও সাধকের পদবীতে উন্নীত করিলেন, আর কবিকল্পনাকে জীবনরহস্যের সারথী প্রধান করিলেন। যত্নপ্রাণ কাব্যে কবি ও কল্পনার সেই নূতন অর্থই আদ্য পাঠ্য। অবশ্য এ কথা সত্য যে ইহার আগে মধুসূদন ‘মধুকরী কল্পনা’কে আদ্যন করিয়াছেন। কিন্তু এ ‘মধুকরী কল্পনা’ রোমান্টিক পুষ্পবনের ভ্রমরী নয়, অষ্টাদশ শতকের কাচি-ছাটাই লবঙ্গালিত উভানের সঙ্গেই তাহার পরিচয়। (পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথের ‘কবিত্বকল্পনালতা’র সঙ্গেই যত্নপ্রাণের কল্পনার আত্মীয়তা। আমাদের দেশে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রজেক্ট-এ পরিণত হইয়াছে, আর কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের দাবতীয় রহস্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নূতন পদবীর প্রথম আভাস যত্নপ্রাণ কাব্যে।) আমার ধারণা সত্য হইলে যত্নপ্রাণ কাব্যের আর-একটি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। (‘রবি উদয়ের’ আগে যে অকপাড়া নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে যত্নপ্রাণে সেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য ‘প্রভাতসংসীত’র পূর্ববর্তী ‘ব্রাহ্মমূর্ত্তের সংসীত’; যত্নভর হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আশ্রয় নবকাব্যের নির্ধরকে ঘন দেখিতে পাই।)

৫

(রূপক কাব্য যতই প্রাচীন হোক, কাহিনীকাব্যের প্রাচীনতা কখনো পাইতে পারে না। যুগপৎ কাহিনী ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলতা ও অর্থভেদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কখনো সে জটিলতা কেহারা কুইন-এর দ্বার্দ্বার্য পরিণত হয়, কখনো অগণকাকৃত প্রাচীন। যত্নপ্রাণের গতি সরল, বিকাশ প্রাচীন আর অর্থাস্বরেরও বিশেষ স্থান নাই। তবু রূপক কাব্যে যেইহু দুহুহু অবিদ্যার তাহা অবশ্যই আছে।)

ইহারই সমাপনবানশে কবি প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে দুই-চার ছত্র গম্ভীর নৃত্যে বোণ করিয়া দিয়াছেন।
আমরা সেগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহাতে সমগ্র অর্থবোধে সাহায্য হইতে পারে।

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ । ସନାତନାନ୍ତରାଜ୍ୟ । ସୂଚନା । ଲେଖକ କୁହକ । ସନାତନ ବାସୀ । ଅନେକଦିନ ଗତ କରନାର ବର୍ଷ-ଆଦି ।

দ্বিতীয় সর্গ। নবমপুস্তকপ্রথমঃ। হুসন্। কবির বাগ্যকালের আনন্দবিক্রমভব। কবি বাগ্যকালে চিত্রকঃ সসীতঃ এবং তৎকৃতির
 পোতা নৈমিত্ত্যে স্তেজ আনন্দে ব্যক্তিঃ, পূর্বদীর সেই সন্মল পুত্রভব কাহিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়। সাধিকা (সবক) কহিকে গণ
 দেখাইল। বাহ্য-বসত্যের পরিচয়নে লইয়া গেল। হামসী (রোহাওণ) কবির মনকে কবনের গুহে প্রবেশিত করিল। হাকী (জমাবাদ)
 কবির মনকে বিবেচনের ভ্রমে ডুবাইয়া বিল। কসাবার তিন সখী হুহুতি, বাবকী, পরহীরা। হুহুতি কিনা কবাবারপাখবাবতি—হুমকতা।
 বাবকী কিনা বাবসী ভাব, বাবুগুণ। পরহীরা কিনা শাহরী ভাব—প্রোদগল।

[illegible]

চতুর্থ সর্গ। বিদ্যাপুত্রের মৃত্যু। পুতলা। কবি বিদ্যাপুত্র হাতাইয়া বিদ্যাপুত্রের অন্তঃগামী বিদ্যাপুত্রের পিতা গড়িল। নানাব্যকার
 খোলা দেখিত গাফিল। আবিধানি করুক মৃত হইল। কবি বিদ্যাপুত্রের রাসা বাহা হুদ পঙ্কজের দিকট মীত হইল এবং আভ্যের
 (অর্থাৎ তাহা হইল) গড়িল। বিদ্যাপুত্রের মৃত্যু হইল। অকস্মেৎ কলাতলে প্রেরিত হইল।

পঞ্চম সর্গ। রসাতলমহাশয়, হুত্বা। বাভোর (অর্থাৎ আগুনের) তল অহুতর আখিখাখি ককিক রসাতলগণিত ভজনক-হসের বিকট নীলিমা দিন। ভজনক-সম পুরোহিতিক ভাষিমা চাষুত্বা দেবীর সপুখে ককিক বসিমা গিতে আশে কলি। ইতিরূপে সৈবর নামক একজন কবালমুখি কাশালিক (বিলি ভজনক রস অশোকাত্তও ভজনক) তিনি হঠাৎ সজা হলে উপস্থিত হইল। আশি ককিকে বসি দিবার শাবসে প্রবাসে লইয়া একটা ককিক হইল। অশোকাত্তের হও হইতে প্রকাশের পায়ে ঐবিধি হুত্বা হইলেন। ককিকা দেবী আশিগ। কাশালিকের হও হইতে ককিকে ককিক, অশোকাত্তের হও হইতে প্রকাশের পায়ে ঐবিধি হুত্বা হইলেন। ককিকা দেবী আশিগ।

স্বর্গ। দশক-প্রায়। শতাব্দী। বীর আর ভগ্নাবক এই দুই রূপের অধীনই দুই দশক সঞ্চারিত হুতুল শত্রু। ভগ্নাবক রূপের পরাজয়। চুক্তি-কেন্দ্র সহিত বাক্যের, বাণীর সহিত বাহ্যের, হিংসার সহিত স্নেহের, অত্যাচারের সহিত কোণসের, ভগ্নাবকের সহিত বীরের মনস্তত্ত্ব।

শুভ্র সর্প। শক্তি-প্রাণ। বুদ্ধি। রাগবাসনে বৃত্ত এবং মাহিতে সর্পাকর্ষ রাগের মেখলা কবির বৈরাগ্য উৎস। কল্যাণ প্রকাশ্য হৃদয় লাভ। শব্দবের আশ্রয় সন্ন। শাশ্বত বৃত্তিসকলের উচ্ছ্বস। সাধুখিলন এবং মেঘখিলন। গুণগণিত। নিরাতল এবং স্বাদ্যবাস।

কবি-প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্বল্পপ্রাণ-তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি না দেখা যাক।

স্বপ্নাবিষ্ট কবি কল্পনার সাগরে মনোরাগে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নবনগরে উপস্থিত হইলেন।

নবনপুরকে aesthetic-লোক মনে করিলে ভুল হইবে না। কল্পনার বিবর্তনে বা বিকাশে বাহ্যিক প্রাধিকার aesthetic ভাৱে আসিয়া পৌঁছায়। এখানে ভাষাকে পথ ছাড়াই লইতে হয়। নবনপুরকে যে বাহ্যিক চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে সে কলাকৈবল্য বা art for art's sake ভাবকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে করিলেই স্মৃতি ও দ্রুত। কবি সেইরূপ মনে করিবার ক্ষেত্রে নানাক্রম দ্রুত, পথস্মৃতি ও পুরীকার



ব্রজমোহন ঠাকুর
 শিল্পী: জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর



ফিরোজনাথ ঠাকুর
শিল্পী : রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়িয়াছেন। এবং এইরূপ মনে করিবার ফলে কুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের গা বেঁধিয়া যে বিলাসপুর অবস্থিত কবি সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর তাহার অনিবার্য পরিণাম ঔদ্যাকে হুগিতে হইয়াছে। বিলাসপুরের অদীশ্বর প্রমোদ। প্রমোদরাজের প্রভাবে “লালসা নায়ী আদিরসের কুহকে পড়িয়া এবং হস্তরসের নটামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে” কবি হারাইয়াছেন। এবারে তাহার হৃৎকের পাশা শুক। কল্পনাকে হারাইয়া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালসা ও হস্তরসের নটামির কলে কবি সোলা বিধানপুরে ঘাইতে বাধ্য হইলেন। “কবি বিধানপুরের রাজা ছাড়া হুহু গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাত্যের (অর্থাৎ তামসিক স্বভাবের) বিচারে সনপিত হইল।” অবশেষে কবি রসাতলে গেলেন। এখানে বলিদানের পূর্বমুহুর্তে তিনি করুণা দেবীর রূপায় উদ্ভার পাইলেন। পরে সময়প্রসঙ্গ। এখানে বীর ও উদ্যাক রসের সৈন্তসলের মধ্যে সংগ্রাম হইয়া উদ্যাক রসের পরাজয় ঘটিল। এবং বীর কতৃক কবি শাস্তিপুত্রে নীত হইলেন। শাস্তিপুত্রের নৃপতি আনন্দ। আনন্দ ও সাধুদ্বৈতের কল্যাণে কবির সহিত কল্পনার মিলন ঘটিল, আর সে মিলন বিবাহবন্ধনে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে আরো দুটি বিবাহ হইল।

আনন্দরূপ বলিলেন—

হও এস সংসারবন্দন ত্রী।

কবি, বীর, কল্যাণ, ভাসিন দিকে ধাঁড়াও সজ্জতি।

একটা ললন

শোভা, কলপনা,

এস সের পাশতী দখী দরবতী।

প্রমোদর সহিত বীরের, শোভার সহিত কল্যাণের ও কবির সহিত কল্পনার বিবাহ হইয়া গেল— আনন্দরূপতি তিনে এক কল্লিকর্তা।

বীরত্ব ও কল্যাণকে কবির বিভূতিস্বরূপে এবং প্রমোদ (আনন্দদানশক্তি) ও শোভাকে (সৌন্দর্য) কল্পনার বিভূতিস্বরূপে দেখা চলিতে পারে। কাহিনীবিকাসের খাতিরে তাহাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখা হইলেও তাহারা আসলে অভিন্ন। ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিকল্পিত হৃৎকের ফলে কবি কল্পনাকে হারাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে হৃৎকের তপস্কার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে বাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। Aesthetic-লোকে অপকৃত্ত ধনকে আনন্দলোকে কিরিয়া পাইলেন, বীর্য ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপীণী ও আনন্দবাহিনী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন।—ইহাই স্বপ্নপ্রয়াণের ভাব।

নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র; কিন্তু শাস্তিপুত্রে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্য ধন মাত্র নয় বোণী জানী সাধু শস্ত্র মহুহ যাত্রেই থাকেন ধন, তাহার স্বভাবে সহস্রজীবন অর্থ ও অকর্ষণ। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আদরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake। গাড়াইয়াছে। / প্রিয়নাথ সেন স্বার্থ ই বলিয়াছেন—

পরার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রন্থিত করিয়া হিন্দু কবি কান্তকে অশেষ এবং অনীদের দিকে প্রদর্শিত করিয়াছেন।—এক কথা

কবি প্রদিশু চারু বৈজ্ঞানিকের মত দানবল্লভক বিবরণ করিয়া দানবজীবনের ক্ষেত্রে রচিগতা এবং উদ্ভাৱন গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চায় নিম্ন ক্ষেত্রে অনেক দূর অতিক্রম করা যা বাড়িয়া যোগ্য হইয়াছে।*

স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যসৌন্দর্যের চেয়ে তাহার ভাবের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারের দিকে তেমন যত্ন দেওয়া হয় নাই, কেবল প্রিয়নাথ সেনের রচনাটিতে কিছু পরিচয় আছে। চুঃখের কথা এই যে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ স্বপ্নপ্রয়াণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গাইত।

নব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যই একমাত্র মহৎ ও বীরাঙ্গ কাব্য। আপন গঠনসৌকর্যের বলে বাহা সগাযমান। সর্গের সহিত সর্গ প্রযুক্ত হইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনা দৃষ্ট হইয়া অস্তিত্ব লক্ষ্যে ও অমর্য গতিতে তাহা চরম পরিণামের দিকে চলিয়াছে, হুতাশিত ও হুশিকিত সৈন্তবাহের সঙ্গে ইহার সার্থক তুলনা চলিতে পারে। এই প্রাপ্তি হেতু নবীনচন্দ্রের যুৎসব কাব্যগুলির আলোচনা করিতে চাই না, যেহেতু দেশে এখনো তাঁহাদের কিছু কিছু গুনগ্রাহী ব্যক্তি আছেন। কেবল এইটুকু বলিলেই, যথেষ্ট হইবে যে অন্তর্নিহিত অনিবার্য কোনো নিয়মের দ্বারা তাঁহাদের কাব্যগুলি নিয়ন্ত্রিত নয়—ওগে যেন নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাধনটা নিতান্তই বাহিরের, ভিতরের বস্তুর পাচ নোকান ঘুরিয়া সংসৃষ্ট। স্বপ্নপ্রয়াণের architectonic বা গঠনসৌকর্য অসাধারণ। মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথপ্রদর্শন হইবার বা লক্ষ্যপ্রদর্শন হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তত্ত্ব—সে নিজেই ছায়াঘর, অলক্ষ্যপ্রায় তাহার গতিবিধি তৎসঙ্গেও কবি যে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত বধাকালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার অগৌরব মনীষা ও শিল্পশক্তি প্রকাশ পায়। এই কারণে তাঁহার সহায় তাঁহার অসাধারণ সংঘর্ষ। যেখানে একটি বিশেষণে চলে সেখানে দ্রুতি তিনি ব্যবহার করেন না, একেবারে না হইলে চলে কিনা সেই দিকেই তাঁহার নজর। অথবা স্বপ্নপ্রয়াণে ও ঘটনাবিশ্তার তাঁহার দু চক্ষের বিব। কাব্যের প্রতিটি সর্গ ছন্দ নৌকার মতো হালকা ও জীৱগতি, সম্পূর্ণ অব্যক্তভাৱ-বহিত। অথচ যখন মনে পড়ে যে, নৌকিক ও কিছুত সৌন্দর্যদৃষ্টিতে তাঁহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সূচ্যাকল্পে বৃত্তিতে পারি পদে পদে কি আনন্দসংঘর্ষ না-আহাকে করিতে হইয়াছে। এদিকের বিচারে স্বপ্নপ্রয়াণ বর্ষাঙ্গ ক্লাসিক রীতির শিল্প, অল্প দিকে কল্পনার deification-এ বা দৈবীকরণে ইহা আবার বাংলা রোমান্টিক কাব্যেরও পূর্বসূর্য্য বটে। শিল্পাংশে ক্লাসিক রীতি এবং কাব্যাংশে রোমান্টিক রীতিকে অঙ্গসংগত করিয়া স্বপ্নপ্রয়াণ যে নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি করিতে উদ্ভূত হইয়াছিল যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাহা অসম্পূর্ণ ও অচরিতার্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্বপ্ন বিশেষপ্রাণ ইচ্ছা করিলে এই ধারাকে হৃদয়ে সার্থকতার পৌছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেই যে তিনি শান্তিপ্রচাপ-অন্তে তত্ত্বপ্রয়াণ করিলেন, নতুন কাব্যপ্রাণ আর তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিল না। কল্পনা যতদিন তাঁহার কাছে পরকীয়া ছিল তাহাকে অঙ্গসংগত করিয়াছেন, বকীয়া হইবার পরে তিনি আর তাহার প্রতি বিরিয়া ডাকান নাই। কি বিফলনা!

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের শিল্পকৌশলতা ও সৌন্দর্য সন্দেহে পূর্বোক্ত সমালোচকগণ প্রায় সব কথাই বলিষাছেন ও উদাহরণবোগে নিজস্বের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পৃষ্ঠান্ত উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল না, (‘এলাভোরাভো’র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছড়ির দ্বার বিচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকর্ষণ।) সে-সব এতই প্রচুর যে চোখে আড়ল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। ^১ ছিগ্গেন্সনাথ যখন সৌন্দর্যস্বপ্নিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভাষ বেন বান ভাবে, আর সেই বানের মুখে কত মৃদুদ্ব্যস্তের স্বপ্নকুহন ভাসিয়া আসে, যেমন ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের যে-কোনো পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞাপতি ও গোবিন্দদাস, নবাব বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ ইহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একবারি কাব্যে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সৌন্দর্যস্বপ্নির পরেই লক্ষ্যীয় ইহার সাজসজ্জা ও ভাষাব্যবহারকৌশল। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে বাংলা ভাষা ও ইজিমন ব্যবহারের নৈপুণ্য এ যুগের পাঠককে বিম্বিত করিয়া দেয়। এক-একবার আচনকা মনে হয়, এই বুদ্ধি ধর্মার্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু হায় ‘সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।’ ঐক্যনাই সামন্ত দুঃখ করিয়া বলিষাছেন, “সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালী জাতিকেও চেনা যায় না।” চেনা যে যায় না তাহার প্রধান কারণ স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালে ভরতের বাঙালী যে ভাষা বলিত এখন তাহা বলে না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মূখ হইতে হাতুড়াবা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার বলে যাহা পাইঘরিছি তাহা হয়তো অধিকতর ঐশ্বর্যময়, কিন্তু অকৃত্রিম বাংলা যে নয় সে কথা হুনিশিত। ছিগ্গেন্সনাথ বলিতেছেন—

আমার দুঃখ বিবাস যে, মনে বসি এখন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা একপনের উপরূর খাঁট খেনি।
তাহার একাধ কতা যায়, তাহাকে একপনের লত দিগেদি idiom-এ অনুবাদ করিতে গাইব কেন? মাই কখনো ওপন মাতাই নি।
আমার সেখার এই নিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না, কিন্তু কৃকক্ষল পারিবে।

কিন্তু কৃকক্ষলের মতো বিশেষজ্ঞও যে বিরল, কাজেই সে ভাষা এখন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই ভাষাত্তর, ভাষা-ভাষীরথীর ভিন্ন পথ গ্রহণ, দুচার কথায় সারিবার মতো নয়। বাংলা সাহিত্য আলোচনাগ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের জনপ্রিয়তার অভাবের অন্ততম কারণ, ইহার ভাষার এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা দুর্লভা বাধা হওয়া উচিত নয়। একটু আদ্যাপ বীকার করিলে পাঠক অগণিত মণিমাণিক্যের খনির সন্ধান পাইবেন। এ যুগে বাংলাদেশে যে-কয়জন ক্ষুদ্রধারমোখাবিশিষ্ট ক্ষুদ্রীয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, logical mind-এর চূড়ান্ত বিকাশ বাহানের মধ্যে হইয়াছে ছিগ্গেন্সনাথ সেই মুহূর্তেরই অন্ততম। এ যেন ব্যক্তির হাতে স্বপ্ন ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে রচিত এই বিচ্ছিন্ন কাব্য বাংলা সাহিত্যে সত্যি এক বিন্দুকের বস্তু। বেদনামবধ কাব্যের মতোই ইহা প্রকৃত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্য বঞ্চিত। কিন্তু ইহাদের অধরবের অন্ত উত্তরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমনই বা মনে করিব কেন? অবশ্য বেদনামবধ কাব্যের অন্ততম উত্তরপুরুষের অভাব নাই, সেই সব অপদার্য স্বপ্ন না হইলে বেদনামবধ কাব্যে নিঃসঙ্গ নহিবা অধিকতর প্রকট হইত। স্বপ্নপ্রয়াণের অন্ততম উত্তরপুরুষেরও অভাব—সনও কৃতার্থতা নিম্নের মধ্যে সংহত করিয়া এই বিচিত্র বিষয় আপনাতে আপনি মটল হইয়া বিরাজ করিতেছে। ✓

বাংলার শাক্তধর্ম

ঐশ্বরিকত্ব দাশগুণ

বাংলাদেশ শক্তিধর্মের দেশ এ কথা আমাদের মধ্যে বহুভাবে প্রচলিত। বহুপ্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে মাতৃপূজা বহুভাবে প্রচলিত ছিল—ঠিক মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে না পারিলেও বিভিন্ন মাতৃদেবীর সন্ধান বহু দেশ হইতেই লাভ করিতে পারি। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মাতৃপূজা প্রাচীনকাল হইতে আর পর্যন্ত ভারতবর্ষে বেদপ একটা সৌন্দর্য ধর্মরূপে প্রচলিত রহিয়াছে এবং এই মাতৃপূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি শক্তিবাদ ভারতবর্ষের সনাতন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, এমন আর অন্তর দেখিতে পাই না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে আবার শক্তিধর্মের প্রভাব সর্বাঙ্গিক। বেশি বাংলাদেশে। শক্তিধর্মের দর্শন, সাধন-প্রণালী এবং আত্মগাণিতিক বিধিবিধানের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে যে গ্রন্থগুলিতে সেই তত্ত্বশাস্ত্র বহুলাংশে বাংলাদেশে রচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় দেশ-সমূহেই শাক্তধর্মাস্তরিত গুহ্যসাধন-ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত ছিল—এ কথা মনে করিবার মতন তথা ও যুক্তি প্রচুর রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাক্ত তীর্থ এবং শক্তিমন্দির এখানে সেখানে পুঞ্জিয়া বাড়ির করিতে হয়; কিন্তু বাংলাদেশে তাহার সন্ধান নিলে সর্বত্র। এ কথাও আমাদেরিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও ঈশানপ্রসাদ, ঈশানকৃষ্ণ এবং ঈশানবিন্দ্রের নাম যে সকল প্রসিদ্ধ শক্তিসাধকের আবির্ভাব বাংলাদেশে ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্তর শক্তিপূজা প্রচলিত থাকিলেও এবং তত্ত্বশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলেও এরূপ সাধকবর্গের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। বাংলার সনাতন, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও এই শাক্তধর্মের দ্বারা যেভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে অন্তর তাহাও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই সকল কারণে বাংলাদেশকে শক্তিধর্মের দেশ বলিয়া অভিহিত করিবার একটা বিশেষ তাৎপৰ্য্য রহিয়াছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের কতগুলি তথ্য ও মত স্মরণে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশকে আর আমরা যেমন করিয়া শাক্তধর্মের দেশ বলিয়া জানি, হাজার বছর পূর্বের বাংলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শাক্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা বলিতে পারি না। শুণ্ড-সাত্ত্বাচ্যোর সময় হইতে সেন-রাজত্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে আমাদের যে ধর্মের ইতিহাস তাহার উপরান সংগ্রহ করিতে পারি আমরা বিশেষ ভাবে দুইটি দিক হইতে—প্রথমতঃ কতকগুলি দানলিপি এবং প্রশস্তিলিপি হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের নৃতিশিল্প হইতে। এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহাতে শুণ্ড পাল সেন সাম্রাজ্যে বাংলাদেশে শাক্তধর্মের কোনো প্রাধান্যের কথা মনে করিতে পারি না। বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হইলেও শাক্তধর্মকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি মৌলিক ধর্ম বলিয়াই মনে হয়। বাংলাদেশে দেবোপাসনার কাহিনী ও বিধিবিধান-সংবলিত যে কয়েকখানি পুরাণ-নামধের উপপুস্তক পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারিখ নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত; কিন্তু মোটামুটিভাবে

এগুলিকে দ্বাদশ শতক হইতে বেশি প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না, কতগুলি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের লেখাও হইতে পারে।

এই সকল পুরাণ উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আমরা যে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মাতৃ-পূজাবিধি গঢ়িয়া উঠিতে দেখি, তাহা কোনো একটা ব্যাপক ধর্মবিশ্বের পরিচয় বহন করে না। সংস্কারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই সকল পূজা বিধেয়। (শক্তিপূজা নিত্যাপ্রসঙ্গরূপে ঐষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও যে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল এমন কথা বলিবার মতন আমাদের দৃষ্টে তথ্য নাই।) আমাদের বধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল সেবীগণের আবির্ভাব এবং পূজাপ্রতিষ্ঠা ও পূজাপ্রসঙ্গের ইতিহাস লক্ষ্য করি সেই সকল সেবীগণ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবীর প্রতিভূ লইয়াই আসিয়া আবির্ভূত হন নাই; তাহার স্থানীয় সেবী—অনেকাংশে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীও। প্রতিকূল বিদেশী স্বাস্থ্যশক্তির নিষ্পেষণে উজ্জ্বলপ্রভাতির ব্রাহ্মধর্ম যখন বিপর্যস্ত তখন সমাজনেতৃদের নিরত্নতাগ হইতে ইহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া সমগ্র গুরুচর্চিতা লাভ করিবার যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে। যে ভক্তগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় সেবীগণের এই ‘মাপ্রাণ’ যত্নপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা, সেই ভক্তগোষ্ঠী স্বভাবতঃই চেষ্টা করিয়াছেন সমাজের উপরত্নতায় নবাগতা এই সেবীগণকে প্রাচীন মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া ক্রমে তাহার সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিতে।

প্রাচীন মহাদেবীকে আমরা বাংলার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তিতরূপে বেশি করিয়া পাইরাছি আমাদের শাক্তপদাবলীর মধ্যে। সাধক রামপ্রসাদ হইতেই এই পদাবলীর উদ্ভব—স্ট্যানশন, উদ্যোগ, এমন কি আমাদের বিংশ শতকে দেখিতে পাইতেছি সেই শাক্তপদাবলীর বিচিত্র প্রসার। পদাবলীসাহিত্য-রূপে বাংলার এই শাক্তপদাবলী একটি নিগূঢ় প্রবণতায় দিক্ হইতে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর সমগোত্রীয়; তাহা হইল মৌলিক মাধুর্যপ্রবণতা। সর্বৈবধর্মশালী সর্বশক্তিময়ী কৃষ্ণকে আমরা যেমন ঘরের বাসগোপাল করিয়া ঘেহের পুত্তলি করিয়া লইয়াছি আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীতে, তেমনিই সর্বৈবধর্মবদী মূলশক্তিরূপীকে বাঙালীর ভাণ্ডারীকৃতদের মধ্যে ঘেহের পুত্তলি কুমারী উষা রূপে লাভ করিয়া মধুরসে তাহার গৌরী তহুকে অরুণ ও উজ্জ্বল করিয়া লইয়াছে। আর যেখানে মা কুমারী উষা নন—গলিতচিহ্নরা, আসবযন্তা, সর্দিয়াপ্র-রসনা রণোদ্ভাসিনী, সেখানেও দেখি—

চলিয়ে চলিয়ে কে আসে, গলিত চিহ্ন আসে আকসে,

যা মা রূপে প্রকটত চলে, বলে দানক-হলে,

ধরি করতলে, সঙ্গরাসে।

কে রে কালায় শরীরে, রসিরাশোজি,

কাফিরীর রূপে কিংকর ভাসে।

কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, মর্গচক্রভাসে একাশে।

পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভঙ্করী হাঘের বীভৎস রূপকেও যথু করিয়া সেখিবার ভক্তের কি আকৃতি!

এই শাক্তপদাবলী বা গানগুলির প্রসঙ্গে আমরা প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে পারি, ইহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিবর্ধের একটা ব্যাপক রূপপ্রিয়তার সূচনা করিতেছে। (ধর্মের বিষয়বস্তু যখন লোক-

সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া ওঠে তখন বোকা ঘায়, ধর্ম সেখানে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় মানসে একটি প্রেরণারূপে দেখা মিথাকে ।) আমরা অহমান করিতে পারি যে, সপ্তদশ শতাব্দী হইতে শক্তিশ্রম এইরূপে আমাদের জাতীয় মানসে একটি গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বাংলার কোনো কোনো মনীষী বলিয়াছেন, বাঙালী যেমন নাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে এমন আর অপর কেহ পারে নাই । এই কথা আমরা আমাদের কোন্ 'মা'-ডাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি (বাংলাদেশে রচিত তত্ত্বপূরণাদিতে আমরা যে নাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছি, তাহা বাংলাদেশে ভাবিকতা-প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করিতে পারে, কিন্তু কোনো একক বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে না ; কারণ পরিমাণে কম হইলেও, অল্পরূপ শাক্ততত্ত্ব এবং শক্তিকে অবলম্বনে রচিত পুরাণ-উপপুরাণ ভারতবর্ষের অল্প কোথাও রচিত হয় নাই তাহা বলিতে পারি না । কিন্তু বাংলাদেশের আগমনী-বিজয় সংগীত এবং অস্ত্রান্ত্র অল্প শাক্তগানের স্তায় গান অল্প কোথাও রচিত হয় নাই এ কথা বলিতে পারি । হুতরাং এই গানগুলির পটভূমিতে যে একটা আত্মীয় ধর্মচেতনা স্বীকার করিতে হয়, সেই ধর্মচেতনা একটা নিম্ন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই দাবি করিতে পারে ।) এই-আত্মীয় একটা ধর্মচেতনা কোনো জাতির মধ্যে নিচ্ছই একটা বিশেষ রূপে একান্ত আকর্ষকভাবে গঢ়িয়া উঠিতে পারে না ; হুতরাং বানিতে হইবে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ইহার একটা প্রভাব ছিল (আমার বিশ্বাস, শাক্তধর্মের যে উপাদান বাংলাদেশে নানাভাবে ছড়াইয়া ছিল—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতেই আমরা তাহার ইতস্ততঃ উল্লেখ ও পরিচয় পাই) যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাহা একটা নব আবেগে নবরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ! তখন হইতে সেই আবেগকে আমরা ক্রমবর্ধমানরূপেই লক্ষ্য করিতে পারি । আমাদের উন্মিঃ শতাব্দীর বিজয়ার্থে শুধু শ্রীমদ্ভক্তকে অবলম্বন করিয়া নয়, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উপরেও ইহা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 'বিশ্বচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে 'তাহারই প্রতীকরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে । শুধু 'বন্দে মাতরম্' গানটি নয়, উন্মিঃ শতাব্দীতে বহু দেশী সংগীত রচিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় বাংলায় শক্তিশ্রমী মহাদেবীর জাতি-মজাতি-বিবিধ যোগও এই সত্য সখ্যে আমাদের কাছে অবহিত করিয়া তোলে । যিক্কেল্লালের স্তায় পাণ্ডিত্যশিক্ষিত নাট্যকারও বহন গান রচনা করেন—'চল, সময়ে দিব জীবন ঢালি ;—ঘর বা ভারত, জয় মা কালী ।'—তখন সে তথ্যটিকে আমাদের আর উপেক্ষা করা চলে না । কিন্তু শতাব্দীতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থচেতনা আমাদের ধর্মচেতনাকে বহুই বহিষ্কৃত বা তিরস্কৃত করিবার চেষ্টা করুক, আমাদের সংস্কৃতির উপরে শক্তিশ্রমের প্রভাব এখনও লক্ষ্যীয় ।

সপ্তদশ শতক হইতে আমরা বাংলাদেশে যে শক্তিশ্রমের নববেগ ও নুবরূপতার কথা ইঙ্গিত করিলাম তাহার ভিতরে আরও একটি লক্ষণীয় সত্য নিহিত আছে । আমাদের ক্ষেত্রে বাংলার এই শক্তিশ্রমের মুখ্য আশ্রয় দুর্গা নহেন, কালী ।) বাঙালীর সমাজ-জীবনের বর্ণনা করিতে গিয়াই আমরা বখনই বাড়ঘরে 'দোল-দুর্গোৎসবের' কথা উল্লেখ করি তখনই বোকা ঘায়, দুর্গাপূজা বাঙালীর অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গ হইতে উৎসবের অঙ্গরূপেই অধিক কিয়দংশ । (অথচ ভারতবর্ষের শক্তি মহাদেবী বলিতে আমরা সাধারণতঃ দুর্গাকেই বুঝিয়া থাকি ।) এ কথা মোটামুটিভাবে সবাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের শক্তিশ্রমের ক্ষেত্রে কালীর আধিকার আত্মপাতিক পরবর্তী কালে । (এই কালী দেবী বা কালিকা দেবী বাংলাদেশে কি করিয়া আসে আস্তে আস্তে মহাদেবীর স্থান অধিকার করিয়া বলিলেন এ কথা বেশ কৌতূহলজনক । যার্কণ্ডে চণ্ডী পাঠ করিলে

বেশ বোঝা যায়, যে-যুগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তখন কদমলবননা কালী দেবী এবং চামুণ্ডা দেবী অতিমহা লাভ করিতেছিলেন; তখন পর্যন্তও তাঁহারা সবারদ্বারা ব্রহ্মপুত্রভাবে সম্বোধিতা নন। চণ্ডীও বৈভবের বধগ্রন্থে এই চামুণ্ডারূপী কালী দেবীকে মহাদেবী চণ্ডী হইতে আত্মা বলিয়া মহাদেবী চণ্ডীর সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। দশম শতক হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলাদেশে বা পূর্বাঞ্চলে যে-সকল পুরাণ-উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আমরা নানাভাবে তুর্গা ও কালীকে মিশ্রিতভাবে এক করিয়া লইবার 'প্রাপণ' চেষ্টা লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীপুরাণের বহু স্থলে মহাদেবীর বর্ণনায় কৈলাসবাসিনী পার্বতী এবং মন্দোদারাবাসিনী কালীর মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে পারি। কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই, বিষ্ণুমায়ী জগদম্বী দেবী যখন দক্ষাশে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বর্ণনা হইল—

সিহব্যাং কালিকাং কৃতাং পিনোক্তুং সূর্য্যোদয়ম্ ।

চতুর্ভুজাং চাক্ষুঃ ॥ নীলোৎপলবদাঃ শুভাং ।

বদ্যন্তরাসাঃ ক্ষুদ্রবদ্যাসাঃ সর্বভাষাভিতাং ।

আরও পুনরায় চাক্ষুঃকেশীঃ মহাবদ্যম্ ।

তারপরে সত্যবেদভ্যাগের পরে হিমালয়ের গৃহে বেনকায় গর্তে দেবী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে তিনি গৌরী হইয়া দেখা দিলেন না; নীলোৎপলমলের তায় ভাষা সেই কজ্জকে দেখিয়া বেনকা পরম হর্ষাভিতা হইয়া উঠিলেন। কজ্জর এই গায়ত্রীমন্ত্র দেখিয়া পিতা হিমবানু স্বাশ্বতম্বরে কজ্জর নান রাখিলেন কালী— এবং কালী নামেই সেই কজ্জা প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

কালীতি নামা হিমবানুসুহাং কুতে গিনে ।

বাঞ্চবৈশ্ব সনৈভৈরব্যাং না পার্বতীতি চ ।

কালীতি চ তথা নামা কীর্তিতা পিরিন্দিবী ।

(মহাদেবের সহিত বিবাহ হইবার পরে এই কালী কি করিয়া গৌরী হইলেন এই বিষয়েও একটি অদ্ভুত উপাখ্যান দেখিতে পাই। একদিন পার্বত্যবনপ্রদেশে স্বর্গীয় ঈশ্বরগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাহাদের সম্মুখেই শিব বাক্য করিয়া দেবীকে 'কালি ভিগ্নাশ্বতম্বরে' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। দেবী কালী তাহাতে নিজেই অপমানিতা মনে করিয়া মর্মাহত হইলেন এবং সেই হইতে সংকল্প গ্রহণ করেন যে, যে-পর্বত সেহে স্বর্গগৌরী লাভ না করেন সে-পর্বত আর শিবের সহিত মিলিত হইবেন না। তাহার পরে কালী দীর্ঘদিন হিমালয়ের এক নির্জন প্রান্তে গিয়া কঠোর তপস্বী করেন— সেই তপস্বীর দ্বারা তিনি গৌরী স্বরূপ লাভ করিয়া গৌরী হইয়া উঠিলেন। এই গৌরীরূপে তিনি শিবের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে মিলিয়া অধনারীশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। এই সকল কিংবদন্তী এবং উপাখ্যান বাংলাদেশে শক্তিসাধনার কেন্দ্রে কালীর ক্রমপ্রাধান্যভায়ে ইতিহাসেরই তথ্য সংবোধ করে। ইহার সহিতই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে বাংলাদেশে ধর্মেরা শক্তিসাধক, কালী তাহা প্রভৃতিই তাহাদের মূখ্য আশ্রয়। ✓

অনু-পুরাণ-উপপুরাণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া এই যে শক্তিসাধনা ও মাহত্ম্য, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য এবং প্রচার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তানীলগণের মন আধিকার করিয়াছে। এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চালু হইয়া গিয়াছে— সে উত্তর

হইল, বাংলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। সাধারণতঃ ধর্ম হইয়া থাকে যে, মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা বৈদিক বা আৰ্যসংস্কৃতিজাত নহে, ভারতবর্ষের আৰ্যের আদিম জাতিগণের মধ্যে হইতে এই মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসামান্য-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং আৰ্যগণের তৎকালের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উরুকাটির জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই আৰ্যের আদিম অধিবাসিগণ সৎকে আবার একটা সমাজতাত্ত্বিক সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আৰ্যের আদিম অধিবাসিগণ ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক আৰ্যগণ সমাজব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া বৈদিক ধর্ম পুরুষসংকলিত প্রাধান্য; আবার আৰ্যের সমাজের এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃসংকলিত এবং মাতৃ-উপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক এই তথ্যটিকে আমরা অতি সহজেই এতদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এই জন্য যে, এই তথ্যটির মধ্যে একটি গূঢ়ার্থ নিহিত আছে। নাহুবের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিলে আমরা বহু স্থলে দেখিতে পাই, নানা ব্যাবহারিক কারণে আমাদের সামাজিক জীবনে যে জিনিগটি একটি বহুমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মব্রূণ অর্জন করিয়া বলে। সেখা দ্বারা, বাহ্যিক অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজচিন্তার কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবৃত্তিতে বা ধর্মজ্ঞানে রূপান্তর। প্রাচীন বৈদিক সমাজ নীতিপ্রধান দেশের অধিবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা সত্য যে তাহাদের সমাজজীবনে অগ্নির প্রয়োজন অতিশয় ছিল, অগ্নি-প্রজ্জ্বলন এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। অগ্নির এই বহুপ্রয়োজন এবং তৎ-সেতু বহুমূল্যই হয়ত ক্রমে ক্রমে বৈদিক সমাজে অগ্নিকে একটি ধর্মব্রূণ দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত অগ্নি এবং অগ্নিপ্রজ্জ্বলনবিধি ও অগ্নিসংরক্ষণব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক ব্রহ্মধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল— তাহার পরে ধর্মজ্ঞানরূপে তাহার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে নানা সংস্কৃতির অর্থ সংস্কৃত এবং উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। আদিম আৰ্যের সমাজগুলির মধ্যে 'বা' কন্তগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণে দেখা দিয়াছিল। সামাজিক দিক হইতে আমরা দেখিতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল—কলে সমাজের পিতৃপরিচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত; মাতৃপরিচয়েই সমাজের পরিচয়—এবং এই কারণেই বা পরিবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণে দেখা দিয়াছিলেন। অনেকে আবার মনে করেন, আৰ্যের এই জাতিগুলির আর্থিক জীবন নির্ভরশীল ছিল মুখ্যভাবে কৃষির উপরে। এই কৃষিকর্মে বীজবপন হইতে ফলসংগ্রহ এবং গৃহে শস্যসংরক্ষণ সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী— তাহার ফলে আর্থিক জীবনেও মায়ের প্রাধান্য অস্বত্ব হইত। এইভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বা পারিবারিক জীবনে এবং সমাজজীবনে যে বহু মূল্য লাভ করিলেন তাহাই এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল।

এ কথা আর সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলাদেশ মুখ্যভাবে আৰ্য-অধিবাসিত দেশ নহে; এ দেশের সমাজসমূহে আৰ্যরক্তের বিশ্রণ অধিক নহে—এবং এই কারণেই হয়ত দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আৰ্যপ্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে দেখা দেয় নাই। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে উরুকাটির জনগণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু আৰ্যপ্রভাব দেখা গিয়াছে; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ বৈদিক আৰ্যপ্রভাব বলিতে পারি না—একটা সমন্বয়কৃত বিশ্র হিন্দুপ্রভাব। এই হিন্দুপ্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব।

পাল-রাজ্যে এই বৌদ্ধপ্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল—সেন-রাজ্যে একটা হিন্দু পুনরুত্থানের আভাস। এ পর্যন্ত শক্তিধর এবং মাতৃপূজার চিহ্ন গৌণরূপে এখানে-সেখানে প্রকট—মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মভেদের উপরে ধ্বন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজসেহের স্বভাব প্রবৃত্তি হইতে এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল—এক তাহার ফলেই দ্রবত বাংলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনার এক প্রণালী।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আরম্ভকাল আমরা সেখানে পাইতেছি, উপরিউক্ত মতটি সর্বাংশে গ্রহণীয় নহে। প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক বা অনার্থ এ কথা বলিবার বৈজ্ঞানিকতা সেখানে পাইতেছি না। (প্রাচীনতম বৈদিক যুগে মাতৃসেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়ায় ও যজুর্বেদে, অথর্ববেদে এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-আর্য্যাক-উপনিষদগণিতে বিভিন্নভাবে সেবীর উল্লেখ পাইতেছি। তাহা ছাড়া আরো একটি সংস্কার সম্বন্ধে আমাদেরগকে অবহিত হইতে হইবে) বাহা কিছু অবৈদিক তাহাই যে অনার্থ এমন কথা মনে করিবারও আমাদের কোনো কারণ নাই। ইহা ছাড়া পূর্ব্বাশোচিত মতটি সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি হইল এই যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার প্রচলন হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আরো বহু স্থানে এই-স্বাতীর্থ মাতৃপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-স্বাতীর্থ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর বহু স্থানে বহুপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।

সামাজিক মাতৃতান্ত্রিকতা এবং মাতৃপূজার প্রচলন বিষয়ে আধুনিক কয়েকজন নৃতত্ত্ববিৎ কে-সকল নূতন তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন সেদিকেরও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত। (পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে প্রাচীনকালে মাতৃসেবী ও তাহার পূজার প্রচলন ছিল।) গ্রীসের বৃহী সেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিগি, ইজিপ্টের ইয়াব, ইন্দিয়া প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃসেবীর এই প্রশংসা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ‘ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহিনী এক পার্বতী (পর্বতবাসিনী) সেবীর পূজা প্রচলিত ছিল; তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।’ ভূমধ্যসাগরীয় এই সকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহু প্রাচীন নারীমূর্তিও আবিস্কৃত হইয়াছে; এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই হুঁচিৎ করে বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া কোন্ সময়ে এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে আদিম স্মৃতিগুলির মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল—এ বিষয়েরও নৃতত্ত্ববিদগণ একটা মোটামুটি অনুমান করিয়া শইয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভূমধ্যসাগরীয় এই সকল অঞ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই আধুনিক সমসাময়িক আরও কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যের আবিস্কার করিয়াছেন। এই তথ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতগুলি কবর। এই কবর খননের দ্বারা তাহার দুইটি দুইটি করিয়া পাশাপাশি শায়িত কতগুলি নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। কঙ্কালগুলি পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দুইটি কঙ্কালের একটি কঙ্কাল পুরুষের, একটি কঙ্কাল নারীর; আরো পরীক্ষা দ্বারা তাহার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাশি শায়িত যে কঙ্কাল রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষটির বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বেশি। তাহার মনে করিয়াছেন যে, কবরে পাশাপাশি শায়িত এই কঙ্কালদ্বয় স্বামি-স্ত্রীর কঙ্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে ঐ অঞ্চলে দ্রবত সহমরণস্বাভাবী কোনো প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠতা তৎকালীন সমাজ-নীতিতে মাতৃতান্ত্রিকতা হইতে পিতৃতান্ত্রিকতার দিকেই অবিকতর ইঙ্গিত দান করে। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী

অকলে যখন মাতৃসুভাষার প্রচলন ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক মাতৃভাবিকতার প্রচলন ছিল না। অবশ্য নৃতত্ত্ববিদ্যা এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিবার মতো বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি এই সকল তথ্য এবং সূত্রকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারি না।^১

আমি আমার পূর্বপ্রবন্ধে যে কথা বলিয়া আসিয়াছি যে, মাতৃসুভাষা এবং শক্তিসাধনার প্রচলন বাংলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও ঐক্যীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা বাংলাদেশে একটি নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে তত্ত্বসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাংলাদেশে এবং তৎসংশ্লিষ্ট পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তত্ত্বপ্রভাব ঐক্যীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তাত্ত্বিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল।^২ আমার ধারণা, বাংলাদেশে হত হিন্দুত্ব প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটি ভাবে ঐক্যীয় দ্বাদশ শতক হইতে ঐক্যীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত।^৩ বাংলাদেশের এই হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধত্ব বলিয়া যে দুইটি ভ্রান্তিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহ মনে হয় না। সংস্কারবদ্ধিতাভাব বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের তত্ত্বসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্মধ্যে বর্ণোপাধিকারিক নবস্রাবগুলি বড় কথা নয়— বড় হইল যেহেতুই যন্ত্ররূপ করিয়া কতগুলি গুহ সাধন-পদ্ধতি। (এই সাধনপদ্ধতিগুলি পরবর্তী কালের দোকানত বৌদ্ধধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বৌদ্ধত্বের সৃষ্টি করিয়াছে, আমার হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হিন্দুত্বের রূপধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ 'প্রজ্ঞা-উপারের' পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাসম্পন্ন সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদান্বিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তত্ত্বসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোহাকাব্য এবং চণ্ডীগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার এবং বিশেষ বিশেষ বাড়ল সম্প্রদায়ের মধ্যে।

অন্ততঃ সে প্রজ্ঞার বংশের ধরিয়া বাংলাদেশে এই একটি তাত্ত্বিক ধারা-প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে— তাহা স্থির সিদ্ধান্ত না হইলেও স্বয়ংগণের বিচারের অল্প উপস্থাপিত করিতেছি। আক্ষকাল আমার ভারতবর্ষের বহু স্থানে তত্ত্বসাধনা এবং তত্ত্বসাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সম্ভান পাইতেছি বটে, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই তাত্ত্বিকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিমে কান্টার হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কাম্বুজ এবং বাংলাদেশ— হিমালয়-পর্বতসংলগ্ন এই ভূভাগকেই বোধ হয় বিশেষভাবে তাত্ত্বিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয়সংলগ্ন এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কি তত্ত্ববর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন? তত্ত্বাগার 'চীনাগার' নামে সুপ্রসিদ্ধ, বর্ণিত চীন বা মহাচীন হইতে এই তত্ত্বাগার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রতীতিও সুপ্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তীও আমাদের অগ্রহামনাই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তত্ত্ব অনেকগুলিই কান্টারে রচিত; বহু-কানরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তত্ত্বের রচনা স্থান— নেপাল-ভূটান-তিব্বত অঞ্চলে এগুলির

বহুল প্রচার এবং অস্বাভাবিক সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীতও পার্শ্বপ্রমাণরূপে আমরা আরো কতগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি। তন্মধ্যে সেই বইটাকের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নিম্নতম মূল্যধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রম্যাক্ষরকে লইয়া এই বইটুক। এই ছয়টি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন— নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ স্বাক্ষর হইলেন ডাকিনী, লাকিনী, লাকিনী, লাকিনী, লাকিনী এবং হাকিনী। এই নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, 'ডাক' কথাটি তিব্বতী, অর্থ জানী; ইহারই প্রিলিঙ্গে ডাকিনী। আমাদের 'ডাক' ও বনার বচন'র ডাকের বচন কথার মূল অর্থ বোধ হয় জানীর বচন। ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধ হয় ছিল 'গৃহজ্ঞানসম্পন্ন'; আমাদের বাংলা 'ভাইনী' কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; যথাস্থানের নাথসাহিত্যের রাস্তা গোপীচাঁদের মাতা মহানমতী 'মহাজ্ঞানসম্পন্ন' এই-মাতাও 'ভাইনী' ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাকিনী' দেবী কোনো নিম্নজ্ঞানসম্পন্ন তিব্বতী দেবী হইবেন। 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' নামে ভারতবর্ষের অত্র কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতেছি না, কিন্তু ভূতানে 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল-ভূতান অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবীরাই কি তন্ময় বইটাকের মধ্যে আপন আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তন্ময় মধ্যে মন্মথের অভিশপ্ত প্রাধান্য। এই মন্মথের বিভিন্ন দিক্ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না করিয়াও কতগুলি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্ময় মন্মথদের মধ্যে আমরা বীজমন্মথের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বীজমন্মথগুলি সাধারণতঃ একাকরী। এই একাকরী বীজমন্মথ সন্মতের মধ্যে প্রথম বা 'ও' সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্মথ। অত্র মন্মথগুলি বৈদিক বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রীঃ স্ত্রীঃ ঐ হৈ ক্রীঃ প্রভৃতি মন্মথ মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাভাষ্যে কি না এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে। এই বীজমন্মথ ব্যতীত তন্ময় মধ্যে আমরা আর-এক রকমের মন্মথও পাই, এই মন্মথগুলি সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক— ইহাদের কোনো অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। মহাবানী বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ একস্থানে বলিয়াছেন যে, এই অর্থহীনতাই ইহাদের স্বার্থ ভাঙ্গণ। অবশ্য অর্থহীন মন্মথ অর্থবোধ বেসের মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্ময় যে একাকরী বীজমন্মথের এবং বাকরী মন্মথের বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত ব্রাহ্মণ্য হইবে যে, এগুলি আমাদের পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক অঞ্চলের কোনো প্রাচীনকালে প্রচলিত ভাষার লুপ্তাবশেষ? আমরা সাধারণ ভাবে যাহাকে চীনাঙ্কল বা মহাচীনাঙ্কল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছি সেখানকার ভাষায় একাকরিত্ব বা দ্ব্যাকরিত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে মনন রাখিতে হইবে।

বাংলার নবজাগরণে বিশ্বং-সভার দান

ইয়ং বেঙ্গলের যুগ

বিলয় ঘোষ

বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণ বিজ্ঞোদীরা যখন মানিকতলার বাগানবাড়িতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে নানারকম সম্ভাষা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন বাইরের জনসমাগে তাই নিয়ে হুহুগুজন হলেও, ঠিক কলরবের স্রষ্টা হয় নি। বিশ্বং-সভার নিয়মিত পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল দলের তরুণদের বাকসুন্দর অব্যাহত ধারায় চলছিল। এমন সময় বাইরের নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে হঠাৎ ফেন আন্দোলনের জোয়ার এল। তরুণের পর তরুণ উদ্ভাস হয়ে উঠল ক্রমে। বৈঠক সভাদাহ-প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন (১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর)। বিশ্বদীর বিধান বানচাল করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রতিপক্ষের বাসবানেকের মধ্যে "ধর্মগতা" নামে এক সভা গঠন করলেন (১৭ জাহুয়ারি, ১৮৩০)। মাস ছয়েকের মধ্যে পাত্রি আলেকজান্ডার ডাক সতীক কলকাতায় পৌছলেন (২৭ মে ১৮৩০)। উদ্বেগ, ঐশ্বর্যের প্রচার ও পাকাত্য শিক্ষার প্রসারের পথ পরিষ্কার করা। কলকাতায় পৌছেই তিনি নিশানারিহৃত উত্তম কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ডাক সাহেব কলকাতায় পৌছবার ছ মাস পরে রামমোহন রায় বিলাত বাত্মা করলেন (১২ নভেম্বর, ১৮৩০)। তার প্রায় একমাসের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শগুরু জিরোজিওর অকালমৃত্যু হল (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। নবযুগের পথিক্ত রামমোহন ও বিদ্রোহী তরুণদের মন্ত্রদাতা জিরোজিও, বাংলায় সমাজ-স্বীবনের এমনই এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে থেকে বিদায় নিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের উত্তরাধিকার বহন করার সমস্ত দায়িত্ব পড়ল নবীনদের উপর। নবীমরা সেই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। সংগ্রাম ও প্রগতি একসঙ্গেই চলতে লাগল। এই প্রস্তুতির পর্বে বাংলাদেশে সভাসমিতির বিকাশ হল অনেক। তার মধ্যে বিশ্বং-সভাই বেশি।

ইংলণ্ডের ক্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ সালে (২৭ ডিসেম্বর) রামমোহনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার নবযুগের ইতিহাসের একটি পর্বান্ত হল বলা যায়। প্রবাসে থাকলেও, বাংলার অগ্রগামী দলের আন্দোলনের পক্ষেতে তাঁর বিরাট পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের কোনো প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। ১৮২২-৩০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়, যার প্রভাব বাংলার সমাজ-জীবনে গভীর ও দূরপ্রসারী। বিলাতে থাকলেও, রামমোহন বাংলার এই সাময়িক আলোড়ন দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন নিশ্চয়। ফিরে এসে তিনি এই আন্দোলনকে কোনো স্থানিষ্ঠ পথে পরিচালিত করতে পারতেন কি না, তা নিয়ে আশ্ব গবেষণা করে লাভ নেই। সম্পূর্ণ না পারলেও, তার অসংখ্য ও আতিশয্যের দিকটাকে ছেড়ে তিনি প্রগতিশীল করতে সাহায্য করতে পারতেন। ঘটনা-চক্রান্তে তা যখন সম্ভব হল না, তখন ইতিহাস তার নিজের পথই খুঁজে নিল। সে-পথ আবর্তন-মূল পথ।

ক্রমবাহিত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের সমাজপ্রাঙ্গণ কলরবমুখর হয়ে উঠল। ইতিহাসের এক নতুন কলরব, প্রাণহীন স্থিতিশীল সমাজে বা পোনা বাঘ না করনো। বন্ধ জোবার পাড়ে তরঙ্গ প্রতিহত হয় না। সমাজের মধ্যে যখন প্রবল ঘোড় বইতে থাকে, তখন তার তরুণের আঘাতে জীয়ে ভাঙন ধরে। সমস্তার

পর সমস্ত, স্থপ্ত লোকচেতনাকে জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত চেতনার বিশ্বব্দের সাময়িক ঘোর স্বপন কেটে যায়, তখন সমস্তার সুশোধিত সে সোজা হয়ে গড়ানোর চেষ্টা করে। সকলে এক দিকে বা এক ভরীতে গড়ায় না। কেউ গড়ায় সামনে, কেউ পিছনে, কেউ পাশে। নানা মত ও নানা পথের চাপে বিদীর্ণ হয়ে যায় সমাজ। স্বয়ং ও বিরোধের ভিতর দিয়ে নতুন পথ নির্মাণ করে এগিয়ে চলে মানুষ। সমাজ-জীবনের নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধন এই ধরনের ঐতিহাসিক সংঘাতকালে রণাঙ্গনে পরিণত হয়। আলোপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোড়ন-আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন প্রাণচাকলা আত্মপ্রকাশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৮২৫-২০) বাংলার সমাজ-জীবনে এই সব বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তখন সভাসমিতিরও বিকাশ হয়েছিল যথেষ্ট। রামমোহন ও ডিরোজিওর স্বভাবে নবীনরা প্রায় অভিব্যক্তনীয় অবস্থায় আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রাচীনদের দলে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক শক্তিও খুব সংহত ছিল। নবীন ও প্রাচীনের মধ্যে, নবীনরা সব দিক দিয়েই খুব দুর্বল ছিলেন। তার উপর তাঁদের কোনো প্রবীণ পরিচালক বা পরামর্শদাতা কেউ ছিলেন না। স্বতন্ত্রাৎ একত্রে দল বেঁধে নিলেমিশে, সভাসমিতি গঠন ক'রে, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশেষ কোনো 'খুব' হিসেবে আপ্যাদিত হলে এই সময়টাকে 'ইং বেকলের খুব' বলতে হয়। এই খুবের সভাসমিতির সংখ্যা নয় শুধু, বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল, সভা-গঠনের উদ্দেশ্যের ঐক্য। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধা আলোচনা ও বেলোমেশার আদর্শ নিয়েই সব সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল।

ঘটনাক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ না দিলে, কিতাবে তার স্বতন্ত্রভাবে বাইরের সমাজে বিস্তারিত কল্পিত হলে এবং সেই বিস্তারিত দলে বিভিন্ন সভাসমিতির বিকাশ হল, তা পরিষ্কার বোঝা যাবে না। ১৮২২ সালের শেষে বেকিট আইন করে সভাসমিতি বন্ধ করে দিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে গোড়া দলবলীল হিন্দুসমাজ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাঁদের প্রতিবাদের নিমিত্তে কলকাতা শহর কঁপে উঠল। ইং বেকল দল বিজ্ঞপ্তি ক'রে ধর্মভার নাম দিলেন 'গুড্‌ম সত্য'। আইন বাতিল করার ক্ষমতা তাঁরা ইংলেও প্রতিনিধি পাঠাবেন, স্থির করলেন। বিশ্বব্দের হল, যে-ব্যক্তি তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তিনি গোপীমোহন দেব বা ভবানীচরণের মেশের লোক নন, বেকিটের মেশের লোক। তাঁর নাম মি: বেবী। এই বেবী সাহেব "অলেকসান্ডার" নামে এক জাহাজে করে বিলাতবাস্তব করেন, ধর্মভার প্রতিনিধিরূপে সেখানে বেকিটের আইনের বিরুদ্ধে আপীল করার ক্ষমতা। কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি নদীপথেই জাহাজটি ডুবে যায় এবং বেবীও মারা যান। অস্ত্রান্ত নাবিকরা নাকি বলাবলি করে যে, জীবন্ত নারীকে দগ্ধ করে হত্যা করার কুনীতির সমর্থক বেবী সাহেবের মতন একজন পাণ্ডিত নরায়ন জাহাজে থাকার ক্ষমতা জাহাজটি ডুবে যায়।^১ বাই হোক, সভাসমিতি-নিবারণ আইনের স্বাভাবিকভাবেই স্বযোগ নিয়ে সনাতনধর্মপরায়ী হিন্দু কলেজের নবান্ধকার দলগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সমস্ত পুণীকৃত আক্রোশ হিন্দু কলেজের পাকাতা শিক্ষার উপর বর্ষিত হতে থাকল। বারো-তেরো বছর হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পাকাতা বিস্তার শিক্ত নতুন একটি বিশ্ব-সমাজের (Intelligentsia) বিকাশ হয়েছে কলকাতা শহরে,

যার সঙ্গে সেকালের পণ্ডিতসমাজের পার্থক্য অনেক। তার সব কলাকল্যাণই যে ভালো হয়েছে, তা নয়। তা হয় ও না কখনো। নতুন কোনো নীতি বা জীবনদর্শন যখন বাইরে থেকে সমাজের মধ্যে আনমানি হয়, তখন প্রথম দিকে সেটা অনেকটা বিচ্যেদনের কাজ করে। কিছুদিন পরে তার প্রাথমিক উত্তাপ-উত্তেজনা যখন কমে যায়, তখন আবার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে। ১৮৩০ সালে উত্তাপ-উত্তেজনার মাত্রাই বেশি ছিল। স্বতরাং অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি ছিল না, তা নয়। ধর্মতাপময়ীরা সেই সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন। ডিরোয়িঙের মতন শিক্ষকের শিক্ষা ও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতন বিতর্কসভার অবাধ আলোচনা-আলোচনার ফলেই যে সমাজের নৈতিক বিনিময় ভেঙে যাচ্ছে, এ অভিযোগ প্রাচীনপন্থীরা উঠে-থরে করতে লাগলেন।

প্রাচীন ও নবীনের এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের উল্লেখপূর্বে ডাক সাহেব এসে পৌঁছলেন কলকাতা শহরে। জালবিহারী সে লিখেছেন : "When Duff arrived in Calcutta, the evil effects of a purely secular education was beginning to manifest themselves." তিনি দেখলেন, কলকাতা শহরের নবীন শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা মানসিক বিপ্লব ঘটে গেছে। তাদের মতামত অত্যন্ত উগ্র, তাদের পথও বিচিত্র। এই নবীনদের দিকে চেয়ে, তাদের জবিয়াতের কথা ভেবে, ডাক সাহেবের যেমন আনন্দ হল, তেমনই ভয় হল :

"He witnessed the revolution which the minds of the intelligent youth of the city were undergoing : the wildness of their views ; the reckless innovations they were introducing ; the infidel character of their religious opinions ; and the spirit of unbounded liberty, or rather, licentiousness, which characterised their speculations. He contemplated this scene with mingled feelings of joy and fear."

ডাক সাহেবের এই আনন্দের কারণ কি ? ভয়েরই বা কারণ কি ? আনন্দের কারণ হল, তিনি এসে এদেশে এমন একদল যুবককে (ইং: বেঙ্গল) দেখতে পেলেন, যারা যে-কোনো বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, অবাধে আলোচনা করতে শিখেছে। ভয়ের কারণ হল, তারা যে শিক্ষা পাচ্ছে, তার মধ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই। এসব কথা তিনি নিয়েই লিখে গেছেন। "অত্যন্ত সমস্ত দিক দিয়ে এই নবীন যুবকের দল তাঁর উদ্বেগসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করলেও, ধর্মের প্রতি তাদের বিরাগ সেখাে তিনি শব্ধিত হলেন। কোনো ধর্মের প্রতি তাদের অস্বাভাবিকতা নেই, এমন কি অস্বাভাবিকতা পর্ষন্ত নেই, তাদের কাছে তো খ্রীষ্টধর্মের কথাও বলা যাবে না। এই হল ডাক সাহেবের ভয়ের কারণ।

রাবিনোহন রায় তখন প্রৌঢ়বয়সে সীমাবদ্ধ পৌঁছেছেন। ডাক সাহেব যখন কলকাতায় এলেন, তখন তিনি আলা-নিরাফার বেধ্যয়ত্বের মধ্যে তাঁর জীবন-অপরাধের দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। তবু তিনি তখন কলকাতার বাঙালীসমাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাই ডাক সাহেব যখন তাঁর পরিচয়পত্র মেনারেল বাটসনের কাছে পেশ করেন, তখন তিনি বলেন—"You must at once visit the Raja and I will drive you out on an early evening." ডাকের চরিত্রকার জর্জ শ্মিথ এই প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন রাবিনোহন সম্বন্ধে—"justice has never been done to this Hindoo reformer, the

Erasmus of India." কৃপাটী বিখ্যাত নয়। শিখের দুঃখ হল, ঐরানপুরের পাণ্ডিত্য তাঁর সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে অনর্থক তর্ক ক'রে উঠকে বিরক্ত করেছিলেন। তাই তিনি আক্শেপ করে বলেছেন : "If Rammohan Roy had found Christ, what a revolution there would have been in Bengal."* ডাক সাহেব অবশ্য সেতক্য তুল করেন নি। তিনি যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁকে বলেন, তখন রাবমোহনই তাঁকে নিষেধ বোঝার পাড়ি ক'রে চিৎপুর রোডে নিয়ে যান, কিরিকী কদল বহুর সেই ঐতিহাসিক বাড়িটিতে। বাইরের যে ঘর দুখানিতে ব্রাহ্মসভার অধিবেশন হ'ত, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই ঘরই তিনি মাসিক ৫৭-৫৫ টাকা ভাড়া ডাক সাহেবকে বাবদ্য করে দেন। ডাক সাহেব সেখানে ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে (কলকাতায় আগার দু মাসের মধ্যে) "রেনোয়েল অ্যাসেম্বলির ইনস্টিটিউশন" প্রতিষ্ঠা করেন। ঘরের টানাপাণ্ডার নিকে আত্মল দেখিয়ে রাবমোহন রায় হেসে ডাক সাহেবকে বলেন : "I leave you that as my legacy."*

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে ডাক সাহেব কান্ত হন নি। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তাঁর আদর্শ ক্ষেত্রও তখন প্রসারিত। বৃদ্ধিমান ডাক নতুন পথ ধরে অগ্রসর হলেন। তাঁর বাড়ির একতলার হলঘরে খ্রীষ্টধর্ম গৃহে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হল। বক্তৃতার পর প্রোভারো স্বাধীনভাবে সনালোচনা করতে পারবেন এবং বক্তাকে প্রশ্ন করতে পারবেন, স্থির হল। আগস্ট মাসের গোড়ার নিকে (১৮৩০) ছিল সাহেব প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বাকসের গোলায় যেন অগ্নিসংযোগ করা হল। বাদপ্রতিবাদের কোলাহলে কলকাতা শহর সরগরম হয়ে উঠল। ডাক সাহেব নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

"The whole town was literally in an uproar...It is impossible to conceive or describe the wide and simultaneous sensation produced...The prevalent idea seemed to be, that bysfair means or foul—by bribery or magical influence—by denunciation or corporeal restraint—we were determined to force the young men to become Christians."*

অভিভাবকদের অভিযোগে ও ছাত্রদের বাবহারে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষও এই সময় বিচলিত হন। কলেজের ছাত্রেরা কোনো ধর্মালোচনার সভায় যোগ দিতে পারবে না, এই মর্মে তাঁরা এক আবেদন জারি করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষের এই আচরণের তাঁর প্রতিবাদ ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকার প্রকাশিত হয়। তাঁরা উক্ত আবেদনকে "tyrannical", "absurd and ridiculous" বলে মন্তব্য করেন। তাতে অবশ্য কোনো ফল হয় নি।

১৮৩০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা শহর, তথা সায়া বাংলাবেশের উপর দিয়ে নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে যখন তুমুল বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়, তাঁর কয়েকদিন পরেই (১২ নভেম্বর, ১৮৩০) রাবমোহন রায় কলকাতা ছেড়ে বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি বাংলাদেশে। সামগ্রিক অগ্রগতির যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, পরবর্তী ঘটনায় বাস্তবপ্রতিঘাতে যখন তা ঐতিমত আবর্তন-কূল হয়ে উঠল, তখন তিনি রহস্যক থেকে বিবাহ নিলেন। তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী ধর্মের তিনি রেখে গেলেন, তাঁরা বয়সে সকলেই নবীন, যৌবনের উদ্দামতায় ঝকল ও অস্থির। এমন কি তাঁদের প্রত্যক্ষ মস্তক ডিরোজিও পর্যন্ত একজন নুবক বাত্র। দশটা সোমাহুজি নবীনের সঙ্গে

প্রাচীরের, বৌবনের সঙ্গে স্ববিরুদ্ধের মধ্যে পরিণত হল। কে-কোনো সমাবেশের একমুখী সংঘাত অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশেও হয়েছিল।

সভাসমিতির প্রাচুর্যের সামাজিক কারণ

এই রকম সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভাসমিতির বিকাশ হয়। এটা আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। অস্ত্রাশ শতাব্দীর ইতিহাসেও তাই দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ যুগের সভাসমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি বলতে বা বোঝায়, তার বিকাশ হয় নি। ইটালীতে রিনেসান্সের “হিউম্যানিস্টিক অ্যাকাডেমি”-গুলির আদর্শে ইয়েরোপে সোসাইটি ও অ্যাকাডেমির কিছু-কিছু বিকাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে সম্মিলিতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরিবেশ তেমন তৈরি হয় নি। সামাজিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরাও এ কথা স্বীকার করেন—

“...the world had not known until the eighteenth century any societies organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds of merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers; but there had never been...anything like societies, let alone a whole network of societies, for the avowed purpose of collective thinking and talking.”

সভা সমিতি সোসাইটি—“for the avowed purpose of collective thinking and talking”—একন্যায় সমস্ত-সংস্কৃত সংঘাতমূলক সমাজেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ও ভাগিদে গড়ে উঠতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজবিপ্লব (আমেরিকান ও ফরাসী) বাহ্যের চিরন্তন একমুখী চিন্তাধারাকে বহুমুখী করে তোলে। অনেক গ্রন্থ, অনেক সমস্ত ও সংসদ বাহ্যের মনে আগু, যার সহস্র ও সমাধান চায় সে। তার ফলে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় সম্মিলিতভাবে। এই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়। এই সব সভা-সোসাইটির মূলনীতি হল স্বাধীন চিন্তা (Freedom of Thought), অবাধ আত্মপ্রকাশের (Freedom of Expression) ও পরস্পর-মিলনের (Freedom of Association) অধিকার। নবযুগের গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনটি প্রাণন স্তম্ভ, নব্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যার অস্তিত্ব ছিল না। এই সমাজ ইয়েরোপে Free-thinker-দের আন্দোলনও আরম্ভ হয়। ভল্টেরার এই অবাধ চিন্তাপরীক্ষার বলতেন, “franc-pensants” এবং নবযুগের আলোকপরীক্ষার লক্ষ্য করে তিনি উপদেশ দিতেন—হৃদয়-গোষ্ঠী ও চক্র গঠন করে একত্রে বেলাবেশ্য করতে, একত্রে আহারবিহার করতে, একত্রে আলাপ-আলোচনা করতে, সভা করতে। এই আদর্শের প্রেরণার ফলে সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল খুব এবং তাদের বলা হত “les sociétés de pensée”. হবস তাঁর Leviathan গ্রন্থে “Captivity of Understanding”—এই কথা বলেন এবং স্পিনোজা তাঁর Tractatus theologico-politicus-এ বাহ্যের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেন। লুক ও হিউমের রচনাও বাহ্যের চিন্তাবিদ্যার পথ পরিষ্কার করে দেয়। সমাজ

উপরে, *Rights of Man* ও *The Age of Reason*-এর লেখক টম্ পেইন (Tom Paine) নবযুগের নবীন সনাতনের চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করেন, বোধ হয় কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ছাড়া আর কোনো চিন্তানায়ক পরবর্তী কালে তা করতে পারেন নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভট্টেয়ার, হিউন, লঙ্, টম্ পেইন প্রমুখ নবযুগের চিন্তানায়কদের রচনাবলী এখাকারে কলকাতার বন্ধরে আবদানি হতে থাকে। বিশেষি মর এ শোধিন জিনিদপত্বরের সপ্তে এই সব গ্রন্থের কথা কলকাতার ব্যবসায়ীরা তখনকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রচার করতেন। *Calcutta Chronicle*, *Calcutta Gazette*, *Morning Post* প্রভৃতি কলকাতার ইংরেজি পত্রিকায় একেদন অনেক বইয়ের বার্তা প্রচারিত হত। এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে মানাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। বোম্বা যায়, বিশেষ থেকে কেবল যে পোট গুয়াইন, ব্রিন, ক্লায়েট, ব্রাণ্ডি আসত তা নয়, তার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি উত্তেজক পদার্থ আসত— যেমন ভট্টেয়ারের গ্রন্থাবলী, হিউনেদ গ্রন্থাবলী, টম্ পেইনের গ্রন্থাবলী ইত্যাদি। ইং বেসলের সমালোচকরা একচক্ষু নিয়ে কেবল এই ব্রাণ্ডিই দেখেছেন, বইগুলো দেখতে পান নি।

ব্রাণ্ডি ও বইয়ের বিপ্লব

এক হাতে ব্রাণ্ডি, আর-এক হাতে বই নিয়ে ইং বেসল হল চিন্তাবিপ্লবের উল্লসেগ করছিলেন। তাঁদের ব্রাণ্ডি-প্রীতির কথা অনেকে বলে গেছেন, কিন্তু নবযুগের চিন্তানায়কদের প্রচারিত আদর্শের প্রতি অহুসারগের কথা তেননভাবে কেউ বলেন নি। এই আদর্শ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ প্রচার-নাথম মুহিত বইয়ের মাঝকত দমাখে প্রচারিত হয়। বাংলাদেশেও হয়েছে। কিভাবে হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নবযুগের অস্ততন চিন্তানায়ক টম্ পেইনের গ্রন্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় আবদানি হয়েছ। দৃষ্টান্তটি পাত্রি ডাক সাহেব উল্লেখ করেছেন। ইং বেসলের আদর্শগুরুদের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"Their great authorities...were Hume's *Essays* and Paine's *Age of Reason*. With copies of the latter, in particular, they were abundantly supplied... It was some wretched bookseller in the United States of America who— basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars despatched to Calcutta a cargo of that most malignant and pestiferous of all antichristian publications. From one ship a thousand copies were landed, and at first were sold at the cheap rate of one rupee per copy; but such was the demand that the price soon rose, and after a few months, it was actually quintupled. Besides the separate copies of the *Age of Reason*, there was also a cheap American edition, in one thick vol. 8vo, of all Paine's works including the *Rights of Man*, and other minor pieces, political and theological."

১৮০১-০২ সালের কথা বলেছেন ডাক সাহেব। পাত্রি সাহেবের পক্ষে টম্ পেইনের বইকে

"malignant" ও "pestiferous" বলা হুই ইয়াডিক। সেই তুন্ত তিনি আমেরিকান পুস্তক-বিক্রেতাকে ও অভিজ্ঞ করেছেন। কিন্তু পুস্তকবিক্রেতার মনাকার মতলব ততই থাকুক, হুইব বাংলাদেশের কলকাতা শহরে যে টম্ পেইনের *Rights of Man* ও *The Age of Reason* এর মতন বই জাহাজ বোকাই ক'রে নিশ্চিতে পাঠানোর মতন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সে-সময়, এ কথা তিনি বুঝছিলেন। আমেরিকার বিপ্লবোত্তর যুগের পুস্তকবিক্রেতার পক্ষে না-বোকাই অসম্ভাবিক। তা না হলে তিনি বইয়ের বহলে ত্রাণ্ডি, অথবা টম্ পেইনের বহলে অন্য কোনো লেখকের বইও পাঠাতে পারতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, জাহাজ-বোকাই টম্ পেইনের বই এল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা হামার কুপি বিক্রি হয়ে গেল। এই একটিনাট ঘটনা থেকে নবাবদের নবীন বিধং-সমাজের প্রকৃত অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগের মধ্যে তার একাংশও পাওয়া যায় না। এক কথায় বলা যায়, ইং: বেস্বলের প্রতি অবিশ্বাস করা হয়েছে, ঐতিহাসিক অবিশ্বাস। বাংলার নবজাগরণে তাঁদের প্রকৃত ধানের তাৎপৰ্য, শেকালের বাঙালী বিশ্বজননের মধ্যে অনেকেই ভুল বুঝেছেন এবং বিকৃত ক'রে প্রচার করেছেন।

নতুন নানাবাদিকার ও অবাধ চিন্তার আদর্শে অহুপ্রাণিত হয়ে ইং: বেস্বল প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হল তাঁদের ছুটি। একটি পত্রিকা, আর একটি বিধং-সভা, বিতর্ক-সভা প্রভৃতি বিভিন্ন সভা সোশাইটি। দুটিই নবযুগের নতুন হাতিয়ার, গ্রেসও নতুন সোশাইটিও নতুন। প্রাচীনপন্থীরাও এই একই হাতিয়ার নিয়ে নামলেন, কিন্তু তাঁদের হুবিধা ছিল অনেক। প্রথমত: ধনিকদের আর্থিক পোষকতা ছিল, বিতীৰ্যত: কুসংস্কারের কুতপ্রভে সেলিয়ে দেবার সুযোগ ছিল এবং সনাতন ধর্মের সোহাই ছিল। ইং: বেস্বলের প্রধান সম্বল ছিল যুক্তির আলোকবিস্তার। তাঁরা ছিলেন *Age of Reason* এর প্রতিনিধি। পত্রিকা ও সভা-সোশাইটির মধ্যে তাঁরা যুক্তির অভিধান আরম্ভ করলেন। বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য-প্রকাশ তাঁরা যে করেন নি, তা নয়। কিন্তু সেই আতিশয্য বড়টা নিশ্চয়, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসনীয় তাঁদের এই অভিধান। পাখিন, হেলপারাগ, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রিফর্মার, এনকোয়ারার, জ্ঞানবোধ প্রভৃতি কয়েকটি ভালো-ভালো পত্রিকা এই সময় প্রকাশিত হল। ধর্মতত্ত্বের পাণ্ডারা তাঁদের পত্রিকাদি মারকত হিন্দু কলেজের শিক্ষারীকা ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে চিঠিপত্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে (সমাচার-চক্রিকা, সন্বাদ প্রভাকর, সমাচার ধর্ম ইত্যাদি) প্রকাশিত হতে থাকল। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে জিরোজিও কলেজের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত হলেন। জুলাই মাসে ক্রমমোহন বন্যোপাধ্যায় *Enquirer* পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং তার প্রথম সংখ্যায় লিখলেন:

"Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness."

পরবর্তী সংখ্যায় ক্রমমোহন যা লেখেন সে-সময়ে তাই সাহেব বলেছেন:

"The next number of the *Enquirer* in particular, seemed as if penned with fire...Hail, freedom, hail! rung through impassioned sentences."

টম পেইনের আদর্শে তাঁরা অহুপ্রাণিত হয়েছেন, বেকন হিউন লক্ জন্টেনার পড়েছেন, তাঁদের ভা

পাষায় কথা নয়। তাই গুরুসভার ঘন ঘন তোপধনিতে তাঁরা আরো বিচলিত হলেন না। প্রচণ্ড আক্রোশে ধর্মসভা তাঁদের বিরুদ্ধে বাণ ছোঁড়া আরম্ভ করলেন। “এনকোয়ারার” পত্রে কৃষ্ণনোহন লিখলেন :

“The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the *Gurum Shabha* is violent, and they know not what they are doing. Excommunication is the cry of the fanatic : we hope perseverance will be the Liberal's answer. The *Gurum Shabha* is high ; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a rage ; let them burst forth into a flame. Let the Liberal's voice be like that of the Roman,—a Roman knows not only to act but to suffer.”

এই লেখার এক মাসের মধ্যেই (আগস্ট ১৮৩১) কৃষ্ণনোহনের অল্পপরিণতে তাঁর বাড়িতে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটল। তাঁর বন্ধুবান্ধব বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, গোমাংস ভক্ষণ করে তাঁর একটি ছাত্র পাণ্ডের বাড়িতে নিক্ষেপ করেন। তাই নিয়ে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, কৃষ্ণনোহন শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। শুভ্রুম সভা যে এই সুযোগে কি পরিমাণ তোপধনি করেন, তা সহজেই অহমান করা যায়। তেজস্বী কৃষ্ণনোহন তাঁর উত্তরে “এনকোয়ারার” পত্রে লেখেন :

“If opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed —A people can never be reformed without noise and confusion—”

টম পেইনের *The Crisis Papers* ও *The Age of Reason* থার পড়েছেন, তাঁরা তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গীর সঙ্গে কৃষ্ণনোহনের এই সব ইংরেজি রচনার বিচিত্র মাদৃশ দেখে বিস্ময়বোধ করতেন। আমেরিকান পুস্তকবিক্রেতার জাহাঙ্গির-বোকাই বই পাঠানো যে কথা হয় নি, কেবল “এনকোয়ারার” পত্রিকার রচনাতেই তাঁর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৩১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের এই ঘটনার পর কৃষ্ণনোহন নভেম্বর মাসে *The Persecuted* নামে একটি নাটকও রচনা করেন।^{১*} ডিসেম্বর মাসে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। ডিরোজিও কামনা করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে একদিন মুক্ত বিহঙ্গের মতন ইয়ং বেঙ্গল তাঁদের বুদ্ধিগোষ্ঠ প্রভিভার পক্ষবিত্তার করবেন, গৌড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। যখন তাঁরা সত্যিই শক্তিপরীকার রক্ত বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির পক্ষবিত্তার করলেন, তখন ডিরোজিও লালিত ও অপমানিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

কেবল পত্রিকার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল দল আন্দোলন করেন নি। পত্রিকা ছিল তাঁদের প্রথম হাতিয়ার। দ্বিতীয় হাতিয়ার ছিল সভাসমিতি। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, সঠিক জানা যায় না। তবে অ্যাকাডেমি ছাড়াও, এই সময়, আরও অনেক সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল। কি পরিমাণ বিকাশ হয়েছিল, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর ভাষ্য সাংঘর্ষের ক্ষেত্রেবর্ণিত এবং ভাষ্য নিয়ে তা লিখে গেছেন। রেভারেণ্ড দে লিখেছেন :

“Debating Societies were multiplied, in which bigotry, high-handed

✓ tyranny, superstition and Hindu orthodoxy was denounced in no measured terms.”^{১১}

ডাক সাহেব আরো স্বন্দরভাবে এই সব সভাসমিতি সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, এর আগে সভা-সোসাইটি ছিল বটে, কিন্তু খুব বেশি ছিল না। তার মধ্যে অধিকাংশ সভাই সাহেবরা উদ্ভোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ আদর্শ-সংঘাতের এই নতুন পরিবেশে সভাসমিতির দ্রুত বিকাশ হতে থাকল এবং তার সংখ্যা অনেক বাড়ল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এই সব সভায় বৈঠক হত কলকাতার। এক-একজন একাধিক সভায় যোগ দিতেন ও সঙ্গত হতেন। আলোচনা-আলোচনা, তর্কবিতর্ক যেন একটা ব্যতিক্রম হয়ে পড়ল। এমন কোনো বিষয় ছিল না যা নিয়ে আলোচনা বা তর্ক হত না। বিষয়বস্তুটির দ্বারা যেন শেষ ছিল না মনে হয়। ডাক সাহেবের নিজের ভাষায় উক্তভিযোগ্য :

“New Societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to a prodigious excess.”^{১২}

✓ সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে, নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কাতর্কি করার মনোভাব একসময় প্রায় ‘নানিষা’ হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে, ১৮২২-৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। ১৮৩০ সালে অনেক “হিন্দুকালেক্সট্রান্স পিছু” কলেজের ছেলেরদের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার বিকক্ষে সংবাদপত্রের চিঠিতে এই ব’লে অভিযোগ করেছিলেন :

“প্রায় সকল ছেলেগুলি একত্রে অবশ অর্থৈক এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহার। স্থানে ২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রান্নানিরদের বিবেচনা করে এই সকল সেখিরা পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্ধ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া বে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব...”^{১৩}

পরিষ্কার বোঝা যায়, ছেলেরা যে স্থানে স্থানে সভা করেছে এবং সেই সব সভায় সামাজিক আচারব্যবহার, এমনকি ‘রান্নানিরদের’ বা রান্নানীতিরও আলোচনা করছে, এতেই “ছাত্রপিছু” বেশ বিচলিত হয়েছেন। তিনি ছেলেকে কলেজ ছাড়িতে চেয়েছেন, ছেলে ছাড়ে নি। মাসিক টাক৬০ বন্ধ করেছেন, কিন্তু তাতেও ‘উৎপাতগ্রস্ত’ হয়েছেন। অথচ এরকম অবস্থায় মাত্র বছর ছয় আগেও, ইংরেজি সংবাদপত্রে এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপনের আবশ্যকতার কথা লেখা হত। *Bengal Hurkaru* পত্রে ১৮২৪ সালে অনেক লেখক সভা-সোসাইটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তার উত্তরে “Medicus” নাম দিয়ে আর-একজন লেখেন :

“A correspondent in your paper...called the attention of the public, to the formation of debating society in Calcutta; by which I conceive he means an Institution, where men may unbend their minds, discuss and express

their sentiments freely and fearlessly, on every subject connected with general knowledge, both political and scientific. In countries, whose Government are different from this, such institutions flourish and to the credit of such, it may be said, that through their medium, Political Economy and Science have been greatly promoted.”^{১০}

‘বেডিকাস’-এর মুক্তি অস্বীকার করা যায় না। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ সাল, মাত্র ছ বছরের মধ্যে, দেশের সামাজিক অবস্থার যে কত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল, সভা-সোসাইটির অভাবময়ী সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই তা বোঝা যায়। তার ফলে যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিধি জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় প্রসার হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রদের পিতারা এই-সব সভাগামিতির দ্রুত প্রীতিমত সত্যাকিত হয়ে উঠেছিলেন।

সভা-সোসাইটি পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

এই সব সভা ও সোসাইটি কিভাবে পরিচালিত হত, সকলেরই তা জানবার কৌতূহল হবে, কিন্তু সে-সময়ে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। এ-সময়ে ডাক সাহেব বা লিখে গেছেন, তা; অনেকটা নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি নিজে একাধিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেক সভার যোগদান করতেন—“At one or other of these societies I felt it to be at once a duty and a privilege constantly to attend”. তার বিবরণ থেকে যেটুকু জানা যায়, তার বর্ম এই :

সভার সদস্যরা যখন বক্তৃতা দিতেন তখন ইংরেজ লেখকদের প্রচুর উদ্ধৃতি দিবে তাঁরা। নিজেদের মতামত জোগালো ক’রে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। আলোচ্য বিষয় যখন ঐতিহাসিক, তখন রবাইটস ও গিবন উদ্ধৃত করা হত। রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরিমি বেন্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে নিউটন ও জের্জ, ধর্মবিষয় হলে হিউম ও টম্ পেইন, দার্শনিক বিষয় হলে শক, রিড, গিউয়ার্ড ও ব্রাউন প্রভৃতির রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে আশ্রয় করা হত। বক্তৃত্যটিকে সাহিত্যিক মাধুর্য়ে আবৃত্ত ক’রে ভোলাল। দ্রুত ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে ভালো ভালো অংশ তাঁরা উদ্ধৃত করতেন।

মধ্যে ওয়াল্টার স্কট ও বাথরন থেকেই বেশি বলা হত, মধ্যে মধ্যে রবাইটস কাব্যগ্রন্থও আশ্রয় করতে শোনা যেত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা—“But the most striking feature in the whole was the freedom with which all the subjects were discussed.”

আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সোসাইটির অধিবেশনের যে পরিচয় দিয়েছেন ডাক সাহেব, তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য। উদ্ধৃতিটি অনেক বড় হবে বলে বাংলায় তাঁর বক্তব্যের সারটুকু উল্লেখ করছি।^{১১} সাধারণতঃ বিধ্ব-সভা ও বিতর্ক-সভার বৈঠকে যা দেখা যায়, তাতে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এক দল বলেন এবং বিপক্ষে আর-এক দল বলেন। বিধ্ব-সভার ঠিক এ রকম কোনো বাধাধারা নিচন না থাকলেও, বিতর্ক-সভা এই নিয়মেই পরিচালিত হয়। ইহা বেসলের যুগে বিধ্ব-সভা ও বিতর্ক-সভার মধ্যে ‘কর্মাল’ ভেদ বিশেষ ছিল না। কারণ সব সভাই প্রায় আলাপ-মালাচনা উর্ধ্ববিতর্কের দ্রুত গতিত

হয়েছিল, নিরাপাণ গবেষণা করবার ক্ষমতা নথ। এই আলোচনাগ্রন্থতাই ছিল তখনকার সভার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। বিতর্কসভার পূর্ণপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দল পূর্বনির্দিষ্ট থাকাই রীতিসংগত। কিন্তু ভাষ্য সাহেব বলছেন, তখনকার সভার তা থাকত না। সভার পরিচালকরা বলতেন যে, তাতে আলোচনা ব্যয়িক 'কর্মল' আলোচনা হয়, কার কি বিশ্বাস ও ধারণা তা জানা যায় না, কেবল পরীক্ষারী ছাত্রদের মতন নৌবিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। সে স্বকম আলোচনায় এই-স্বাভাব্য সভা-স্থাপনের আগল উদ্দেশ্যই অনেকটা বার্ষ হয়। সুতরাং এই সব সভায় কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পূর্ণপক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকতেন না। সকলে নিমিত্ত হবার পর যখন সভার কাছ আরম্ভ হত, তখন স্বাধীনভাবে যার যে-পক্ষে ইচ্ছা আলোচনা করতে পারতেন। তাতে হয়ত এক পক্ষেই পরপর দু-গাত জন বক্তা বলে গেলেন এমনও হত—“All were, therefore, left alike free in their choice; hence it not infrequently happened, that more than half-a-dozen followed in succession on the same side.” সভাস্থলের বলা শেষ হয়ে গেলে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেউ এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইতেন, তাঁকে তা বলবার সুযোগ দেওয়া হত। সমস্ত আলোচনা-আলোচনার মধ্যে পরস্পরের মতামতের প্রতি এমন একটা সমস্ত স্রষ্টার ভাব প্রকাশ পেত, যা সভাই প্রশংসনীয়। যাদের পৈর্ষ সংঘন শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদির অভাব সম্বন্ধে প্রাচীনদের অভিযোগের অন্ত ছিল না, তাঁরা যে সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ককালে এ স্বকম উপায়তা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন, তাবলেও অবাক হতে হয়। বোকা, ঘাণ, সমাজসংস্কারের নীতি বা পদ্ধতির দিক দিয়ে তাঁরা অধৈর্য ও অসংবাদের পরিচয় দিলেও, ব্যক্তিগত চরিত্রের বনিয়াম তাঁদের বেশ দৃঢ় ছিল। তা না হলে, তাঁদের সভা-সমিতির পরিচালনার এই শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যেত না।

সভা-সোসাইটির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য

১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে, এই প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের ফলে, কলকাতা শহরে অনেক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সাময়িক পত্রিকাগুলি তখন-তখন ক'রে খুঁজলে সভাসমিতির হাবির্ষ একটি ভালিকা তৈরি করা যেতে পারে। সভা-স্থাপন করা যখন তখন বাংলায় প্রায় 'নানিয়া' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন স্বল্পকালস্থায়ী সভাও অনেক গড়ে উঠেছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাদের অনেকগুলির দু-এক লাইন 'নোটি' ছাড়া, আর কোনো পরিচয় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে কয়েকটি সভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং কিছুকাল স্থায়ীও হয়েছিল। যেনন :

বহুস্থিত সভা

আংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন

জানসন্সকী সভা

ডিবেটিং ক্লাব

বঙ্গরত্নী সভা

বিজ্ঞানবায়িনী সভা

সর্বভারতীয় সভা

জানসন্সকী সভা

সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ

তত্ত্ববায়িনী সভা

মেকানিক্স ইনস্টিটিউট

টিচার সোসাইটি

ডিরোজিঞ্জর অ্যাকাডেমিক্যাল সোসাইয়েশন তদ্রূপ ছাত্রমণ্ডলে সভাস্থাপনের প্রেরণা প্রদান করে। ১৮৩০ সালেই “আংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন” স্থাপিত হয়। ২ সেপ্টেম্বরের (১৮৩০) “সম্মান কৌমুদী” পত্রে এই সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানা যায় যে তার কিছুদিন আগে এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সিমলায় রামমোহন রায়ের আংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এবং হেয়ার সাহেবের পটলভাঙা স্কুলের ছাত্ররা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই সভা স্থাপন করেন। রামমোহন রায় তখনও বিলাত যাত্রা করেন নি, কলকাতাতেই ছিলেন। এই সভাস্থাপনের ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি না, বলা যায় না। সভার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বেগে মনে হয়, হয়ত তিনি পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় কেবল নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচার অহুসীলন ও চর্চা করার স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু ধর্মবিষয়ে কোনোরকম আলোচনা করা নিষেধ ছিল। ডিরোজিঞ্জর অ্যাকাডেমির আলোচনায়, অথবা ডাক হিল প্রভৃতি পাণ্ডিত্যের ধর্মপ্রচারে তখন যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সমাজে, রামমোহন রায় তার প্রতি পূর্বে যে প্রসন্ন ছিলেন তা মনে হয় না। তাই কেবল বিদ্যাভুসীলনের উদ্দেশ্যে এই সভাস্থাপনে তাঁর খানিকটা সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। প্রতি মাসের বিজয় ও চতুর্থ বুধবারে এই সভার অধিবেশন হত।^{১০} “জ্ঞানদীপন সভা” স্থাপিত হয় পাণ্ডুরিয়াঘাটার উমানন্দ ঠাকুরের বাড়িতে, ১৮৩০ সালে। এই সভারও নিয়ম ছিল, ধর্মবিষয়ে আলোচনা করা চলবে না, কেবল বিজ্ঞানবিদ্যে চলবে। এই সময় চৌরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে “ডিবেটিং ক্লাব” নামে এক সভা স্থাপিত হয়। “ইংরাজী বিজ্ঞান” যাতে সভ্যজন্মের মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয়, এই ছিল ক্লাবের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায়ের সিমলায় স্কুলে, ১৮৩২ সালের শেষ দিকে, “সর্বজনীনপিকা সভা” স্থাপিত হয়। সভাস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষার বিশেষ অহুসীলন করা। অধিকাংশ সভাপ্রতিষ্ঠাতা শিক্ষিত যুবকরা তখন ইংরেজিতে বক্তৃতা ও আলোচনা করতেন। বাংলাভাষা অনেকটা উপেক্ষিত হত। তদ্রূপ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই বিভাজনীয় মনোভাব দূর করার জন্য এই সভাটি স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়ের পুত্র রমাশ্রীদাস রায় এবং সম্পাদক ছিলেন তাঁর সতীর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।^{১১}

এ রকম আরো অনেক সভাপ্রতিষ্ঠান এই সময় স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও নিয়মকানুন সকলের যে এক ছিল তা নয়। তবে যার যে উদ্দেশ্য বা নিয়মই থাক-না কেন, একটি প্রয়োজন সকলেই সমন্বিতভাবে বোধ করতেন। সেটি হল বিদ্যাভুসীলনের প্রয়োজন। এমিক থেকে বিচার করলে, এই সময়কাল জুটি সভা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে স্থায়ী অঙ্গন অধিকার ক’রে আছে মনে হয়। একটি Society for the Acquisition of General Knowledge বাংলায় “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা” বলে পরিচিত; আর-একটি “তত্ত্বাবোধিনী সভা”।

পাশ্চাত্য বিদ্যৎ-সভার প্রভাব

এদেশের বিদ্যৎ-সভা স্থাপনের মূলে যে পাশ্চাত্য সভা-সোসাইটির প্রেরণা ছিল অনেকটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘ইয়ং মেন্সের’ দ্বারা এই প্রেরণা আরো বেশি প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রচুর সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত বাচ্চদের মধ্যে নতুন জ্ঞান বিতরণ করা। এই সব সোসাইটির

মধ্যে প্রথম "ডেকানিস্ ইনস্টিটিউট" নাম করতে হয়। ইংলণ্ডের অনেক আশ্রয় এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অস্কাট গেলব সোসাইটি এই সমস্ত স্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— "Society for the Propagation of Christian Knowledge" (S.P.C.K.), "Society for the Diffusion of Useful Knowledge" (S.D.U.K.), "Society for the Diffusion of Political Knowledge" (S.D.P.K.) ইত্যাদি। ইংলণ্ডের সামাজিক দীর্ঘমেয়াদে প্রত্যেকটি সভা ক্রীতিনত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবারের বেশে বিখ্য-সভার ও অস্কাট সভার নামকরণে পঞ্চ পাশ্চাত্য সভার প্রভাব দেখা যায়। "ডেকানিস্ ইনস্টিটিউট" এদেশেও স্থাপিত হইবে। S.D.U.K. ও S.D.P.K.-র সঙ্গে এদেশের "Society for the Acquisition of General Knowledge" (S.A.G.K.)-এর সদৃশ ও লক্ষণীয়। "Diffusion" ও "Acquisition"-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। সে-পার্থক্য ইংলও ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয়। ইংলণ্ডের কাছে তখন বড় প্রব "Diffusion"-এর, আবারের দেশের বিখ্য-সমাজের সভ্যতা হল "Acquisition"-এর। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রায় একই সময়ে দুই দেশেই এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয় (ক)

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা

"সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকজন উদ্যোগী মিলে একটি ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে প্রচার করেন। প্রচারপত্রে পাঠকদের স্বাক্ষর ছিল দেখা যায়— তারিখীচরণ বসোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারচাঁদ চক্রবর্তী ও রাধাকৃষ্ণ দে। ১৮৪০-৪২ সালের প্রকাশিত সভার "ইন্ট্রাক্যাকশন"-এর গোড়ায় প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট হিসেবে নয় শুধু, অস্কাট দিক থেকেও এই প্রচারপত্রটি খুব মূল্যবান বলে, এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল :

COUNTRYMEN,—Though humiliating be the confession, yet we cannot, for a moment, deny the truth of the remark so often made by many able and intelligent Europeans, who are, by no means, inimical to the cause of native improvement, that in no one department of learning are our acquirements otherwise than extremely superficial. We need only examine ourselves in order to be convinced of the justice of the remark. After the ground-work of our mental improve-

(ক) ইংলণ্ডের এই সব সভা-সোসাইটির বিবরণ Dr. R. K. Webb-এর *The British Working Class Reader, 1790-1848—Literacy and Social Tension*. নামক গ্রন্থে বিবরণে বর্ণিত হয়েছে ৬ ব্রিটিশ বিউনিয়ন ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে রচিত, এই সব সোসাইটির বহু অগ্রগতি মূল্যবান ও অমূল্য বিবরণ থেকে ভাঙা গিয়ে এই ইতিহাস রচনা করেছেন। পূর্বে যারা রচনা করেছেন, তাদের বিবরণ কিনা ও সম্পূর্ণ নয়। যেমন, S.D.U.K. সম্বন্ধে ভাঙা গিয়েছে নিম্নলিখিত— "There is, for example, a pretty extravagant passage in G.D.H. Cole and Raymond Postgate, *The Common People* (London, 1947), pp. 810-11. The only large-scale attempt at an assessment of the Society's work is an unsatisfactory and unpublished dissertation in the University of London: M. C. Grobel, 'The Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 1826-1846,' (p. 176, Note 13)

* উদ্ধৃতিসমূহ মধ্যে ইটালিয়ান লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত।

ment has been laid in the School, (and a school tuition seldom does more) we enter into the world and never think of building a solid superstructure. *The fate of our Debating Associations, most of which are now extinct, while not one is in a flourishing condition,* as well as the puerile character of the native productions that appear in the periodical publications, are lamentable proofs of this sad neglect. If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent of learning ? We have ever sincerely regretted the want of an institution, which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindus, and of exciting an emulation for mental excellence. There is at present no occasion whereby we are ever called upon to congregate on an extensive scale, for the purpose of mutual improvement, and whence we may receive an impetus for applying ourselves to useful studies. Is it then not desirable to unite in such a laudable pursuit, by which the bonds of fellowship may be strengthened, the acquisition of knowledge promoted, and the sphere of our usefulness extended ?

With a view therefore to create in ourselves *a determined and well regulated love of study*, which will lead us to dive deeper than the mere surface learning, and enable us to acquire a respectable knowledge on matters of general, and *more especially, of local interest*, we have thought it expedient to invite you to meet, in order to consider the proposal of establishing an institution which, in our humble opinion, is eminently calculated, not only to effect this great end, but likely to promote mutual good feeling and union—an object of no less importance. We cannot, of course, within the limits of a circular, give a detailed account of the plan we propose to lay before you, but allow us to state the following brief outline.

Such members of the proposed Society, as may be willing, should undertake to deliver at its meetings, written or verbal discourses, on subjects suited to their respective tastes, at such times as may be previously fixed by them with a view to their convenience, and to the degree of research and attention which the subjects may require ; and, *if they should fail without satisfactory reasons, to fulfil their pledges, they will be liable to pay a pecuniary fine.* The

purpose of this circular is to call a general meeting, to consider the propriety of establishing the proposed institution, and to arrange the details.

It is at this general meeting, Gentlemen, that we most earnestly solicit your attendance. You must be well aware that the success of a public object, like the one we propose, must depend on the degree of cordial cooperation we may receive from the members of our community. We cannot believe that in such a cause, coldness will be manifested by any person that entertains the least regard for his own improvement, or breathes any love for his own country; and we flatter ourselves with the hope, that we shall meet with your hearty support in a proposal, which none can look upon with indifference, unless lost to all sense of duty, or sunk in apathy. Those who may, from circumstances, be unable to take an active share in our proceedings, can at least countenance the object by their presence, for which they may be assured of our thanks.

We have, through the kindness of Baboo Ramcomul Sen, Secretary to the Sanerit College, obtained permission to use the Sanerit College Hall for our meeting, where precisely at 7 o'clock P. M. on Monday, the 12th March next, we earnestly entreat and hope, that every one of you, Gentlemen, will have the goodness to try your best to be present.

Calcutta, February 20, 1838

TARINEY CHURN BANERJEE
RANGOPAL GHOSE
RANTONOO LAHIRY
TARA CHAND CHUKERBUTTEE
RAJKRISHNA DAV

প্রচারপত্রের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ, ১৮৩৮ সালে স্বাক্ষরকারীরা যখন এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে পত্রটি প্রচার করেন তখন, তাঁরা বলেছেন, উল্লেখযোগ্য একটিও বিতর্ক-সভা বা বিধ্বং-সভা ছিল না। যা দু'একটি ছিল, তাও তখন প্রায় নিষ্ফল হয়ে গেছে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ভাব সাহেবের কলকাতার আসার পর, বিশেষ করে ডিরোজিওর মৃত্যুর পর, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তার আগেই হয়ত তার কার্যকলাপ কিয়দে পড়েছিল। তার পরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিধ্বং-সভা পড়ে উঠে নি। তার কারণ, সামাজিক অবস্থার অভিস্রুত পট-পরিবর্তন। বাইরের সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে যখন চারিদিকে তীব্র কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তখন বিচ্ছিন্নতাবাদের অব্যবস্থিতি হয়ে থাকেন। ছোট ছোট বৈঠকী চল তখন অনেক গন্ধিঘে উঠলেও, বেশ বড় কোনো স্থায়ী বিধ্বং-সভা স্থাপনের স্বযোগ তখন হয় না। ১৮৩০-৩১ সালে বাংলায় ঠিক এই অবস্থায়ই সৃষ্টি

হয়েছিল। ভাষা সাহেব এই সময়ে যে খবরের সভার প্রচুরের কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই ছোট ছোট বৈঠকী সভা, বড় কোনো বিধ্বং-সভা নয়। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে অবস্থা অনেকটা শান্ত হবার পর, সকলে নিশিত হয়ে বেশ বড় স্থায়ী বিধ্বং-সভা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। সাধারণ জ্ঞানোপাধিকার সভা, ভাববোধিনী সভা ইত্যাদি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে হয় নি, কারণ হবার মতন অল্পকাল পরিবেশ ছিল না।

প্রচারপত্রের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, স্থায়ী বিজ্ঞাচর্চা ও গভীর জ্ঞানার্জনের সংকল্প। উদ্ভবদেব মতো অনেকে আক্যাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রতিবার উদ্বেগপূর্ণ তখন তাঁদের বিজ্ঞানোচ্চাচা চপলতা ও তরলতার ভাগ ছিল বেশি। আট-ন বছরের মধ্যে তাঁদেরও অনেক মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়েছে, দৃষ্টিও গভীর হয়েছে। এখন আর তাঁরা বিধ্বং-সভায় চাপল্যের বা ভাবল্যের পরিচর দিতে চান না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানে আর তাঁরা সন্তুষ্ট নন। প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে তাঁরা প্রবেশ করতে চান। জ্ঞানসমুদ্রের বুকে ডুব দিয়ে তলিয়ে দেখতে চান, উপরে সাঁতার কাটতে চান না। প্রকৃষ্টে এ কথা প্রচারপত্রে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, আদ্যসংঘ ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধেও তাঁরা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। যদি কোনো সভা তাঁর পুণিনির্দিষ্ট দিনে সভার যোগদান না করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুত বক্তৃতাটি না বেন বা রচনাটি না পাঠ্য করেন, তাহলে সভার গৃহভিঞ্জে তাঁকে অর্থদণ্ডও দণ্ডিত করা যেতে পারে। বিধ্বং-সভার এ স্বকম কঠোর বিধান বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু প্রথম পর্বের অন্তরিক্ত উচ্ছ্বলতার কথা ভাবলে, পরবর্তী কালের এই কঠোর শৃঙ্খলার ইঙ্গিত অনেকটা স্বাভাবিক ও বলা যেতে পারে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল—কেবল পাশ্চাত্য বা সাধারণ বিজ্ঞাচর্চার মধ্যে তাঁরা আর সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। স্থানীয় বিষয় নিয়েও (“matters...of local interest”) তাঁরা পড়াশুনা ও আলোচনা করতে চান, কেবল বিদেশের নয়, এ দেশেরও। জ্ঞানোপাধিকার সভায় এ দেশের পুরাণ ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ১৮২৮-২৯ থেকে ১৮৩৮-৩৯ সাল, মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে একশো বিধ্বং-সভার যে বেশ উন্নয়নযোগ্য আশ্রয়গত পরিবর্তন হয়েছিল, জ্ঞানোপাধিকার সভার গ্যামিফেস্টো তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

১৮৩৮ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন তারারচাঁদ চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও কল্যাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক ছিলেন রামতল্লাহ লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র, পরিচালক-বঙালীতে ছিলেন ঝকুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি। সাধারণ সভারূপে সেবেজনাথ ঠাকুরও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার ছিল সকলের, কোনো বিশেষ বিষয়ে কোনো নিষেধ ছিল না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বর্ণন, সব বিষয় নিয়ে এই সভায় নিয়মিত আলোচনা হত। সাধারণতঃ সংস্কৃত কলেজেই সভার মাসিক অধিবেশন হত বলে মনে হয়। বাংলার নবীন বিধ্বং-সমাজের প্রায় সকলেই এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে এই সভার অধিবেশনে যোগদান করতেন। সেই সব বক্তৃতা বিধ্বং-সভা স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই সভাটিকে বিশেষীকৃত ও একবার্তা প্রাপ্ত করে গেছেন। কিন্তু কোনোদিক থেকেই এই সভা বিশেষীদের মূখ্যোপক

ছিল না। বহু সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে বেতাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হত, তাতে কলকাতার ইংরেজ-সমাজ সভার প্রতি খুব গ্রীত ছিলেন না। তবু 'আদর্শ' বিষয়-সভার সমস্ত গুণ এই সভার ছিল বলেই তাঁরা প্রশংসা না করে পারেন নি। কলকাতার তদানীন্তন ইঙ্গ্রীম কোর্টের আডভোকেট জর্জ জনসন লিখেছেন : "One of the most meritorious of the native associations is the Society for the Acquisition of General Knowledge".^{১৮}

এই সভার Transactions ও Proceedings-ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হত, কিন্তু তার একটিও এখন পাওয়া যায় না (খ)। জনসন সাহেব একটি বও নিজে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তার বিষয়সূচী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "The contents are essays, topographical descriptions, etc, all of a superior character." অস্তিত্ব: তিনি বও Transactions প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ ১৮৯৩ সালের "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—"3rd Volume of the transactions of the Society for the Acquisition of General Knowledge, shortly to be published and all volumes to be had of Messrs. P. S. D' Rozario & Co"^{১৯}

এই মুদ্রিত বিবরণীগুলি পাওয়া গেলে, সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা জানা যেত। এখন যেহেতু পাওয়া যায়, তা বিভিন্ন সদস্যমণ্ডিক পত্রিকায় প্রকাশিত টুকরো-টুকরো সংবাদ ও রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত। তাও সভাস্থাপনের পর প্রথম দিকের বিশেষ কোনো সংবাদই পাওয়া যায় না। ইংর বেসলের মুখপত্র "জানাবোধ" পত্রিকায় হরত কিছু-কিছু সংবাদ প্রকাশিত হত, কিন্তু তার একটি কপিও এখনো পাওয়া যায় নি। "জানাবোধ" থেকে উদ্ধৃত "সভাচার নর্পণের" একটি বিবরণে দেখা যায়, প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে (১৩ মে, ১৮৮৮) কৃষ্ণমোহন পুরাণপাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেদিন "অতিশয় দুর্যোগ ও মেঘগর্জন হওয়াতে ঐ পাঠের বাবু বক্তৃতা প্রবণে শতাধিক বহুত আগমন করিয়াছিলেন।"^{২০} সভার কার্যকলাপ পত্রিকায় প্রকাশ করার ক্ষম পরিচালকরা উৎসাহিত ছিলেন না। ১৮৯০ সালে "বেঙ্গল হরকরা" পত্রে সভার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথমেই এই কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন : "Although this Society has existed for several years, its members are so modest and have so studiously resisted publicity as to be hardly known that the Society does exist."^{২১} হরকরা-পত্রের এই বিবরণ থেকে জ্ঞানো জানা যায় যে, সভার নিম্নোক্তের বৃশি ও সাধারণ অহুয্যার্থী যে-কোনো বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন এবং কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে নয়, বাংলাভাষাতেও তাঁরা প্রবন্ধ রচনা করে পাঠ করতে পারতেন। ১৮৯৩ সালে সভার সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। এই সভ্যসংখ্যা থেকে "জানোপাঠিকা সভার" ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

নব্যমন্দের মুখপত্রের সকলেই প্রায় এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তাঁরা যে কতটা স্বাধীনভাবে সভার আলোচনা করতেন, তা আদর্শেও বোধ হয় অনেকে কল্পনা করতে পারবেন না। কেবল বর্ণন বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত না, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত।

আলোচনাকালে ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করতেও তাঁরা সক্ষম হতেন না। উপস্থিত ইংরেজ প্রতিনিধির সামনেই কহতেন : ‘একবার একটি অধিবেশনে এইরকম আলোচনার সময় খুব গভগোল হয়। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ “বেঙ্গল হেরাল্ড” পত্রে প্রকাশিত হয়।’^{১১} সংক্ষেপে ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংযুক্ত কলেজে সভার একটি অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি তারাগাঁও চক্রবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর-একজন ইংরেজ দর্পক সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বক্তা এবং বক্তব্য বিধয় ছিল : “On the Present State of the East Indian Company’s Criminal Judicature, and Police, under the Bengal Presidency.” বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণারহন কোম্পানীর কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিশের অসাধুতা ও অকর্মণ্যতা এবং ব্রিটিশের এরূপে আসার অভিসন্ধি সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন :

“To stand up in a hall which the government had erected and in the heart of a city which was the focus of enlightenment, and there to denounce, as oppressors and robbers, the men who governed the country, did in his opinion, amount to treason...The College would never have been in existence, but for the solicitude the Government felt in the mental improvement of the natives of India. He could not permit it, therefore, to be converted into a den of treason, and must close the doors against all such meetings.”

রিচার্ডসনের এই অসৌম্য-প্রকাশে বিচলিত হয়ে, সভাপতি তারাগাঁও চক্রবর্তী (হিন্দু কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র) চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ান এবং বলেন :

“Captain Richardson, with due respect I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and on behalf of my friend Baboo Dukhin. I must say that your remarks are anything but becoming, I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to the society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the Committee of the Hindoo College, and if necessary to the Government itself. We have obtained the use of this public hall, by leave applied for and received from the Committee, and not through your personal favour. You are only a visitor on this occasion, and possess no right to interrupt a member of this society in the utterance of his opinions. I hope that Captain Richardson will see the propriety of offering an apology to my friend, the writer of the essay and to the meeting.”^{১২}

এর পর দক্ষিণাফ্রিকা তাঁর প্রথমটি পাঠ করেন। রিচার্ডসন পরে অবশ্যই চুঃখ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। জানোপাত্তিকা সভা যে কেবল এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করেছিল তা নয়, বাঙালী শিক্ষিতসমাজে স্বাসৈনিকভাবেও প্রথম জাগিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার যে কেবল কৃষ্ণাই হয় নি, হৃৎকণ্ঠ হয়েছিল, এ কথা তখনকার বাঙালী-সমাজের অনেকে না বুঝলেও, রিচার্ডসনের মত ভ্রাত-ইংরেজের মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন। ধারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে লর্ড টমসন এসেছে আসার পর, এই সভার সভাপত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হয় (গ)। তাঁরই উদ্বোধনে সভার সভাপত্য ১৮৪৩ সালে *Bengal British India Society* স্থাপন করেন। এই জানোপাত্তিকা সভার সভাপত্যের মতোই অনেকে "তত্ত্বাবোধিনী সভা"র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। গোড়া থেকেই তত্ত্বাবোধিনী সভার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তত্ত্বাবোধিনী সভা

"জানোপাত্তিকা সভা" প্রতিষ্ঠার বছর দেড়েকের মধ্যে "তত্ত্বাবোধিনী সভা" ধারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩২, ৬ অক্টোবর)। প্রথমে নাম ছিল "তত্ত্বাবোধিনী সভা", পরে পণ্ডিত ব্রাহ্মচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে "তত্ত্বাবোধিনী সভা" নাম হয়।^{১০} সভার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "অসামান্যের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বৈদ্যুতিকপ্রতিপাদ ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রচার"। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের দিক থেকে বিচার করলে তত্ত্বাবোধিনী সভার প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার করা হবে। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও পূর্বকার সনাতন-পন্থীদের "ধর্মসভা" ও "তত্ত্বাবোধিনী সভা"র মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল। ১৮৩০ সাল থেকে বাংলায় সামাজিক জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর নৈতিক জীবনে যে ভাঙন ধরে, রামমোহন রাই জীবিত থাকলে (যাক্ষ সম্ভবও ছিল) নিতান্ত তীব্র অসংযত উদ্বুদ্ধতা ও উচ্ছ্বলতার নিকটাকাঁড়ে সংঘত করার চেষ্টা করতেন। যে-সমস্ত সমস্যাতেই ভয়াবহরূপে তাঁর সামনে প্রকট হয়ে উঠত, তা হল কৃষ্ণমোহনের মতন বাংলার প্রতিভাবান যুবকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের সমস্যা। তখন বৈদ্যুতিক ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রচারের মন্ত্র "তত্ত্বাবোধিনী সভা"র মতন নতুন কোনো সভা স্থাপনের কথা রামমোহনও ভাবতে বাধ্য হতেন। তাঁর অভাবে, তাঁর স্থযোগে উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ গুরু অসমাপ্ত কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল, ভাঙ্গা ছিল প্রমুখ পাদবিনয়ের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে খ্রীষ্টানধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে অবাধ অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ করা। ধর্মভার্য মতন "গুডুন সভা" স্থাপন করে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তত্ত্বাবোধিনী সভার মতন সংস্কারমূলক ধর্মতত্ত্বাবোধী সভার পক্ষেই তা করা সম্ভব। এই দিক দিয়ে, ধর্মের ক্ষেত্রেও, তত্ত্বাবোধিনী সভা সেই সময় যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

তথু ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তত্ত্বাবোধিনী সভার দান সমসাময়িক যে-কোনো প্রগতিশীল সভার তুলনায় বেশি ছাড়া, কম নয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "*The Tattva-*

(১০) লর্ড টমসন এই সময় 'জানোপাত্তিকা সভা' ও 'হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়ার ইন্টারেস্ট' অনেক বক্তৃতা দেন। ১৮৪৩ সালের *Bengal Hurkaru* ও *The Bengal Spectator* পরে তাঁর অনেক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্গভাষায়ও কিছু বক্তৃতা সংকলিত হয়।

boothini Sabha used to hold weekly and monthly meetings. Papers were read and discussed at the weekly meetings and divine service used to be held once a month. The *Sabha* commenced its career with only ten young men as its members. But so great were the energy and enthusiasm with which its proceedings were conducted that in the course of two years the number of members rose to 500..."^{১৭} আরো কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্বাবোধিনী সভার সভ্য-সংখ্যা প্রায় ৮০০ পর্যন্ত হয়। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী বিধ্বংস-সমাজের অধিকাংশই এই সভার সভ্য হন। সভার মূলপত্র "তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা" সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সনাতনীতি, ধর্ম, ধর্মন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার প্রবর্তন করে বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। অক্ষয়কুমার মল্ল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতন প্রতিভাবানদের অভাব হয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্বাবোধিনী সভার দ্রুত প্রগতি ও উন্নতি হয়। এ সম্পর্কে তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা লেখেন :

"তত্ত্বাবোধিনী সভার ক্ষমাবহার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহার উন্নতি আলোচনা করিলে অবশ্য অত্যন্ত আশ্চর্যের মত হইতে হয়। প্রথম কালে মশরুম নামে সভা দ্বারা উহার সংস্থাপন হয়। এইক্ষেণে পাঠশত অপেক্ষা অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন; তৎকালে রাসে দশমুদ্রা একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল। এইক্ষেণে প্রতি মাসে প্রায় চারিশত টাকা সংগৃহীত হইতেছে এবং আয়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে; তৎকালে সভার অভিপ্রান্ত ব্রাহ্মোপাসনার প্রচাৰ জন্য প্রধান প্রধান সমুদায় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষেণে তদন্ত জ্ঞানজনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে—প্রথমতঃ কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাসীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিয়দিকল তৎকালের ব্যতিক্রিৎ কর্ম সেই স্থানেই স্থাপন হইয়াছিল। পরন্তু কার্যের কিঞ্চিৎ বাহুলা দ্বারা স্থানের সীমিততা প্রযুক্ত সভার কার্যালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ষট্টিমুদ্রা মাসিক বেতনে কলিকাতার শিমুলিয়াস্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মথোপাধ্যায়ের গৃহে পরিচালিত হয়। সেখানে তৎকালে তত্ত্বাবোধিনী পাঠশালায় কর্ম এবং সভার অত্রক তাবৎ কার্য একত্র নির্বাহ হইত। তদনন্তর তত্ত্বাবোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবর্তী গ্রামে স্থান্তর হইবার নিশ্চয় হওয়াতে পাঠশালায় বার এবং সেই বৃহৎ বাটীর বেতন একত্র নির্বাহ করিলে অসমর্থ প্রযুক্ত সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অধাকেরা সভায় দ্বুত কার্যালয় ১৭৬৪ শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার রোডপোকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরন্তু অল্প বিবস পরেই সভার অবস্থা স্থানান্তরে পরিবর্তন হইল, সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রাবল্ল স্থাপনের কল্পনা হইল, বহু কর্মচারী আবশ্যক হইল; ...ইত্যং দ্বুত ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক দ্বুতাল্য কর্ম প্রতঃ পক্ষ হত স্থানে এই সমুদায় ব্যাপার সম্পাদ্য হইবার মাত্র কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৪ শকের আষাঢ় মাসে সেখান হইতে হেতুবা পুন্নিবর্তিত বসিণ অকালে এক প্রেশত গৃহে সভার কার্যালয় আনীত হইল..."^{১৮}

সভার কার্যকর্মের ক্রমিক প্রগতির ফলে স্থানসংকট দেখা দেয়। স্থান থেকে স্থানান্তরে, লোকের

অনুসন্ধান উপর নির্ভর করে ঘুরে বেড়ালে, সভার কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সভাসদে কাছে এককালীন দানের জন্য পত্রিকা মারফত আবেদন করা হচ্ছে, যাতে সভার একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করা যায়—“মাসিক দান নহে, বার্ষিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিছু দান করিলে যখন এতদূর মহোপকার হয়, তখন তত্ত্বাবোধিনী সভার সভ্য হইয়া কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন? তত্ত্বাবোধিনী সভার অতি দরিদ্র সভ্যও যিনি তিনি আপনার ভরণপোষণের দৈনিক ব্যয়কে সংক্ষেপ করিয়াও ইহার আনুকূল্য করিতে কি ক্রপণ হইতে পারেন?”

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ত্বাবোধিনী সভার মতন আর কোনো সভা বাংলার বিষ্ণু-সমাজে এত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, এমন কি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যেটুকু অভাব ছিল, তত্ত্বাবোধিনী সভা সেই অভাবটুকু পূরণ করে দিয়েছিল। সেই অভাব হল, দেশীয় সংস্কৃতির উদার ও মহান ঐতিহ্যের উপর পাদ-প্রতিষ্ঠার অভাব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শাবর অভিনন্দন জানিয়েও, তত্ত্বাবোধিনী সভা দেশীয় ঐতিহ্যের ঘাবড়ানু মহান তাকে অস্বীকার করে নি। কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার ছিল না। ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রিহদ ঘোষণা করে যে কোনো স্থায়ী সত্যের কিছু করা যায় না, অথচ তার কালসঞ্চিত কুলংকারগুলোকে ছেঁটে কেলে দিয়ে যে মুক্ত মনের অধনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ-সভা প্রথমে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী কালে নোডরহান আদর্শবাদীদের দিগ্‌ভ্রান্তির মধ্যে তত্ত্বাবোধিনী সভা এই দিক-নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। পূর্বের সনত্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার ঘাবড়ানু ভালো তার সবটুকু বিনা বিধাঘ গ্রহণ করে এবং ঘাবড়ানু মন তার সবটুকু নির্ভয়ে বর্জন করে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদিক থেকে তত্ত্বাবোধিনী সভা নবজাগরণ বাংলার বিষ্ণু-সমাজকে স্বস্থির আদর্শ-সময়ের পথের সন্ধান দিয়েছিল। মনে হয় যেন, আদ্যীয় সভা, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাসো-ইতিহাস হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন, সর্বভারতীয় সনত্ত সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রভৃতি সমস্ত সভার পরমকার্য পরিণতি হয়েছিল তত্ত্বাবোধিনী সভায়। তার পর থেকে সভা-সমিতির ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা হল।

১। George W. Thomson, *The Stranger in India* (London 1843), vol. 2, pp. 151-152, footnote.

Rev. L. B. Day, *Recollections of Alexander Duff* (London 1879), p. 24

Rev. A. Duff, *India and India Missions* (Edin. 1840), Appendix.

George Smith, *The Life of Alexander Duff* (London 1879), vol. I, pp. 112-113.

২। স্বর্গ দিব্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১২০ পৃষ্ঠা।

৩। Rev. A. Duff, *India and India Missions*, Appendix, pp. 634-635.

৪। *Encyclopaedia of Social Sciences* (1951 print), vol. 6, "Free-thinkers" by Robert Eisler. এ ছাড়া J. B. Bury লিখিত *A History of Freedom of Thought* (London 1913) ইত্যাদি।

অ্যালেকজান্ডার ডাক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬৪০ পৃষ্ঠা।

Enquirer পত্রিকা কোনো ফাইল পাওয়া যায় না। ডাক সাহেব তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রবন্ধে আমি সেইগুলি ব্যবহার করেছি।

ঔষেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দি পদিকিউটেড' নাটক সংক্ষেপে লিপ্যেছেন : "১৮৩১ সনের শেষ ভাগে প্রকাশিত *The Persecuted* নাটিকাখানি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। পুস্তকখানি দুঃসাপ। ১২৩১ সালে *Calcutta Municipal Gazette* পত্রের ১৭শ বার্ষিক সংখ্যায় আমি এই নাটিকাখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, 'দম্পত্যকীর্তি', ১০৭ পৃষ্ঠা)। নাটকটি সংক্ষেপে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সমাজের দর্পণ' পত্রিকা থেকে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা) উদ্ধৃত করা হয়েছে।

"দি পদিকিউটেড" নাটকের একটি কপি জ্ঞানদাল লাইব্রেরিতে আছে।

১১। লালবিহারী মে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয় অধ্যায়।

১২। অ্যালেকজান্ডার ডাক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট।

১৩। ঔষেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা।

১৪। *Bengal Hurkaru*, November 22, 1824.

১৫। অ্যালেকজান্ডার ডাকের পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের বিবরণ থেকে গৃহীত।

১৬। ঔষেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১২১-১২২ পৃষ্ঠা।

'সমাজের দর্পণ' পত্রিকা থেকে কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ সংকলন করা হয়েছে।

J. K. Majumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, pp. 271-274.

George W. Thomson, *The Stranger in India*, p. 153.

Bengal Hurkaru, February 27, 1843.

'সমাজের দর্পণ' থেকে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত।

Bengal Hurkaru, January 16, 1843.

Bengal Hurkaru, February 13, 1843.

"বেঙ্গল হরকরা" পত্রের ১৮৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

মন্সিয়ারজনের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৮৪৩ সালের ২রা ও ৩রা মার্চ।

২৭। "তত্ত্ববোধিনী সভার" বিবরণ সেবেজনাথের "আত্মজীবনী", ইবেব মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (৩য় ভাগ), রামনারায়ণ বসুর "আত্মচরিত", শিবনাথ শাস্ত্রীর *History of the Brahmo Samaj* প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, vol I, (Calcutta 1919), pp. 86-88.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ জানুয়ারি ১৮৬৭ খ্র

বাউল-পরিচয়

শ্রীকিতিমোহন সেন

পুণ্যস্মৃতি

সাধনা

জানী ও পণ্ডিতেরা তাকে "তং" বস্তু বলিয়া ভুল হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বাউলরা পণ্ডিত নহেন। তাঁহারা বলেন, আমরা "তং" বা তব বৃত্তি না; আমরা চাই নাহুয। তাই তাঁহারা ভগবানকে পুরুষ বা মনের নাহুয বলেন। এই জগতে নানা বস্তুর মধ্যে সেই নাহুযকে হারাওয়া চলিয়াছি। সেই নাহুযের বিরহ যখন মনে জাগে তখন আর কোনো বিষয়রূপে মনে তৃপ্তি হয় না। এই নাহুযকে খুঁজিয়া পাওয়াই হইল সাধনা। তাই বাউল গাহিয়া ফেরেন—

আমার মনের নাহুয যে রে আমি কোথায় পাব তারে।

হারায়ে সেই নাহুযে তার উদ্দেশে দেশ কিম্বে বেড়াই ঘুরে।

তব ও জানে কখনের সেই বাবা সারে না—

তবে কবে মন মানে না পরম নাহুয চাই-ই চাই।

তিয়াস যে করে না বুজায় (—কুলাপায়) কল্যাণের কই যে পাই।

পাঁচ পঁচিশ কি দ্বিগুণ সাধনে, মন মানে না উঠায় করে অহুয কাধনে।

এখন মহাত্মব পরমার্থ লাগে যেন সব বালাই।

নাহুয আমার চার সৈ নাহুয (তাই) বাউল বাউল হুয়া গাই।

সেই নাহুয যদি মন বিলাপী বিলাস যে আর গতি নাই।

বিশ। হইল কৈবর্ত বলার শিল্প, জাতিতে কৃষ্ণমালী।

কবীর, দাস, রামদাস, রবিদাস প্রভৃতি ভক্তেরা এই নাহুযের মত্ত ব্যাকুলতা পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষত্বক ভো বেসের একটি কোণায় পড়িয়া আছে। অধৰ্ব বেসে তাহা ১২-৬ ও ঋগবেদে তাহা ১০ মণ্ডলের ২০তম সূক্ত। কিন্তু বাউলদের আগাগোড়াই হইল পুরুষত্বক।

তাঁহারা জানী পণ্ডিত, বাহাদুরের সনাত্তে বিশেষ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা, তাঁহারা ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছেন তবে জানে, আচারে অহুচানে, নসিরে ধর্মব্যবহার। সরল শাস্ত্রজ্ঞানহীন বাউলরা অতপত বুঝেন না, তাঁহারা তাঁহাকে খুঁজিয়াছেন জীবনে ও আচরণে নাহুযের মধ্যে সরল ও সহজ করিয়া।

সম্প্রদায়-বন্ধন

তাঁহাদের সেই সহজ পথে যখন কতদিন নসিরে ও শাস্ত্র আসিয়া পাড়ায় তখন ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে তাঁহারা বলেন—

তোমার পদ চাইকালে নসিরে মসজিদে।

(তোমার) ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই কইখা পাড়ায় ওরতে মোরদেয়ে।

ভূঁইয়া ঘাতে অক ভুজায় তাতেই বরি ধনং পুজায়
কল্মষে ভক কোথায় দাঁড়ায়, (তোমার) অকল্ম সাধন মরলো তেবে।
তোমার হুঁসারেই মানান্ ভাগ্য, পুণ্য কোরণ তসী মালা
তেবে পবই তো প্রধান ছালা, কেহ মন সরে খেবে।

✓ যে সরল সহজ জীবনে তাঁহাকে অহুভব করিতে পারা যায় তাহাতে মন বশন তৃপ্ত হয় না তখন নানা কুত্ৰিন চেষ্টা করিতে হয়। তাই কবীর বলেন—

হৃদ্য মন পীরে নহে বোদি পিরনকী হোল।—কবীর ৪, ৭ পৃ

“হৃদ্য মন (যাহা সহজ ও সমুপে আছে) পান করিবে না, ইচ্ছা হইল বে খুঁড়িয়া অল বাহির করিয়া পান করিবে!” তখন নিম্নের রচিত শাস্ত্র প্রকৃতি বন্ধন একের পর এক আমাদের দৃঢ় করিয়া ধাপে।

যে কী পুত্ৰী স্মৃতি আদি।

বধতে বধ হোড়ি ন লাগে।—কবীর ৪, ৩ পৃ

“বেবের পুত্ৰী আবার আদিলেন স্মৃতি, তিনি গািলেন এমন বানন যে কিছুতেই আর যায় না ছাড়ানো।”

মতবাদ বা ‘ক্রীড’

✓ চারি দিকের আক্রমণ হইতে সাধনাকে রক্ষা করিতে বর্ষক মতবাদের (creed) বেড়া দিয়া নির্বিঘ্ন করা গেল। একদিন উঠিয়া দেখি, সাধনার কেবল গোত্রবাছুর চরিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু বেড়াগুলিই জীবন্ত হইয়া তার সব শস্ত খাইয়া ফেলিতেছে।

বেড়া দীন্দ্রী বেহুকা বেড়াই বেত যায়।—কবীর ৪, ১১ পৃ

যাহারা সরল প্রেমপন্থী তাহারা কৃত্রিম স্বর্ণ-নরক বা শাস্তের শাসনে ভীত নহেন। “যাহারা হরিকে না জানে তাহাদেরই স্বর্ণ-নরকের ভয়, যাহারা হরিকে জানে তাহাদের সে ভয় নাই।”—

অনলাসে কো বর্ণ নরক হৈ হরি জানে কো নাই।—কবীর ২, ১১ পৃ

✓ পণ্ডিতেরা যখন তাহাদের স্বরচিত এই জটিল তত্ত্বাঙ্গে আব্রাহাম, তখন এই মূর্খ ও সরল লোকেরা সহজ সরল ধর্ম খুঁজিয়াছে জীবনে, প্রেমে। তাহারা জীবন-মরণ লইয়া মাথা ঘামায় নাই, শৃংসার ও পুনর্জন্ম লইয়া ভর্ক করে নাই; অলহাওয়ার পরণু তাদের অভিভাকের দূর করে নাই, তাহারা (পরম পুরুষের) গবেই তাহারা নিত্য বসতি করিয়াছে—

জীবন মরণ ন বাঃহৈ কন্দু’ জাগ্রা যখন ন করে।

পানী পরম পরম নহি’ গায়ে তিহি সাদি করে বসের।—বাবু, রামকলী পৃ ২১-

তাহারা ঘরেও বস্তু হয় না, বনেও ঘুরিয়া বেড়ায় না। ক্রহু সাধনাও কিছু করে না, সমুৎকল উপদেশে তাহার মনের সহিত নিম্ন জনকে মিলায়।

না বরি বলা না বনি পরা না কুহ কিয়া কবল।

দাদু মনহী’ হন বিদায় সন্ততরক উপদেশ।—দাদু, ওলফের অর্থ, ৭৪

ভগবানকে তাহার কেবলমাত্র পূরণের অবতারের মধ্যে অবতীর্ণরূপে দেখিয়া তৃপ্ত নহে। তাহার সেপে, সকল জীবনে সকল মানবে তাহার অবতারলীলা নিতাই চলিয়াছে—

ধীরে ধীরে চায়া দেখি সবই যে তাঁর অবতার।

নূতন গীতা কি কেবাণি, তাঁর বিভাসীলা চমৎকার।

সেই অবিদ্যায় পুরুষকে সবাই সবাই দেখিতেছেন, কেবল সাধনার বলে সাধক তাহাকে চিনিতে পারেন—

সবকো বৃষ্টি পড়ত অবিদ্যায় বিরলা সর পিঙ্গালে।—কবীর ২, ১২

ভেষ, বাহুচিহ্ন

✓ সহস্র সরল পথের পথিক বলিয়া বাউলরা ডেখ-চিহ্নাদি পছন্দ করেন না। নানক কবীর দাদু রামদাস প্রভৃতি ভক্তগণও বার বার এই কথাই বলিয়াছেন ✓ কেন্দ্রলীরই মহোৎসবে আমাদের এক বন্ধু এক বাউলের গান শুনিয়া চমৎকৃত হন। তাঁহার কাপড় দেখিয়া না হইয়া সাধা কেন এই প্রশ্ন করায় বাউল গাহিলেন—

✓ ভিতরে হল না ছেলে কি বাইরে কি রে রু করে ?

কেন কি অসুখ নামে বাইরে ভারে রু করে ?

কলে যখন রস হয়, তখন বাহিরে আপনি রস লাগে। নহিলে বাহিরে হইতে রু করিলে কি আর ফলে নাখুঁ আসে ? গৈরিক পরিলেই তো অস্তরে রস আসিবে না।✓

* অন্তরের সাধনা প্রেম

✓ ভাবের রাগে প্রেমের রাগে অগ্রসর হইতে গেলে বাহু সাধনার লাভ নাই।✓ শিল্পাদির জায় ভাব-সাধনাও যদি শুধু বাহু বস্ত্র লইয়াই থাকিত তবে তাহার শিক্ষাও বাহু হইত।✓ কিন্তু ভাব ও প্রেম হইল জীবনের ভিতরের বস্ত্র, তাই তাহার সাধনাও হৃদয়া উচিত অন্তরের। বাউলদের মধ্যে প্রেমই হইল ধর্মার্থ সাধনা। প্রেমই সরল ও সহস্র সাধনা। প্রেমেরই ধর্মার্থ যোগ। জানে শুধু পরম্পরে বিরোধ ও বন্ধন। তাই যৈত ও অযৈত লইয়া চিরকাল বে বিবাদ জানের দগতে চলিয়া আসিতেছে প্রেমের সহম যোগে সহরেই তাহার সমাধান হইয়াছে। প্রেমের সংজ্ঞাই হইল বাউলদের মধ্যে—

নিজ ক্ষেতে নিজ ঐক্য ঘের তার নাম।

যৈতের মধ্যেও যৈতকে অতিক্রম করে প্রেম, কেহ কাহারও নিজ ধর্ম না হারাইয়া, অর্থাৎ পরম্পরের যোগে পরম্পরে পূর্ণ হয়।

বাউলদের প্রেমঅস্তর কিছু কথা চৈতন্তচরিতাবৃত্তেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রেম বাহিরের কোনো প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার নহে, কাজেই কোনো বাহু বিধি বা ধর্মের স্রষ্টব্যস্রপ করিলে প্রেমের ধর্ম নষ্ট হয়।

✓ শাস্ত্রবিধি ও শোকাচার আশ্রয় করিলে যে প্রেম বৃথা। প্রেমও উচ্ছ্বল ব্যাপার নহে।—কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ বাহিরের নয়। প্রেম হইবে প্রেমের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শায় হুক্তি নাহি বান্দে রাগানুগার প্রকৃতি।

—চৈ. চ. ২২, ১১৩ পৃ. ১২০ দে. সা.

কাম দেহস্থ প্রকৃতি প্রকৃতির দ্বারাও প্রেম যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে প্রেম তাহার শুভ ও স্বাধীনতাকে হারায়। বৈধী ভক্তি হইতে এই স্ব নিয়ন্ত্রিতা স্বাধীনতা ভক্তিই ভাল।

রাগানুগারক্তি মুখ্য।—চৈ. চ. ৪৭, ২২, ১১৮ পৃ. ১১৩ দে. সা.

আর যে সাধক প্রেমের নিয়ন্ত্রিত পথে চলেন তিনিই ভগবৎপ্রেমের মার্গে সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্তের পক্ষে তাহা মূল্যবান নয়।

কেল বে রাগদ্বার্যে, তবে কুল অদ্বার্যে, তারে কুল মার্গে হস্ত।—চৈ. চ. ৪৭, ২২, ১১৮ পৃ. ১১৩ দে. সা.

লোকাচার শাস্ত্রাচার ও কান্যাদি বৈহিক প্রকৃতির অতীত বিহীন প্রেমেরই ভগবৎপ্রেম-মার্গ লাভ হয়। এই প্রেম হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য স্বয়ং উদ্ভূত হয়, তাহাই ভাবসাধনায় এই ক্ষেত্রে চলে, নহিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ইহার অবশ্য-অঙ্গ মানিলে এই প্রেমের পূর্ণতা হানি হয়।

জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি তত্ত্বের কিছু নহে অঙ্গ।—চৈ. চ. ৪৭, ২২, ১১৯ পৃ. ১১৮ দে. সা.

শাস্ত্রজ্ঞান লোকবিধি কামপ্রকৃতি প্রকৃতি বাহ্য কোনো নিয়মাবলি দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত নহে।

এই প্রেম হইল বিহীন অসীম ও অপার, তথাপি ইহা নিতাই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা বিহীন কথা। কারণ প্রেম “বিহীন” হইলে আর ইহার বাড়িবার অবসর থাকিত না। তথাপি ইহা নিত্যবৃদ্ধিমান।

গদা প্রেম বিহীন বাহ্য বাড়িতে নাহি ঠাকি

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া যায়।—চৈ. চ. ৪৭, ২২, ১১৯ পৃ. ১১৮ দে. সা.

পাছে কামপ্রকৃতিকে কেহ কেহ বাহ্য মনে না করিয়া আস্তর বলিয়াই গ্রহণ করেন তাই কবিরাজ গোস্বামী বিশেষ সাবধানতার সহিত স্পষ্টই বলিলেন যে, এই প্রেমের মধ্যে কাম ও ইন্দ্রিয়সক্তির স্থান নাই।

কাম হইল আস্তরহুগ্ধা, প্রেম হইল ভগবানের স্নেহহুগ্ধা।

আন্তরিক্যইতিবাচ্য তাহে বলি কাম।

ইন্দ্রিয়সক্তিত্বইচ্ছা করে প্রেমদাম।—চৈ. চ. ৪৭, ২২, ১১৯ পৃ.

• এই প্রেমেরই ঐশ্বর্যেরও কোনো হাত নাই। অর্থাৎ এই প্রেমের ক্ষেত্রে কেহ বড় কেহ ছোট নয়। শক্তি বা বিকৃতির স্থান এখানে নাই। এই প্রেমেরই আমরা আমাদের শ্রিয়ত্বের সমান হইয়া যাই। উভয়ের মধ্যে যে ভেদবিভেদ তাহা ঘুচিয়া যায়। যদি তাহার ঐশ্বর্য দেখিয়া সেই সোভেই বন্ধিতা থাকি তবে তো প্রেম শুভ হইবে না। পুরুষ ঐশ্বর্য বা কামে দ্বন্দ্বিত প্রেমের তাহার আনন্দ নাই।

ঐক্যনিবিল প্রেম নাহি মোর ঐক্য।—চৈ. চ. ৪৭, ২২, ১১৯ পৃ.

তাই কাহার ক্ষেত্রে আমরা সহজে বন্ধনে বদ্ধ হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমের আনন্দের স্বাধীন করিয়া

দিয়াছেন, সেখানে যদি নিঃশব্দে হীন মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিতে চাই, তবে তাহা প্রেম নহে। তাহাকে প্রেম নামে দিলেও সে প্রেম সত্তা হইবে না। প্রেমভাবে একটি স্বাধীন সান্না চাই।

আমাদের ইচ্ছা নানে আপনাদের হীন।

তার প্রেম বশ আদি না হই অধীন।—চৈ. চ. আদি, ১, ৫০

নানা নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই সংসারের মধ্যে সংস্র নিয়মের বন্ধ থাকিয়াও প্রেমে সলাই আনরা তাঁর সঙ্গে সনান ভাবে শীলা করিতে পারি। এক নানা কর্ণের নানা বন্ধনের মধ্যে আমাদের চিত্ত সলাই তাঁর আত্মানের মন্ত্র উৎকর্ষ হইয়া থাকে। তাই মহাপ্রভু চৈতন্য এই কথা বুঝাইতে গিয়া উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

পরমানবিনী নারী যতপ্রাণি মুহুর্ৎমহু।

ভবেদ্যাব্যবসায়ভাববিনয়সামান্য।—চৈ. চ. মধ্য, ১ ২৬ পৃ. মে. স:

পরকীয় তত্ত্ব

এই যে সংসারে সাংসারিক নিয়মের মধ্যে বন্ধ থাকিয়াও যে সংসারাতীত প্রেমময়ের মন্ত্র ব্যাকুলতা, ইহা যেন ঘরে থাকিয়া বাহিরের মন্ত্র ব্যাকুলতা; ইহাই পরকীয় রস বলিয়া কথিত।

অতএব মধুর রস কহি তার দাব।

পরকীয় পরকীয়গণে বিবিধ সংসার।—চৈ. চ. আদি, ১, ৫, পৃ ১০

কবিরাও আত্মাকে মানসলোকাগত হংস বলিয়াছেন (মৈত্রী, ৬, ৮)। সেই হংস এখানে বাসা বাধে না, এগানকার মলিন জলে সিক্তপক্ষ হয় না। সেখানকার ডাক জনিলেই উড়িয়া চলিয়া যায়। সে “অনন্দ”। “অনন্তের সন্ধানে সে ঘন সন্ধান”। বিত্তীয় ইহার গতি (হংস, ১)। এই হংস বাহিরের মন্ত্রই ব্যাকুল। হংসো শেলাঘতে বহিঃ (বেতা, ৩, ১৮)। এই অদানের কি এক অপূর্ব ডাক আছে যে বাহু সেই ডাকে স্থির থাকিতে পারে না, মন বয়ে রহে না, জলধারা যেন কাহার সন্ধানে সলাই অদূরের দিকে ধাবমান।

কথা বাস্তা বেলগতি কখন রক্ত মনে।

কি যাপন সত্য প্রেম সত্তা বৈশিষ্ট্য কখন। অর্থ, ১০, ১, ৩১

† এই কথাই দাঁড় বলিয়াছেন—

যেহ রূপে সংসার বেঁটী বশ কক্ষ পাস।—দায়ু, বিচার অর, ২

সেহ সংসারে থাকিলেও ক্ষম পড়িয়া আছে যেন তাঁহারই কাছে।

এই পরকীয়ত্ব ঠিক বৃত্তিতে না পারিয়া কত সাধনার্থী নিঃস সাধনা ব্যর্থ করিয়াছেন তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

† এই প্রেম বাহু সব সুবিধার দ্বারা নিয়মিত নহে। নিতাই নানে এক বাড়িকে একবার প্রের করা গিয়াছিল, প্রেম-বস্তুর পরিচয় সে পাইল কেমন করিয়া। সে বলিল, “বাবা, আমারও-স্বামী ছিলেন। সেহেহ কাছে যেহ দশ-বারো বৎসর রাখিয়াছিলাম। তার পরে তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া গেলেন, তারও পরে দশ-বারো বৎসরের পর, হঠাৎ একদিন অধঃগতের মন্ত্র তাঁহাকে পাইলাম। সেই প্রেম-পরশটুকু পরশমণির মত

স্বামাকে সোনা করিয়া দিয়া গৈছে।" এই প্রেম-পরশ হয় ভগবানের বিশেষ রূপায়। তাই চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

ধর্ম ছাড়ি রাশে ধোহে করয়ে দিলন

কহু নিলে কতু না নিলে সেবের ঘটন।—আদি, ৪, ৭২ গু

এই কারণেই নরনারীর পরস্পরকে চেনা সহজ নয়। সমস্ত ক্ষুদ্র কাননা না ছাড়াইতে পারিলে কেহই কারও পরিচয় পায় না। তবু বাউলদের মধ্যে নারীপরিহার করাই ধর্ম নহে। নারীর নারীত্ব যে কি রহস্যময় বস্তু এবং প্রেমপথে বাহারা সাধনার্থী তাঁহাদের পক্ষে “নারীত্ব” যে কত বড় সহায়, তাহা সহজ-তবজ্রা জানেন। এ প্রসঙ্গে তাহা বুকাইবার মত স্থান নাই। মহাপ্রভুর মত সাধকও প্রকৃতিভাবে সাধনা করিয়া প্রেমের বর্ষা পরিচয় পাইতে চাহিয়াছেন।

বাউলদের মধ্যে নারীকে অগ্নির মতো তুলনা সেওয়া হইয়াছে। অগ্নির যে বাহিকানক্তি সংসারের কেবল কার্ণাধিকা, সেইকু তাহার গৃহের ও গৃহকর্মের বিশেষ সম্পত্তি। কিন্তু তাহার দীপ্তিটুকু সর্বমনে। সেই দীপ্তি সকলেরই ভিত্তির হরণ করে। তাই নারীর “বিগ্রহ”রূপ তাহার স্বামীতে ও পরিবারে আবদ্ধ কিন্তু তাহার “আগ্রহ”রূপ বা অধ্যাত্মরূপ সকলের সাধনাকে জ্বাতি দিতে সক্ষম। এই তত্ত্ব না বুঝিয়া যে “আগ্রহ”তত্ত্বের সঙ্গে তুল্য করিয়া “বিগ্রহ”কে অস্বীকার করে সে নারীকে অস্বাভাবিক করে, সাধনাকে ক্ষুর করে। এবং সহজের গভীর কথা। এই প্রসঙ্গে বলিবার মত স্থান নাই। এই প্রেমসাধনা হইল অশ্বরের। ভগবানের বিশেষ রূপা ছাড়া নাহয় সে রস জীবনে পায় না। তাহার মহাশয় হইল লোভ, মন ও অহনিকা। লোভে, মনের কেলতায় ও স্বার্থবুদ্ধিতে এই সহজ সরল সাধনা নষ্ট হইয়া যায়।

পরকীয়া প্রীতি বুঝিতে কেহ কেহ পরনারীতে আসক্তি বুঝিয়া সহজ ধর্মের মূল মাঘাত করিয়াছেন। সহজ রসের আর-এক কথা লইয়াও তাহার। গোল করিয়াছেন। বাউলরা বলেন, আপনাকে চেনাও হইল নৃত্তির এক দ্বার। নিজেকে চেনাই যায় না, ঘনি-না আনরা পরের প্রেমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিজের স্বরূপটিকে না ধরিতে পারি। ভগবান সর্বত্র হইলেও তাঁর স্বৰ্ণাধুর্ তাঁর নিজের কাছেই অজ্ঞাত অনাস্বাসিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাবিকার অমৃতত্বের মধ্য দিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিতে চান। তাহাই হইল চৈতন্যচরিতামৃতের লেখকগণের চৈতন্যলীলার মূল কথা। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথা শ্রীরূপ গোবর্দীর “শ্রীরাধার প্রণয়বহিনী” শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়। ভালো করিয়া বুঝানো হইয়াছে।

শ্রীরাধাঃ প্রণয়বহিনী কীদৃশো বান্ধবো

বাঘো ধোহুতবুঝিা কীদৃশো বা স্বামীঃ ।

সৌভাঃ চাত্তা মহাজনতঃ কীদৃশঃ বেতি সোভাঃ

তত্ত্বাভ্যাসঃ সমন্বি পটীগর্ভে সিন্ধৌ হরীকুঃ ।

আনা হৈতে রাধা পায় যে স্বামীই হয় ।

তাহা আশ্বাসিত আশি সদাই উদ্ভূত।—চৈ, ৫, ৮. আদি, ৪

(ভাগবতে তো রাধা নাই। সেখানে লক্ষী-কম্বুগীই যথেষ্ট। রাধা হইলেন সহজপর্যায়ের মহানীরা।

নিজের স্বার্থপর্যায় নিজের কাছেও রহস্যবৃত্ত। ইহা আবিষ্কার করিতে পারি আমার প্রতি অন্তরে যে প্রেম সেই প্রেমের মধ্য দিয়া। নিজের রূপও নিজেরই অজ্ঞাত। তাহা দেখিতে পায় পরে। নিজে দেখিতে হইলে

সেখানে হৃদয় নরপণের কথা দিয়া। প্রেমিকপ্রেমিক। সেই নরপণ। সে নরপণে স্বার্থার্থ প্রতিবিকিত দেখা যায়। তাই ভগবান আনানের প্রেমের কথা দিয়া নিজেরই মাদুরসংযোগ করেন। আর প্রেমের কথা দিয়াই নিজেকে আনিতে পারিয়া আমরাও মুক্তির পথ হৃদয় করি। ইহা হইল সহস্র সাধনার একটি গুঢ় কথা। ইহারও নানা বিস্তৃতি ঘটানো আছে।

একরস ও সমরসত্ত্ব

স্বানের ভেন আমরা মৈত্রিক গতি দিয়া অতিক্রম করি। কালব্যবস্থা আমরা জীবনগতি দিয়া অতিক্রম করি এবং সর্ববিধ ভেন আমরা সমরস বা একরস বা অধ্যাত্মগতি দ্বারা অতিক্রম করি। ইতি অগৌণে সীমায় আবদ্ধনরপণ। তাহাতে উভয়ে উভয়ে পূর্ণ করে। এই সমরসত্ত্বটি বাউলদের সহস্রপথের একটি খুব বড় কথা—ভেদবিভেদের সব অনেক। এই একরস ও সমরস সাধনের দ্বারা দূর হইয়া যায়। শিব আর শক্তি, জ্ঞান আর ভক্তি যদি ভিন্ন হইয়া থাকে তবে তাহা কোনো কারণেই লাগে না—একত্র হইলে তবে নব নব সৃষ্টির মূল খুলিয়া যায়। তাই আনন্দলাহরী বলেন—“শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ প্রভবতি”—শক্তির সহিত যুক্ত হইলে শিব কিছু করিতে পারেন, নচেৎ তিনি “অস্মিতুমশি” অক্ষম। বাউলরা সমরসের কথাই বলেন—

নিপত্তি হলে মুক্তি হবে সবসময়।

স্বর্গকে বলে সুখের পাথ,

সদান হয়ে সহস্র নুতন নিয়ামক থাকে।

সেহতবশ্যাকেরা জ্ঞান ও প্রেমধারা, গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিন্ধলাকে একত্র করিয়া সেই গঙ্গমে মুক্তিরান করেন। কবীর বলেন—

হরত ঠার বিরত হার মনসে পকড় কর;

পক ঠার মনসকে ছাট আনৈ।

নীল নির্বল ওয়া বৈন দিন বরত হৈ।

জনম ঠার বৈল ভব অতে পাই।

প্রেমে ও বৈরাগ্যের গঙ্গাধারা। আর একত্র যোগ করিলে যে “প্রযোগ” বা “প্রযোগ” হয় তাহাতে স্নানই মুক্তি। যোগ হইতে উপরে এই প্রযোগ। সাধারণ নদীসংগমে বা ‘প্রযোগে’ আসে মুক্তি হইবে কি করিয়া?

তাই বাউলরা গান করেন—

কু কি সাধন আছে আর

ভেন বিরক্তে একাত (= এক কর) বলে সবসময়ের করণি দার।

যদি শিব শক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়,

ভাইন আর বায়ের আলন দারা ভিন্ন ভিন্ন বার।

তবে মিথ্যা মুক্তি নাই যে মুক্তি সবই নুতন নুতনকার।

জগৎ বলে শোনে ও বাবা

কণ তপ উপাস্ত জীর্ষ শাস্ত চার্চ সব সাধা।

যদি পরার্থ সাধনি নিজ, যোগে নিদ্রা নানান দার।

এই সময়স বা একরস ও বাউলদের মতে প্রেমেরই এক নাম। কারণ রস ছাড়া জ্ঞান ও প্রেম, স্বপ্ন এবং চিত্ত, জীব ও শিব, শিব ও শক্তি সর্বপ্রকারের ভেদ বিভেদ দূর করিয়া এক হয় না। রসের আনন্দের এই এক হওয়া। তারই নাম সময়স। এই সময়স বা একরসের কথা মাধবপুর যোগীদের মধ্যে, শৈব যোগীদের মধ্যে তন্ত্রে ও উক্তর-পন্থিমে, পণ্ডাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের সাধকদের মধ্যে বহু বহু স্থানে আছে। বাহালা-ভবে এখানে উল্লেখ করা গেল না।

ভৈরবানন্দ এই প্রেম দ্বিগুণে সহস্র সাধনার সব কথা। এই সহস্রের কথা কবীর নানক দাদু রবিরাস ব্রহ্মব প্রভৃতি সবাই বলিয়াছেন। দাদুর শিষ্য হুন্দরদাস তে। সহস্রানন্দ বলিয়া একটি গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন। দাদুর গুরুদেব অষ, ৭৪ পর, রামকলী রাগের ২১০ সর্বদ, সারংগ রাগের ২৬৮ সর্বদ প্রভৃতি দেখিলে তাঁর সহস্র বস্তুটুকু যায়। হুন্দরদাস তাঁর সহস্রানন্দ গ্রন্থে সহস্র মতের সব কথাই লুকাইয়া বলিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

১. সাম্প্রদায়িক আচারক্রিয়াকর্মে ও বিধিবিধানের আড়ম্বরের কোনোই সার্পকত। নাই।

২. বিশেষ বিশেষ কর্ম-এ অকুষ্ঠান বিনা, বিধিবিধান ও সাম্প্রদায়িক আড়ম্বর বিনা, সহস্র প্রেমপথেই সহস্র জ্ঞান ও আনন্দ বেলে।

৩. বোদ্ধব্যবহিত তত্ত্বজ্ঞানেও যে কর্মের সমূল নাশ হয় বা না হয়, সহস্রানন্দ হইতে তাহা আবে। সহজে হয়।

তাই তিনি বলেন—

সহস্র সহস্র রাসধূনী সোই।

সহস্র হিঁ রাঁহি সবারে সোই। (৮)

সহস্রেরই জীবন ভগবৎসংগীতে সংগীতময় হইয়া যায়। সহস্রের মধ্যেই তাহা হয় বলীন।

হুন্দরের মতে, সেই নিরঞ্জন সকলের মধ্যেই সহস্র হইয়া আছে—

সহস্র নিরঞ্জন সব বৈ সোই। (৯২)

তাই সকল সাধক সহস্র হইয়াই তাঁহাকে ও নিজেরদের বোধ্যকে পাইয়াছেন—

সহস্রৈ কতখিলে সব কোয়। (১০)

(ভক্ত সোজাঙ্গী, পীপাঙ্গী, সেনাঙ্গী, ধনাঙ্গী, ভক্ত রবিবাস, ভক্ত দাদু, শিব সনক শুকবেবাদি সবাই এই সহস্র পথেরই পথিক—)

সোজা স্টপা সহস্র সনান।

সেন বন্য সহস্রৈ রস জানা।

জন রইবাসে সহস্র কোঁ চরা।

ভক্ত দাদু সহস্রৈ আননো। (২০)

এব, প্রহ্লাদ, গোবিন্দ গোপীচন্দ্র, জয়দেব সবই সহস্র পথেই চলিয়াছেন (২১-২২)।

সর্ববিধ ভেদবিভেদের অঙ্গ-গতি হয় সহস্রে সময়সে। কাছেই সময়স হইল সাধনার মধ্যে একটা মহা যোগসাধনা।

জার্মান-কবি রিল্কে'র দুটি কবিতা

খ্রীস্টানীকান্ত ওষ

রিল্কে কে ও কি ছিলেন বাহু-স্বীকৃতি, পরে কিছু বলছি। তাঁর কবিতা নিয়েই আগে তাঁর পরিচয় আরম্ভ করি।

প্রথম, 'অরফেউস ও ইউরিসিস' কবিতাটি^১। গ্রীকদের এ কাহিনী সুপরিচিত। অরফেউস ছিলেন সংগীতকার, অতুলনীয় সংগীতকার—পৃথুপাণি তরুণত। পৃথু হুত হয়ে বাহু তাঁর সংগীত শুনে। তাঁর প্রাণমিণী ইউরিসিসের মৃত্যু হয় হঠাৎ, সর্পাঘাতে। মৃত্যুলোকে (Hades) চলে গেলে, অরফেউস ও তাঁর অশ্রুস্রবণ করলেন সেখানে শব্দগীত। এবং তাঁর সংগীতে মৃত করলেন মৃত্যুদেবতাকে; ইউরিসিসকে ও কিরে পেলেন, তবে এই শর্তে যে ইউরিসিস যখন ফিরে চলেবে তাঁর পিছনে, পৃথিবীর উপর পৌছনো পৃথু তিনি তাঁর দিকে ফিরে তাকাবেন না, তাকালেই ইউরিসিসকে হারাতে হবে, সে ফিরে চলে যাবে অখোলোকে। কার্ণত: অরফেউস ভুলে গেলেন তাঁর শর্তের কথা, পৃথিবীর নিকটে এসে ফিরে তাকালেন ইউরিসিস এল কি না দেখবার জন্য, আর হারালেন তাকে।

শান্তিন কবি ভরিস বলেছেন এ কাহিনী, বাধুর্ধে কাঙ্ক্ষণে অতুল সে কাব্য বিশ্বসাহিত্যে। অরফেউস আনন্দে ঔৎসুক্যে আশ্রুত হয়ে ফিরে তাকালেন, ইউরিসিস কেনার বলে উঠলেন—

কি করলে তুমি, হতভাগা! দুঃখনাই আমার!—এই বে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোথায়, কোথায় তোমার হাত? অন্ধকার রাত্রি যে ঘিরে এল! বিহার, বিহার!^২

রিল্কে কিন্তু এ করুণ পরিণতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মৃত্যুলোকে গিয়ে, মৃত্যুর আবহাওয়ায় ইউরিসিসের ঘটেছে রূপান্তর—শেষশীঘ্রের জাখায় sea-change। শুধু দেহগত নয়, তার মধ্যে এসে গিয়েছে চিত্তগত বিপর্দয়, কেবল ভৌতিক নয়, তার হয়েছে আদ্যিক ও আধ্যাত্মিক নবগঠন। রিল্কে দিয়েছেন চিত্রটি এই ভাবে—

ইউরিসিস তবে কিরে চলেছে মৃত্যুলোক হতে মর্ত্যলোকে, অরফেউসের পিছনে; দুঃখনের মাঝখানে, ইউরিসিসের ঠিক সামনে পথ দেখিয়ে চলেছেন দেবতাদের দূত মার্কারি (বৃহদেব)। এ দেখদূত কি রকম? ননোহারী—এবং গভীরবাহুনাপূর্ণ। রিল্কে'র এই আলোচ্য—রিল্কে'র ভাষায় জাদু ইংরেজি অহুবায়েও আমার কথকিং অহুভব করতে পারি—বাংলা অহুবাদ দিতে পারে তার দূর প্রতিধ্বনি—

পথচলার সেবতা, দূর বার্তার সেবতা।

দীপ্ত আঁধি ছাটির উপর হুঁকে পড়েছে তার পথবাড়ীর মন্তক-আবরণ,

১ ঐক্য

Rainer Maria Rilke : *Requiem and other Poems*, translated and edited by J. B. Leishman. The Hogarth Press.

২ Jam que vale : feror ingenti circumdata nocte,
Invalidas que tibi tendens, heu! non tuo, palmas.

হাতে অঙ্গুষ্ঠও বেধের সম্মুখে প্রসঙ্গিত,
পায়ে ডান্না বীরে চলে চলেছে,
বা হাতে ধরে রেখেছে তার কাছে সম্মিত— তাকে ।*

আর ইউরিনিগ ?—

নিজের মধ্যে নিজেকে ঢেকে সে রেখেছে— তার সম্মুখে যে হয়ে এল । চিন্তা করে না— পতি তার শাননে এগিয়ে চলেছে, কি, রাত্তা তার উঠে চলে মিশেছে আবার জীবনধারণ ।

যিরে রেখেছে নিজেকে নিজের মধ্যে, চলেছে অনমনে— স্বভাৱ তার কি পূর্ণতা দিয়ে তাকে পূর্ণ করে তুলেছে ।

পরিণত ফলের মত যথুভাষ আর গাঢ় আঁপারে পূর্ণ হয়ে সে পরেছে তার মহামহৎসে সঙ্গে মিলে— এখন নতুন জিনিস তা, আর-কিছু সে-সময়ে আর তার অন্তরে প্রবেশ করে না ।

ফিরে আবার যে কুমারী হয়ে উঠেছে নৃতনভাবে, স্পর্শের অতীত এমন ; নারীর তার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যা ফলের মতো আপনাকে গুটিয়ে নিয়েছে, পাংস্তল স্নক তার হারিয়ে ফেলেছে পরীক্ষার অভ্যাস সব...*

আর সে সেই স্বন্দরী রমণী নয়, কবির কাব্যকে যে একদিন প্রতিরবিত করে তুলেছিল ; আর সে হরভিত প্রসঙ্গিত শব্দ্যার বেয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর সে পতির সম্পত্তি নয় ।

দীর্ঘ ক্ষুণ্ণের মতো নুনে পড়েছে সে, কুটির মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু বিচিত্র অববানে আপনাকে বিতরণ করে দিয়েছে— ফিরে গেল সে তার আদি সন্ধ্যা, লাভ করলে কেবল মূল্যপ...

দিশারী দেবতা করণ কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠল, "এই যে, হ্যাঁ, ফিরে তাকাও !" স্পর্শ করলে না কিছু তাকে, উজ্জ্বল বললে মৃদুকণ্ঠে— "কে ?"*

৩ The goal of faring and of distant message,
the travelling-hood over his shining eyes,
the slender wand held out before the body
the wings around his ankles lightly beating
and in his left hand, as entrusted, her.

৪ Wrapt in herself, like one whose time is near,
she thought not of the husband going before them,
nor of the road ascending into life.
Wrapt in herself she wandered, And hear deadness
was she with her great death, which was so new
that for the time she could take nothing in.

She had attained a new virginity
and was intangible; her sex had closed
like a young flower at the approach of evening
and her pale hands had grown so disaccustomed
to being a wife.

৫ Even now she was no longer that fair woman
who'd sometimes echoed in the poet's poems,
no longer the broad couch's scent and inland,
and yonder husband's property no longer.

মৃত্যুর অপরাধের দ্বন্দ্বের কাব্যে মূল হয়। মৃত্যু একটা অপরাধ নহে। যা ঘটার বেহেতু অবশ্যই নহে।
 দেহের অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট উদার মহামুক্তির লক্ষণ। মৃত্যুকে বার বার বলা হয়েছে মহামৃত্যু (the
 great death)। মৃত্যুর স্পর্শ সূচায় পাণ্ডব ব্যক্তিব্যবস্থার বন্ধন, দূর করে আধারের ইচ্ছাশক্তি স্বত্ববোধ—
 আধার হয়ে ওঠে বসবস্তু ("রস বর্জ"), উপাস্য, তপস্বী ; আর নান্যরূপের সৌন্দর্য্য ভেঙে দিয়ে নিয়ে
 আসে বিশ্বের সকলের আধারের সঙ্গে সাম্য ও সমপ্রাপ্ততা। মৃত্যুর এই স্বরূপ দ্বিতীয় কাহিনীটির মধ্যেও
 মিলকে স্পষ্ট করেছেন। এটিও গ্রীক-কাহিনী—আলিসেস্টিস ও আদমেটাস (Alcestis and
 Admetus)। আদমেটাস মৃত্যুর দ্বারা—যেমন সে ফিরে পেতে পারে যদি আর কেউ তার বদলে মৃত্যু
 বরণ করে। বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা রাজি হলেন না, যুবক বন্ধুও কিংবা চলে গেল—রাজি হয়ে এল তার
 পত্নী আলিসেস্টিস। আদমেটাসের মহাত্ম্যেতে আছে ধর্ম্ম-পুঙ্খ উপাখ্যান—পুত্র পুত্র গ্রহণ করেছিলেন পিতা
 যথাতীত বার্ষিক্য। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিস্ তার বিখ্যাত নাটকে দেখিয়েছেন পত্নীর আত্মত্যাগের সৌন্দর্য্য
 ও মহিমা, পরম কাঙ্ক্ষণা অভিব্যক্তি করে। কিন্তু মিলকে সেমিক দিয়ে বানানি। আলিসেস্টিস এল দীর্ঘ
 প্রাণান্ত পদক্ষেপে, মৃত্যুর কাছে নিজে থেকে দূর দিতে, মৃত্যুর সঙ্গে চলে যেতে। মৃত্যুর কাছে সে ফের বহু
 আগেই ধরা দিয়েছে, বহু পূর্বেই সে নিবেদিত উৎসর্গীকৃত। সকল জিনিসের পারে সে চলে গিয়েছে, শেষ
 হয়ে গিয়েছে সব বস্তু তার মধ্যে।^১ মৃত্যু একটা। পরম উপরিত, সকল তৃষ্ণা-বিবর্জিত প্রাণাতি। ক্ষুদ্র
 গতি থেকে বিদূর আনন্দ, এক থেকে বহুর মধ্যে একাত্মতা। তাই তো মৃত্যু এখন গ্রহণ করলে এই
 নারীকে, তখন তাঁর মূর্তির মধ্যে এল যেন এক আত্মকণা তার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শত বাহুরের জীবন।
 অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে আনন্দা বিশেষ ঘাই বিশ্বের পুরুষের একটা গভীর অর্থে—বিশ্বের উপাস্য প্রাণান্ত
 জীবনধারার সঙ্গে একীকৃত হয়ে লাভ করি একটা সমুদ্র আধ্যাত্মিক গতি। মৃত্যুর পরে লুই'র পরিণতি
 সম্বন্ধে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ধরনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মিলকে স্পষ্টই আর একটি
 কবিতার বলছেন : বীজ তার বয়ে চলল নদীর স্রোতে, গেয়ে চলল তরুণতার মধ্যে, চেয়ে রইল
 প্রশান্তভাবে ফুলের ভিতর থেকে—রইল সে একান্তে, চলল সে গেয়ে।^২

বিশ্ববস্তুর সঙ্গে আত্মা এই বহুবিচিত্র ঐক্যের আলোকে আরো দিয়েছেন মিলকে এইভাবে : নামহীন

She was already loosened like long hair,
 and given far and wide like fallen rain,
 and dealt out like a manifold supply.

She was mere root.
 And when, abruptly swift,
 the god laid hold of her, and, with an anguished
 cry, uttered the words : He has turned round!—
 she took in nothing, and said softly : Who?

৩ for no one's reached the end
 of everything as I have. What remains
 of all I used to be.

^১ And when he died, light as without a name, he was distributed : his seed ran in brooks,
 his seed sang in the trees and looked peacefully at him from flowers. He lay and sang.

সবই আমার গাঢ়তর অভিব্যক্তি। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে, পানির মত যেন আমি আকাশের হাওয়ার উড়ে যাই।

রিল্কে'র মূল ভাষা বড় স্বপ্নের এখানে—

mit meinen sinnen, wie mit Vögeln, reiche
ich in die windigen Himmel aus der Rinde.

আমি আমার অস্বভূতি বাহ্যের উপর ভর করে ভুবে যাই যেন আলোক-চকল পুতরের তলার।

মৃত্যুকে রিল্কে অনেক সনয়ে বলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছায়াগাঢ়— অর্থাৎ এ পরিণাম একটা নিবিড় গ্রন্থের পরিপূর্ণতা, সে হল যেন শিকড়ের অস্বস্ত আত্মসমাহতি।

তাই তুমি এত ভ্রামল, হে মৃত্যু, তোমার গীমানায় এসে আমার ক্ষুদ্র আলো তার কোনো অর্থ বুঝে পায় না।... তোমার শক্তির অভিন্নার লীলা, তোমার অপকল্প সেবাব্রত শিকড়ের মধ্যে বেড়ে চলেছে, বৃক্ষকাণ্ডে মিলে বিশেষ গিয়েছে, শাখার শিখরে নবজন্ম লাভ করেছে।*

এই হল আসল রহস্ত— মৃত্যু মৃত্যু নয়, তা হল পুনর্জন্ম, রূপান্তর। তাই তো মৃত্যু যখন আলসেসটিদকে নিয়ে চলেছে, তখন সে দেখলে—

সেই কুমারীর মুখখানি ভাবিবে রয়েছে তার দিকে হান্তনর, আশার ও ভরসার আলো যেন, ফিরে আসবে আবার পরিণত হয়ে, মৃত্যুর পাতাল থেকে তারই কাছে জীবনের পূজারী বে।...†

২

রিল্কে অর্জন বলেছি। তাঁর জন্ম প্রাগ শহরে, চেকোস্লোভাকিয়া দেশে। চেকোস্লোভাকিয়া অর্ন্তিম্য গাব্রাভোর অন্তর্গত ছিল তখন। রিল্কে মূল ও কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন বটে, ব্যারিষ্টার হওয়ার চক্রে ভেরিও করছিলেন নিজেই। কিন্তু বরাবর তিনি ছিলেন ডাব্লু প্রকৃতির, অনিশ্চয়, নির্জনতা-প্রিয়। শিক্ষার ও জীবন-ধারণের অর্জন-ব্যবস্থার যে কড়া আইন-কানুন সে-সব তাঁর কাছে উৎপীড়ন বলে মনে হত। জীবনে দুটি তীব্র অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষ অভিভাবিত ও অভিকৃত করে। এক, ইউরোপীয় মহাবৃত্ত— প্রথম বিশ্বের। তাঁকে সৈনিক হয়ে যোগদান করতে হয়েছিল, যদিও তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের ক্ষত্রে শেষে কেরানীস কাঙ্ক্ষিত দেওয়া হয়েছিল। ষেৎ-হিংসা দেবারেবি বক্তব্যকি তাঁর উদার উদাসী কোমল প্রকৃতির ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী। বাহুসের

* mit (with) meinen (my) sinnen (senses), wie (as) mit (with) Vögeln (birds), reiche (reach) ich (I) in (into) die (the) windigen (windy) Himmel (sky) aus (from) der (the) Rinde (bark).

† You are so dark, my little brightness on your border has no meaning—

Du bist so dunkel; meine kleine Helle

an deinem Saum hat keinen Sinn.

Such is the wondrous play of forces, passing so serviceably through things :
in roots, vanishing into the trunks, and in the tree-tops like resurrection.

‡ he saw the Maiden's face, that turned to him,
smiling a smile as radiant as a hope,
that was almost a promise : to return,
grown up, out of the depths of death again
to him, thy liver. . .

এ রকম নির্বম উগ্র পাশব ক্রুতি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হল ফরাসী দেশে আগমন। ফরাসীর মানস-প্রকৃতি ও সংস্কৃতি তাঁকে বোহিত করেছিল— তাঁর মধ্যে স্থান পেয়েছিল ফরাসীর সমাজিত স্বকৃতি, ভাষার, ভাবে, আচারে— স্বর্নীর অতীন্দ্রি দার্শনিকতার সঙ্গে। কিন্তু ফরাসী দেশে এসে যে-দৃশ্য তাঁকে বিভ্রান্ত ব্যথিত করলে তা হল শ্রেণীবদ্ধ হাস্যপাতাল রাস্তায় রাস্তায় অর্থাৎ বহু দুঃস্থ রোগী অসহায়ের এক রকম অস্পষ্ট আবহাওয়া— তাঁর কার্য্যপূর্ণ পারলৌকিকতা এই অভিজ্ঞতায় হতত আরো শানিত হয়ে উঠেছিল। তবে ফরাসী দেশের বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁর হল ডাক্তার রোভিন'এর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বস্থাপন। এ দুজনের আশ্রয় ভাবের মিল এক রকম অসাধারণ ছিল। রোভিনের প্রভাবে রিল্কে'র ভাবে ও চেষ্টার ধারায় ঘটেছিল বিশেষ পরিবর্তন। রিল্কে গোড়ায় ছিলেন অনেকখানি ভাববিলাসী, তাঁর চেতনায় ও তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গিমাতে দৃঢ়তার নিশ্চয়তার চেয়ে বেশি ছিল বাধুর্ষ, রোমান্টিক-হুলভ উচ্ছ্বাস ও অস্পষ্টতা। কিন্তু রোভিনের সংস্পর্শে রিল্কে'র এল ভার্ণ-হুলভ আত্মস্বতা, দৃঢ়তা, পরিষ্কৃতিতা, সংহত স্বচ্ছতা।

রিল্কে রূপ দেশ ও ঘুরে এসেছিলেন। রুশিয়ার বে বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্পর্শ করে তা হল তার প্রগাঢ় আন্তরিকতা (আজও সে আন্তরিকতা প্রকাশ পায় না কি তার নাস্তিকতার মধ্যে?), আর একটা অসীমতা ও নিরবচ্ছিন্নতার আবহাওয়া। এ সবই রিল্কে'র কবি-চেতনার উপাদান হয়েছিল।

রিল্কে'র আন্তরিকতাবোধ একটা ভীতভা, প্রগাঢ় আশ্রয়্য পরিপূর্ণ থাকলেও, তার মধ্যে এসেছিল প্রশস্ততা শান্তরসাম্প্রদায়। জীবনে বাহ্যতঃ তাঁকে খুব বেশি বিরোধ-সংঘর্ষ-সঙ্ঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় নি। অতাব-অভিযোগ তাঁর কমই ছিল। বন্ধুবান্ধবের সহায়কৃতি সহযোগ সর্বদাই পেয়ে এসেছিলেন। তবে তাঁর দেহ কোনোদিন খুব সুস্থ ছিল না— অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ নিয়ে এল— শেষ হল একটা দান্ত্রিই নয়।

রিল্কে'র আশ্রয়্যের কবি, আলোর কবি— সে-আশ্রয় এ-পারের সব পুড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যায় ও-পারের আলোকে।—

Yes I know from where I came!

Ever hungry like a flame

I consume myself and glow.

Light grows all that I conceive,

Ashes everything I leave:

Flame I am assuredly. ১১

পরিণতি হল একটা পরিপূর্ণতা, এবান থেকে চলে গিয়ে আবার নবভাবে ফিরে এসে নবীন সার্থকতা—

Over the nowhere arches the everywhere

Oh, the ball that is thrown, that we dare,

Does not fill our hands differently than before?

By the weight of return it is more. ১২

পূর্বে যে পুনর্জন্মের কথা আমরা বলেছি সেই resurrection—এই বাণী প্রতিধ্বনিত এখানেও।

ভারতীয় সাহিত্য

হিন্দী ভক্তিসাহিত্য

যে সময়ে হিন্দীতে ভক্তিসাহিত্যের সৃষ্টি শুরু হল সে এক যুগসন্ধির কাল। সেই প্রথমবার ভাষাতত্ত্বের সনাতনকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল যা এককাল তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তখন পর্বত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার কোনো প্রতিচ্ছবি ছিল না। আগারতট ব্যক্তির সমাজচ্যুত করা হত আর তারা এক নতুন জাতের সৃষ্টি করত। এভাবে যদিও শত শত জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হচ্ছিল তবু বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা কোনো-না-কোনো আকারে সমায়ে চলিতই ছিল। কিন্তু এ সময়ে তাদের সামনে এমন একটি যুগ্মিত সনাতন এল যা প্রত্যেক ব্যক্তি আর প্রত্যেক জাতিতে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে সমান আসন দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। সে হল ইসলাম। একবার কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে, রাজা থেকে ভিখারী, ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সকলকে ধর্মোপাসনার সমান অধিকার দিতে ইসলাম স্বীকৃত। সবাজে দণ্ডিত ব্যক্তি তখন অসহায় বোধ করত না, ইচ্ছা করলেই সে এক যুগ্মিত সনাতনের সাহায্য পেতে পারত। এই সময়েই দক্ষিণদেশ থেকে ভক্তিদর্শনের আগমনে বিদ্রোহের মত এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছেঁদে ফেলেছিল। এই ভক্তিদর্শন দুই বিভিন্ন ধারায় নিজেকে প্রকাশিত করেছে, নিগূণ ধারা ও সগুণ ধারা। এই দুইই সাধনা দুটি পূর্ববর্তী ধর্মতত্ত্বে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছিল। সগুণ উপাসনা পৌরাণিক অবতারদের কেন্দ্র করেছিল আর নিগূণ উপাসনার কেন্দ্র ছিল ষোড়শের (অর্থাৎ নাথপন্থী সাধকদের) নিগূণ পরব্রহ্ম। প্রথম সগুণ সাধনা হিন্দুজাতির বাহ্যচারের শুদ্ধতাকে আন্তরিক প্রেমের সিকনে রসায়ন করেছিল আর দ্বিতীয়টি নিগূণ সাধনা বাহ্যচারের শুদ্ধতাকেই দূর করার চেষ্টা করেছিল। এর মধ্যে এক দল খদল আপসের পথ, অন্য দল গেল বিরোধের পথে। এক দল শাস্ত্রের সাহায্য নিল, অন্য দল অমুক্তবের। এক দল শ্রদ্ধাকে পথপ্রদর্শক বলে মানল, অন্য দল জ্ঞানকে। এক দল সগুণ ভগবানকে স্বীকার করল, অন্য দল নিগূণ ভগবানকে। কিন্তু দুই দলেরই প্রেমের পথ, শুধু জ্ঞান চরমেরই অগ্রিম। কেবল বাহ্যচার পালনে দুই দলের কারোই সম্মতি ছিল না। আন্তরিক প্রেমনিবেদন উভয়েই ঐশ্বর্য। অথচ ভক্তি উভয়েই কামা, আত্মসমর্পণ উভয়েই ধর্মসাধনের উপায়। ভগবানের লীলায় উভয়েই বিশ্বাস। উভয়েই অমুক্তব করত যে, ভগবান লীলার অগ্রই এই জাগতিক প্রপঞ্চ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাদের মধ্যে প্রধান ভেদ এই ছিল যে, সগুণ ভাবে তারা ভজনা করত তারা ভগবানকে দূরে রেখে দেখার কল পেত আর নিগূণ সাধক তার নিজের মধ্যে রূপ করতেন যে ভগবান তাঁকে পরম কামা মনে করত।

সে সময় ভারতবর্ষের শাসন বিধানের নিবন্ধ রচনার প্রবৃত্তি হয়েছিলেন। সে কাজে তাঁরা প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব পরম্পরা শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন— সেই পরম্পরাটি হল যে সকলের প্রতি সম্মানের ভাব রেখে নিজের পথ আবিষ্কার করা। সগুণ সাধক ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে এই পুরাতন পরম্পরাগত মনোভাবের পোষক ছিলেন। তাঁরা সমস্ত শাস্ত্র আর ঋষিদের অন্তর্ভুক্তি নেতা বলে স্বীকার করে তাঁদের বাক্যের নাগতি প্রেম-পক্ষে নিযুক্ত করলেন। এর জন্য তাঁদের কম পরিশ্রম করতে হয়নি। সমস্ত শাস্ত্রের প্রেমভক্তিমূলক

অর্থ কত্রার সময় তাঁদের নানা অধিকারীভেদ ও নানা ভজনরীতির আবিষ্কৃত্য যেনে নিতে হয়েছিল, নানারকম অবস্থার কল্পনাও করে নিতে হয়েছিল। সাংগিক, সাম্প্রদায়িক আর ক্রান্তিকালিক প্রকৃতির বিস্তার খেবে অনন্ত প্রকৃতির ভক্ত আর অনন্ত প্রাণালীর ভবনের কল্পনা করতে হল। সব শাস্ত্রেই উচিত বর্ণনা দিয়ে শেষ পর্বন্ত ভাগবত মহাপুরাণকেই সর্বপ্রধান প্রবাস্য গ্রন্থ বলে স্থানতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। অগচ্ তাঁরা কখনো কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞা অথবা অবহেলার ভাব দেখাননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল সর্বদাই ভগবানের পদম প্রেমময় রূপ আর বনোহব শীলার উপরেই নিবদ্ধ, অগচ্ তাঁরা পূর্ব ঐশ্বর্যে সবে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সঙ্গতি এনে দিয়েছেন। সপ্তম ভাবের ভক্তদের মহিমা তাঁদের অসীম ঐশ্বর্য আর অধ্যবসায়, নিগুণ শ্রেয়ী ভক্তদের মহিমা তাঁদের সাহসের মধ্যে প্রকাশিত।

কিন্তু কেবল ভগবৎপ্রেম বা পাণ্ডিত্যই এই যুগের সাহিত্যকে রূপ দেবে নি। হিন্দী ভক্তিসাহিত্যকে কাব্যের নিয়ম আর প্রভাব থেকে একেবারে সরিয়ে আনা যায় না, আর অলংকারপাত্র ও কাব্যগত সংস্কার থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাও চলে না। অথচ তা এমন বস্তুর ন্যায় থাকে সংস্কৃত, প্রাকৃত আর অপভ্রংশের পূর্ণবর্তী সাহিত্য বলা যায়। সেই সাহিত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে সাংবধান হয়ে সেগুলিকে আমাদের মনে রাখতে হবে।

স্বপ্ন থাকতে পারে, অসংস্কারশাস্ত্রে দেবান্নিবিষয়ক রীতিকে তাই বলা হয়। যে অসংস্কারিকেরা এ কথা বলেছিলেন তাঁদের কথার তাৎপৰ্য এই ছিল যে, বরনারীর প্রেমে এক প্রকার স্বাধীন আছে; বসন কোনো রোগ বা নেবতা সৃষ্টি হয় প্রেমের ভাবাবেশের প্রাধান্য হয়, তা অস্ত্রাত্তরকারী ভাবের নত বলবাহ। অথচ এ কথা ঠিক সন্দেহ করা যায় না। এই বিধানের দ্বারা ভগবদ্বিষয়ক প্রেমকে বোঝানো যায় না। ভগবদ্বিষয়ক প্রেমে নির্বেদ ভাবের প্রাধান্য রয়েছে অর্থাৎ ভগবতের প্রতি উদ্ভাসের হবার প্রবৃত্তি তাতে প্রবল থাকে এ কথা বললে কেবল ভগবতের চেয়ে মানসিক সম্বন্ধে প্রাণন বশে নেনে নেওয়া হয়। এই কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, বহুত্বের সঙ্গে ভগবতের সম্বন্ধের স্বাধীন থেকে রসের নিরূপণ হয়। কারণ এভাবে যদি তত্ত্ব বিচার না হত তবে শাস্ত্ররসে ভগবতের সঙ্গে যে নির্বোধ্যক সম্বন্ধ আছে তাকে প্রাধান্য না দিয়ে ভগবদ্বিষয়ক প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হত। বারা শাস্ত্র রসের স্থায়ী ভাব হিসেবে নির্বেদকে না ধরে শব্দকে ধরেন, তাঁরা এভাবে চিন্তা করেন। এই প্রসঙ্গে বাববার ‘ভগবদ্ব্যংগ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দ ভক্তিপাশ্বের পারিভাষিক শব্দ। এই প্রশংসাবিচারে মনে রাখা চাই যে, ভারতীয় দর্শনের মধ্যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি সবই ভগবৎপ্রকৃতির বিকার বাহ্য। সেজন্য চিত্তবিষয়ক প্রেমে ভগবানের সঙ্গেই কেবল সম্বন্ধ আছে। ভক্তিশাস্ত্রীরা দাবী করেন যে, এই পরম প্রেম প্রাপ্ত হবার পর অস্ত্রাত্তর প্রেম শিথিল হয়ে যায়। সেজন্য ভগবৎপ্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, মনোগোনা বা বুদ্ধিগ্রাহ্যও নয়। অত্যাধিক দ্বারা এই একে আশ্বাস করতে হয়। এই রসের সাক্ষাৎকার হলে আশ্বাসের ফলে কিছু আর থাকে না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা স্বভাব দ্বারা কোনও কৰ্ম সম্পন্ন হয়, সে সবই সত্ত্বিদানন্দ নামাঙ্কণে দিয়ে বিভ্রামলাভ করে। ভাগবতে (১১।২।৩৯) এই ভগ্নই বলা হয়েছে—

काष्ठेन बाँधा मन्मथजिरोर्ध्वं दृष्ट्वा क्त्वा वाग्मूढं तस्मात् ॥ १९ ॥

करोति ययं सकलं परमैः नादात्मैरेति समर्पणे ॥

কিন্তু নিঃশর্তভাবে জনসাকারী ভরসের ব্যাপ্তির অধ্যয়নের পক্ষে শাস্ত্রের মহায় ধুব কম। এখন পর্যন্ত

তার অধ্যয়নে যে উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। সেইগুলি বোঝার সবচেয়ে বড় উপায় লোকগীত, লোককথা আর লোকোক্তিরা জ্ঞান। আর ততগামিই প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন স্রাতি ও সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়নীতি, পূজাপদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের জ্ঞান। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে এ সবের একান্ত অভাব। ভক্তিসাহিত্যের পাঠককে, বিশেষতঃ নিম্নগণ ভক্তির অধ্যয়নকে, যে কথা সর্বাধিক আকর্ষণ করে তা হল— এই সময় উত্তরদেশের হঠাৎগী আর দক্ষিণদেশের ভক্তদের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান। তাদের মধ্যে একের ছিল জ্ঞানের গর্ভ, অপরদের ভরসা নিজের অভিজ্ঞতায়। একের পক্ষে পিণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড আর অপরদের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডই পিণ্ড। একের ভরসা বিশ্বের উপর, অন্যের ভরসা প্রাণের উপর। এক বল মনে করত প্রেম দুর্বল আর অন্য বল মনে করত জ্ঞান কঠোর। একজন বোখী, অস্ত্রজ্ঞান ভক্ত। এই দুই ধারার বিচিত্র মিলনেই নিম্নগণ-দ্বারার সেই সাহিত্যসৃষ্টি ঘায় এক দিকে অনমনীয়তা, অন্য দিকে দ্বন্দ্বভাষ্যের মনোমুগ্ধতা।

এই সাহিত্য আয়তনশূন্য নয়। নাথবার্গের নথ্যগুণ্যের এর মধ্যে সহস্র মত আর বহুবলেন্দব শৈব ও তন্ত্রবাদের অনেক সাধনা আর চিন্তাধারা মিলিত হল আর দক্ষিণের ভক্তিপ্রচারক আচার্যদের শিক্ষাদার। বৈদান্তিক ও অন্ত শাস্ত্রীয় চিন্তাও এল।

মধ্যযুগের নিম্নগণ কবিদের সাহিত্যের সহজ, শুল্ক, নিরঞ্জন, নাদ, বিন্দু ইত্যাদি বহু শব্দ যেগুলিকে বাদ দিলে সে সাহিত্যের চলবার উপায় নেই— সেগুলি পূর্ববর্তী সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে বোঝাই যায় না। ‘কবীর’ পুস্তকে আমি এই শব্দগুলির মনোরমক ইতিহাসের প্রতি বিষংসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। একটি দৃষ্টান্ত দিই। সবাই জানেন যে কবীর ও অন্যান্য নিম্নগণ সন্তদের সাহিত্যে ‘বসব’ শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। সাধারণতঃ এর অর্থ করার হয় পতি বা নিকৃষ্ট পতি। আদর্শী ভাষায় এ ধরনের একটি শব্দ আছে। এই শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে ধর্মের অর্থ করা হয়েছে পতি। কবীরদাস পদম শব্দটির এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে তার ব্যঙ্গনা হয় নিকৃষ্ট পতি। কিন্তু পূর্ববর্তী সাধকদের পুস্তকে এই শব্দ এক বিশেষ অবস্থার অর্থে প্রযুক্ত হয়। ‘ব-সব’ ভাব অর্থাৎ আকাশের সমান ভাব। সমাদির এক বিশেষ অবস্থাকে বোঝায় ‘গগনোপম’ অবস্থা বলেন। ‘ব-সব’ আর ‘গগনোপম’ একই কথা। অবস্থগীতায় এই গগনোপম অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মনের সেই অবস্থাকেই এই লঙ্কা সেওয়া হয়েছে বনন বৈত আর অকৈত, নিত্য আর অনিত্য, সত্য আর অসত্য, দেবতা আর দেবলোক—ইত্যাদি কোনো বোধ থাকে না। সে অবস্থা মনোপ্রপঞ্চের উর্ধ্বে, দৃষ্টিবি ব্যাপারের অতীত, সত্যাসত্যের উপরে, আর জ্ঞানরঞ্জী অন্ততপনের পরিণাম। টীকাকারগণ ‘ব-সব’ শব্দটির অর্থ করেছেন—‘প্রজ্ঞার তুল্যত্ব’। ভক্তিসাহিত্যে এতে ভাবভাববিনিমুক্ত অবস্থা বোঝায়। নিম্নগণ সাধকদের সাহিত্যে এর অর্থ আরো বদলে গেছে। গগনোপমাবস্থা বোঝিদের চূর্ণিত সহজাবস্থার আসন থেকে এখানে নীচে নেমে এসেছে। কবীরদাস সে প্রাণস্থান প্রভৃতি শরীরপ্রবেশে সাধিত সমাধিকে বিশেষ মূল্য দিতেন তা মনে হয় না। যে সহজাবস্থা শরীরচেষ্টা দ্বারা সাধিত হয়, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিলয়। এই কারণেই কবীরদাস এই প্রকার ব-সমাধিহাকে সাময়িক আনন্দ বলেই মনে করতেন। মূল বস্তু তো ভক্তি, যা পাবার পর ভক্তের ইচ্ছার দ্বারা বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ভক্ত তা পেয়েছে—সেই সহজ-সমাধির অধিকারী। সহজ সমাধিতে ‘কহু’ সো নাম, হুঁ সো হুঁমিরণ, জো কহু করু সো পূজা।’ পূর্ববর্তী সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখার জন্য পণ্ডিতেরা ‘বসব’ শব্দটির এই প্রকৃষ্ট অর্থ লক্ষ্য করেন না। উল্লিখিত ‘কবীর’ পুস্তকে আমি

বিজ্ঞতভাবে এই শব্দের পূর্বাগর অর্থের বিচার করছি আর এইজন্যই আমি 'এ কথা বলতে গায়ী হয়েছি যে, কবীরদাস 'খসর' নাম ব্যবহারকালে তার আরবী অর্থ ছাড়া ভারতীয় অর্থও ব্যবহার মনে রেখেছিলেন। আমার বিশ্বাস নেপাল এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যেখানে যেখানে বোগমার্গের প্রবল প্রচার ছিল, সেখানকার লোকস্বীত এবং লোককথায় এ রকম অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন করা যায়।

কিন্তু দৈবাৎ সৌভাগ্যবশতঃ যে পুস্তকগুলি আমাদের হাতে এসে পড়েছে তন্মু সেইগুলি অধ্যয়নের প্রধান অবলম্বন বলে স্বীকার্য নয়। সাধারণতঃ পুস্তকে লেখা কথায় আমরা সমাজের এক বিশেষ প্রকার চিন্তা-ধারারই পরিচয় পাই। ধারা এ কাম হাতে নেবেন তাঁদের প্রচুর কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় সমাজ আজ যে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় ছিল না। এই বিশাল দেশে নিত্য নব জনসংঘের আগমন হয়েছে, আচারবিচারের অস্বাভাবিক প্রভাব তাঁরা রেখে গেছেন। পুরাতন সমাজব্যবস্থাও সর্বদা একরকম ছিল না। আজ যে সকল জাত সমাজের সবচেয়ে নীচের স্তরে তারা সর্বদা তাই ছিল না, আজ যারা উচ্চ স্তরে তাদের সম্বন্ধে অসুস্থ কথায় প্রযোজ্য। এমন যুগও গেছে যখন এই দেশের এক খুব বৃহৎ জনসমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মকে মানত না। সেই সমাজের পৌরাণিক পরম্পরা ছিল, সমাজব্যবস্থা ছিল, লোক-পরলোকে বিশ্বাসও ছিল। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এলব জাতকে হিন্দু বলা হত না। কোনো জাতকেই তখন হিন্দু নাম ছিল না। মুসলমানরাই এই দেশবাসীদের প্রথমে হিন্দু নাম দেন। অজ্ঞাত কোনো সামাজিক পেশার কলে এর মধ্যে অনেকগুলি অপৌরাণিক মন্ডের জাত হয় হিন্দু নয় মুসলমান হতে বাধ্য হল। তারা সংখ্যায় অবশ্য সীমাবদ্ধই। এ যুগের এটিই একটি বিশেষ ঘটনা যে এই সব প্রত্যেকটি মানব-গোষ্ঠী কোনো-না-কোনো বড় দলে শরণ নিতে বাধ্য হল। উত্তর-পাঞ্জাব থেকে বাংলা দেশের ঢাকা কবিরদাসী পর্যন্ত এক অর্ধজাতকৃতি ভূভাগে জোলাদের মধ্যে রিম্বী সাহেব তাঁর *Peoples of India* পুস্তকে লিখেছেন (পৃ ১১৬) "যে, এরা কোনো একসময়ে সংঘবদ্ধভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কবীর, রুম্ব প্রভৃতি মহাপুরুষেরা এই দেশের রত ছিলেন। বর্তমতঃ তাঁরা না হিন্দু না মুসলমান। দলমতপন্থী সাহিত্যপ্রকাশনে একটি কথা বুঝি, স্পষ্ট হয়েছে। মুসলমান-আগমনের অব্যবহিত পূর্বে জোম, হাড়ী প্রভৃতি জাতগুলি যথেষ্ট সম্পদ ও শক্তিশালী ছিল। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে তাদের উচ্চ জাত বলে ধরা হত এমন খলি না, তবে এ কথা বলতে পারা যায় যে, তারা শক্তিশালী জাত ছিল।

নিগূর্ণ সাহিত্যের অধ্যয়নের এই জাতগুলির লোকোক্তি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জানা বুঝি দরকার। এ কথা তুললে চলবে না যে, এই অধ্যয়নের উপকরণ কোনো একটি প্রান্তে, কি একই ভাষায়, কি একই কালে, কি একই জাতিতে, কি একই সমুদ্রায়ে সীমাবদ্ধ নেই। এই সাহিত্যের প্রত্যেক কবিকে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করলে সমস্ত সাহিত্য সম্প্রদায় আর অসম্পূর্ণ মনে হবে। অবশ্য নানা কারণে কবীরের ব্যক্তিত্ব বুঝি চিত্তাকর্ষক হয়ে আছে। তিনি নানারকম পরম্পর বিরোধী অবস্থায় মিলন বিন্দুতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি এমন এক প্রগতি চৌরাস্তার উপর ঠাঁড়িয়েছিলেন যার এক দিকে হিন্দু অত্র দিকে মুসলমান, যার এক দিকে জ্ঞান অত্র দিকে অনিশ্চয়, এক দিকে বোগমার্গ অত্র দিকে ভক্তিমার্গ, এক দিকে নিগূর্ণ ভাবনা আর অত্র দিকে সগুণ সাধনা। তিনি দুই দিকই দেখতে পেতেন পরম্পরবিরুদ্ধ পথের মোহণও স্পষ্ট বুঝতে পারতেন। এই ছিল কবীরদাসের ভগবদ্বদ সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্য সাহিত্যকে অপর প্রাণরসে প্রাণিত করতে পেরেছিল। কিন্তু একেই একমাত্র মনে করে বসে থাকলে আমরা একেও ঠিকভাবে

বৃত্তে পারব না। আচার্য ক্রিষ্ণিবোহন সেন 'ওম! অভিনবম গ্রন্থালা'র একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগের ভক্তিসাহিত্য কিভাবে বিভিন্ন প্রায়শ্চলির সঙ্গে লব্ধ।

সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থ আর গ্রন্থকারদের উদ্ভব আর বিলয়ের কাহিনী নয়, কালস্রোতে বয়ে আসা জীবন্ত সমাজেরই বিকাশের কথা—গ্রন্থকার আর গ্রন্থ সেই প্রাণধারার প্রতি ইঙ্গিত রাখ করে, তারাই মূখ্য নয়। মূখ্য হল সেই প্রাণধারা বা নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে আর আবারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রাণধারা নিম্নের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। ভক্তিসাহিত্যকেও আমাদের এইভাবেই দেখতে হবে।

ঐহ্যাকারীপ্রসাদ ভিবেদী

অনুবাদ : ঐমতী বলিনা রায়

গ্রন্থপরিচয়

✓ **বলেঙ্গ্রনাথের গ্রন্থাবলী**। সম্পাদক ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্বীকান্ত দাস। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য বারো টাকা। আট আনা।

বলেঙ্গ্রনাথ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করেছেন, তা একটি মহত্ব কৰ্ম। এ কাৰ্য শুণু নিষ্ঠার পরিচয় নয়, স্নাতিকৃত পরিভ্রমণাপেক্ষ। একে তো 'বলেঙ্গ্রনাথের বিষয়বস্তু বহুমুখী, রচনা অসম্মত। তার উপর, ১২০৭ সালে ষড়্বেঙ্গ্রনাথের চেষ্টার আচাৰ্য্য রামেন্দ্ৰচন্দ্রশ্বরের তুদিকা-সম্বলিত বলেঙ্গ্রনাথের যে রচনাবলী একত্ৰ সংকলিত হয়, তাতে সংকলনের কোনো বিশিষ্ট পদ্ধতি অহুত হয় নি, বিকল্প প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সন্মিলিত করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সংকলন-গ্রন্থ তখনই সার্থক হয় যখন গ্রন্থকারের মন ও তার ধৰ্ম তারই ভিতর দিয়ে পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। তাই প্রথম প্রকাশের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে যখন বলেঙ্গ্র-গ্রন্থাবলীর সংস্করণ হল, এবং বলেঙ্গ্রনাথের মানস-ইতিহাসের দিক থেকে কালাহুতিক ভাবে সম্বলিত হয়ে প্রকাশ হল, তখন তৃপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলেঙ্গ্রনাথের অতি-প্রয়োজনীয় এই রচনা-সংকলন প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের আন্তরিক ও নৈতিক দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। উদারদৃষ্টি, সাহিত্যের রসজ্ঞ গুণগ্রাহী রামেন্দ্ৰচন্দ্রশ্বরের মূল্যবান তুদিকাটির অধিকাংশই সরিবেশিত হয়ে গ্রন্থাবলীর গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

— অতি-আধুনিক মতবাদ-শাসিত সাহিত্যগোষ্ঠীগুলিতে বলেঙ্গ্রনাথের কি মূল্যনিরূপণ হবে ঠিক জানি না। হয়তো, যে সহস্রাধি সৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাহিত্য ও সৌন্দর্যের বিচার করেছিলেন, যে প্রাকৃত শ্রী তাঁর দৃষ্ট ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার অন্তরকমলম্বাখ্যা হতে পারে। কিন্তু বলেঙ্গ্র-প্রতিভা হতেই স্বতন্ত্র হোক, তার একটি ঐতিহ্য ছিল। কারণেই তাঁর মনস্তত্ত্ব এবং সাহিত্যপ্রচেষ্টার স্বরূপ বুঝতে হলে, দুটি কথা মনে রাখা দরকার। তিনি শিল্প-কাব্য-সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন এমন এক বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে থেকে, — যে তাঁর সাধনাকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সম্ভব নয়। ঠাকুরবাড়ির শিক্ষাদীক্ষা ও রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর মানস-বগলকে ঘিরে আছে একটি কোমল আবেষ্টনীর মতন। স্বতরাং একটি হুনিদিত, সুপরিচ্ছন্ন সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশে ঐ রকম সংস্কৃত মনের স্মৃতি বিকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। আর যিঁতার কথা : যে সহস্র রূপ-দর্শন ও শিল্পচর্চা বলেঙ্গ্রনাথের প্রভাবগুণ ও স্বধৰ্ম, সেই মনোবর্ধ এবং তাবের প্রবণতা দ্বারাতে পায়ে অবসরহুতনৈঃ)। কাব্যধরী-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার যে দীর্ঘ অবকাশ-প্রস্তুত দীর্ঘ-মহর গতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই রসাবিহিত নিরুত্থ গতি আর অবসরহুতনী দৃষ্টি আছে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'গল্পগুচ্ছ' রচনায় যেমন আছে বলেঙ্গ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' এষে এবং 'কবিক পুস্তক'-র নতন মালিক পত্রে বিকল্প বহু নিবন্ধে। এই অবকাশ-উপভোগকে অভিজ্ঞাত মানস অথবা তাববিলাস বাই বলা হোক, সেটা শিল্প ও সাধনার বস্তু। (রবীন্দ্রনাথ ও বলেঙ্গ্রনাথ উভয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন অবসরের অহুতুল আবহাওয়ায়, এ কথা ঠিক। কিন্তু সাহিত্য যে বিলাসের মনোরঞ্জন-উপকরণ মাত্র নয়, এ কথাও তাঁরা জানতেন। তাই শৈলীর এমন সহস্র বিকাশ যে কতখানি সংঘন ও সাময়িকের অপেক্ষা রাখে, একটি মহত্ব পূৰ্ব্ব ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অবতারণ করতে হলে যে কতটা কলাহুতল হতে হয়, সেটা দুজনেই অতি

ঘরে ও পরিশ্রমে প্রবাহণ করে গিয়েছেন। তখনই এই যে, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি আরো গভীর, শব্দবাহী ভাষার মাধ্যমে তিনি এমন একটি দৃষ্টি-স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন যেখানে শব্দের চেয়ে ঐশ্বর্যের ছাতি আরো মহৎ, বাকের চেয়ে সত্য বড়। আর বলেছেন নাথ ছিলেন সচেতন শিল্পী। প্রকৃত কাকশিল্পীর মতই প্রতিটি শব্দের গুণন বৃদ্ধি ব্যবহার করতেন, শব্দের স্রবণ ও অর্থনিহিত ধ্বনি নিষ্কাশিত করে ভাষার অঙ্গদৌর্ভব ছুটিয়ে তুলতেন। তাই তিনি শুধু 'শ্রাবণী' আর 'রাধাবিকা'র কবি নন, গল্পরচনাতেও একটি বিশেষ দমনের দৃষ্টি ও কংকার আনয়ন করেছিলেন—সে কংকার ও বাহুবল ছাড়া শুধু পড়ার শেষে কানে বাজে না, এক দূর্লভ স্মৃতি হয়ে রসাস্বাদের ঘরে ঘরা হয়ে থাকে। বহুকাল পরেও মনে হয়, এমন নিষ্ঠা হাত শুধু তাঁরই হয় যিনি কবি হয়ে অয়েছিলেন, যিনি কাব্যের প্রসাদগুণ যেন অবলীলায় ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত রচনায়। আঘাতের অস্তিত্ব তাই আর চোখে পড়ে না। কবি-কর্ম আর লিপিকোষল বিষয়বস্তুকেও রসে নিবিষ্ট করে তোলে। ভাষানির্বাণের পদ্ধতি এমন বোঝানুম যে প্রশস্ত মূর্ত হয়ে চোখের সামনে আসে।)

* এই সূত্রে বলেছেন শব্দ সাহিত্য-জীবনের কথা মতই মনে হয়। মাত্র উনত্রিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কেমন করে পরীকার স্তরগুলি পেরিয়ে পুরোপুরি 'আটাস্ট' হয়ে উঠলেন, এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বহিন্ বধ্যা; রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘা। টাইল নিহে পদীকার বধেই সময় পেয়েছিলেন তাঁরা। (মৃত্যুর আগে বলেছেন শব্দ মাত্র তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম প্রবন্ধের বইখানিভেই তিনি জ্ঞাত-লিখিত প্রমাণ-সমত সাহিত্যের আগের নামলেন। 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থের গল্প পূর্ণপ্রাণ। এক দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ, অপর দিকে সংস্কৃত কাব্যের মতই চিত্রনিত্য। এই দুইয়ের এমন অঙ্গাঙ্গী মিলন বড় দেখা যায় না। কালিদাসের চিত্রাধনক্ষমতা-প্রদর্শনে বলেছেন নাথ বিশ্বের ভাষা দিয়েই দেখিয়েছেন খও বও চিত্ররচনায কালিদাসের কেমন আনন্দ ছিল। আবার উত্তরচরিত্রের আলোচনায় তাঁর ভাষাও দৃষ্টকাব্যের অঙ্কন, কল্পন-গম্ভীর দৌর্ভব সঠিবিভ। ভবভূতির পরম অস্থায়ী বলেছেন নাথ। তাই হয়তো কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি তেমন সময় দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি প্রধানতঃ হলেন রসসাহিত্যের ব্যাখ্যাতা। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বর্ণনায় তিনি নৃতন ও নৃষ দিক-নির্দেশ করেন নি। তাঁর মূল কাজ হল মন্তব্য নয়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণও নয়—আবেগস্পন্দিত অপরূপ শব্দবিজ্ঞানে রসের কল্পলোক সঠি করা। প্রাচীন সাহিত্যের মাধুর্যকে মাধুর্যবিত্তি ভাষায় ধরে রাখা, পাঠকের চোখে তারই মাধুর্য লাগিয়ে দেওয়া। আধুনিক মনীষার কাছে এই ধরনের সহজ রূপোদ্ভাটন ঠিক মনঃপুত হবে না। তাঁরা চাইবেন তথ্য, অস্তর্ভৌ দৃষ্টি। বলেছেন নাথ হলেন মর্যস্পর্শী। সমালোচনার কাজে তিনি কিছু মোহাবিষ্ট। তবে রসমীটা, এ কথা নিঃসন্দেহ। তাই সমালোচনার কাজে খুঁটিয়ে দেখা কিংবা নৃষ বিশ্লেষণ করে বিচারবুদ্ধি দিয়ে কোনো প্রতিপাত্তকে প্রতিষ্ঠিত করা, এ ধরনের মনীষা বলেছেন নাথ, তা স্বীকার কনাই ভালো। যা দেখেছেন ও বুঝেছেন, যা ভালো। লেগেছে এবং যেমন করে তাঁর দৃষ্টিতে নাকড়া দিয়েছে তেমনি করে আপনার উপলব্ধিকে রসভোগে তারিয়ে তারিয়ে লেখনী যায় মতটা সম্ভব ততটা পাঠকের চিত্তে বহন করে দেওয়াই তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য। বলেছেন নাথ দৃষ্টি সমগ্র, সাংলৈবিক। তিনি যা দেখেন তা পুরোপুরি দেখেন। খও খও চিত্রের দারুণত তিনি অখও একটি দৌর্ভবের পরিচয় যেন। নিজের আনন্দ আর পাঠকের উপভোগ, এ দুটির সংস্পর্শ সাধন করছে তাঁর অপূর্ব ভাষা। এ ভাষা কাকশিল্পের ভাষা।

নন্দন-আমোদী ঘটকতাই তার প্রাণ। সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্ররচনা লোক অথবা উচ্ছিন্নের সেবকেন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় চিত্রশালিকাই হোক, স্রাবণের বারিধারা-প্রসঙ্গে নিভৃত চিন্তা হোক অথবা কণারকেশ বিবাহ-গুপ্তীর সহঃ সৌন্দর্যের অভিলষিত হোক, সমগ্র দুইয় কোদল উজ্জল আগোষ বিবহুগুলির মৌলিক ও সম্পূর্ণ প্রকৃতি যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একটি ভাবমোহর রসবসর আবহ-স্রুতিতে বলেজ্রনাথের সমকক্ষ কেউ নেই, একমাত্র তাঁর গম্বুজনার আর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। বলেজ্রনাথের হানসভা, প্রাচীন কালের সাহিত্য ও শিল্পকলার স্রব্ধ উপসরণ আর ভাবার বলবিত গতিমার্গ, এই তিনটির সমন্বয় তাঁকে গীতিকবির পর্গণে তুলে দিয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের অহুসীলনে এবং ব্যাখ্যায় বলেজ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারা গ্রহণ করেছেন।

‘চিত্র ও কাব্য’ গ্রন্থানির কথাই বার বার উল্লেখ করছি এই কারণে যে, এইখান থেকেই বলেজ্র-প্রতিভার দ্ব্যর্থ বিকাশ। এর পূর্বে বালক-বয়সের দেব রচনা, সেগুলি কেমন অস্পষ্ট, আবেগম্পন্দনে ও ভাবালুতায শিথিল। কিন্তু চিত্র ও কাব্যের প্রবন্ধগুলি যখন রচিত হয়, তখন তিনি বাইশ-তেইশ বছরের যুগপূর্ণ্য। ললিতনিষ্করের প্রতি অহুসাগ, সংস্কৃত সাহিত্যে আন্তরিক আসক্তি এবং নিজেস্ব উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ করার আকুলতা তখন দানা বেঁধে সার্থক রূপ-সন্ধান করেছে। এই সময়ে বলেজ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব পড়েছিল পরোক্ষে অথবা প্রত্যক্ষে, তার জট শাল-তারিখ বা দলিলের প্রয়োজন নেই। ‘সাদনা’-‘ভাবতী’-পরের রবীন্দ্রনাথ পরিণত শিল্পী। ‘নেঘদূত’, ‘নিম্নে’ কিংবা ‘স্বপ্নিত পাখা’-এর লেখকের বাগবিত্তাসে যে আত্ম, তা বলেজ্রনাথের লেখায় যদি আর্ষ মোহ বিস্তার করে থাকে, তাতে অসত্যবিকৃত নেই। ‘কণারক’, ‘কলবেদনা’ অথবা ‘পৃথকোণ’ প্রবন্ধে যে বর্ধিত সৌন্দর্য এবং গুস্ততা, তার তুলনার ক্ষেত্রে একমাত্র পিতৃব্য-রচনার শরণাপন্ন হতে হয়। শেষ পাঁচ-ছয় বছরে বলেজ্রনাথের লেখায় ব্যক্তিগত হ্রস্ব কবে গিয়ে একটি নৈবাঞ্চিক রূপ ছুটে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন একটি উজ্জ্বল ভাবানিলের বাহকতার নিখিল মনের সঙ্গে সখ্য এবং আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছিল। প্রেম আর পক্ষিত, দুই দিক দিয়েই তিনি আরো ব্যাপক আরো গভীর হতে পেরেছিলেন। ‘চুড় উৎসব’ ‘নিবন্ধ-সভা’ ‘প্রাচীন উজ্জিয়া’ আর ‘প্রাচীন প্রদামনকলা’ পড়লে মনে হয়, বলেজ্রনাথ বর্ণনের অভিরিক্ত সত্যের স্থির ও দৃঢ় আবেশনে উপনীত হয়েছিলেন। দ্রুতগায়কসে রচনার এই দ্রুত উত্তরে স্থায়ী হতে-না-হতেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। আরো এক যুগ বেঁচে থাকলে তাঁর সত্তা ও স্টাইল কেমন ভাবে ও কোন্ পথে এগে সার্থক পরিণতি লাভ করত সর্বপ্রভাবমুক্ত হয়ে, সেটা অনেকটাই অহুমানের বিষয় হয়ে রইল।

বলেজ্রনাথের স্বাধিকার ছিল এমন একটি ভাষা যা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরি। তিনি কবি, আবার কীবনরসিক। তাই বিবহবস্ত অহুসারে তাঁর ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সরলোচ্চারণ তাঁর ভাষায় বিচিত্র কাককার্যের শোভা। নিঃসর্গের বর্ণনায় তাঁর ভাষা ভাবন-কোমল, লতাপাতা-দুশকলের সৌন্দর্যভারে আনত। নবাবিত্ত বাঙ্গালী-স্বীবনের পরিচরে তাঁর প্রকাশভঙ্গী দ্রুত সরল কোঁচকে উজ্জল। সামাজিক স্থিতির আলোড়নে তার ভাষা অতীত দিনের চিত্রবর্ণে আপনাকে ছুঁয়ে নিয়ে বিপ্লব অঞ্চল মধুর হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষার কাপণ্য নেই, আবার অকারণ কাপণ্যও নেই। যখন তিনি চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে লেখেন, তখন ভাব ও বুদ্ধির সমন্বয়ে তাঁর ভাষাও স্বল্প অঞ্চল মধুর ‘নরতার সৌন্দর্য’ প্রবন্ধটিতে এ উচ্চিশ্রুততা প্রতিপন্ন হবে। পূর্বেই অবশ্য বলেছি যে-বলেজ্রনাথের বৈশিষ্ট্য শুধু বুদ্ধি-

মুখায়া কিংবা বিরোধে নয়।* স্মৃতি-কৃত কল্পনাতেই তাঁর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ। এ-মাতীর প্রবঞ্চণা তাঁর কলমে নিছক তথ্যপূর্ণ বা মননকূল হয় নি। বিবরণত ধারণাশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ববসত মহাহুঁত নিশিবে তিনি একটি বিশেষ ধরনের ভঙ্গী সৃষ্টি করে নেন, যার মধ্যে সত্যাহুঁত সৌন্দর্যপ্রবণতাই প্রাধান্য। তাই এখানে ভাবও সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে অঙ্গসরণ করে, যেমন : —

নবতায় নব্য বসাবের সৃষ্টি হয়, এইজন্য তাহার সৌন্দর্য কুলে কুলে। তাহার নব্য ছবিতে নিঃসীম রস ব্যতির করায চেষ্টা বিহীন। নব্য ছোঁয়াশ্রোতে ইচ্ছিকা পরবার অভ্যাসে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ আনন্দের আশাওয়া পড়িতে হইবে। নব্য সৌন্দর্য স্ব-প্রকাশ। উহার সৌন্দর্য কি যোগ্য করিয়া দৃষ্টাইতে হয়? পঙ্খলা, দুর্দৃশী, কুল, কপালকুলো, এ সকল চিত্রের কাব্য। অদম্য। আর বেশ প্রসঙ্গ—যাংবা না করিলে তাহার সৌন্দর্য কোথায়? প্রাচীন বিদ্যার চর্যের ক্ষণ উড়াইল চৌধুরী প্রাণীক জীর পদসেবার নিমিত্ত করিলেন; পরবার, রামায়—দকলই ভাগ্য চুটাইয়াছিল, তারও নিষাধ, তপাশি সে চরিত্র চুটই না—যেন ভাঁতায় সে। এই বিদ্যার চরিত্রের পক্ষে শৈবলীকো বেশ, নব্য সৌন্দর্য তাহার নব্য বসাব কেনন বসাব আছে। নবতায় সৌন্দর্য কুটী অধিক। তাহার নব্য কি বেন লক্ষ্যইবা পবিত্রতা লাগিয়া আছে।

বিলেপন করতে গিয়ে ও বলেছিলেন সৌন্দর্যবোধের সাহায্যেই নিরুদ্দেশ, 'পূর্ব ছোয়াংওয়া কাঁপাইয়া পড়িতে হইবে'—এটাই মূল কথা এবং ঐ কথাটিকে ঘিরেই তাঁর স্বভাবকল্পনা অগ্রসর হচ্ছে বিস্তৃত পরিধির সন্ধান। যে শব্দ তুলনা তিনি করলেন, যে যুক্তি দেখালেন, সেখানে তথ্যবহনের চেয়ে সত্যকল্পনাই বড়। 'গণিক শূন্যতা' বা 'অজীভ' প্রবন্ধেও এই ধরনের ভাব ও ভাষার সুন্দর মিশ্রণ হয়েছে। একটাই মূল সত্য, তাকে কেন্দ্র করে তাঁর কল্পনার দ্বার রচিত হচ্ছে গ্রন্থের পর গ্রন্থ দিয়ে। যে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছেন, ভাষাও তাইই গড়ে যেমন পরস্পর চলছে, যেমন :

বর্তমানের পুতি কোশা? অতীতেরই পুতি। আমরা বর্তমানে অনেক রিভিউ এত বেশী করি। দেখি যে ভাষার রহস্যময়, সৌন্দর্যবাহু হুমি। হবি বিকটে আসি। দেখিলে অনেক সময় দেখা এত অধিক হয় যে হেডে আশিখা বই আর কিছু নয় থাকে না। কিন্তু দুই হইতে আশিখা যোগ্যতামতে সেই হবিই মণ্ডু হইয়া উঠে...বলা বাহুল্য এশমবহার আমরা ভাষার সমন্বয়ই দেখিতে পাই। চিত্রে ভাষার অংশই হারা করে বেশি, বস্তু নির্মতে, তাৎপর্যে অবশিষ্ট।

এইখানেই শেষ কর। যেত। কিন্তু বলেছিলেন যে হুমিত তুলনা-প্রয়োগ এবং অর্ধসম্বিত ভাবের দগ্ধ বিকাশ শেষ হত না। তাই আরও একটু ভাবের প্রয়োজন, আর একটু কবিত্বের সাদৃশ্যের বিস্তার। অতঃপর তিনি বলেন :

অতীতেও বহু নিম্নাংক-ভাব আছে নার। সেই তাই বৃত্তি। শূন্যতেই অতীত বহু। বর্তমানে বহুইই অবিচার-ভাব মনে
 সূচিত পায় না। বহু হাটী নহে, ভাব হাটী। এইমত অতীত হসরে এতাব বিচার করে, অতীতেই মত অনেক বিদ্যাপ কবি।
 বর্তমানে অধিকনি গুকাইয়া যায়। অতীত এতদ্বারা সেই গুণ ভূমির উপরে প্রাচল উদ্ভাব রচনা করে।

এখানে ভাব ও ভাষার কি বিলন হয় নি ? হয়তো আধুনিক দৃষ্টিতে এটা অতিকথনের মতো বনে হবে। দলটা পরিসরে চিনি অতীতের স্বভাব বুবিয়েছেন, তার চেয়ে আরো সংক্ষেপে ঘনবহু স্থিতিতে একমাত্র প্রতিপাদকে খাড়া করতে পারতেন। কিন্তু প্রাচুর্য আর সরলতাই তাঁর মনের ও কলমের স্বার্থ পরিচয়। একে বাণীবাহ্য বলব না; বলব স্ব-বিজ্ঞার। একটি বক্তব্যকে ঘিরে কথার জাল-বুন চলছে। এটা কল্পনাবিলাস, কিন্তু বলেছনাতথের মতো শিল্পীর কাছে এটা অপরিহার্য। তাবাকে সংযুক্ত করে আনলে ‘অতীত’ প্রবন্ধটির বিষয়গত ক্রটি হত না। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রাণহানি ঘটত। তাই বনে হয়, ‘বলেছনাতথ’ ব্যক্তিতে আর ঠাই নেই ছটি বিরোধী ভিনিসের সমন্বয় ঘটেছিল। সৌন্দর্যপিপাসায় তিনি মুক্ত। আলোচনা,

বাধ্যায় ও টিল্লনীতে তিনি অভিযাত্র। এই স্বভাব আর সংস্কার এই 'স্রীজ্ঞ' আর 'সোফিস্টিকেশন' উভয়ের মিশ্রণ তাঁর দৃষ্টিকে সহস্র অর্থ তীক্ষ্ণ এবং ভাষাকে নূর অর্থ উজ্জ্বল করেছিল।

* বরোহা আটপৌরে জিনিসের বর্ণনাতেও বলেছনাথের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি ক্ষুণ্ণতাও করে। সহস্রা ও প্রাঞ্জলতা, যা তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য, তা নেই হয় না। এ দিক থেকে 'গৃহকোণ' প্রবন্ধটি তাঁর প্রতিভার প্রতিনিধি-করবার দাবি রাখে। মাটির প্রসীপের ক্ষীণ শিখায় গৃহকোণ এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যে ছোটোপাটো জিনিসগুলি নম্বর এড়াই না। তারপর 'গৃহকোণের' গৃহলক্ষী, পুস্তকপাড়, আমবাগান, বাঁশঝাড়, সরষেকৈতের নখা নিয়ে আকাঁধিকা। পথ, ঘরের খালাবাগান, পুষ্কার প্রভা—সব কিছু নিলে একটা ভাবখন হুগুস্ত গার্হস্থ্য চিত্র মনের পটে চিরকালের জন্ত একে যায়।—তেননি 'সুত উৎসব' এবং 'নিমন্ত্রণ-সভা'। মধ্যবির্ত্ত জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতায় এগুলি ভরপুর। 'হৃদয় কৌতুক'র অভাব নেই, আবার অতীত দিনের সামাজিক প্রথা ও আগেরগুলি ব্যাতি বদেশী ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরল দৈনন্দিন জীবনের আলো ছায়ায় সিদ্ধ হয়ে, পাঠকের মনে অনতিরঞ্জিত সমাহৃত্যুতি প্রাপ্ত করেন 'নিমন্ত্রণ-সভা'র আরম্ভেই বলেছনাথের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

দুইই হই বা দরিদ্রই হই, আমাদের নিমন্ত্রণাণার সমাজোন্মন বড় অধিক নহে। কবলীপান ও মুগপান হইলেই আমাদের মুগ ও কল অনায়েসে সমাধা হয়, এবং ইহার উপর যদি একখানি কুশানন মুটে তাহা হইলে বজ্রাণা সমাজ কোন অই অসম্পূর্ণ থাকে না।...ইহারের মত ঘণ কুটিলি স্তিগনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু লইয়া আমাদের কারবার নহে।

আবার প্রবন্ধশেষে—

সব শুদ্ধ অভিধিপদ্যালতা আচা জাতির একট নিশেপ ধায়...আমাদের সকল কাগরেইই অত্বরে অত্বরে যে একটি শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অত্বরের সমুদ্র আকর্ষণ। এবং এই শুভ দৃষ্টিটুকু হল: আমাদের অত্বরণ হইতেও যে তিরোহিত হইতেছে ইহাই সর্বলোকা দুঃখের বিষয়...

এই দৃষ্টব্যটি পড়লে লেখকের বিজাতীয় ভাব বর্ধন এবং বিগত বাংলার সামাজিক সমাচারের প্রতি অসুযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

✓ কিন্তু বলেছনাথের মানসলোকের সমস্ত 'হৃদয় অক্ষুণ্ণতা, স্পর্শকাতরতা, আকর্ষণ আকুলতা, কাব্যের প্রাণ প্রাণবন্ত সৃষ্টি নিয়ে চোখের সামনে ভাসে তাঁর স্মৃতিচলক রচনাগুলিতে। নানা ধরনের স্মৃতি, অতীতের ও বর্তমানের অম্ল উপভোগের তীব্র কোমলতা ছড়িয়ে আছে 'দাত্রা', 'বানালার ধারে', 'কাহিনী', 'একরাতি', 'বনপ্রান্ত' এবং 'বোলতা' ও 'মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি রচনা। এগুলি বার বার পড়লে পাঠকের মন ভাবার ও কল্পনার বোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এ সব লেখায় স্মৃতি পটভূমির কাজ করে, আবেগ আর কল্পনা প্রাণ প্রজ্জ্বল করে। 'দাত্রা' প্রবন্ধটিতে ভাষা যেন পুরাতন অভিজ্ঞতার এক আবহা স্মৃতিতে ধূসর ও মধুর হয়ে ওঠে, একটা অস্পষ্টতার রহস্ত ঘনিষে তোলে—যেমন 'বনপ্রান্ত' লেখাটির শেষ অংশে গরুর গাড়ির চিমে-চাল নিঃশব্দ কল্পনার মধর আবর্তনের সঙ্গে অকৃতভাবে নিশে যায়—)

আবার সেই গরু গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাড়ীও চলিয়াছে, বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিমান নাই, তাহার বাতায় শব্দ নাই।

ছুটি প্রবন্ধেই একই চিত্ররূপী কল্পলোক—যেখানে অক্লান্ত বাতায় রান নিঃসঙ্গতা বিদায়ের ও অপরিচয়ের বেয়নাকে আকাশে বাতাসে কণ্ঠিত করে রেখে যায়। 'বোলতা' ও 'মধ্যাহ্ন' এখনি আর—একটি অনবন্ত রচনা,

যার স্বহৃদয় সৌন্দর্য দুপুরের পরম হাওয়ারতেও মূখের উপর এক ঝলক ঈতল শান্তি বুলিয়ে দিয়ে যায়। এ প্রবন্ধে বোলভাকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে বলেছেন যে প্রেমের ও কাব্যের যে তীব্র দহন-স্বপ্ন, তার ধারণা রূপটি এঁকে দিয়েছেন। এই খিগলিত স্বপ্নের বিপ্রসরের অসীম আলস্ত ও নৈরাস্ত যেন বিদূষিত বাহুতরঙ্গ ভেসে বেড়ায়। এক বছর আগেকার রচনা 'বোলতা' দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে পরিণতি লাভ করেছে, বদ্বী চং থেকে মুক্ত হয়ে কাব্যের মর্মকোষ উন্মুক্ত করেছে। এটি সব স্বাভাবিক রচনা পড়লে মনে হয় সৌন্দর্যের কত সহজ, কত অল্প সাধক ছিলেন বলেছেন। এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধম্পর্শে ভরা নিত্যপ্রবহমান সৌন্দর্য-স্রোতকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করতে পারবেন না বলেই কি তাঁর এত বিষম বিহ্বলতা? 'উত্তরচরিত' আলোচনায় কি তাই কীটসের 'নাইটিংবেল' কবিতা থেকে তিনি একটি সবশ্রেণীর অভিজ্ঞতার আত্মপোষিত সত্ত্ব উদ্ধৃত করেছিলেন?

My heart aches and a drowsy numbness pains

My sense, as though of hemlock I had drunk---

বলেছেন কবি— 'রাখবিকা' ও 'প্রাণী' কাব্যগ্রন্থে তিনি যে কবি, তার চেয়ে অনেক সার্থক ও পরিণত কবি তিনি তাঁর গল্পরচনায়।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যপ্রকাশিকা। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিজ্ঞানভবন, বিশ্বভারতী। গ্রাণ্ডিহান বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা ৭। মূল্য দশ টাকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণার সব তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের স্বপরিজ্ঞাত নহে। এখনো নিত্য নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই সব পুঁথি কোথাও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিতেছে, কোথাও সে আমাদের পুরাতন ধারণা একেবারে বদলাইয়া দিতেছে। এইসকল নূতন নূতন পুঁথির আবিষ্কার ব্যতীত আমাদের সাহিত্যে অল্পপরিজ্ঞাত কতগুলি বিষয়ও রহিয়াছে— সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বহুদিন ধাবং কতগুলি অস্পষ্ট— এবং অনেকস্থলে ভ্রান্ত— ধারণার সৃষ্টি করিতেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভালোভাবে গবেষণা করিতে হইলে আমাদের এই নবাবিহীন তথ্য এবং অজ্ঞাত তথ্য, উভয়কে লইবাই বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতীর বিজ্ঞানভবন এই গবেষণার কাজ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বিজ্ঞানভবনের গবেষণালব্ধ তথ্য সংগৃহীত হইয়া এই প্রথম খণ্ড সাহিত্যপ্রকাশিকা মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদক্য নৃপবন্ধু ভট্টর ঝাংগা জনাইয়াছেন যে, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় অনেকগুলি মূল্যবান বাংলা পুঁথি সংগৃহীত আছে, সেই সব পুঁথির বিবরণ এই গ্রন্থশালায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে— কোনো কোনো পুঁথিও হস্পাদিত হইয়া এই গ্রন্থশালায় প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতীর বিজ্ঞানভবন হইতে এই গবেষণা ও গ্রন্থশালা প্রকাশ অভ্যাস আশা ও আনন্দের কথা। ইহা যেরূপ এক দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়া গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে, তেমনিই, আমাদের বিশ্বাস, ইহা বিশ্বভারতীর মর্যাদাও বৃদ্ধি করিবে। বাংলায় এই-জাতীয় গবেষণা-প্রকাশক গ্রন্থের একান্ত অভাব। সাময়িক পত্রসমূহ গবেষণাধ্যক্ষ দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশে স্বাভাবিক

অক্ষয় ও অনিচ্ছুক ; অথচ গবেষণাকে সর্বত্র 'সরল ও সৎকিঞ্চ' করিয়া তোলা নিরাপদ নহে— হৃদয় সন্তবও নহে ; সুতরাং ইহার মন্ত্র পুথক গ্রন্থালায় একান্ত প্রয়োজন ; বিশ্বভারতীর বিভাজন এ-বিষয়ে অগ্রণী হইয়া সাধুবাদের ভাজন হইয়াছেন । তাহাদের এই আদর্শ অগ্ররও অল্পদূরত্ব হইবার^১ যোগ্য ।

সাহিত্যপ্রকাশিকার আলোচ্য প্রথম খণ্ডে আমরা বাংলা সাহিত্যের দুইটি বিশেষ দিক্ সন্মুখে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই । ঐতিহ্যবাহী যোষাল আলোচনা করিয়াছেন কবি সৌলত কাজির 'গভী মননা ও শোর-চম্পাণী' বিষয়ে ; আর ঐহবনয় মুখোপাধ্যায় আলোচনা করিয়াছেন 'বাংলার নাথসাহিত্য' বিষয়ে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি সৌলত কাজির আলোচ্য গ্রন্থাবলির একটি বিশেষ স্থান আছে । ঐষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশের একেবারে পূর্বপ্রান্তে আরাকান-রাজসভার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি আশ্চর্য প্রসার ঘটিয়াছিল । এই রাজসভার দ্বাংহারা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রথমেই সৌলত কাজি এবং তৎপরে কবি আলাওলের নাম করিতে হয় । বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিগণের যৌথ সাধনায় সমৃদ্ধ । মুসলমান কবিগণের মধ্যে কবি সৌলত কাজিকেই সর্বপ্রথম কবি বলা না গেলেও এ কথা বলা ঘাইতে পারে যে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক মুসলমান কবি । তাহার প্রসিদ্ধ কাব্য 'গভী মননা ও শোর চম্পাণী' তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই— তাহার অসম্পূর্ণ কাব্য তাহার স্মরণ্য উত্তরাধিকারী কবি আলাওল সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন । কবি সৌলত কাজির এই গ্রন্থ বর্তমানে দুস্ত্রাপ্য ; অধ্যাপক যোষাল এখানে কাব্যখানির একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ দিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজন করিয়া এই কবি ও তাহার কাব্য, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আরাকান-রাজসভা ও তৎকাল বাংলা সাহিত্যের চর্চা সন্মুখে অনেক মূল্যবান তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ।

অধ্যাপক যোষাল যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার ভিত্তর দিয়া একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া ওঠে । সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান-রাজসভার যে মুসলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতেছিলেন তাহারা কোনো রাক্ষসিক কারণে হিন্দু কবিগণ হইতে একান্তভাবে অসমগোত্রীয় ছিলেন না । তাহারা ঐতিহ্যবাহী একই বাঙালী বিবাসপ্রবণতা ধ্যানধারণা, একই ভাব ও ভাষার অধিকারী ছিলেন । তাই কবি সৌলত কাজি বা কবি আলাওল গ্রন্থরূপে মুসলমান ধর্মের বিধি অস্বাভাবিক বন্ধনাদি করিলেও কাব্যমধ্যে ভাবে ও ভাষায় নিঃস্বের কোথাও বৃহত্তর বাঙালী-মানস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই । এমন কি, আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, ধর্মের ক্ষেত্রেও অবোধপূর্বভাবেই তাহাদের লেখার মধ্যে একটা ব্রহ্মস্রব সমন্বয়ের স্খাভাস রহিয়াছে । আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের প্রতি অধ্যাপক যোষাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন— তাহা হইল তৎকালীন সবগ্র বাংলা সাহিত্যের উপরে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বাভিযায়ী প্রভাব । হুদয় আরাকানে বসিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি যখন একান্ত পার্থিব প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া ব্রহ্মল্লির অমুকরণে কবিতা লিখিতেছেন—

মোহর হৃদায়ক

গুণের পালক

মধুর মুরতি মূখ ভেঙ্গ ।

সো মধু ভেজিয়ে

করাওসি বিষপান

ভাল, ধাই, কহ উপদেশ ।

•
 তুমি বড় পাপিনী পাপ শুনাওনি
 • ধরম করাওনি বার্মা ।
 পাতকী ঘাতকী ধাই কি নোক চিৎকারি
 আতি কুল করহ নির্দাম্য ॥
 অথবা কবি শ্রীকৃষ্ণদেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি সম্বন্ধে দ্রাবিড়া ধ্বনি বর্ণনা করিতেছেন—
 নবচূত অম্বর কিশলয় মঞ্জুল
 রঞ্জিত তরুলতা পুণ্ডে ।
 কোকিল কাকলী কল কল কুজিত
 সুললিত ললিত নিহুতে ।
 কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক
 বহুল-মূল-কুল রসে ।
 হেরইতে নধুর মধুপানে নধুর
 মানিনী মান বিভসে ॥

তখন সভাই আশ্চর্যবিত্ত হইতে হয় ।

দ্বিতীয় নিবন্ধে শ্রীমত স্বনামধন্য মুখোপাধ্যায় বাংলার নাট্যসাহিত্য বিশেষ করিয়া গোবন্ধ-বিজয় বা গোবর্ধ-বিজয় এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকে অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন । যদিও আলোচনাগ্রন্থে কতগুলি ঐতিহাসিক বিতর্কের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইয়াছে এবং বিচার-বিবেচনার পরে তথ্যগত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তথাপি ঐতিহাসিক বিচার ভাঁটার মুখা কাজ নহে—এই সকল গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যবিচারই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য । স্বনামধন্যের সমস্ত আলোচনা পড়িয়া আমাদের প্রধান স্তম্ভ দুইটি কথা মনে হইয়াছে । প্রথমতঃ তাঁহার আলোচনা একটু অকারণ দীর্ঘ মনে হইয়াছে ; বিধবের প্রতি কোনোরূপ অবিচার না করিয়াও আলোচনাটি আরো অনেক সংক্ষিপ্ত এবং সংহত করা বাইতে পারিত । দ্বিতীয়তঃ, আধাবিগকে মনে রাখিতে হইবে, সব আতীত সাহিত্যরচনা সম্বন্ধেই একই বিচারবিধি সুপ্রযুক্ত নহে । লোকসাহিত্যের নিরর্থক কতগুলি বৈনিষ্ঠ্য এবং আকর্ষণ থাকে—তাঁহাদের বিচারে সেই বিশেষ আকর্ষণগুলিকে পরিচুটী করিয়া তোলাই বেশি দরকার । অভিজ্ঞাত সাহিত্যলক্ষণ এই সব সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে সে চোটা সর্বত্র হুই নাও হইতে পারে । এ ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে সেই চোটাংশকা করিয়াছি বলিয়াই কথাগুলির উল্লেখ করিলাম ।

শ্রীশশিকুব্জ দাসগুপ্ত

•
 •
 নন্দীপথে । শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত । বিশ্বভারতী । পৃ ৬৮ । মূল্য দুই টাকা । শ্রীপরিতোষ সেন চিত্রিত । আমাদের মনের মধ্যে যে স্বাধাবের পাখিটা দিনরাত ডানা ঝাপটিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের "নন্দীপথে" পড়বার পর সে কিছুক্ষণের জন্য কতকটা শান্ত হয়ে এসে ।

স্বাভাবিক একবার চিঠিতে লিখেছিলেন যে অন্ত কষ্ট ক'রে ব্রহ্মিনপত্র বাস্তবনী ক'রে, অল্পসং টাকাপয়দায় শ্রদ্ধা ক'রে, রেলগাড়ি ইত্যাদিতে চেপে হাওয়া বদল করার চেয়ে, মিথ্যা টেবিলের কাছটি থেকে সরে এসে

জানলার ধারে বসলেই তো দৃষ্ট ও হাওয়া উভয়ই বদল করা হয়। উপরন্তু পাগলের মত পৃথিবীটার পিছনে ছুটে বেড়াতে হয় না, বরং পৃথিবীটাই কাছে এসে থরা দেয়। এ বইখানি পড়ে সে কথাও মনে হল।

রচনার কোনো চটকমার গুণ নেই, নিরলংকার স্বরস্বরে পরিষ্কার বাংলায় লেখা কতকগুলি চিঠি মাত্র। তাদের মধ্যে লোকবোধানো কোনো গুণপনা নেই, কোনো দার্শনিক ভাবকথা নেই, কোনো কাব্য গাওয়া নেই, কোনো চালাকি-চাতুরীর বাংলাই নেই।

পুরোনো দিনের সব কথা; বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের বছর আগে; ঘটনাগুলি ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬ সালের। অথচ লেখক যেন আমাদের হৃদয় নিয়ে গিয়ে এক অপরিচিত নদীতীরে উপস্থিত করলেন।

সেখানে অশ্রু ও অবিরেচক ইংরেজ প্রবৃষের অনিশ্চয় ভূতা, মুসলমান সারো-বাটলারদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে, নিশ্চিত স্বপ্নে, সেবর্জিত অনাবিল আসক্তে দিন কাটাতে হয়। বাজলী ঘাটী পেয়ে জাহাঙ্গে ইন্টি-চেয়ার বা পর্দা-কালরের বাহুল্য থাকে না। ছুই পাশে দুটি মালবোঝাই স্ল্যাট ঝাঁপ থাকে। ঘাটে লাগবার সময় আবার স্থানান্তরে তাদের দু-একটাকে নাক-নদীতে খুলে আসতে হয়। মাল নামে, মাল বোঝাই হয়। খাবার জল আর কাঁচা রসদ হুরিয়ে যায়। নদীর উপরে বাস করেও ভালো মাছ পাওয়া যায় না। ছোট একটা ক্যাম্প কি অশ্রুয়ের ইলিশ জুটল তো বহু ভাগ্য। তবে উকিল মহাপ্রয়ের কাছে জমিদারী সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে এখানেও লোক আসে। হরবোলা নানান পানির ডাক শুনিয়ে যায়। পার্টির নৌকোর সঙ্গে ছোটখাটো একটা স্ট্রোকার্টুফিও লাগে, তাতে কারো বিশেষ কতি না হ'লেও, বিপুল ইংরেজিতে দুটো দুটো রিপোর্ট লিখে দিতে হয়। আর পরদিন পর্বত সারোঙের মন ধারণ হয়ে থাকে।

আকাশে ঢিপি ঢিপি মেঘ জমে, উত্তরে হাওয়া বয়, কিন্তু সামনের ডেকটা যোঁবে ভরে থাকে। এখানে এখানে স্রোতাঙ্কুর নামধারী সব জায়গায় কুয়াশার জল বা ভাঁটা পড়ার জল একনাগাড়ে পাঁচ-সাত ঘণ্টা জাহাজ আটক থাকে। তার পর সপ্তর্শী নদী বেয়ে, নামকানা পাল ধরে স্বন্দরবনের দিকে এগিয়ে চলে। হুপুন্ডিনাংকল বনের ওপারে সূর্য অস্ত যায়, ঘরীর জল গোলাপি রং দিয়ে থোলা হয়ে ওঠে। ক্রমে সন্ধ্যা নামে, মাক্রিমাক্রিম পিছনের ডেকে নামাজের আজান দেয়। বিচিত্র তাদের জীবন। পরীক্ষা পাশ দিয়ে সারোঙের কান পেতে হয়, তাও সাধা চানকাদের চেয়ে অনেক কম মাইনেতে। পাট দিয়ে সাবানজল দিয়ে জাহাজখানিকে আগাগোড়া চকচকে করে রাখে। সন্ধ্যাবেলা রোজা ভাঙবার সময় এক-একটা বড় থালায় ভাত-ভরকারি বেড়ে নিয়ে, তিন-চারজন একদমে বসে যায়।

এত অভিজ্ঞতা লেখক একবারেই লাভ করেন নি। সময়ের সঙ্গে এ রকম খাড়াই কারো কোনো সম্পর্ক থাকে না। প্রথম বছর অগ্নরাগ ঘাট থেকে ধীরে স্বপ্নে কালকাটি পৌছতেই ছুটিন বৈয়াস হুরিয়ে যায়। এক বছর পরে, নারের কোথাও না খেনে, কলকাতা থেকে বরাবর কালকাটি অবধি চলে এসে, আবার শুরু হয় সেই ঢিমে-তেতালী জ্বলে ছুটি ভোগ।

এবার পর। নদী ধরে গোয়ালন্দ অবধি অগ্রসর হওয়া যায়। তারপর আরো এক বছর বাসে ঢাকা মেলে গোয়ালন্দ পৌছে, সেখান থেকে আবার নৌবিহার শুরু হয়। এবার সিরাজগঞ্জ পেরিয়ে, ফুলছড়ি ঘাট পিছনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র ধরে, ঢিলানারি হয়ে বুঝি। সেখান থেকে বিলাসীপাড়া, গোয়ালপাড়া, পলাশবাড়ি, পাখুঘাট, গৌহাটি, তেজপুর। সেইখানে এসেই স্বপ্নস্রোতার শেষ সীমানা পৌছনো গেল।

সেখানকার নদীর সঙ্গে, বাংলাদেশের সুপুরি-নারকেলের বন আর অমবাগান-কলাবাগানের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিতা নদীটি কোনোই লাঞ্ছিত নেই। এখানে ভীরে লম্বা লম্বা ঘাস আর পাহাড়ের লাইন, ভাবের বাধ্য কৃপা জন্মে আছে, জলের ধার বেঁধে নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়, ভাবের মতো কোনোটা অনাবৃত্ত কালো পাথরে ঢাকা।

এরুনি ছাপা হবে বলে লেখা হয় নি, সেইজন্য এমন একটি মন-কেনন-করা বই খুঁজে পাওয়া যায়। ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বিরল, সেটি হল মনের শান্তি। মনে হয় লেখক তার শব্দান পেয়ে থাকবেন। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি সর্বদা নাটকের পর পরিহার করে, পা ছুটি মেলে দিয়ে, দর্শকের আরামকেদারায় বসে থাকেন।

শ্রীলীলা মজুমদার

পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা। অশোক মিত্র প্রণীত। বাক্স, ১১বি জোয়দী টেরেস, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

সংস্কৃতির একটি লক্ষণ সার্বজনীনতা। শুধু দুচারটি বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ নয়। উনিশ শতকের বাঙালী, এমন কি বিশ শতকের গোড়ার পানেও বাঙালীর শিক্ষার এই সার্বজনীনতা এবং বিস্তারিত ছিল। সকলেই যে সব বিষয় জানতেন তা নয়, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী অনেক বিষয়ে অনেক কথা জানতেন। বঙ্গদর্শনের পাতা তুলতালে এ কথা বোঝা যায়। কত বিষয়েরই আলোচনা তাতে হত! সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রকৃতি, সামাজিক শাস্ত্র, ইতিহাস—আরো কত কি। সমাজপতির পত্রিকা ‘সাহিত্য’ সম্বন্ধেও এই কথা ঘটে। তাঁদের সাহিত্যিক রচির মাননও আজকের বিচারে চলবে এমন কথা নিশ্চয়ই বলছি না—কিন্তু তাতে লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল রচির বহু-মুখীনতা। ইতিহাস, নিদালিপির পাঠোদ্ধার, সমাজতত্ত্ব, ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা থাকত তাতে। কলা বাহ্যিক, এ ধরনের কাগজ চলা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না, যদিও তখন পাঠকের চিত্তও মোটামুটি এইসব বিষয়ে উৎসুক থাকত। সে তুলনায় আজকের দিনের পাঠকের রচির বিচার করলে দেখা যায়, রচি যেন অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বস্তুতঃ এই লক্ষণ শুধু বাঙালী পাঠকেরই নিম্ন নয়—এ বোধ হয় সারা ভগবতেরই একটি আধুনিকতম লক্ষণ। জীবন ঘড়ি চলছে, জীবনের বিভিন্ন দিকে যত বিশেষীকরণ হয়ে উঠছে, ততই আরো বিশেষজ্ঞদের স্বত্ব হয়ে পড়ছে, কিন্তু এই নব বৈশেষিক দর্শনে জীবনের সমগ্রতা খণ্ডিত হয়ে চলেছে। সমস্ত খণ্ডিতবন এবং সংস্কৃতির চূর্ণীভবন (atomisation) এ যুগের সাংস্কৃতিক সংস্কৃতির অন্ততম লক্ষণ। এ কথা সত্য যে আজকের দিনে সে-বাহু দিয়ে চলে না যে-মাইল পাঞ্জিপুরি দেখে একটা ব্যক্তির দিন ঠিক করে দিতে পারতেন, নাকী সেখা মোটামুটি রোগটাও বাতলে দিতে পারতেন এবং দরকারযত চাষবাসেরও দুচারটে হুদিস দিতে পারতেন। আজ জীবনবাহু আর এত সহজ নয়, যাতে নানা বিষয়ে ঐ রকম অশিক্ষিতপটু দিয়ে কাজ চাটিয়ে দিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, একালে ঐ রকম অশিক্ষিতপটুই অচল হলেও সমস্ত খণ্ডিতবন সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের পরিপূরক নয়। সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশ হতে গেলে জীবনের বিভিন্ন বিকল্পের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। হয়তো তা আগেকার মত অত সহজে আর হবে না, হয়তো তার জন্য কিছুটা বিশেষ জ্ঞান দরকার—

কিন্তু তা সচেতন স্বীকার করতেনই হবে যে, সেই বিশেষ জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে। তা না হলে আমরা ক্রীবনের বিভিন্ন দিকের আশ্রয় পাব না, আমাদের সংস্কৃতিও পূর্ণাঙ্গ হওয়া উঠবে না।

সেই দিক থেকে শ্রীহরী অশোক নিম্ন প্রণীত 'পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা' বইখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব বিশেষ তরুণিতরুণ বই রচনা করেন নি— পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলার সঙ্গে সাধারণ এবং সহজ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের কথ্যভাষায় "পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলার সাধারণ পরিচয় ও শিক্ষার জন্য বইটি লেখা।" সে কাষে তিনি অভাবনীয় সাক্ষ্য অর্জন করেছেন। শুধু "ফ্রান্সের উচ্চ ক্লাসের ছেলেমেয়েরা" নয়, প্রত্যেক সাধারণ বাঙালী পাঠকই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ অহুতব করবে। তিনি আশিষ্য থেকে তাঁর কাহিনী শুরু করেছেন। আস্টোরিয়া প্রভৃতি গুহার দ্বারা অঙ্কিত আশিষ্য ছবি দিয়ে তাঁর বর্ণনা শুরু করেছেন। তার পর ইজিপ্টের ছবি। তার পর তিনি গ্রীক চিত্রকলার এবং প্রধান যুগের খ্রীষ্টিয়ান চিত্রকলার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তার পর তিনি প্রাক-রেনেসাঁ যুগের কথা আলোচনা করে বিখ্যাত রেনেসাঁ যুগে পৌঁছেছেন। তার মধ্যে আবার ছোট রেনেসাঁ এবং আসল রেনেসাঁ। প্রত্যেক দিকেই তখন ধর্মের বন্ধন থেকে মানবচিত্র মুক্তিলাভ করছিল, ছবিতেও ধর্মবিহীন ছবি আঁকা শুরু করলেন বিখ্যাত চিত্রকর বতিচেই। তার পর পেরুজীনা সাক্ষ্যের দ্বারা বিকালেজেলো দাত্তিক প্রভৃতি সময় শিল্পীর আবির্ভাব হল— ইতালীয় ভাবতরঙ্গ পূর্ণ জোয়ারে বইতে লাগল। শুধু কি চিত্রকলা? স্থাপত্য, ভাস্কর্য— সব দিকেই এই ভাবতরঙ্গের পূর্ণ জোয়ার। শ্রীহরী নিম্ন শুধু এই ভাবতরঙ্গেরই বর্ণনা দেন নি, তার সঙ্গে বিখ্যাত ছবিগুলিরও বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ছবিরও প্রচুর নকশাও ছেপেছেন। তার পর পরে পরে অত্যন্ত বেশ বড় শিল্পী এসেছেন— বেমন রেব্রাণ্ট, রুবেন্স ইত্যাদি ডাচ শিল্পী, ভিউরর প্রভৃতি জার্মান শিল্পী, ভেরমীর, গ্রেকো, ভেলাস্কেস ইত্যাদি বহু শিল্পীর পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী এবং পিকাসো-তে পৌঁছেছেন। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলার একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন।

বস্তুত: এ বইটির খুব প্রয়োজন ছিল এবং এ বইটি একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছে বলে মনে হয়। পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা এক নতুন বস্তু, আমাদের পক্ষে এক অনাব্যাহিত-পূর্ণ জগৎ। ভারতীয় চিত্রকলার— এমন কি চীনা বা জাপানী চিত্রকলার— ঐশ্বর্য অনন্ত, তার নানা দিকে বিকাশ ঘটেছে, তার বহু দিকে প্রতিবিম্ব। কিন্তু তাদের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলার মূলগত তফাত আছে। সাধারণ দর্শক হিসেবে আমার বারবার মনে হয়েছিল, প্রাচ্য চিত্রকলায় ছবিটি হচ্ছে ভাবজ্ঞাতনার উপলক্ষ্য মাত্র, বং ছবি পটভূমি সব মিলিয়ে একটি ভাবতরঙ্গের স্বরূপ হওয়াই তার সবচেয়ে বড় কথা। সেইজন্য সেখানে দীর্ঘায়িত চক্ৰ বা আঙুল বোটেই অমানব। অথবা চীনের ছবি— যুগের পটভূমিকায় একটি শুকনো ভাল একটি কোড়ো পাখি। কিন্তু ইউরোপের চিত্রকলা, মনে হয়, ঠিক এ পথে যায় নি। সেখানেও ভাবতরঙ্গের অপূর্ণ স্থান আছে— মনো লিঙ্গার কথা কে না জানে, অথবা সাক্ষ্যের সাক্ষ্যের সাক্ষ্যের ছবিগুলির? কিন্তু একবার একালের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলায় ভাবতরঙ্গের অপূর্ণ স্থান। থাকা সত্ত্বেও সেখানে ছবিতে শারীরিক গঠন এবং অবয়বের দার্থ্য রক্ষা করা হত। তার সঙ্গে পশ্চিমী ছবির আর-একটি বড় কথা হল কম্পোজিশন। কত মাহুকের ভিড় ছবিতে! এক-একটা বড় ছবি দেখলে বিম্বিত হতে হয়। যেমন ভ্যাটিকানে সাক্ষ্যের সাক্ষ্যের সাক্ষ্যের ছবিগুলি। অথবা সিস্টিন চ্যাপেলের গায়ে আঁকা বিকালেজেলোর

অপূর্ব কীর্তি। কত মানুষের ডিড় ছবিতে, আর কি বৃহদাকারের নাহু! ওয়ারউইক ক্যাসলে ভ্যান ডাইকের আঁকা একশানি সিংহের ছবি আছে। জনশ্রুতি এই যে, সেই ছবি দেখন আঁকা হয়েছিল তখন সেই সিংহ সেপে কুহুরের। ভয়ে চাঁৎকাপ্ত করতে করতে পালিয়ে যেত— এমনই জীবন্ত সে ছবি। দ্বারা কবেমের ছবি দেখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অমুভব করছেন, কী জীবন্ত জলন্ত প্রতিমূর্তি! কাম্বোই ভাবন্তোতনার প্রক্রিয়া এই চিত্রধারণ। স্বস্ত। আমদা দ্বারা সাধারণতঃ অন্তরকম ভাবপ্রক্রিয়ার অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে পশ্চিন ইওরোপের চিত্রধারণ। একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অত ধরনের স্বপ্ন। সে বিষয়ে ত্রিভুক্ত নিব্ব এনে একটি স্বপ্নপাঠ্য স্বপ্নের এবং ধারাবাহিক আলোচনা বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়ে বাঙালী পাঠকের অদৃষ্ট সাধুবাদই শুধু অর্জন করেছেন তাই নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহিনীর যুগে সাংস্কৃতিক প্রসারের সহায়তাও করেছেন—তার ক্ষত ও তিনি ধন্তবাহার।

ত্রিবিমলচন্দ্র সিংহ

স্বীকৃতি

এই সংখ্যায় প্রকাশিত, ত্রিভুক্ত নন্দলাল বহু অধিত 'মুদ্রা ক্রমাও উপদেশ' চিত্রগানি কলিকাতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর বিগত বার্ষিক প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; ব্রকও উক্ত অ্যাকাডেমির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গত (কার্তিক-পৌষ ১৩৬২) খ্যায় ১৩৩ পৃষ্ঠার শঙ্কুয়ে মুদ্রিত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ফোটোগ্রাফ ত্রিগতোদ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত।

ଅବଗତି

যে যাচনা যতনে মনে মনই ছানে

পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিলে ।

ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିବାସି ଯେନ କତ ଅପରାଧୀ ନିରସିଧା ସାଧି ପ୍ରାପ୍ତପଣେ ।

তবু তো সে নাহি তোষে, আরো দোষে অকারণে ॥

कथा' । त्रीधन कथक

স্বরলিপি ॥ ত্রিযতী ইন্দিরাসেবী চৌধুরানী

II -। { ^१ ^२ ^३ ^४ ^५ ^६ ^७ ^८ ^९ ^{१०} ^{११} ^{१२} ^{१३} ^{१४} ^{१५} ^{१६} ^{१७} ^{१८} ^{१९} ^{२०} ^{२१} ^{२२} ^{२३} ^{२४} ^{२५} ^{२६} ^{२७} ^{२८} ^{२९} ^{३०} ^{३१} ^{३२} ^{३३} ^{३४} ^{३५} ^{३६} ^{३७} ^{३८} ^{३९} ^{४०} ^{४१} ^{४२} ^{४३} ^{४४} ^{४५} ^{४६} ^{४७} ^{४८} ^{४९} ^{५०} ^{५१} ^{५२} ^{५३} ^{५४} ^{५५} ^{५६} ^{५७} ^{५८} ^{५९} ^{६०} ^{६१} ^{६२} ^{६३} ^{६४} ^{६५} ^{६६} ^{६७} ^{६८} ^{६९} ^{७०} ^{७१} ^{७२} ^{७३} ^{७४} ^{७५} ^{७६} ^{७७} ^{७८} ^{७९} ^{८०} ^{८१} ^{८२} ^{८३} ^{८४} ^{८५} ^{८६} ^{८७} ^{८८} ^{८९} ^{९०} ^{९१} ^{९२} ^{९३} ^{९४} ^{९५} ^{९६} ^{९७} ^{९८} ^{९९} ^{१००} ^{१०१} ^{१०२} ^{१०३} ^{१०४} ^{१०५} ^{१०६} ^{१०७} ^{१०८} ^{१०९} ^{११०} ^{१११} ^{११२} ^{११३} ^{११४} ^{११५} ^{११६} ^{११७} ^{११८} ^{११९} ^{१२०} ^{१२१} ^{१२२} ^{१२३} ^{१२४} ^{१२५} ^{१२६} ^{१२७} ^{१२८} ^{१२९} ^{१३०} ^{१३१} ^{१३२} ^{१३३} ^{१३४} ^{१३५} ^{१३६} ^{१३७} ^{१३८} ^{१३९} ^{१४०} ^{१४१} ^{१४२} ^{१४३} ^{१४४} ^{१४५} ^{१४६} ^{१४७} ^{१४८} ^{१४९} ^{१५०} ^{१५१} ^{१५२} ^{१५३} ^{१५४} ^{१५५} ^{१५६} ^{१५७} ^{१५८} ^{१५९} ^{१६०} ^{१६१} ^{१६२} ^{१६३} ^{१६४} ^{१६५} ^{१६६} ^{१६७} ^{१६८} ^{१६९} ^{१७०} ^{१७१} ^{१७२} ^{१७३} ^{१७४} ^{१७५} ^{१७६} ^{१७७} ^{१७८} ^{१७९} ^{१८०} ^{१८१} ^{१८२} ^{१८३} ^{१८४} ^{१८५} ^{१८६} ^{१८७} ^{१८८} ^{१८९} ^{१९०} ^{१९१} ^{१९२} ^{१९३} ^{१९४} ^{१९५} ^{१९६} ^{१९७} ^{१९८} ^{१९९} ^{२००} ^{२०१} ^{२०२} ^{२०३} ^{२०४} ^{२०५} ^{२०६} ^{२०७} ^{२०८} ^{२०९} ^{२१०} ^{२११} ^{२१२} ^{२१३} ^{२१४} ^{२१५} ^{२१६} ^{२१७} ^{२१८} ^{२१९} ^{२२०} ^{२२१} ^{२२२} ^{२२३} ^{२२४} ^{२२५} ^{२२६} ^{२२७} ^{२२८} ^{२२९} ^{२३०} ^{२३१} ^{२३२} ^{२३३} ^{२३४} ^{२३५} ^{२३६} ^{२३७} ^{२३८} ^{२३९} ^{२४०} ^{२४१} ^{२४२} ^{२४३} ^{२४४} ^{२४५} ^{२४६} ^{२४७} ^{२४८} ^{२४९} ^{२५०} ^{२५१} ^{२५२} ^{२५३} ^{२५४} ^{२५५} ^{२५६} ^{२५७} ^{२५८} ^{२५९} ^{२६०} ^{२६१} ^{२६२} ^{२६३} ^{२६४} ^{२६५} ^{२६६} ^{२६७} ^{२६८} ^{२६९} ^{२७०} ^{२७१} ^{२७२} ^{२७३} ^{२७४} ^{२७५} ^{२७६} ^{२७७} ^{२७८} ^{२७९} ^{२८०} ^{२८१} ^{२८२} ^{२८३} ^{२८४} ^{२८५} ^{२८६} ^{२८७} ^{२८८} ^{२८९} ^{२९०} ^{२९१} ^{२९२} ^{२९३} ^{२९४} ^{२९५} ^{२९६} ^{२९७} ^{२९८} ^{२९९} ^{३००} ^{३०१} ^{३०२} ^{३०३} ^{३०४} ^{३०५} ^{३०६} ^{३०७} ^{३०८} ^{३०९} ^{३१०} ^{३११} ^{३१२} ^{३१३} ^{३१४} ^{३१५} ^{३१६} ^{३१७} ^{३१८} ^{३१९} ^{३२०} ^{३२१} ^{३२२} ^{३२३} ^{३२४} ^{३२५} ^{३२६} ^{३२७} ^{३२८} ^{३२९} ^{३३०} ^{३३१} ^{३३२} ^{३३३} ^{३३४} ^{३३५} ^{३३६} ^{३३७} ^{३३८} ^{३३९} ^{३४०} ^{३४१} ^{३४२} ^{३४३} ^{३४४} ^{३४५} ^{३४६} ^{३४७} ^{३४८} ^{३४९} ^{३५०} ^{३५१} ^{३५२} ^{३५३} ^{३५४} ^{३५५} ^{३५६} ^{३५७} ^{३५८} ^{३५}

I পা -1 } -1 । মা-গা মপমা -1 I
 • • ব • বে•••

I ব্রজনা -পা -১ -১ মা জ্ঞা । বা -১ -১ -১ -১ -১ -ব্রজ I
মঃ . . নই জা নে . .

I সা রা মা পা । ধা স্বৰ্গধা -পূৰ্বা -বৰ্গধা । ধা পা -। -। -। -। -। -। I
 পা ছে শো কে হা সে...

I পথ। গ। স। -বর্গ। -সর্বস। -। বধ। । পম। -বধ-সর্গ-ধপ। । মা -স্তা -স। -স্ত। II
লাজ প্র ক। শং কং গ্লি বে .

II {मा मा मा -मा । -मा मा मा मा । -मा मा मा मा । -मा मा मा मा । -मा मा मा मा ।

1. ମା ନା ନା ମା ମା । ନା -1 -1 । -ନମା -ନମା -ବମା ୩ I
 ବି ସେ ନ କ ଡ ଷ ଧ ଙ

I सः -१ (-वशा-पमा)} । -१ -वशा । { पा-र्षा-१ वसा । पः पा-१ -१ । -सवसा-ज्युषा-मगा-मा I
 शी नि . . उ . ब वि

I -1 -1 -1 ખા ્વા -ધપા -ધા ના -1 ઝી ળઝી । ના -1 ઝી -1 I
 • • ના ધિ • • પ્રા ૧ • ૫ • ૯ •

I {-1 -1 মা গা ধা -1 । ধা ধা ধবর্সা -বা । -বা -গা ধা • পা} I
 . . ত ব তো . সে না হি. . . . তো যে

I পা ধা না । সর্গা -১ বা -ধা । পম্বা -এবা -সর্গা-ধণ্যা । মা -জ্ঞা -রসা -রা II I

আ প্রো ধো ষে . অ . কা দ্র পে



বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩

চিঠিপত্র

শ্রীমতী নৈবেদ্যী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণিয়াহ

তোমার বাবা যদি আমার চিঠি না পেয়ে থাকেন সে তোমার বাবার দোষ। তিনি আমাকে কি একটা পাহাড়ে গোছের ঠিকানা দিয়েছিলেন আমি ঊঁর প্রতি বিশ্বাস করে সেই ঠিকানাতেই জবাব দিয়েছি। এখন নুকতে পারছি তিনি আমাকে ঠিকিয়েছেন। তা হোক—একরকম ভালোই হয়েছে কারণ সেই জন্তেই তোমার চিঠিখানি পেলাম। চিঠির মধ্যে ছাতিম গাছের যে কবিতাটি লিখেছ সেটি হৃদয় হয়েছে—ঐ ছাতিমে ভাবী কালে যে ফুলের মঞ্জরী ধরবে তোমার কবিতাটুকুর মধ্যে এখনি তার গন্ধ পাচ্ছি। কাব্য-সরস্বতী ঊঁর নৈবেদ্যের জন্তে এখন থেকেই তোমাকে বাধনা দিয়ে রেখেচেন সেটাতে আর সন্দেহ থাকতে না,—আমি পূজার দিনে উপস্থিত থাকব কি না বলতে পারিনে—কিন্তু একটা আনন্দ এই যে আনন্দ যে জালি শালিয়ে গেলুম তারি মধ্যে তোমার নব বিকশিত ফুলগুলি এসে মিশবে।

তোমাদের রবীন্দ্রপরিষদে^১ যে রবীন্দ্রকে তোমরা আহ্বান করেচো সে তো ঐশ্বর্য্যরী রবীন্দ্র—বাণী তার বাহন,—আর এই যে দেহধারী রবীন্দ্রনাথ এ আগুন খোজে তোমাদেরই সংসদে—এর বেদ্যের অন্ন—যে ক’টা দিন আছে তোমাদের একটুখানি দত্ত আদর আর ছাতিমগাছের ছুটো একটা ফুল উপহারে নগর বিদায় চাই—এমন কি ঐ সম্ভবতঃ স্মৃতিরস্বাহী পরিষদের রবীন্দ্রনাথের পরে তার ঈর্ষা জন্মে। অতএব বাবাকে মাকে নিয়ে শ্রী শান্তিনিকেতনে চলে এস, তার পরে অস্ত্র কথা হবে। ইতি ২৭ কার্তিক ১৩৬৩

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহ

তোমরা ভাক দিলে আসন টলে না এত বড় স্বাক্ষর পদার্থ আমি নই—কিন্তু অসুই বে খাটা বানিয়েছেন তার সোহাগ শলাগলোকে বিখ্যাত বখির করে গড়েছেন। নিউ গলায় গুয়া যে এতটুকু গুলবে এমন নম্রতাও প্রদেয় নেই। তাই বেরোবার ঠাক পাড়িনে। বহুকাল অহুপস্থিত ছিলুম—সেই দীর্ঘ সময়ের লোকসানটা অল্প সময়ের মধ্যে ঠেসে পুরিয়ে নেবার ক্ষমতা মনিব তাড়া লাগিয়েছেন। মনিব যদি বাইরেকার কেউ হতেন, তাহলে ঠাক দিলে আপিস পাশাতুম কিন্তু ইনি অন্তরে বসে তারিফ করেন এর শাশন এড়াবার ছো নেই। স্ববর নিশ্চয় পেয়েছ একটা গল্প লিখতে শুরু করেছি—মাঝে দীর্ঘকাল ছেদ পড়ল—আবার ছোড় ফেলাতে হচ্ছে। লেখা মিনিশ তো ছুতোয়ের কাজ নয়, অর্থাৎ শুকনো কাঠের কারবার একে বলে না,—এ মালাগিরি, সমীচ গাছের ডালপালা নিয়ে কাজ—কাটা। ভাল দীর্ঘ অন্যায়ের তকিয়ে গেলে শুধন নাটিতে পুঁখলেও শিকড় ছড়ায় না, কলমের ছোড় লাগাতে গেলেও আর ছোড়ে না, থলে পড়ে। এই ক্ষমতা ভাড়া গল্পটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে তার তথ্য করতে লেগেছি। এই যে কাজে নিযুক্ত আছি এর ফল তোমরাই ভোগ করবে—আমি তো। তোমাদেরই মালকের মালিকর। তবু কিছুদিন বাবে কোনো না কোনো বিশেষ উপলক্ষে কলকাতার বেতে বাধ্য হতে হবে—তখন যোগ্যবিলায় তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হবে, আর তোমার ছাতিম গাছে বহরী ধরবার আগেই তার পরিচয় নেব। তোমার বাবাকে টানবার চেষ্টায় ছিলুম—তিনিও বেশি গতিশক্তিরহিত—বহুদয় বলেছিলেন পর্তুগ যদি উর ডাকে না আসে তিনিই পর্তুগের কাছে যাবেন—কিন্তু যেখানে হুই পক্ষেই পর্তুগ সেখানে উপায় কি? কলিঙ্গের গন্ধমালন নড়াবার বত মহাবীর তুলন্ত—এই কারণেই বেবদুতে দেখতে পাবে একদিকে রানগিরি পর্তুগ আর একদিকে কৈলাস পর্তুগ এর মাঝখানে যেখার ডাক বলানে ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল নী—এখনো সেই যুগই চলচে। ইতি ২ অগ্রহায়ণ [১৩৩৪]

ভাষ্যখ্যাতী

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাবাকে আর স্বতন্ত্র চিঠি লিখলুম না। যদি লিখতুম আমার অবকাশের অভাব স্বতই অগ্রহায়ণ হয়ে যেত। তোমার বাবা গ্রামশায়ে পণ্ডিত এই ক্ষমতা কবিকেও সাবধানে চলতে হয়।

ও

ও

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহ

রোজ বনে করি চিঠি লিখি। লোকে বলে কবির স্বভাবত অহঙ্কারী। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু অহঙ্কারী বাহুরের সঙ্গে কারবার করা সহজ। একটু স্তব করলেই তার মন পাঞ্জা যায়। গেল চিঠিতে তুমি

আমার পত্ররসনার গুণব্যাখ্যা করেছিলেন। সেটাতে কার হয়েছে—মন সম্পূর্ণ রাগি হয়েছে তোমাকে লিখতে। কিন্তু আমার দুই গ্রন্থকে রাগি করানো শক্ত। কাছের অস্ত্র নেই। তুমি লিখেছ তোমার বাবার অনেক কাহিনী—বোধ হয় তিনি তোমাদের কাছে তাঁর কাছের বড়ই করে থাকেন। বেশি করে খেতে এসে, অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে, অনেক হাঁপিয়ে, বিশ্বের লোককে ভাড়া লাগিয়ে, ব্যস্ততার পোষাকে বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে বোধ হয় তিনি প্রত্যায়জনকরূপে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কাছের লোক। একটা কথা মনে রেখো, কাছের লোককে কাহিনী কল্প করতে হয়, অকাছের লোকের কাহিনী অনুমান। অকাছের লোককে নির্ভর কাহিনী করতে হয় বলে তার ছুটি নেই। মলের কল হ'ল কাছের, করনার ধারা হ'ল অকাছের। হাজার লোক ভিড় ক'রে মীটিঙ করে উৎপাত করলেও মলের কলের ছুটি আছে, কিন্তু নির্জন গহ্বতলে একটি মানুষ না থাকলেও করনার হাঁক ছাড়বার সময় নেই—এক কথায় বলতে গেলে, কাছের সীমা আছে। অকাছ অসীম। আমি অকেজো হয়ে জমেছি বলে মরবারও অবকাশ পাইনে।

সম্প্রতি একটি নাট্যা্যালোচনা^৩ নিয়ে নাচ গান কবিতার শাইকোন বড় চলছে। সেই কুশান ঠেলে একটি ছোট চিঠির নোঁকোকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেওয়া বড় শক্ত। মাঝে মাঝে হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসে, লাঁড় বাগিয়ে বসি এমন সময়ে আবার ফড়ির দমকা এসে তরী ডাঙার আহুড়ে ফেলে। অনেক শাবদানে এই ত্রিভিঙ্গানি তোমার ঘাটে ভিড়িয়ে দিয়েই তালতালি নোঙর কেলদুম—তোমাকে খুঁজি করবার মত এটাকে নিয়ে যে ঝানিকটা বাচ খেলব সে লামা আমার নেই। ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

সত্যানুধারী

কাল কলকাতা রওনা হব।

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়ায়

দুই একদিনের মত কলকাতায় গিয়েছিলেন, একটা সত্যায় বহুতা করে ফিরে এসেছি, কথাটা সত্য। তোমাকে খবর যিহিনি কেন রিজায়া করেছ। আমার কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে খবর দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু দেব এই ছিল অভিপ্রেতি। অর্থাৎ শরীরে বর্ণন দেবার ইচ্ছা ছিল। মনের উৎসাহে ভুলে গিয়েছিলেন যে, বেশির ভাগে আকাজকাটা সত্ত্ববর্ণের শক্ত। মহাসেবকে আভ্যন্তরীণ বল। হয়েছে তার কারণ উপস্থিত তাঁকে যা দেওয়া যায় অল্প হলেও তাতে তিনি রাগি,—বেশি দেব বলে আশা দিতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে ঠাকুরি দিয়ে থাকে। আমি সেই দলের। বেশি দেবার ইচ্ছাটাও যেমন লোভ বেশি দেবার ইচ্ছাটাও ভেদন লোভ। এই লোভের তাড়নায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করে মরেছি—সেই ব্যস্ততার হান্নিযেটি অনেক, বলকে, অর্থাৎ স্থলর অল্পকে। এই স্থলর অল্পকে দেবার শক্তি নিয়ে কত লোক পৃথিবীকে রক্ষণ করেচে—যেমন তুমি সে বটগাছের মত বেশি দেবার চেষ্টা করে না তবু সে কতবার—ধর্মীকে বরদা প্রদান থেকে সেই বাঁচিয়েছে। ৮ই মাসে কলকাতায় ঘাব বিগ ডাকাতের মত আগে থাকতে খবর জিলুম। ইতি ৫ মাস ১৩৩৪

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহ

ভূমি যে উক্তর প্রত্যাশা করে চিঠি লেখ এ কথা আগে ভাবি নি। তার কারণ এই যে তোমাদের বয়সে এখন চিঠি লিখতুম তখন চিঠি লেখ। মনকে পেয়ে বলত বলেই লিখে যেতুম—তার কাছে কতক হতুম থাকে উপলক্ষ্য করে চিঠি লেখা সহজ হত। কালের চিঠি থাকে-তাকেই লেখা যায়, কিন্তু সহজ চিঠি লেখাতে পারে এখন লোক অল্পই মেলে—যখন তাদেরকে পেয়েছি তখন নিজের গুরুত্রেই চিঠি লিখে গেছি। কিন্তু সে এ বয়সে নয়। অকারণ কর্মের বয়স আমার ফুরিয়েছে। এখন সাকারণ কর্মের বোকার আমার পিঠ গেল বেঁকে। এখন আমার মনবনশ্চিৎ ফলজারের ডিড়ে নিশ্চর—এখন শেষের সেই দিন ঘনিষে আসচে এখন

অন্তে পত্র লেখে কিন্তু আমি রহি নিজন্তর।

জীবিত কালের প্রধান ঐশ্বর্য হচ্ছে অবকাশ। সেই অবকাশের ঠাক দিয়েই আসে আলো হাওয়া গন্ধে বর্ণে বিশ্বের মৈত্রী। আর সেইটেই হলো চিঠি চালাচালির প্রশস্ত পথ। পাছে এই পথ দিয়ে পাঠশালা পালাই—কাজ কানাই করি তাই কর্তা এ রাত্রা বন্ধ করে দিয়েছেন। যে বয়সে কর্তব্যের বালাই নেই সে বয়সে এ পথে পাহারাওয়ালি থাকে না—আমারো ছিল না—তুলে এখন যদি এই রাত্রায় এসে পড়ি পদে পদে প্যামিট বেগাতে হয়—পথে দণ্ডযাত্রীর অন্ত নেই—অতএব আমার সঙ্গে পত্রযাত্রার চালাতে যে চায় তাকে স্ত্রীতার উপদেশ খুব ভালো করে হৃদয় করতে হবে। এ সম্বন্ধে বহু তোমার বাবার কড়নুর উরতি হয়েছে জানিনে, কিন্তু উপদেশ বিতে পায়বেন। তাঁর কাছ থেকে শত্রুগাণ্ডেয় ভাঙটা আদায় করে নিয়ো। যে স্বখটুকুর লগ্ন ডাক-পিণ্ডের তুলিটার পরে নির্ভর করতে হয় তার আশা-বন্ধন থেকে মনকে মুক্তিমান কোরো।

তোমার বাবার অস্থবের কথা শুনে উত্তর হলুম। সেবে উঠতে কেন যেহি না করেন তাঁর পরে আমার এই অস্থবোহ। ইতি ২৮ মাঘ ১৩৩৪

গুডাম্বায়া
ঐক্যবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

কলকাতায় এসেছি। কিন্তু শরীরটা রাস্তা—একে নিয়ে টানাটানি করা বড় কঠিন হয়েছে। ভাঙার বশে কিছু কোরো না—চূপ করে থাকো—আর সকলেই বলছে, কথা কও, বহুলা করো, প্রবণ লেখো, সভাপতি হও—কাজ করো, করতে করতে রাস্তার বাঁকখানে মুখ খুঁড়ে পড়ে হঠাৎ নরো। রাত্রি ছিলুম যদি কালের মতো কাজ হত। বত রাত্তর বাজে কাজের আবর্জনা চাপা পড়ে নিশাচ বন্ধ হয়ে মরার

মতো ছুটি আর কিছুই নেই*। ক্রসের উপর পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেরেছিল বিস্তৃত ঠুকে, আমাদের মাঝে আলগিন ঠুকে ঠুকে। কোনো একদিন হু হু যদি থাকি এক সময় যদি পাই তবে তোমাকে গিরে দেখে আসব। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহু

ফিরে এসেছি। বেলগাড়ির নাক খেয়ে আমার প্রাণপুরুষ উদ্ভাস্ত হয়ে উঠেছে। তাই শয়ান অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছি—আমার উত্থান একাধিক তিথি করে পড়বে নিশ্চিত জানিনে। চলৎশক্তি যখন অবাধ হবে তখন তোমাদের ওখানে যাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব। আপাতত কল্পনাতৃপ্তি ছাড়া আমার আর কোনো মনোবৃত্তি বা সৌন্দর্য্য ভ্রমণপটু অবস্থায় নেই। ৭ বৈশাখ ১৩৩৪

ভট্টাকারী

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহু

একটু ভালো আছি— সেই পরিমাণে ছোট চিঠি লিখব।

কথা আছে কলকাতার ফিরে গিরে নীলরতন বাবুর হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করব। ফিরতে লেন-যাত্রা ইচ্ছে নেই। কিন্তু চিকিৎসককে ঠাকি দিতে গেলে বদরাজ পাছে অটোহাস্ত করেন এই ভয়ে বা ওটাটাই বির করছি। আগামী হপ্পায় কোনো এক সময়ে পৌঁছব।* যদি গলিতে জল পাড়ায় তাহলে কী করব সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করি? ১ আশ্বিন ১৩৩৪

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহু .

তুমি স্ফোতিবিস্ত। আলোচনা করতে দেখে গেছ শুনে ভীত হয়ে পড়েছি। নাড়িনকড়ের কথা বা আমার নিজের কাছেও অগোচর তাই যদি তোমার কাছে ঠাস হয়ে যায় তাহলে হৃদয় লক্ষ্য পেতে হবে— নকড়ের সাক্ষ্যের উপরে আমার শরকা হ্রস্ত প্রামাণ্য হবে না।

একজন স্ফোতিবী একবার কড়া কড়া কথা শুনিবে দিয়েছিল, বলেছিল দেবদ্বিজে আমার ভক্তিমান্য নেই, এমন কি পোকডেও নেই। শেষ নালিশটা শুনে মনে বড়ো মানি হল, তেঁটা করলুম তখনই সেই

জ্যোতিষকে ভক্তি করতে। তার মুখ দেখে পেরে উঠসুম না। শরীরটা গাঁয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি। তাতেই রুই হয়ে নাশে মাঝে ও আমাকে দ্রব করবার চেষ্টা করে—আমি কিন্তু হার মানবার পাত্র নই, ওর আপত্তির উপর দিয়েই আমার কাজের বোঝাইকরা রথ চালিয়ে দিই। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"

Santiniketan

Bengal.

কল্যাণীয়ায়

আমার খবর জানতে চাও কিন্তু যে কোণে বাস করি এখানে পবর ঘটে না,— খবরহীন দিনের দায়খানে রবি বিরামমান।

তুমি একথা এখানে আমাকে একটা প্রকাণ্ড বেতের চৌকির উপর লক্ষ্যমান পড়ে থাকতে দেখেছিলে। সম্প্রতি সেই ছবিয় কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি না জিজ্ঞাসা করেছ। ঘটেছে। কারণ সংসারে যেমন চলাচলঃ চলচিত্তঃ তেমনি চলমানমানঃ। সে ঘরে আমি নেই—তারি অনতিদূরে দুটি ছোট ঘর আশ্রয় করে থাকি—তাতে আমি ছাড়া বড় পরিমাণের কোনো পদার্থ নেই—দুই একটা আসন আছে, কিন্তু বৈধব্যে তারা আমার প্রতিস্পর্কী নয়। এখানে মানসা আছে এবং বাহির ব'লে বিরাট পদার্থটি অব্যাহতভাবেই আমার নৃষ্টির সামনে বিস্তার। ওইটাই আমার প্রকাণ্ড কেন্দ্রা, আমার মন ওরই উপর নিষেকে প্রসারিত করে অনেক সময়ই স্তব্ধ হয়ে থাকে। কাঙ্ক্ষণ যে কিছু নেই তা নয় কিন্তু সে সব কাঙ্ক্ষের বিবরণ প্যান্ডাস্টে দেখা চলে চিঠিতে নয়। অতএব ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১৩০১

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"

Santiniketan

Bengal.

কল্যাণীয়ায়

তুমি আমাকে একশো মাইলব্যাপিনী কাছার ডর দেখিয়েছ—সেটা শব্দ করবার আগে চিঠি লিখতে বসেছি। উত্তর হাওয়া গিলে পত্র করে, আমার হরেচে কি, উত্তর দিতে গেলেই আশার পত্র অবর্ণন করে—এতে বোঝা যাচ্ছে আমার আঘাতে নীত বজ্র অবির্ভাব। দক্ষিণ বাতাসের দাক্ষিণ্য আশার কাছে আশা করা বৃথা।

এগারই মাঘ উপলক্ষে কলকাতার বাবার সভাবনামাত্র সেই। আমি এখানে চূপচাপ বসে আমার সেই ছোট ঘরের বাতায়ন থেকে স্বর্ধ্যাত্ত দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটাতে চাই। একবারে রান্নাকীৰ চাল ফুঁড়েমি করতে পারলে খুশি হতুম কিন্তু গ্রহ নারাজ, ছুটি নেলো না। বালাকালে কান্না কান্নি দিয়েছি, এখন তার স্বপ্ন গুণতে হচ্ছে। আমার এই দুঃস্বপ্ন থেকে তোমার বেন শিক। হয়—নইলে সাতগুটি বছর বয়সে পাকা মাখার ঝাটুনির অন্ত থাকবে না। ইতি মাঘ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

[পোস্টমার্ক পাঠিনি: কতন ১৩ জুন ১৯২২]

কল্যাণীয়ার

তোমার উচিত ছিল আইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হওয়া। তুমি পুরোনো বলিল বেঁটে যে সব তর্ক তুলেছ তার জবাব দেওয়া কঠিন। সাহস এই যে অদ্যন্তে বিভাঃ হবে না। গোড়ার বে আভাশমাত্র সেওয়া পেছে* শেষ পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি যদি কিছু নাও দিই তাহলেও বাহিতোর বিচারে চুক্তিভঙ্গের মকদ্দমায় ডায়োবদ দিতে হয় না। আমার পক্ষে এই হচ্ছে মন্ত উন্নয়।

ঘন ঘোর বর্ষা নেনেচে—আকাশ স্ফায়ল, ধরণী স্ফায়ল, সবির আসে। তারি মাকখানটাতে কণে কণে সোনার লেখন লিখছে। ইতি আষাঢ় ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়ার

ছুটো দিন অভ্যন্ত গোলমালের মধ্যে কাটিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু এখানে অনেক কালের স্ননা কান্ন আমার পথ চেয়ে ছিল, এসে পৌঁছবামাত্র চারদিকে ঝেঁকে এসেছে। এই ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠতে কিছুদিন লাগবে। রান্নী-কৃত চিঠি টেবিলের উপর ভিড় করে আছে, তাদের ধনিহীন বাক্য যদি ধনিত হয়ে উঠত তাহলে সেই বহুভাষার শাইকোনো আকাশ বেত পাগল হয়ে।

এল্যা* তার স্বামীকে বলে নিঃস্বল বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। পূর্বে কিছু দিয়েছে, পরেও কিছু দেবে এই তার সঙ্কল্প। সেইদিন তার মূখ থেকে এই কথাই আভাস পেয়েছি।

* বোম্বায়ে উপগ্রামের স্থলার যে অধিনাথ বোম্বালের উজ্জ্ব আছে রান্নাপনে আর তাহার বিবরণ নাই, এই প্রসঙ্গে অক্ষর উক্তরে লিখিত।

* 'বাতানন'-এর কবি উমা ভদ্র, শান্তিনিকেতন বিভাগের এককালে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ও রবীন্দ্রনাথের 'কব্যাঙ্ক' (১৯১৭) সম্পাদক মোহিতজ্ঞ সেনের কন্যা।

হাতের কাগজলো শেষ ক'রে তার পরে হিবার্ট লেখচার লেখবার চেষ্টা করব— কিন্তু আপাতত ব্যস্ততার অন্ত নেই। এখন তোমার লেখা শোধন করবার মরকার হয় না। তোমার রচনার ধারা তার নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নিয়েচে— আমরা তাতে হাত লাগাতে গেলে হয়ত তাকে মূক্ত না করে বাধাগ্রস্ত করা হবে। ইতি ২ জুলাই ১৯২০

সেহাঙ্গদে
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

তোমার খাতা আর এসে পৌঁছল। এর মধ্যে পরিবর্ত অপরিবর্ত দু'রকমেরই কবিতা আছে। বোধ করি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা। তোমার হালের লেখাগুলি নিঃসংশয় চিত্রে প্রকাশ করবার যোগ্য— অন্ততলো তাদেরই সমুদ্রে তীর্থযাত্রা করতে পারে "দীন বধ্য রাহুল্ল সময়ে।" অধিক কিছু সংশোধন করবার আছে বলে মনে করিনে। যদি কিছু করি সেগুলি স্বীকার না করলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। সবগুলি এখনো পড়বার সময় পাইনি। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহ

আমার আশীর্বাদ ইতি ২৮ আশ্বিন ১৩৩৬

সত্যজিৎ
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহার সঙ্গে একটি কার্ড

Kali phos 6x
Kali Mur 6x Calc phos 6x
Nat. Mur 6x

পঞ্চায়ত্নে প্রত্যেক শুদ্ধ দিনে দুইবার।

ভক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীদাস

✓ আমাদের ছোট-আমি জন্মদ্বার শ্রোতে প্রবহমান, স্বপ্নঃপের তরঙ্গে সোলায়িত। আমাদের অন্তরতম নিভ্র-আমির গর্বে তাকে অস্তিত্ব করে কল্পনা করি বলেই আমরা বদ্ধ হই গীড়িত হই বলিন হই। এই কথা আমাদের শাস্ত্রে বলে এবং আমি এই কথা মানি। সংসারে আমাদের আত্মা কেবলি অপমানিত হতে থাকে এই ছোটোটার সঙ্গে যুক্ত থেকে। ✓ আমি দাত্তা করে বেরিয়েছি সেই স্ত্রুটায় থেকে বহু দূরে যেতে— এই কথা আমি সেদিন সকালে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। ✓ সেই দূরত্ব থেকেই আমি তোমাকে অনির্বাক্য করবার অধিকার লাভ করি। ✓ আত্মার মধ্যে যে-সত্যকে পাবার ক্ষেত্রে আমরা এই প্রাৰ্থনাময় উচ্চারণ করি, অসত্যো না সদাশয়, সেই সত্য তোমার জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, এই আমার কামনা। ইতি ১১ নভেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীদাস

যে জিনিষটা বিশেষ অবস্থার অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করি যেটা তর্কের বিষয় নয় সেটাকে যে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারব এমন আশা করি নে। বুঝিয়ে দিলেও সেটা ব্যবহারে আসতে পারবে কি না তাও জানি নে। তবু তুমি প্রেরণ করত বলে কথাটা বলে নিই।

পৃথিবীর একটা গতি আছে সৃষ্টির চারদিকে, সেই গতিতে সে সমস্ত সৌরগ্রহের সঙ্গে এক মহা-প্রদক্ষিণে মিলিত, আর একটা গতি আছে যেটা তার নিজের চারদিকে, সেইটিতে তার নিজেরই দিন-রাত্রির আলো ও অন্ধকারের আবর্তন চলে। তার ছোট গতিটাও তার বড় গতির সঙ্গেই সঙ্গত, তার কক্ষ কেন্দ্রস্থিত মহাভৌম্যাতি কেন্দ্রই আকর্ষণে। বস্তুত সে যেন তার আশ্রয়প্রদক্ষিণকেই উৎসর্গ করতে তার বড় প্রদক্ষিণের কাছে,— তার বড় প্রদক্ষিণেরই অক্ষমালার ৩৬৫ গুটি হচ্ছে তার ছোট আবর্তন।

পৃথিবীর এই দুই গতির সামঞ্জস্য প্রকৃতির সনাতন নিয়মে বাধা হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষকে নিজের ইচ্ছাকৃত সাধনায় বেঁধে নিতে হয়। এখন সে আপন দুঃখহর্ষণ, আলো অন্ধকারের নোলাকেই একান্ত করে জানে তখন তার সেই সর্বাঙ্গ জীবনব্যাপ্য লাভ ক্ষতি উৎকট হয়ে উঠে সত্যের ছন্দকে হারায়। এই ক্ষেত্রেই নিজের দ্ব্যঙ্গীকরণের কেন্দ্রস্থলে নিরন্তর নিজেকেই না দেখে মানুষ যদি পরমভৌম্যাতিকে ঘেঁষতে পায় তাহলে তার আত্মআবর্তন প্রতিদিনই নিজেকে অতিক্রম করে চলাতে পারে। তারি মধ্যে বদ্ধ হয়ে সে নিরর্থক হয় না।

আমাদের ছোটটিই যে আমাদের একমাত্র সত্য এই বিশ্বাস প্রতিদিন জীবনে সঙ্গীহমান হয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এ কঠিন জড় বিশ্বাসকে ক্ষয় করতে হয় প্রতিদিন নিম্নের জ্বর আবেগের থেকে নিঃসেক দূরে এনে বড়কে উপলব্ধির সাধনায়।

দূরে আনার নামে বর্জন করা নয়। আনার মনে বিত্তহীন হ্রের একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শটি না থাকলে আনার পক্ষে সঙ্গীতের কোনো অর্থই থাকে না। কিন্তু সেই আদর্শ যদি কেবল মনেই থাকে তাহলেও তাকে সঙ্গীত বলা চলে না। এই অস্ত্রেই বীণার তারে বখন স্বর নেবে যায় তখন বীণাকে বর্জন করার ঝগড়াই আমরা সঙ্গীতের বিত্তহীন লাভ করবার আশা করিনে—ধ্যানস্থিত হ্রের বিত্তহীন আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে বীণার স্বর বাঁধলে তবেই সঙ্গীত সম্পূর্ণ হতে পারে। সেই আদর্শ স্বর সঙ্গীতের প্রব সত্যে আশ্রিত, তাকে শিক্ষার সাধনায় আমরা অস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখি, কিন্তু তার পরে সেই উপলব্ধিকে গান গাওয়ার দ্বারা প্রকাশ করতে থাকলে তবেই দুইয়ের যোগে সঙ্গীতের স্বষ্টি হ'তে থাকে। অস্ত্রে যদি উপলব্ধি বিত্তহীন না হয় তবে বেহুরের বন্ধনজাল বিভাবিকা হয়ে ওঠে। বীণার তারে বন্ধনকে স্বীকার করি, কিন্তু সেই বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আবির্ভাব হয় বিত্তহীন হ্রের আনন্দে। জীবনে বখন দেখি কর্ণশত, তখন পালিয়ে সেটাকে পরিহার করবার ইচ্ছা বাড়ে বাড়ে নিঃশব্দ হয় তখন অস্ত্রের মধ্যে সেই সত্যকে বিত্তহীন ভাবে উপলব্ধি করতে হয় যার মধ্যে শান্তি যার মধ্যে কল্যাণ। বাইরের বেহুর থেকে অস্ত্রের মধ্যে দূরে আসতে হয়—কিন্তু বাইরের স্বরকেই মেলাবার ক্ষমতা—সেই স্বর বখন মেলে তখন একই কালে দূর ও নিকটের সাদৃশ্য ঘটে। তখন "তদ্বদে তদ্ব্যাক্তিকে চা"... ইতি ১৬ নভেম্বর ১৯২২

সত্যকাজী
ঐদ্ব্যাক্তিবাধ ঠাকুর



পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

“বাংলা ইতিহাসে তিনি [অক্ষয়কুমার] যে স্বাধীনতার দৃশ্য প্রবর্তন করিয়াছেন সেদিক
তিনি বশাধিতো দৃষ্ট হইয়া থাকিবেন।”

—রবীন্দ্রনাথ, ১০০৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশের মনোবীসমাজে সাহিত্য শিল্প ইতিহাস ও বিজ্ঞান-চর্চায় এই একটি ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, “ভারতবর্ষের ধর্মার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে”, “বিশ্বভাষ্য ভারতবর্ষের অমরবাণী উচ্চারণ করিবার সময় উপস্থিত”—“বিপুল নানবর্ণকি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে... এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘূচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সফার করিয়া সেই প্রাণ পুণিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে।”

এই “নবজাতির জয়গংগীত”—এর প্রধান উৎসাহিতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—“আবার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়লোক জন্মিবেন বাহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করিবেন ও এক্ষণে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন”—প্রবন্ধোৎসবের এই কল্পনাকে তিনি সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে যেমন সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বহুসমাঙ্গে যেখানেই প্রতিভার দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছেন সকলকেই “পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে” আহ্বান করিয়াছেন—“বঙ্গের আত্মা প্রত্যাহই পরিচূড়িতর ভাবে ধনিত হইয়া উঠিতেছে—আপনি যে এই আত্মার লক্ষ্য আছেন তাহা আমি কবির চক্রে দেখিতেছি এবং একদিন যে আপনি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গের ললাটে নূতন ঘণাখালা স্থাপন করিতেছেন তাহাও আমি দেখিতে পাইতেছি”, এবং প্রবল উৎসাহে তাঁহাদের কাণে প্রেরণা সফল করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।*

* তুলনায় ভাষার ক্ষমতা যতই দ্রুত এসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা, “বঙ্গিগণিত্ত্ব”, ‘ঐদীপ’, পৃষ্ঠা ১০০৫—

“আধুনিক ভারতবর্ষে বাহারা নামে নামে এই আশা আলোক জালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদি বা আমাদের হৃৎকেন্দ্র নাও হন তবশি আমাদের কবনের অঙ্গ হইয়াতে তাঁহারা এক যথিবাচিত ভবিষ্যতের দিকে আনন্দিক পথ দেখাইয়া দ্রাব্যতয়েন। সত্যতঃ সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের দৃষ্টি বহির্ভূত একদিন যাব হইয়া বাইতে পারে কিন্তু শুধাশি তাঁহারা দৃষ্ট।

“ভারতবর্ষ আশ পৃথিবীর সমাজসূত্রে” তাহাকে আবার সমাজে উন্নীত হইবে। কোন একস্থানে পৃথিবীর সহিত তাহার আদান-প্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও কিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা যুগ। কিন্তু নিজের স্বতন্ত্রতার ক্ষমতার প্রতিভারামে আমরা স্বাধীন আদান লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।

“রাষ্ট্রাধিপতিরসম্বন্ধে ইংলও আমরকাল উৎকণ্ঠস্বাসী জাতিবাক্যক আশ্রমের গোষ্ঠের দ্বার যত খেলিত আরম্ভ করিয়াছেন। সত্য এদিক এবং আফ্রিকা ওয়াশিংটন ভারতবর্ষ এবং তাঁহাদের দৃষ্ট যোগ্যিয়ার দৃষ্ট আছে, কিন্তু আধুনিক লেখকসম ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহিয়া লইয়াছেন।

“অন্ত আশ্রমের স্বীনতার অভাব নাই একথা সত্য কিন্তু উৎকণ্ঠস্বাসী ভারতবর্ষে ফিরকার পৃথিবীর দৃষ্টি করিয়া আসে নাই।...”

এই বহুগোষ্ঠীর পুরোভাগে আচার্য জগদীশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ও (১৮৬৯-১৯৩০) এই গোষ্ঠীর অন্ততম। অক্ষয়কুমারের ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে জয়মনি কি অল্পপণ অবিরল ভাবে ঘোষিত হইয়াছিল তাহার নিবর্ণন এক্ষণে সংকলিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি-প্রকাশিত 'ইতিহাস' গ্রন্থে, এবং তাহার বিপর বিবরণ গ্রন্থিত হইয়াছে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস-সামান্য' পুস্তকে, এখানে তাহার বিস্তৃত পুনরুক্তি বাহ্য।

ইতিহাস-গ্রন্থ ছাড়া, দেশের আর-একটি মঙ্গলকার্যেও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ হইয়াছিল। ইতিহাস-আলোচনা বাতীত নানা বিশেষজ্ঞদের অহুষ্ঠানের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের যোগ ছিল, রেশম-শিল্পের উন্নতিচেষ্টা তাহার অন্ততম। "রেশম-শিল্পের সকল বিষয়েই ইনি অভিজ্ঞ"†— 'পটুভব', 'এতি' সম্বন্ধে তিনি রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'ভারতী'তে (১৯০৫) প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাঙ্গগাহীতে রেশম-শিল্পবিদ্যালয় অক্ষয়কুমারের উদ্বোধনেই পরিচালিত হয়, "ইনি পাচ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।"† রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে তাহার আগ্রহ ও উদ্বোধনের বিশেষ পরিচয় এই চিঠিগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে।

এ সবই যদেই আবেশনের পূর্বকাল কথা। যদেই শিল্পবাণিজ্যপ্রণয়, বৈদ্য শিল্পের পুনরুদ্ধারে উৎসাহ-উত্তর, ও সেসব ক্ষতিবীকারের প্রবৃতি ঠাকুর-পরিবারে দীর্ঘকাল ধরিয়াই বর্তমান ছিল; এই পরালাপকালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইনহে অবিরালিতে বাস করিতেন, পত্নীর উন্নতিকল্পে এই সময়ে তিনি নানাতরপ পরীক্ষা শুরু করেন, 'আশ্বের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকার (৭ পৃষ্ঠা ১৯৮) তাহার কিছু বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অক্ষয়কুমারের উৎসাহের আকর্ষণে রেশমের গুটির চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কিছু ক্ষতি বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার আভাসও এই রচনায় আছে; ইহাদের উৎসাহে রেশমের কোটপালনে জগদীশচন্দ্রও ব্যস্ত হইয়াছিলেন।†† অক্ষয়কুমারের পরিচালিত শিল্প-বিদ্যালয়কেও তিনি বহুসাধ্য উৎসাহিত করিতেন— অক্ষয়কুমারের চিঠিতে যে কাপড় পাঠানোর কথা আছে তাহা তিনি নিজেও ব্যবহার করিতেন, বহুজনকেও উপহার দিতা ব্যবহারে উৎসাহিত করিতেন— ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে একখানি চিঠিতে (৩০ চৈত্র, ১৯০৫) তিনি লিখিতেছেন—

মহারাজার জন্ত সর্পাক্ষের হস্তে একটি সাগা রেপবেলখান পাঠাইলাম।

আশ্রমের জন্তও রাজসাহী শিল্পবিদ্যালয় হইতে মটকার খান অন্তত হইয়া আসিয়াছে উপহার পাঠাইব—ইহার অন্তত এক হুট সাহা পরিচা আবার সহিত শিলাইনহে যখন লক্ষ্য করিত আসিয়েন বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।

শিল্পবিদ্যালয়কে উৎসাহ বিস্তার জন্য সেখান হইতে আমি সর্পাহই কেন্দ্রের বঙ্গোঁসি ক্রয় করিয়া থাকি—সোমের দ্বা দোক ও সার্ব্য আর হস্তগত তাহার শিল্প ও অধিক পরিচালনা কাপড় গোলাইতে পারে না—কতকটা আবার এই সকল ক্রয় উপহার কেন্দ্র আবার উপহার নহে তাহা ব্যবহার উপহার। অন্ততঃ আশা করি আশ্রমের তৃষ্ণা বহিরা ইহাকে অব্যাহত করিয়ে না।**

অক্ষয়কুমারের লিখিত ১-সংখ্যাক্রিত চিঠিখানিতে, তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যসমাজের একটি বিতর্কের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বর্তমান কালে সাহিত্যপরিবারের...পৃথিবীক্ষেত্রে'র বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কাব্যে

† অ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'কলকাতার সেক্স' পুস্তকে অক্ষয়কুমার ও বৈদ্যের সম্বন্ধে প্রস্তাব

†† এ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র, ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯, এখানে, জ্যোতি ১৩০৩

** এ রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ

উপন্যাসে ইতিহাসের বিকার ঘটিলে, বিশেষতঃ কোনো চরিত্রের অসংগত লাবণ্য হইলে, অক্ষরকুমার তীব্রভাৱে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন— বন্ধিন-নবীনের রচনাও অব্যাহতি লাভ করে নাই। ‘পলাশির যুদ্ধ (কাব্য)’ গ্রন্থে (১৮৮২) নবীনচন্দ্র কর্তৃক ‘কাল্পনিক সিরাদ-কলঙ্ক’ প্রচারিত হইয়াছে, এই অভিযোগ অক্ষরকুমার করেন ভারতী পত্রের মাধ্যমে ১৩০৩ সংখ্যায়, তাহার সুবিখ্যাত ‘সিরাদকল্যাণ’ গ্রন্থের ‘পলাশির যুদ্ধ’ অধ্যায়ে। পরবৎসর (১৩০৪) ভারতী পত্রে মীরকাশিম সম্বন্ধে অক্ষরকুমারের আলোচনা পারাবাহিক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে; বৈশাখ সংখ্যায় উপকল্পনিকাতেই তিনি বন্ধিনচন্দ্রকে আক্রমণ করেন, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাশিম ও তঁাকি গাঁৱ চরিত্র অস্তায় ও অনৈতিহাসিক ভাবে অশ্রদ্ধেয় করিয়া অস্মিত করিবার অভিযোগে; অক্ষরকুমারের পক্ষে এই রচনার প্রসঙ্গই উল্লিখিত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় পূর্ণিমা পত্রের ১৩০২ আষাঢ় সংখ্যায়, ‘বন্ধিনচন্দ্র ও মূল্যবান সম্পদ’ প্রবন্ধে। ভারতী-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে ‘সান্নিধ্য সাহিত্য’-সমালোচনা বিভাগে পূর্ণিমা এই প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া যে সম্বন্ধ করেন নীচে তাহা স্মৃতিত হইল—

মীরকাশিম লেখকের প্রতি, মতবিরোধ নাই, অমঙ্গল প্রকাশের অধিকার তাহারও নাই। বন্ধিনবাবুর প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আবার সমালোচনা প্রবন্ধলেখকের অসঙ্গত নৃত্যত পীকার করিতে পারি না, তাই বলিয়া মীরকাশিম লেখক হৃদয় অক্ষরকুমারের মত মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন আবার উচিত বোধ করি না। কায় কবচাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যইতিহাসের সম্মান-ভাজন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বর্তমান এসেছে অত্ৰ হিন্দুর লক্ষ্যবাসুর সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কালাবৃত্তে ভুলারের স্নেহ গর গড়িছিল হিন্দুর পক্ষে তাহার অনেক বিপর্যয় দেখা যায়, তাই বলিয়া কোন ভুলবোধ হিন্দুর পক্ষে করিলেও কাশিমাবের বিকট তাহার বেখান। তত্ত্ব থাকে না। বন্ধিনবাবুর উপন্যাস ইতিহাস যদি বা বিপর্যয় হইয়া থাকে তাহাতে বন্ধিনবাবু কোন দরদা হয় নাই। উপন্যাসের বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও বা, আর ব্যস্ততা মিত্রা অত্র হইল উঠে নাই বলিয়া দ্বন্দ্ব করাও তাই। উপকল্পের কথা ইকা থাকিতে পারে কিন্তু তদুৎপত্ত মত নহে এবং মত অত্র নহে, একপাক্ষী ঘোড়ার বরিতা গাঁৱা ভবে বস্ত-বিচার করা উচিত। অক্ষরকুমার নিজস্বা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিয়ে না তবে ইতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংগ্রহে উপন্যাস একটা বিশেষ রস দকার করে, ইতিহাসের সেই রস হুঁকর প্রতি উপন্যাসিকের লোভ, তাহার মস্তার প্রতি তাহার কোন ব্যক্তি নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ পদ্ধত্বক্ এতঃ ব্যাবহৃত্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অথও ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যক্তনের মধ্যে আশ্রয় লিয়ে ধনে হতুর্ পরের সম্মান করেন। মূল্য আশ্রয় রাখিা যিনি ব্যক্তনে ধার বিতে পারেন তিনি দিন, এবং যিনি ধীষ্টা ধীষ্টা একাকার করিয়া ধার বিতা থাকেন তাহার সঙ্গেও আমার কোন দ্বন্দ্ব নাই, কারণ ধারই এখানে লক্ষ্য, মূল্য উপলব্ধি মাত্র। কিন্তু ইতিহাস অক্ষরকুমার এতই অস্বাভাবিক সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কখনো লেশমাত্র উপায় তাহার অস্বাভাবিক, সিরাদকল্যাণ গ্রন্থে মীরকাশিম তাগ টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চকলা কাব্য-সরবতী গুলুচন্দ্র কর্ত্তা বিভিন্ন ইচ্ছাধারা তাহার অঙ্গণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, এহরী অক্ষরকুমার সেটা স্বেচ্ছাকৃততই সহ্য করিতে পারেন না— কিন্তু মহাশয়ীরা ধার লক্ষ্যে আসে। উদ্যান এহরীরাই মিত্রার ধাবু, কিন্তু এক সবার হুঁকর হইতে আর এক সবার পুন্ডার লগ্ন হোঁক্ বা এগাধনের লগ্ন হোঁক্ যদি একটা ভাগি কুল পুরে জুড়িয়া হইয়া যায় ততু তিনি তাহার কৈশিকতের দাবী করিয়া এত গোলাবাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু ক্ষীণুটি হয়। বিশেষ যত্নে যদি শ্রী শবনে না হয় তবে কাব্যের প্রতি গোলাবাল করা যায় সৌন্দর্য হানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।

এই সম্বন্ধে সম্বন্ধে, অক্ষরকুমার রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে, “কবিকল্পনার সীমা কোথায় তাহার সীমান্সা করিতে গিয়া আপনি তাহাকে স্বতন্ত্র এগর দিয়াছেন তাহাতে আমার লানিশের সুবিচার হয় নাই।” রবীন্দ্রনাথ বিপর্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন আখনি ১৩০৬ সংখ্যা ভারতী পত্রে,

“ঐতিহাসিক উপভাষা” প্রবন্ধে; রচনাটি তাঁহার ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে সুস্থিত আছে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন—

আমাদের অলঙ্কারে বহুতুল্যরসের ব্যবহার আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্জন্যের মিশ্রণে আজ অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার ব্যবহারের চোরা হয় নাই।...সেই সবগুলি অনির্জন্য রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া বাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের আশঙ্কন।।...

সেকুণ্ডিরারের আটনি এক ক্রিয়োগ্রাফী নাটকের যে দুই দৃশ্যটি তাহা রসায়ের প্রাচ্যাত্মিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অদ্ভুত অজ্ঞাত রহস্যের সৌক্য কুহকিনী নারীরাগমায়ে আপন ইহকাল পরকাল বিসর্জন করিয়াছে; এইরূপ ছোটখাট বহুর ও মহাবাহুর পোচনীর ভয়াবশেষে রসায়ের পথ পরীক্ষণ।

আমাদের হস্তাক্ষর নন্দারীর বিদ্যাবৃত্তের প্রায়নীমাকে কবি একটি হৃদয়গত ঐতিহাসিক রসকুণ্ডির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরতি করিয়া তুলিয়াছেন। কবিবিরের পঙ্কতে স্ট্রাইবিমের যেবাড়র, প্রেমবশের সঙ্গে এককরনে বহু প্রাপের প্রত্যেক আকর্ষণের সমন্বয়জনক। ক্রিয়োগ্রাফীর বিলাসকর বর্ণনা বাস্তবিক, ঘুরে সমুদ্রভীর হইতে তৈরুর সাংবাদিকগণি তাহার সঙ্গে একত্রে মিলিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এক কণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিলিত করিতেই তাহা এখন একটি চিত্তবিচারজনক দৃশ্য ও কবিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই ঐতিহাসিক রসে পণ্ডিত যদি সেকুণ্ডিরারের এই নাটকের উপর প্রবেশের তীক্ষ্ণ আন্দোলন বিবেচনা করেন তবে সম্ভবতঃ ইহাতে অনেক কালবিপর্যয় (anachronism) অনেক ঐতিহাসিক রস বাহির হইতে পারে। কিন্তু সেকুণ্ডিরার পাঠকের কবে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন, আর বিকৃত ঐতিহাসিক ধারাও যে একটি অনির্জন্যের ঐতিহাসিক রসের অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক নৃতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।...

অর্থাৎ সেক্ষেপ ঐতিহাসিক রসও রাসিয়াই করুন আর খণ্ড করিয়াই করুন সেই ঐতিহাসিক রসের অবলম্বন নকল হইসেই হয়। তাই বলিয়া কি স্বাভাবিক পামর এবং স্বাভাবিক সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপ্রাণ নাই? অপ্রাণ আছে। কিন্তু তাহা ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে অপ্রাণ নহে কারণেই বিরুদ্ধে অপ্রাণ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া ধাঁড় করা হইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকের বেন একেবারে বাধার বাড়ি পড়ে। সেই একটা ধন্যভায়েই কাব্য একেবারে কাঁচ হইয়া ছুটিয়া যায়।...

অক্ষরবৃত্তার বিঘটিত পুনঃপ্রাপন করেন ১০০৮ ভাস্র সংখ্যা ‘প্রদীপ’ পত্রে, রবীন্দ্রনাথের ‘কব্য’-কাব্যের (১০০৬) আলোচনায়। এই গ্রন্থের দীর্ঘপ্রবন্ধে প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

...কিন্তু যিনি বঙ্গসাহিত্য বহু পঞ্চ বাহিত হইয়া অকসমে কোকিল-কুল, ত্রয়-ভট্ট ও মানভবনের তরল তরঙ্গের তরঙ্গসেই সন্নিবিষ্ট বহু হইয়া উঠিতছিল, তখন সৌম্য দৃষ্টের অধ্বরেণে কল্পনার উচ্ছ্বাসে নন্দারীতে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রত্যাহা বসনের ঐতিহাস হইতে আদর্শ রূপে করিয়া তাহাকে অসম কমেয়ে কবিতা বিকৃত করিলেও যে সৌম্য দৃষ্টের বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গ-সাহিত্য-সেবকগণের সমুখে এক অভিনব চোরা বার উপস্থাপিত করিয়া বিদ্যাজন।

ঐতিহাসিক চিত্রচরন কবিকল্পনা যে সর্বথা নিরত হইতে পারে না, তাহাও একবার কর্তব্যানুযায়ী প্রত্যাহা নির্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় যেন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন:—“সুদের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে, আশা করি সেই পরিবর্তনের দ্বারা সাহিত্যবীতিবিধানকে বর্তমান পণ্য হইবে না।” আমি কবিকল্পনক ঐতিহাসিক ইহাও দ্বন্দ্ব তাড়না করি নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক আদর্শ অধুনা তাহাও দ্বন্দ্ব সন্দেহকেই আশ্রয়ে অধ্বরেণে করিয়াছিল। বাহ্য যে চরিত্র তাহার মূর্ত্তি অধুনা তাহাও দ্বন্দ্ব সন্দেহ ও সহজে বোধগম্য কথার দ্বন্দ্ব অন্যত্র বিরুদ্ধ কিছু কিছু পরিবর্তন করিলে ঐতিহাসিক রস নাই— সাহিত্যের বিলম্ব লাভ। কবি বর্তমান পুস্তকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূর্ত্তি কিছুমাত্র পরিবর্তন করেন নাই; দ্বন্দ্বতা: অন্যত্র বিরুদ্ধে বাধ্য কিছু ইতর বিদ্যে করিয়াছেন, তত্ব কহে তাহাকে কতই দ্বন্দ্ব করিতে পারিলেন না।...

“ঐতিহাসিক চিত্র”-কাগজ।

গোড়ানার, রায়সাহী।

[১০০৫]

শ্রীতিনমস্কার নিবেদনমতঃ—

আবশ্যের ভারতী পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের ইতিহাসের সমালোচনার^১ এবং প্রসঙ্গ কথা^২ এবার ভারতীসম্পাদক ঐতিহাসিক তথ্যলোচনার যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বাংলা সাময়িকপত্রের গৌরব বর্ধিত হইয়াছে; এমন স্মৃতিস্মাগ্রহৃত প্রবন্ধ বাংলা সাময়িকপত্রে সর্বত্র প্রকটিত হইলে আমাদের সাময়িক সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের আস্থা বৃদ্ধি হইত। আপনি ঐতিহাসিক চিত্রের “সূচনা” লিপিব্যবস্থাপাত্র বলিয়াই সে ভার আপনাকে দিয়াছি, এমন আর বলিতে পারিবেন না যে আমি সে গান গাহিতে শিবি নাই। আপনার প্রবন্ধ না পাইলে কার্য্যারম্ভ হইবে না, সুতরাং একটু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব সচর হইবেন। ছবি কেমনাই ও কাগজ ক্রয়ের ক্রম প্রকাশক কলিকাতার গিয়াছেন; তিনি প্রত্যাগত হইলেই কার্য্যারম্ভ করিব।

এবারকার সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা^৩ উপলক্ষে আমার কথা কিছু বেশী বলিয়া ফেলিয়াছেন, উহা আপনার বেহোজুত ভিন্ন আমার ভাষাপ্রাপ্য প্রশংসা বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। কবিকল্পনার গীতা কোথায় তাহার সীমাংসা করিতে গিয়া আপনি তাহাকে যতদূর প্রসার দিয়াছেন তাহাতে আমার মালিশের স্ববিচার হয় নাই। ইতিহাসে বাহার যে স্বাধ উপলক্ষেও তাহার সেই স্বাধ রক্ষিতে হইবে, যে ইতিহাসে মহাবীর উপলক্ষে তাহাকে কাপুরুষ সাজাইতে পারিবে না,— ইহাই আমার মূল বক্তব্য। উপলক্ষে কল্পনা মানান্দপ ঘটনা সৃষ্টি করুক, তাহাতে কেহ বাধা দিতে চাহে না কিন্তু কাল্পনিক ঘটনাসৃষ্টির ক্ষমতা থাকিলেও মূল চরিত্র বিকৃত করিয়া দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞানগত মহাশয় এদেশের আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তি; তাহার সম্বন্ধে সহস্র কাল্পনিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া কবিকল্পনা তাহার ঐতিহাসিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করিতে চাহে ত করুক, কিন্তু কবিকল্পনা যদি তাহাকে কাল্পনিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া পূর্ব নিষ্ঠুর নীচমনা ও দুর্বল বলিয়া লোকসমাজে তাহাকে চিত্রিত করিয়া কেলে তবে কি তাহাকে সংযত করা আবশ্যক হইবে না? দুর্ভাগ্যক্রমে নীরকশিমের উপক্রমবিকাশ আমার পূর্বলিপিভাষ্যের সহিত শ্রীমতী সরলাদেবীর সংকলিত

১ ‘আধুনিক সাহিত্য’ ও ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে সংকলিত।

২ এই প্রসঙ্গ কথাটির প্রধান রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড (পৃ ৪৪৪-৪২) সংকলিত হইয়াছে। পরাগ, অক্ষরচূষার মৈত্রেয় এর্জেন্ট ‘সিরাঙ্কবাণ’ গ্রন্থে লক্ষ্যে “কোন আন্দোলিতগণ পত্র” যে “কোন একজন করিয়াছেন” তাহার আলোচনা। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ১০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীতে উক্ত গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড ‘আধুনিক সাহিত্য’ অংশে, ও ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে সংকলিত।

৩ অক্ষরচূষার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র পত্রের প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৯২২) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই “সূচনা” ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ১০০৪ তারিখ সংখ্যা ভারতী পত্রও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক চিত্র লক্ষ্যে আলোচনা করেন—ঐষ্টক পঞ্চমীকা ১১।

৪ এই পত্রাবলীর ভূমিকায় পুনঃস্মৃতি ও আলোচিত।

বহু কথা সংগ্রহ হইয়া উহাকে নিত্য অসংকট লেখনীর দৃষ্টান্তরূপ করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং আমাকে পুণিমা-লেখকের লগুতাঘাত পর্যন্ত সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু মূল বিষয়টির প্রতি আপনারা দৃষ্টিপাত না করিয়াই মপথলের হাকিমের মত নথী না দেখিয়াই বিচার করিতেছেন। আপনি কি ইংরাজী ও পারস্য ইতিহাসে মীরকাশিম ও তকি খান চিত্র পড়িয়া তাহার সহিত চন্দ্রশেখরের ছবি মিলাইয়া কোন কথা বলিয়াছেন? অবশ্যই তাহা করেন নাই—কলনের মুখে বাহা আশিয়াছে লিখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঐটুকুই আমার লালিশের প্রধান অজুহাত। সেহন, একে আনাদের বেশে লোকশিক্ষার উপায়ান অন্ন, ইতিহাস হইতে আত্মভাগ অবশেষের শিখাইবার সম্ভাবনা কম তাহার উপর যে দুই একটি চরিত্রে সে সকল গুণ বিকশিত হইয়াছিল কল্পনাবলে তাহা বিমর্ষ করিলে পাড়াইবার স্থান থাকে না।

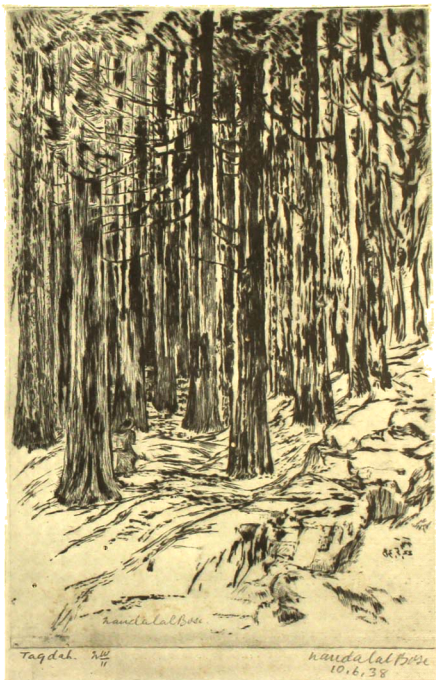
যাহা হ্রস্ব তাহার আদর কে না করিবে? কিন্তু সৌন্দর্য্যস্বপ্নের স্রুত বাস্তবকে নষ্ট করা অগ্রাঘ। ইতিহাসের পাখ্যায় হইতে রসাহরণ করিয়া উপভোগ লিখিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে, কিন্তু তাহার রস পাখ্যায়ের ভ্রাম্য নথুর না করিয়া তিরু করা অগ্রাঘ, তাহাতে রসভঙ্গ হয়, সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া কুসংস্কৃত প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আপনি ও অনেক প্রখ্যাত বীর সম্ভানকে লইয়া কল্পনাবলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ধরুন, আপনার চিত্রাঙ্কনা। বাহানী তাহার দ্ব্যধাচিত আদর করে নাই বলিয়া এমন ভাবিবেন না যে তাহা অস্বন্দর—উহা আপনার একধািন অত্যুত্তম চিত্র। উহাতে অর্জুনকে আপনি কল্পনাবলে যত সাজ সজ্জা সাজাইয়া তুলিয়াছেন তৎসংগেও অর্জুনকে অর্জুন বলিয়াই চিনিয়া লওয়া যায়, বরং কল্পনা তাহাতে আনাদের সহায় হইয়াছে, অর্জুনকে বেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আপনি যদি তাহা না করিয়া গাভীবর্য্যকে কাপুরুষ সাজাইতেন সে কল্পনার কেহ প্রংসা করিত না, বলিত—এমন কল্পনাবিশ্বাসে আপনার অধিকার নাই। মুসলমানের প্রাণ আছে, তাই তাহার। বহুমানকে রত্নভূমিতে আনিতে দেখ না; আনাদের প্রাণ নাই তাই আনরা বৃদ্ধ চৈতন্য রাম লক্ষণ সকলকেই রত্নভূমিতে বথেক প্রদর্শিত হইতে দিয়া তাহাদিগকে কত না নানান্যবদ্য করিয়াছি। যে সকল ঐতিহাসিক ঠিকির লোকশিক্ষাবিধানের যবনে ঐচ্ছাসানিক ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত, তাহাদিগকে বাট করিয়া বিকৃত করিয়া, নিরন্তর মুখরোচক উপভোগ বা নয়নবিনোদন অভিনয়বি বাহা আনরা ক্রমশঃ মাটি করিয়া ফেলিতেছি। লোকে উপভোগ ও রত্নভূমির সাহায্যে তাহাদের যে চিত্র স্মৃতিপটে মুচুমুত্রিত করিতেছে তাহা সহস্র দূর হইবার নহে। কবিকল্পনা যদি সে সকল চরিত্র অবিকৃত রাখিয়া প্রবাহিত হয় তবেই ভাল, নচেৎ কবিকল্পনা অনিষ্টাধান করে, হ্রস্বরকে কুসংস্কৃত সাজাইয়া সৌন্দর্য্যবিকাশের পরিবর্তে কুচরিত্র প্রদর্শ দেয়।

আমি আর লালিশ করিয়া কি করিব? বেচার। বহু বৎসর মরিয়া গিয়াছে, ইংরেজরা তাহার বীরকীর্ত্তি সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, আবার স্বদেশের কবিরুল যদি তাহাকে কল্পনাবলে পল্লিপ্ত করিয়াই স্থখী হন তবে আমি আর কি বলিব? আর বলিলেই বা আবার কথা কে শুনিবে? যখন এদেশের প্রাণ প্রতীতি হইবে তখন লোকে আপনা হইতেই তকি খান মত বীরের মস্তকে বায়ানবান পদাঘাত খেঁচিয়া করতালি প্রদান করিবে না, রশাল পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিবে— ইত্যাদ্য

ডবরী

ঈশ্বরদাস মৈত্র



ভাগদা'র পাইন-বন : ঐন্দ্রলাল বসু

“ঐতিহাসিক চিত্র”-কাণ্ডাংশ।

ঘোড়াঘাট, রামলাহী

[১০০৪]

শ্রীতিনম্বদারনিবেদনঃ—

আপনার উপদেশমত ত্রিপুরায় পত্র লিখিলাম। নাটোর* ঈশ্বরী টাকা পাঠাইবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এখন সংখ্যা বাহির না হইলে অপরিচিতের দ্বারস্থ হইতে ভয় হয়; এত লোকে এত দূর দূরীয়া চীৎসা সাধিয়া বেড়াইতেছে যে, লোকে সহসা আবাদিগকে ও খন্ডিয়া মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। ইহার সঙ্গে আপনার নামের সংযোগ আছে, আপনাকে আর নাস্তানাবুদ করিতে পারি না। এখন ডিকার কুটিটা কাছেই তুলিয়া রাখা ভাল মনে করিতেছি।

আমি ঠাকুরবাংশকে টানিব না, সে বিষয়ে—মা ভৈঃ। স্ত্রীর মহাপ্রাণ মতীজ্ঞমোহন একখানি “ঠাকুর বাংশাবলী” উপহার দিয়াছেন সেই কথাই লিখিয়াছিলাম। আমার বর্তমান লক্ষ্যস্বামী রাধবাংশ ও পুরাতন জমিদারবাংশ।

আপনি এবারকার ভারতীতে ঐতিহাসিক নামাদির বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ কথায় কিছু লিখেন ত আমার মতটি সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া রাখি।

গ্রীক, চীন, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশীয় পরিব্রাজকেরা আমাদের বৌদ্ধমূর্ধের কোন কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থেও স্বেচ্ছা রামণনের উল্লেখ আছে। বিদেশের লোকে তাঁহাদের য য ভাষায় আমাদের নামাদি বিকৃত করিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের নামাদি বিকৃত করিয়া লইয়াছি। ফল এই হইয়াছে যে এখন আর মাথা কুটিয়াও মিল করা সম্ভবিত্বে না। দুই একটা উদাহরণ লউন :—

মুদ্রারাক্ষস নামক কবি বিশাখদত্ত রচিত সংস্কৃত নাটকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক পাঁচটি প্রধান স্বেচ্ছ-মাত্রেয় নাম চিত্রবর্ণা, সিংহনাথ, সিদ্ধুসেন, পুষ্কর ও মেধাক বলিয়া লিখিত হইয়াছে,—এখন আর কিছুতেই তাহাদিগকে চিনিবার উপায় হইতেছে না। বেগাখিনিদি লিখিয়াছেন গঙ্গা ও এরবন্দ নদীর সংযোগস্থলে পালিবোহা নগরে সম্রাটকোজ্জুন নামে রাজার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। স্ত্রীর উইলিয়ম ড্যান্স এলিয়টিক রিসার্চের দ্বিতীয় খণ্ডে বহু ভরকি প্রতীপন্ন করিয়াছেন যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহুর সংযোগস্থলে পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্ত নামক রাজার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল তাহাই বেগাখিনিদিগের বক্তব্য। আমাদের গোড়নবৃত্তকে ব্রহ্মদেশীয় লোকে গঙ্গামা Gandama বলিয়া নামকরণ করিয়াছে চীনেরা আরও কত অদ্বুত শব্দ সংযোগ করিয়া আবাদিগকে গোলে কেলিয়াছে। গ্রীকভাষার বর্ণমালায় চন্দ্রগুপ্ত, পাটলিপুত্র ও হিরণ্যবাহু লিখা অসম্ভব ছিলনা; তাহা লিখিলে কোনই গোল হইত না। ইহা হইতে ঠেকিয়া লিখিয়া আমি এই বলিতে চাই যে বিদেশের নাম তাহাদের উচ্চারণ কৌশলে ভেদগ উচ্চারিত হয় ঠিক সেই শব্দাদৃষ্ট অবিকৃত রাখিয়া আমাদের অক্ষরে বর্ণবিভাগ করা উচিত।

সির্গারে ও উৎকলে যে অশোকস্তম্ভাদি অবিভক্ত হইয়াছে তাহাতে “আন্টিওকো যোনরাজ” শব্দ উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা “Antiochus যবনরাজ”। নানা ক্ষুদ্র-নদীশ Nana Feruviz হইয়াছেন,

উহাকে এখন নানা ফরনভিস্ করিলে গোল বাধিবে। W কে ব করিয়া William বুলিদের হইলে কালে বিস্তর গোলযোগ হইবার আশঙ্কা। আমি সেই অগ্রই বলিতে চাই তাহার নাম যে দেশে বেত্রপ উচ্চারিত হয় সেই উচ্চারণ দ্বারা বাংলায় উত্তরাইতে পারা যায় সেইভাবে তাহার নামের বর্ণবিজ্ঞান করা উচিত। আমার মত সংক্ষেপে লিখিলাম, আপনি বেত্রপ ভাল মনে করেন লিখিবেন।

যখন স্থাপনাত পাঠাইবেন, ভারতীর লক্ষ বিব্রত, তাহার উপর আমি হৃদয় তাগিদ পাঠাইয়া আরও বিব্রত করিয়াছি। প্রকাশক এখনও কলিকাতায় আছেন, সুতরাং ভারতীর কাজ সাধিয়া আমার যখন বিলেও চলিবে। ইতি

ডবলীর

ঐতিহাসিক ছিন্ন মৈত্রেয়

"ঐতিহাসিক ছিন্ন" কাঞ্চালয়

বোম্বাই, হাফলাই।

২ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ ইঃ

[২৫ তার ১৯০৮]

ঐতিহাসিক নিবেদনমেষঃ

ঐতিহাসিক চিত্র-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি শেষ করিয়া পত্র লিখিব বলিয়া কয়েকদিন কোন উত্তর দেই নাই— ছাপার কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ছবি পোদাই হইয়া আসে নাই ১০ কর্ম। পরমিত 'কাপি' ঠিক হইয়াছে— অবশিষ্ট কাপিও পাই নাই; সমুখে পূজাবকাশ—সুতরাং ঠিক পূজার পর ভিন্ন আগে কাগজ বাহির হইল না। হৈনাসিক কাগজ সুতরাং ভবিষ্যতেও তাহাতে পূজার বন্ধন সময় কোন সংখ্যা বাহির করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই করা কর্তব্য; তৎকর্তৃ অগ্রহাষণে বৎসরান্ত করিলে মন্য হইবে না; আগামী বর্ষে তাহাই করা যাইবে এবার প্রথম সংখ্যা কার্তিক বাহির হইবে এই বন্দোবস্তে ছাপা চলিতেছে নমুন। পাঠাইলাম দেখিবেন।

আমি ইতিমধ্যেই প্রদর্শনাদানের গুরুত্ব কিছু কিছু অসুভব করিতেছি—গুলিশের ইনস্পেক্টার সর্বদা তব লইতেছেন—কলিকাতায় দুই একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকও ইহার উদ্দেশ্য উঠা করিয়া বুঝাইবার লক্ষ্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনাকে আর গোপন করিয়া কি করিব, প্রবীণ ঐতিহাসিক ... বৈঠকে নাকি কথা উঠিয়াছে যে, ঠাকুরবংশের কীর্তিযোষণার উদ্দেশ্যেই তাহাদের চেষ্টায় আমার নামনাম সম্পাদকতায় এই নতুন কাগজ বাহির হইতেছে—আমার "সম্পাদকের নিবেদন" ছাপা শেষ হইয়া যায় নাই, সুতরাং লোকে বাহাতে ভুল না বোঝেন তাহার কৈকিয়ৎ দিয়া দিব।* আমাদের দেশের অবস্থা এইরূপ ইহা বলিয়া আর দুঃখ করিয়া কি করিব ?

* "ধারার আধুনিক রাজা বা সন্ন্যাস, তাহাদের কথা নানা কারণে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্থান পাইবে। সে তার ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখকের হস্তে রহিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্রের সহিত তাহার কিছুনাঈ সংসর্গ নাই,—পুরাতন সংস্করণ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

ঘটকার কাপড়ের নমুনা পাঠাইয়াছি। কোট প্রস্তুতের জন্য অট্টেলিয়া ঘটকা ক্রয় করিবার জন্য আমাদের শিল্পবিভাগে নমুনা পাঠাইয়াছে, এই নমুনার কাপড় এ দেশের অর্থাৎ রাজসাহী, বহরমপুর ও মালদহের তাঁতিরা সহজেই প্রস্তুত করিতে পারিবে। কিন্তু আমাদের বিভাগে তত বড় কারখানা নাই, গোয়ারা দামে ৫০০০ হাজার খানও লইতে পারেন তিন জেলাতেও তত কাপড় গরীব তাঁতিরা বুনিয়া উঠিতে পারিবে না। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সময়ে দানমুদ্রে কাপড় প্রস্তুতের কারখানা খুলিলে বাঙ্গালীর একটা বস্ত্র বাণিজ্যের দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন, ইহাতে কাহারও প্রতিযোগিতা নাই। আমি বস্ত্রের পারি এ দেশের তাঁতিদের সুবিধা করিয়া দিতেছি। বহরমপুরের Messrs Fergusson & co অট্টেলিয়ায় মাল চালান দিবার কারবার করিবেন বলিয়া তাহাদের লোক নানা স্থানে পাঠাইতেছেন ঘটকার কাপড়ের বৈদেশিক বাণিজ্যে বাহা কিছু লাভ হইবার কথা তাহা ফরগুসন কোম্পানীরই হইবে, তাঁতিরা খাটিয়া বৃত্তিমা চাঙ্গিরা উদার মাত্র পাইবে, অথচ বেশ ঘুয়াইয়া আছে— শুধু বস্ত্রতায় ইহার আর কি হইবে? ‘সবেউতাওয়ার’ যদি অট্টেলিয়ার সহিত এই কারবার চালাইতে প্রস্তুত হইতেন ত আমি স্বাস্থ্য মালপত্র সংগ্রহ করিয়া দিতাম— এক্ষণে Fergusson কোঃ officially লিখায় যদি কিছু করিয়া দিতে পারি সে ফল তাহারা ই ভোগ করিবেন।*

আমি দিন কতকের জন্য একবার মপাশলে দাঁইব। ‘ভারতী’ এখনও পাই নাই। তরঙ্গা করি আপনি স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখিয়া খাটিবেন।

ডবদী

ঐযক্ষ্মকুমার মৈত্রেয়

*ইতিহাসিক চিত্র কাগানদ।

গোড়ামারা, রাজসাহী।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯২০

[২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮]

প্রীতিনবভারতিনিবেদনযেতং

আপনাকে পত্র লিখিবার পর ভাষ্যের ‘ভারতী’ পাইয়াছি। উহার কবিতাটি* অতি সুন্দর হইয়াছে, মুখ্যে বনাম বাঁড়ুবা* বিশেষ শিক্ষাদান হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গ কথা** আমার পক্ষে কিছু অভিজ্ঞতা আশ্রয়

১ এই প্রসঙ্গে উইয়া—“কদম্ব বস্ত্রের কীরকারে তিনি [বালকনাথ ঠাকুর] প্রণমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বালকনাথ ও জুবলনাথ [ঠাকুর] উভয়ে বৃত্ত ছিলেন। স্বীকৃত্য পরে বোম্বাই করেন। বালকনাথের বাড়ী এখন গুপ্তী জাওয়ার বাড়ির একদল প্রসঙ্গ হয়।”—কর্তব্যনাথ ঠাকুর, “বালকনাথবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়”, “বার্ণার বালকনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী” (১৯০৭)।

২ প্রসঙ্গে এই অনুচ্ছেদে আলোচিত বিষ্ণু-প্রসঙ্গে পত্রাবলীর সুখিকা উইয়া।

৩ “জাণ ও কদম্ব”, “কাহিনী” গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

স্বীকৃত্য-রচনাবলী পদম ৫ ও সংকলিত

১১ স্বীকৃত্যনাথ মকরমুমার কৈশোর সম্পাদিত ইতিহাসিক চিত্র প্রসঙ্গে ‘সুচনা’ লিখিয়াছিলেন—এ প্রসঙ্গে ‘সুচিত্র প্রতাবনা’ পাইয়া ভারতী পত্র (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) লসাহরীর ‘অনঙ্গ কথা’র দীর্ঘ আলোচনা করেন—‘নিম্নের সমস্ত সচরন ইইয়া এক্ষণে

উদ্বেক্ত করিয়া স্তম্ভিত থাকিবার কারণ জ্ঞাহইয়াছে। ভাষ্যের ভারতীয় প্রবন্ধগুলি সমুদাই চিত্তান্বিতভাৱে পরিচায়ক, এমন সহযোগী সমালোচকগণ বাহাই বসুন।

আমি যে পুরাতন পুস্তকের তালিকা পাঠাইয়াছিলাম ঐ তালিকার অনেক পুস্তকই আমি পড়িয়াছি কোন কোন পুস্তক ফিনিয়াছি ও কোন কোন পুস্তক ধার লইয়াছি। ঐ সমস্ত পুস্তকই উক্ত তালিকার লিখিত মূল্যানুসারে। অল্পমূল্যে কলিকাতার অত্র লোকের নিকট পাওয়া যায়।

আমি ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধটির সমস্ত লেখাওনা শেষ করিতে পারিলেই দিনকতকের মত একটু অবসর প্রাপ্ত হইব, সম্প্রতি পূর্বাধিকার নিকটবর্তী বলিয়া কাজের ও কিছু চাপাওগি ও সম্পাদকীয় কর্তব্যের ও কিছু গুরুত্ব পতিত হইয়াছে, তজ্জন্ত রীতিমত পত্রাদি লিখিতে পারি না।

শিল্পবিভাগের কাপড়ের যে নমুনা পাঠাইয়াছি তাহা কেমন হইয়াছে ইত্যাদি লিখিবেন। চানয় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারও একখানা নমুনা বথাসময়ে পাঠাইব। কোট প্রস্তুতের কাপড়েরও নমুনা দিব। এতদ্ব্যতীত বাহা কলিকাতায় চলিতে পারে জানাইবেন।

ভবদীয়

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোম্বাইয়ের রামসাহী

১৪/১২/২২ ইং

[৩০ তার ১৩০৬]

ঐতিহাসিক নিবেদনসমূহ

বলেন্দ্রনাথ^{১২} অকালমৃত্যুতে আত্মা সকলেই নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি। আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, তৎসম্বন্ধে যে আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে নিজস্ব আপনায় বন বলিয়াই স্নেহমমতা করিতাম। তাঁহার উদার স্বভাব, নির্দল চিত্ত ও যশোহিতাকাঙ্ক্ষার চোটা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। কেবল আপনায় কেন সমগ্র দেশের লোকেই তাঁহার অকালমৃত্যুতে একটি আত্মীয় হারাইয়াছে। আমাদের দেশের কথা আর কি বলিব—অতি অল্প লোকেই দেশের জন্ত প্রকৃত পন্থায় পরিশ্রম করিয়া থাকেন; যে দুই চারিজন করেন, তাঁহাদের এইরূপ অকালমৃত্যু অস্ত্রের উৎসাহ অবসর হইয়া পড়ে। সেই শীতের সময় যে কলিকাতায় গিয়াছিলাম—সেই শেষ সাক্ষাৎ হইবে, এমন মনেও কল্পি নাই!

আমরা দেশে এবং কালে এক জ্ঞপ্ত এবং বিরাট জ্ঞপ্তে আপনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক।...সেই মহৎ আবিষ্কারখণ্ডের লেখক 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি ভরসী।...আমাদের ইতিহাসকে আমরা প্রত্যহ হাত হইতে উদ্ধার করি, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা পবিত্র স্তম্ভিত দেখি, সেই আশ্রয়ের দিব আসিয়াছে।...ঐতিহাসিক চিত্র ভারত-ইতিহাসের স্বকল্যাণের জন্ত বর্ধনকর আয়োজন প্রকৃত।

সম্পূর্ণ রচনাটি রচিত-রচনাগুলি নবম বর্ষে 'আধুনিক সাহিত্য' জংশন ও 'ইতিহাস' জংশনে সংকলিত।

১২ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম ৬ নভেম্বর ১৮৭০, মৃত্যু ২০ আগষ্ট ১৯২২। জট্টা ব্রহ্মব্রহ্মণ্য বংশোদ্ভূত, 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,' সাহিত্যসাধক-চরিত্রমালা ৩০।

আপনি কোথায় আছেন জানিতাম না এবং এই শোকের সময়ে পত্র লিখিতেও সাহস করি নাই। আমরা এখানে বড় বিস্তৃত—অরে সপরিবারে সহরস্থ ভ্রমণলী প্রায় সকলেই শধ্যাগত, তাহার উপর ওলাওঁতা মারীভয়ের আকার ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য সম্পাদন করিবার পর অত্র কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় হয় নাই। তথাপি আপনার কর্তৃচরিত্রের পত্র পাওয়া মাত্র আমি হতা পাঠাইবার হুকুম লিখিয়া দিয়াছিলাম। শিক্ষক তখন মণ্ডলে ছিলেন, নগর টাকা ভিন্ন হাটে হতা কেনা যায় না—একথা আমাকে তখন জানা না। তাই বিলম্ব ঘটয়া গিয়াছে বলিয়া আমি দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। দ্বিতীয় কোয়ারট্রা সাহিড়ীর নিকট রেল পার্সেলে কিছু হতা গিয়াছে, এবং হতা কিনিবার ক্ষমতা হুকুম দিয়াছি, বত চাহেন পাঠাইতে পারিব। আপনার ইচ্ছা একটি নাই, ইচ্ছা করে দশহাতে আপনারদের মণ্ডলনের সেবা করি, কিন্তু দুখানি হাতে পারিয়া উঠি না তজ্জন লোকের নিকট লাহিত হইয়া কত না নরসীড়া অশ্রুভব করি। এই এক মাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চিত্রের তৃতীয় সংখ্যায় সমস্ত কাপি ঠিক করিয়া ছাপিবার ক্ষমতা কলিকাতায় সাত্তাল কোম্পানীর কাছে পাঠাইয়া নিশ্চিত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রকাশকের বাড়ীতে ওলাওঁতা লাগিয়া গিয়াছে; এবং পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট শেখমুহুর্তে নাখাইনগরের তাম্বলককরাবির ক্ষেত্র পাঠাইয়াছেন। এবার কটে ঘাইতেই পারে না, কিন্তু প্রবর্ত্ত নিতেই হইতেছে। হুত্তরা কাগজ একটু দেরীতে ভিন্ন আর হইয়া উঠে না। আমার কাম আমি সারিয়া রাখি—চতুর্থ সংখ্যায় পর্যন্ত কাপি ঠিক আছে; কিন্তু অস্ত্রাত্ত ক্রমশঃ প্রকাশ প্রবন্ধের লেখকগণ যে কি অলস—কত পত্র ও টেলিগ্রাম দিয়াও চেষ্টা করিতে পারি না—দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এ বোকা অর্ধপথে নামাইয়া দিয়া বাঙ্গালীজনের পরিচয় সেই। কেবল রণে ভব বেওয়া অভ্যাস নাই বলিয়াই পারি না। কিন্তু আমি সব কাম করিলেও কোন কামই বাসসময়ে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিয়াছেন। তাহার কারণ আর কিছুই নয়—মানুষ একা, কাম অনেক। এ মানুষকে দিয়া কাম করা হইতে হইলে সহিয়া লইতে হইবে, নচেৎ এ বেচারা পারিয়া উঠবে কেন? আমি যে উদরামের ক্ষমতা নাই অপরিমিত জ্ঞান করিতে বাধ্য তাহা ভুলিবেন না। কিন্তু এমনও বিশ্বাস করিবেন না যে আমি তজ্জন কেবল কালে ভয়ে অত্র কামে হস্তক্ষেপ করি। প্রতিদিনই সাহিত্য শিল্প ও অপরাধের ওকালতীর বাহিরের কাম করিয়া থাকি, বাহা কেবল আপনার উপর নির্ভর করে তাহা একরূপ নামাইয়া নিতে পারি, বাহা মণ্ডলনের উপর নির্ভর করে তাহা পারি না। কি করিব?

পূজার ছুটি সমুখে। বেশে ঘাইবার ইচ্ছা নাই। সেখানেও ম্যালেসিয়া চুকিয়াছে। কোথায় বাইব এখনও স্থির করি নাই। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার পূজার ছুটি ভিন্ন সময় ঘটয়া উঠিবে কিনা জানি না হুত্তরা আপনার ওখানে বাওঁতার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু শিলাইঘাটে ঘাইতে হইলে পাবনা এবং সুয়ারখালীতে না গিয়া উপায় নাই—মোটাই তাহা ভাল দেখায় না। তাহাতে কিন্তু বেশী সময় লাগিবে। যদি ততটা সময় ও সুযোগ ঘটে তবে অবশ্যই বাইব।

তাতি শিক্ষককে বলিবেন তাহার বাড়ীর মঙ্গল। সে যেন নিপুণ হইয়া নিশ্চিত মনে আপনার কার্য সম্পন্ন করে—পলায়ন না করে। আশা তবে এইখানে বিরোধ হই, আশা করি আপনার পত্র এখন রীতিমত পাইব। নিবেদনমিতি

ভববী

ঐশ্বর্যকুমার বৈদ্য

বোড়াবারী রায়সাহী

১৭(১২)১৯৯ ইং

[২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৬]

খ্রীষ্টানন্যকার নিবেদনমতঃ

আপনার 'কবিকা' পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম। কেহ কেহ হাত বাড়িলেই পর্জিত হয়—আপনার 'কবিকা'ই তাহার প্রমাণ। কথায় ছোট হইলেও কাগজে কম নহে, ইহাতে আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব দূর করিবে। আমরা ধনজনে সজ্জার ছায়ায় একত্র মিলিত হইয়া বাঙ্গালা কবিতা হাতে করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের গুরুত্বহীনতাকে ভাঙিতে হয়। জলের মত সরল, ঘোঁহাওয়ার মত নির্মল, প্রিয়তমের মত সুন্দর বলিয়া 'কবিকা'র কবিতা সহজেই সকলকে পুলকিত করিতে পারিবে।^{১০}

যদি লক্ষ্যে ঘাই তবে, হৃদয় বড়বিনে কলিকাতায় দেখা করিতে পারিব না। ঐতিহাসিক চিত্র বাহির হইল—দু' একদিনের মধ্যেই পাইবেন নিবেদনমিতি

ডব্দীয়

ঐক্যসুন্দর বৈদ্যের

মূল পত্রখণ্ডি শান্তিনিকেতন রত্নাকরদনে রক্ষিত

সংগোষ্ঠন

১-সংখ্যক পত্রে, ও পত্রাবলীর ভূমিকায় কাব্য উপভাস ও ইতিহাসের ক্ষেত্র ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথের যে আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথ স্বরেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত সুবিখ্যাত "লক্ষণ সেনের পলায়ন"-চিত্র উপলক্ষে অক্ষয়কুমার বৈদ্যের ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলীও সম্বোধিত। এই চিত্র প্রকাশিত হইলে, লক্ষণ সেনের পলায়ন-কলর 'অলৌকিক', 'স্বনিপুণ চিত্রকর'-অঙ্কিত এই চিত্র 'সর্বথা কালানিল', এই মর্মে অক্ষয়কুমার রায়সাহী শাখা-সাহিত্য-পরিষদে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১০১৫ বাৎ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে উহা ("লক্ষণ সেনের পলায়ন-কলর") মুদ্রিত হয়। ১০১৬ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে "কলরভঞ্জন" প্রবন্ধে (স্বরেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে) অবনীন্দ্রনাথ ইহার উত্তর দেন—"ইতিহাসের রাজ্য আর শিল্পের রাজ্য এক নয়। পলায়নকলরভঞ্জন প্রবন্ধ পড়কে আশ্চর্য করিয়া তোমার নবোন্মদগাল অবাধে গিয়া গিয়া ঠিক জায়গায় বিকাশলাভ করিয়াছে, বঙ্গরাজ্যের একটি নিরুদয় কলর বিদায়লব্ধিতে। তোমার এ লক্ষণ সেন ইতিহাসের ছায়া নয় কিন্তু কালচক্রের মর্মভেনী বঙ্গবনার স্থপতি প্রতিধ্বনি যাত্র।"^{১১}

১০ রায়সাহী হইতে প্রকাশিত, অক্ষয়কুমারের রচনার পরিশুষ্টি, 'উৎসাহ' পত্রের বার্ষিক-টোকা ১৩০৬ সংখ্যায়, 'কবিকা'র সমালোচনা পূর্বক লিখিত বীথ আলোচনা বিদ্যাবসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১০০৮ বাৎ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রে অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যের যে আলোচনা করেন তাহা এই পত্রাবলীর ভূমিকায় সংগত উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপতি-প্রসঙ্গ

শ্রীকুমার সেন

বিজ্ঞাপতির কথা অনেক অনেকভাবে বলেছেন, আমিও কিছু বলেছি। তবে আমার বিজ্ঞাপতি-প্রসঙ্গ কেন, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তার উত্তরে বলব কথায় কথা বেড়ে গেছে বটে কিন্তু তথা ও মুক্তি আনানের “অচলা” বিশ্বাসকে বিশেষ নাড়া দিতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের প্রাচীন কবিরের সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা পোষণ করি তাকে “কেবল” বললে রুঢ় হয় বটে কিন্তু মিথ্যা হয় না। নূতন কথার প্রতি আমাদের ঘোরতর অবিশ্বাস, যদি সে কথা প্রতিষ্ঠিত ধারণার অঙ্গুল না হয়। দ্বিতীয় আপত্তি বিজ্ঞাপতি এখন রীতিমত আন্তঃপ্রাদেশিক মানদণ্ড বিষয়। বাঙালীর দাবি স্বাধিকারের নম্র, ইতারাদারের। সে ইজারার স্বেচ্ছা চূষে গেছে। এখন পূর্ণাপূর্ণি স্বত্ব মিথিয়ার। কিন্তু সে স্বয়ং হিন্দী এসে স্ববরণ্য করছে। বিজ্ঞাপতি এখন প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের কবি, কেননা শোনা যাচ্ছে মৈথিলী ভাষা নাকি হিন্দীরই এক উপভাষা যেহেতু দুইই নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়।

অগড়ার কথা থাক। বিজ্ঞাপতির রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য আমার গোচরে এসেছে এবং সে সম্বন্ধে কিছু নূতন চিন্তাও আমার মনে উদয় হয়েছে। সত্যায়নদ্বিত্ব প্রাচীনসাহিত্যরসিকদের কাছে গ্রাহ্য হবে মনে করে সে বিষয়ে আলোচনা করছি এই প্রবন্ধে।*

২

বিজ্ঞাপতি একটি ছোট সংশ্লিষ্ট-নাটক লিখেছিলেন গোরক্ষনাথের কাহিনী নিয়ে। এ কথা কারো কারো জানা ছিল। এই নাটকের একটি পুথির কয়েকটি পাতার ফটো-প্রতিলিপি আমি বছর সাত-আট আগে দেখেছিলাম। কিছুকাল আগে এই নাটকের একটি পুথির বিবরণ আমার গোচরে এসেছে।^১ সেই বিবরণ আমি বাঙালী পাঠকের নজরে এনে যেওয়া আবশ্যক মনে করি।

পুথি আছে নেপালে। তালপাতার পুথি, বারো পাতা, মৈথিলী অক্ষরে লেখা। নাম ‘গোরক্ষবিজয় নাটকম্’। বিষয় শিখ গোরক্ষনাথ কতৃক কামিনীমোহনানন্দ গুপ্ত রম্যেন্দ্রনাথের উদ্ধার। রচনার রীতি উনাপতির পারিজাতছত্রের মতো। অর্থাৎ গানগুলি ভাষায়, বাকি সব সংস্কৃত আর প্রাকৃত। ভাষা মানে মৈথিলী ও বাংলা অর্থাৎ ব্রজবুলি। মিথিলায় ভৈরবের শিষ্য উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্য শিবসিংহের আদেশে বিজ্ঞাপতি এই সংশ্লিষ্ট-নাটক রচনা করেছিলেন। অন্তঃপ্রবর্তনাকাল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।

এই দ্রুতি শিব-বন্দনা শ্লোক দিয়ে নাটকের আরম্ভ—

ধর্মপোষকদ্বন্দ্বিত্ববিবরণ্যঃ সঃসদি শ্রীতিমত্যা

গৌর্য্য যৌর্য্য পুরাণে ছহিহুগরিণের শ্যকন্তঃ চূষাননে।

ভবন্তঃ শৈলিবন্তে নিমিত্তমিতি কৃশা কীচা চক্রঃ মহাশো

দুই, ভবন্তঃসত্ত্বাঃ সিতভবন্তঃ পাত্ৰঃ পাকবন্তঃ।

—‘ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের সভায় ভূমিতার পরিণয়ে ম্যারির মতকে হর্ষভরে সম্মেহে চুপন করবার সম্বন্ধ শ্রীতিমতী গৌরীর মুখ শৈলীর (শিবের) মুখের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে ডেবু চন্দ্র হোসে উঠল । তাই দেখে তখনই সহাস হল শিবের হৃদয় পঙ্কমুখ, সেই পঙ্কমুখ ভোম্বাদের রক্ত করুন ।’

অপি ৫।

কল্যেভোরহি নিমিত্তাঃ স্তবকিতা যক্ষাণহি স্মারিতাঃ
সেঈশীমনি ভক্তিতাক্ষর্যগো রক্তোঃ পুনর্বিভক্তাঃ ।
পাংগত্যাঃ প্রতিবারিত্রিগতঃ স্তবক ভক্তানি বো
নিমিত্তাভিকপুন্দ্রায়কশীরে রাশত দুঃভঙ্গ্যঃ ।

—‘অধিকন্তু । মুখপরে বিস্তৃত, স্তনে স্তবকিত, নিতম্বেরেখাঃ স্মারিত, চরণে গুন্ডিত, বক্ষে বিস্তৃত— পার্বতীর প্রতি অঙ্গে বিচিত্রগতিপ্রাপ্ত সঙ্গীত নন্দনশরবিদ্ধ ইশের এইরূপ দুগুণভক্তি ভোম্বাদের মন্বল বিস্তার করুক ।’

নানীর পর গান । তার শেষ কয় ছন্দ এই—

মন পরিতোষ মোহ তব দুখ
হারল মন দ্বিআউল পুণ ।
মুক্তি কারুণ্যে তে ভেলাই ঘটাখারী
ভুক্তি কারুণ্যে অর্ধতম্বের নারী ।
জনই বিভাগতি পুণেখু আখা
মঙ্গলকার এ খেব বিশ্বখালা ।

তার পর নট-সুত্রধারের উক্তি,

অদমতিবিরহেণ । ততো নটী যাত্নয় সসীতকববতারসানি ।

নটীর প্রবেশ ও উক্তি,

অজ্ঞাত ইয়ঃ যু অহঃ চিট্টানি । কিঃ আগমেদি অজ্ঞোঃ ।—‘আর্ধপুত্র, এই আমি হাজির । আর্ধ কি আজ্ঞা করেন ।’

নটের প্রত্যুত্তর,

শ্রীবিভাগতি-সংকীর্ণরক্ত পোরকবিবর বান নাটক-নটনার্যঃ মহাত্মাঃপ্রাণ-
শ্রীমণিবসিরেদেবপানৈঃ হৃদেভুকার্যঃ শ্রীমৎ তৈয়বতকরঃ আজ্ঞাপিতাহসি ।

নটীর উক্তি,

অজ্ঞ কঃ সমরঃ লক্ণবীকরঃ নটিবক্যঃ ।—‘আর্ধ কি সবর উপলক্ষ্য করে নাট করিতে হবে ।’

নটের প্রত্যুত্তর,

পারদমেব । অয়

পিনতি তমঃ পশিলেখা বিকশতি পল্লঃ হলাভি সুমুখানি ।

লমুখপি হাভতি তাত্ৰা গুরুহপি সীমতি পরোবাহঃ ।

প্রমুদসেগুন্দনপঙ্কসুখা

মুখাঃ একাতোপেলসর্যারক্তেযু ।

ভূগাফ বিল্লকয়ঃণ ভূগা

ভূমোহয়ঃ সুখতি সত্যসত্যানি ।

—‘পর্য্যকালেই। এ শব্দে

শশিকলার দীপ্তি বাড়ে, পদ্ম বিকশিত হয়, কুম্ভ হালে, ছোট তারাগ উজ্জ্বলতর হয়, ভারি বেধও অবশর হয়।

কোটা ছাতিমতুলের গন্ধশূক ভূঙ্গগণ ফুলারেণু-ভরে নত হয়েও প্রভাতে উৎপল-সৌরভে মুগ্ধ হয়ে এখন অনবরত গতাগত করছে।’

গোরক্ষ তাঁর চোখকে সজ্ঞে নিয়ে এসে হাছির হলেন মন্তেক্তজনাথের প্রাসাদঘারে। বৌবারিক বললে, ‘অরে যোগিনৌ বুঝো রক্ত প্রবেশো নাতি’।

গোরক্ষ বললেন, ‘ওরে বৌবারিক, আমরা যোগী আমরা সর্বত্র বধ্যভিক্তি বেতে পারি ও থাকতে পারি। কেউই আমাদের নিবেধ করতে পারে না।

তবুও প্রহরী চুকতে দেখে না। তখন গোরক্ষ বললেন, আমি যা খুশি তাই করতে পারি বটে কিন্তু গুরু যদি চটেন সেই ভয় করি।

সংকোচমাণি নগরঃ গগনে নভাশি
প্রশান্তদেব নৃপতে নিকৃতঃ কিমাশি।
কি [-কৃতঃ যোগবহিতঃ] ত জয়সিধাশীঃ’
হাগাহুভক্ষনহন্ত ভলো রিতেনি।

—‘নগর আলোচন করতে পারি, তা আকাশে তুলে বসাতে পারি, নিভূতে নৃপতির প্রাসাদে তো অবশ্যই প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু ভয় করি- ‘অমুরাগমুদ্রচিত্ত গুরুর রোষ।’

প্রাসাদে চুক গুরুর সামনে গিয়ে গোরক্ষ গুরু-বন্দনা পাইলেন,

গোরখ নামে তোমর হয়ে ঈশ
সেবা আশ্রয় বেহ আশ্রয়।’

তারপর গুরুকে শিষ্যের জ্ঞান উপদেশ,

কোমলকোমলার্থো দুর্গকটিনমগ্ধত্ব।
রাজ্যঃ কিংবাঃ যামলো জন্মোজাতিঃ পরিত্যক্তান্।

—‘হে প্রবেশ, রাজ্য ত্যাগ করে জুগুপ্সা মধ্যবর্তী কোটি স্থরের প্রভাভয় সেই জ্যোতি ধ্যান করুন।’
মন্তেক্তজনাথ এ কথা হেলে উড়িয়ে দিলেন। তখন গোরক্ষ খেদ করতে লাগলেন,

অস্বপ্নানী মিত্রবনজরো বঁধ সীতাঃশ্রমোদে
মাত্তো রাজাপি চ মম গুরু যোগিনামগ্রপাঃ।
অব্যয়্যো যোগোবল্লভতমঃ ধং স মন্তেক্তজনাথঃ
সীতাক্রিহহং হৃদ্যঃ ক্রলভাপাংবদ্যঃ।

—‘ত্রিভুবনের গুরু চক্রেখেরের শিষ্য (এই) মাত্ত রাজ্য যোগীদের অগ্রগণ্য, আমারও গুরু। এমন যে ভব্য ও জ্ঞানদীপ্তসেহ মন্তেক্তজনাথ, আচ্ছা! তিনি এখানে স্থানধনী নারীর ক্রলভা পাশে বদ্ধ হয়ে মুগ্ধন।’

রাজা মন্ত্ৰেয় হেলে বললেন,

অতাকঃ বোনিং কৃতঃ রিয়ো মোহঃ ।

কাটঃ শিলা কুলিগঘতি কটোরবর্ণণ
তেজোহপি পাণ্ড যথিকঃ কিল বোদিচেতঃ ।
অতঃ বিতঃ কমলপত্রদিব্যাভাসৈব
গোলিরতে কল্পাশা পরমরমণে ।

—‘আবরা বোণী, আমাদের নারীমোহ কোথায় ।

কাঠ পাথর বহু এই সব কঠিন ভ্রবা, এগবের চেয়েও অধিক অভেদ্য বোণীর চিত্ত । হতে পারে (চিত্ত) বারিবিম্বহৃত কমলপত্রের মত, কিন্তু শর ব্যতিরেকে তা কল্পনার দামা বিনষ্ট হবে (?)’

গোরক্ষ নাছোড়বান্দা । অবশেষে মন্ত্ৰেয়ের চক্ষুঃস্মারন । তিনি পর গাইলেন যার ধূয়া

তোহে বোর পোরহ আপগদান ।

গোরক্ষ গমুচিত উত্তর দিলেন পব পেয়ে । পদটির জনিতা

জনই বিভাপতি প্রোক্ত হাথ
সব ন লাগহ মন্ত্ৰেয়নাথ ।

শেষে ভগ্নতাবাকা । শিবকে গুরুর আশীর্বচন,

পদবাসুনিবে হিম্মত্ৰিশিখরঃ বিভাঃ স্বরঃ সত্যতা
বকঃ সৌমিনাশ্বকায়গধনে লক্ষ একাগো ধরা ।
কমে শিবকমলঃ.....কমে বীরঃ বসুঃ
ঈগোরক্ষ চিরে ধীরঃ লগতি বংকীর্তীকৃত্য ভরতাম্ ।

—‘নাগর থেকে হিম্মত্ৰিশিখরে গঙ্গার মত বিস্তা গুরুকে বিশেষে । তোমার অস্ত্রে আসক্তিরূপ বিশাখকারে আমি আলোক পেয়েছি । তুমি আমার শিষ্যঃ আমার দেহ তোমারই । শ্রীমান গোরক্ষ তুমি চিরকাল বেঁচে থাক আর তোমার কীতি জগতে বিস্তীর্ণ হোক ।’

অতঃপর “ইতি নিষ্কান্ধাঃ সর্বে” । তার পর পুষ্পিকা

ইতি ব্রহ্মকিষ্ক-মহাভারত পত্ৰতমঃ-শ্রীমদ্বিভাপতি-সংকবি বিধচিতঃ গোরক্ষবিরাট-নাম নাটকঃ সৰ্ব্বাণ্ড । লগঃ ৩২ঃ অষ্টমঃ ৮ঃ ৭
বদি ১১ তিরো...দিসে...বোসে কল্পা শ্রীহরারি কঠরাত্তর শ্রীভগীকৃত্যংব দিবিতঃ পৃথকদিতি ।

বিভাপতির “মহারাঙ্গলগিত” বিকস অস্ত্র দেখা যায়নি ।

৩

‘বিভাপতি গোষ্ঠী’ বইয়ে লিখেছিলুম “বিভাপতির কোনো পদে পদসিংহ বিশ্বাসদেবীর উল্লেখ নেই” এ কথা এখন প্রত্যাহার করতে হচ্ছে । বিভাপতির একটি পদে বিশ্বাসদেবী ও পদসিংহের নাম মিলেছে । একটি পুরানো ভালপাতার পুঁথি মৈথিলী অক্ষরে লেখা, তাতে পদটি মিলেছে ।’ জনিতা এই,

১ পদটো বিবিত্তান্দ্রের পুঁথি । ঈশ্বর বিশ্ববিশ্বারী মনুস্মার তাঁর বিভাপতির পদাবলীতে পদটি উদ্ধৃত করেছেন (২০০) । তবে পাঠে কিছু ভুল আছে ।

ভনই বিজ্ঞাপতি-^১ নহি আনে

বিশবাসমেবি-পতি হদবো বিলক নৃপতি পছমদিহি মানে ।

এই পুথিতে এমন একটি পদ আছে যার জুড়ি বিদ্যাপতির পদাবলীতে অথবা অন্য পদাবলীতে
বেলে না। পদটিতে শৈভের প্রকোপ সরলভাবে বর্ণিত, সেই সঙ্গে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে কবির গোষ্ঠী
কুমার অমর সিংহের প্রত্যাশিত বদান্ততার (ঝোড় শালের ?) দিকে।^২ পদটি এই—

সারসী ।

জাড়ন বায়ুন তেজ সনান

জাড়নি বা [-বিনী জাড়ন]^৩ মান ।

জাড়ন বাড় বোকরী নাম

জাড়ন বসিক তেনা গাব । হ্র ।

জাড় আএল কহব কাহি

কড় পরাভল পান চাহী ।

[ক] রপি

পিঠিক জাড় সেহও নহি হরাপি ।

অনল কুকিঅ হেরিম দর

সিদির পাহি সেহও তেল লু ।

হুবি- . . -কাহার

জাড়ন বীর কৈসে হোএ বাহার ।

কাহি মন করি অনে আর

তৈসন সিংহ তইলন পিয়ার ।

[সরল]^৪ কবি বিজ্ঞাপতি গাব

কেও নহি ইসব জাড় চুড়বে

সকল হলত জাড় হরগ

কুমর অমরসিংহ সরল ।

—‘জাড়ে (অর্থাৎ শৈভের চোটে) বায়ুন সান ছাড়লে, জাড়ে বানিনী মান ছাড়লে । জাড়ে বুড়ো হাটু তুলে
পা মুড়ে মাথা শুঁজলে, জাড়ে বসিক (ঘুবক) টেনা (কাপড়) গায়ে দিলে । জাড় এল, কি আর বলব ।
সেখ পবনের খুব প্রভাব হল (?) । [অগ্নি সেবনে কিছু প্রতিকার] করে, কিন্তু সেও পিঠের জাড় হরণ
করতে পারে না । আগুন ফোকা সেপে হুর্বে সেও শৈভকাল (বা শিশির) পেয়ে দূরে সরে গেল ।’^৫ মুক্ত
• কাহার, জাড় বীর কি করে বীর হবে । যনে যনে নিরুপণ করলে (??), যেমন সিংহ তেমনি

১ পুথিতে এই বর্ণে একর লুপ । বিদ্যাবায়ু পড়ছিলেন “হুবং বম্বুগতি ভোমে হুদি গতি ।”

২ বিদ্যাবায়ু পদটির পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি (২১০), তাই যানে বা যাখা সেন দি ।

৩ বন্ধনীস্থিত অংশ কবিত ।

৪ বন্ধনীস্থিত অংশ পুথিতে একর লুপ, পাঠ বিদ্যাবায়ু ।

৫ পাঠ “অনল কুকিঅ হেরিমহর” ।

শিয়াল। বিভাপতি কবি গাইছে, এমন কেউ নেই যে ঝাড় তাড়ায়, (তবে) সকল জগতের ঝাড় (মুখতা) হরণকারী কুবীর অবলম্বিৎ শরণস্থল।’

৪

বিভিলায় পাওয়া বিভাপতি-পদাবলীর আকর গ্রন্থ ও পুথির মধ্যে লোচন শর্মার রাগতরঙ্গিণী প্রাচীনতম ও প্রামাণিকতম। রাগতরঙ্গিণীর একটি পুথির লিপিকাল ১৬০৬ শকাব্দ, আর একটির ১৬১৩ শকাব্দ। ১৬০২ শকাব্দে লোচনের নিম্ন হাতে লেখা নলচরিত (নৈবদীয়চরিত) কাব্যের পুথি মিলেছে। সুতরাং রাগতরঙ্গিণীর রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ। রাগতরঙ্গিণীতে শুধু যে বিভাপতির পদাবলী কিছু উদ্ধৃত আছে তাই নয়, তাঁর পদাবলী গানের গোড়ার কথাও কিছু বলেছেন। তার মধ্যে এমন নতুন খবর আছে যা অদ্ভাববি কাব্যে গুপ্তি আচ্ছাদিত করে নি।

সেই গীতের আলোচনার আরম্ভে লোচন বিভাপতির গানের উল্লেখ করেছেন,

দেভাযশি স্বনন্দিত্যং^১ এতৎ শিবিলাশ্রয়তাবদ্যে শ্রীবিভাপতি-কবি-
বিবদ্য তাতা শৈবিন-সুতরভক্ত্যঃ প্রবর্ত্যে।

তারপর বিভাপতি-গীতের “উৎপত্তিপ্রদর্শনম্”,

বিখ্যাত-কুসুম-হৃৎ-নহতিঃ
বিভামিকৃতির্ভক্তিরাসীৎ।
স সেবতারাঃ কিল শিচ্ছিত্যোয়াৎ
কাব্যং পূরণপ্রতিভাঃ চকার।

—‘বিখ্যাত উত্তম ব্রাহ্মণবংশের সন্তান ছিলেন বিভাবিকৃতিমান ভবকৃতি। তিনি সেবতারার বরে সিদ্ধিলাভ করে পূরণতুল্য কাব্য রচনা করেছিলেন।’

অবাতা তৎসংগি পার্শ্বেত্যাঃ
কণ্ঠতরীয়াঃ কথয়াৎসু।
অভয়দানীঃ হৃদতিঃ কলাবান্
কাব্যবহুঃ কথকো বহু।

—‘এঁর কাছে শিক্ষা করে কাব্যর সন্ধান কালোয়াত হৃদতি তখন কথক হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ-সভায় (ভক্তর রচনা) কথকতা করতেন।’

হৃদতি-সুতোদয়-ভক্ত্যঃ স্তবতঃ শিবিলাঃসংসারঃ।
গতিতর-কবিশ্রবণ-বিভাপত্যে তু সন্ধ্যাতঃ^২।

—‘হৃদতির পুত্র উদয়। উদয়ের পুত্র ভরত। তাকে রাজা শিবসিংহ পতিভ্রষ্ট কবিচূড়ামণি বিভাপতির কাছে দিলেন।’

এইতঃ সঙ্গীতবিন্দিঃ স্বরনিকরমহিৎকাভক্তকবিয়াৎ
জ্যোতীলংপ্রেরাৎপ্রবিতগতিকাঃ কলুতাঃ কেপি রাগাঃ।
তদ্ব্যনার্থন্ত বিভাপতি-কবিকৃতিনা কলিতান্ত এনা বাস্
কাশ্যেবেকাপ্রবাতকবদিহ ভরতঃ সঃগি শ্রীকৃপ্তঃ।

—‘এই সংগীতবেত্তারা স্বরসাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে নবনবোন্মেষিত স্বরমণ্ডলের বিচিত্র ভবিনাথ কতকগুলি রাগ তৈরি করেছিলেন। সেই সব রাগ গানে ছুটিয়ে তোলবার জন্যে কৃতী কবি বিজ্ঞাপতি বেশব ধূম্য রচনা করেছিলেন রাজার সভায় সেগুলির একমাত্র উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন ব্রজত।’

পিতৃহতভক্তাঃ কিম কলাতিরানন্দাঃ প্রদিতাঃ ।

ব্রজতামরনি বিভূকঃ কুচো নিরুবেদিশায়কঃ মদসি ।

—‘ব্রজতের পুত্র হল কুক। ইনি পিতার মতো গুণবান, লোকপ্রিয় দশমী কাশোদ্যত, উদাসীন-প্রকৃতি এবং সভায় বেশীশ্রুতের গায়ক।’

ততশ্চ

বিদলনতিরতীর্ণপ্রারকাতঃ কখাতাম্

মদসি কখবকারী স্তম্ভগাবিধিষ্টঃ ।

সফলমুখি কনকজামসাম্যাতবিজ্ঞা-

বিসিহ-হরিহরাখ্যো মমিকঃ প্রাহুতাম্ ।

—‘তার থেকে জন্মালেন হরিহর মমিক। ইনি নির্মলবুদ্ধি, সদমৃতসেহ, সভায় কথার কথক, গীতের গানে ব্রোষ্ট। এর জন্য সফল। ইনি অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব ল্যা বিদ্যার জন্য বিখ্যাত।’

খড়্গরান-ঘনজান-কলীহাম্য ব্রজঃ মৃত্যোঃ ।

এতত্ত্ব ব্রজ তেবেকো ঘনজানর গায়কঃ ।

—‘এর তিন পুত্র—খড়্গরান, ঘনজান, কলীহাম। তার মধ্যে একমাত্র ঘনজান হলেন গায়ক।’

রামায়া লক্ষ্মিরাঘবটীকাখ্যাঃ শ্রীমদম্প্রাঃ ।

কমেনিরাঘকাতো হৃদযন্যব-হতাঃ ব্রজঃ ।

—‘ঘনজানের তিন পুত্র—লক্ষ্মিরাঘ, রাঘবরান, টীকারান। তাঁরা বেশিগানের গায়ক ছিলেন।’

তার পরে বিজ্ঞাপতির প্রসঙ্গ শেষ করছেন লোচন এই বলে,

শ্রীমদ্বিজ্ঞাপতি-কবিরিভুঃ কাব্যবর্ণনাধ্বজাঃ

গুণতৎপ্রাধান্যমীত হৃদহৃৎ-ব্যতীর্ণবিশ্বজান্ ।

রাগাবেজাঃ কমমণি তথা বহুগীত-ত্যা যোমন্

এন্দ্ৰা শ্রীমদ্রত্নপতিরতো লোচন গুণিলেখঃ ।

—‘শ্রীমান্ বিজ্ঞাপতি কবির কাব্যবর্ণনাধ্বজ অথবা সেগুলির তুলা অথবা সেগুলির অঙ্কুর, প্রচলিত গীতে নিবদ্ধ, রাগগুলি থেকে কোনো ক্রমে কিছু যোগাড় করে শ্রীমান্ নরপতির অমূল্য বীমান্ লোচন সারসে সেগুলি লিখলেন।’

তার পরে সেইসব রাগের নাম-গোষ্ঠী নির্দেশ ও গীত-উদাহরণ।

বিজ্ঞাপতির রচনা সম্বন্ধে লোচন বা বলেছেন তার মধ্যে দুটি কথা অমূল্যবানবোধ্য। লোচন প্রথমে বলেছেন, বেশি রাগের গানে রূপ সেবার জন্য বিজ্ঞাপতি ধূম্য পর লিখেছিলেন। শেষে বলেছেন, তিনি বিজ্ঞাপতির “কাব্যবর্ণনাধ্বজ” রাগ সংগ্রহ করেছেন। কাব্যবর্ণনাধ্বজ নামে স্পষ্ট—সম্পূর্ণ পদাবলীর রূপযুক্ত।

লোচনের স্বাণতরঙ্গিত্তিতে বিভাগতির ভূমিত্যুক্ত পদাবলী কয়েকটিই প্রধানত সংকলিত হয়েছে। ভূমিত্যাহীন যে দু-চারটি পদ আছে, সেগুলিতে পদসংখ্যা চার অথবা আট। যেন হয় এই ধরনের ভূমিত্যাহীন ছোট পদগুলিকেই লোচন “ক্রবা” বলে নির্দেশ করেছেন। যিবিলায় অথবা নেপালে বিভাগতির পদাবলীর যেসব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে ভূমিত্যাহীন পদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ডক্টর ব্রীহত্তর বা সম্পাদিত নেপালের পুঁথির কতকগুলি পদ আসলে ভূমিত্যাহীন, পুঁথির লেখক বিভাগতির নাম যোগ করে দিয়েছেন শুধু “ভূমি বিভাগতীত্যাধি” অথবা “ভূমি বিভাগতীত্যাধি” বলে। কোনো কোনো স্থানে এমনি যে “ভূমি বিভাগতি” “ভূমি, বিভাগতি” অথবা শুধু “বিভাগতি” ছন্দের সঙ্গে খাপ খায় না। স্বভাব্য এখানে স্বীকার করতেই হয় যে এমন ভূমিত্যাহীন মূল ছিল না। উদাহরণ দিই—

কত ন ধ্বন	সকট পরএ	কত ন মৌলএ নিধি
ইরিন তৈমও	মতা ন হাড়এ	ভল মল কর দিধি।
	লাগনি গএ কুকাবহ কাহু	
উচিত বোমইতে ^১	জে বোম সে হো(ক)	সেন ন ভাবহ ধনু। ৫। ^২
ফেলন সম্পতি	তৈগনি আসতি	পূরন আইসন হল।
বোন ‘বেচি যদি	প্রাণ সে রাবোম	তাতে মরণ জলা।
ভূমি বিভাগতীত্যাধি।		

চৈতন্যচরিতামৃততে আছে যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পরে যখন অষ্টমত আচার্যের ঘরে শান্তিপুত্রের আগমন তখন একদিন লভ্যাবেশার আচার্য ও হরিনাম “এই পদ গাই হর্ষ করেন নর্তন—”

কি কহব যে সবি আনন্দ ওর

চিরদিন মাধব মনিয়ে যোর। ১।

পদটিকে অনেক কাল পরে পাওয়া যাচ্ছে বিভাগতির নামে একটি পূর্ণাঙ্গ পদের অংশ রূপে। পদটি এই,

কি কহব যে সবি আনন্দ ওর

চিরদিন মাধব মনিয়ে যোর। ৫।

পাণ হৃৎকর যত হৃৎ সেন

পিন্না-মুখ বরননে তত হৃৎ সেন।

আচার ভরিনা যদি মহানিধি পাও

তব হাম দুরসে পিন্না না পারিও।

শ্রুতের গুলনী পিন্না দিগ্বৈর বা

বহিবার হুত পিন্না বহিয়ার না।

বিধন পিন্নার [হাম] না কৈনু বতন

এবে হাম মানকু পিন্না হুত ধন।

ভূমি বিভাগতি ভূমি বরবারি

দ্রবক হৃৎ দিবল ছই চারি।

১. পদটির দ্বন্দ্ব ও বাক্যরীতি বাংলা। ‘বোমইতে’ এই বৈশিষ্ট্য পদটি হুন্দোছট, বাংলা ‘বদিত’ পদে প্রচলিত হয়।

২. এইটাই প্রথম, ডক্টর বা প্রথম পদটিকে ক্রবা নির্দেশ করেছেন।

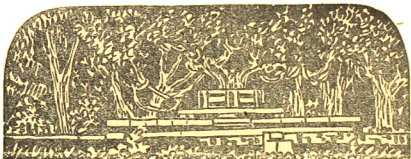
৩. কব, সেন অথবা বান।

এই পদের শেষ আট ছত্র, বিশেষত শেষ ছ ছত্র, প্রথম চার ছত্র থেকে স্পষ্টত বৃত্ত। শেষের ছত্রগুলির ভাব। ও ছন্দ পূর্যপূরি বাংলা। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, বিজ্ঞাপতির এই গানটি ছিল “ঋবা”-জাতীয়, ছ ছত্রে বা চার ছত্রে সম্পূর্ণ। জনিতা ছত্র বিজ্ঞাপতির অন্ত পদ থেকে বোগ হয়ে থাকবে। আর মাঝের ছত্রগুলি থাকে বাংলায় বলে সম্পূর্ণ, ইংরেজিতে প্যাভিং।

বিজ্ঞাপতির “ঋবা” গীতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে বিজ্ঞাপতির সঙ্গে গোবিন্দবাদের যুক্ত ভনিতার পদগুলির কিনারা হয়। এই পদগুলির সম্বন্ধে সাধামোহন ঠাকুর বলে গেছেন,

বিজ্ঞাপতি-ঐক্যের গীতপুণ্য গোবিন্দবাস করিয়াছ-কৃত দ্বিতি বদ্যতে।

এ উক্তির সমর্থন হয়। গোবিন্দবাস বিজ্ঞাপতির কয়েকটি “ঋবা” গীতিকে পূর্বতর রূপ দিয়েছিলেন এবং উত্তরস্থায়ী কপিরাইট প্রাপ্ত করেন নি।



নিধুবাবু ও বাংলার টঙ্কা

শ্রীরাধেশ্বর মিত্র

বাঙালীর স্বভাবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে ভারতীয় সমাজে স্বাভাবিক প্রদান করেছে। এই বৈশিষ্ট্য এবং স্বাভাবিক তার সংগীত-সংস্কৃতিতেও বর্তমান। বাংলার সংগীত এবং উত্তরভারতীয় সংগীত—এই দুইয়ের দৃষ্টান্তে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে অথচ দুইয়ের মধ্যে এক অনিবিড় যোগদ্বারাও বর্তমান। এই পার্থক্য কোথায়? একটি সামাজিক এবং মানবিক, অপরটি কৌশলী শিল্পবৈজ্ঞানিক। এই যে সামাজিক এবং মানবিক দৃষ্টান্ত, এইটিই হল বাংলা গানের মূল কথা। দরবারি গানের চর্চা বাংলায় হয়েছিল কিন্তু বাঙালীর কৃতিত্ব সেখানে নয়; বাংলার সংগীতকলা সেখানেই সার্থকতা অর্জন করেছে যেখানে সংগীত উচ্চ ভাবলোক বা আদ্যাপন্থা রূপে ছেড়ে নিজের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত অহুতিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই কারণেই বাংলার লোকসংগীত এত মধুর, এবং কীর্তনের আবরণগুলি এইমাত্র আনন্দের সমস্তকে এত স্পর্শ করে। বাংলার কাব্যসংগীত ধ্বন গড়ে উঠতে লাগল তখনও তাতে রাগসংগীতের প্রয়োগ হলেও তার কাব্যস্বরূপ অক্ষর রইল। আবাসের মনোভাব এবং অহুতিকে রাগ-সংগীতের স্পর্শে রূপায়িত করা হল কিন্তু নানা 'কর্তব্য' খাটিয়ে তাকে একটা উচ্চশ্রেণীর সংগীতে পরিণত করার প্রয়াস বিশেষ প্রাধিকার লাভ করে নি। এরকম চেষ্টা যে একেবারে হয় নি তা নয়, কিন্তু তেমন সফল পায় নি। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) -র টঙ্কার মূল বৈশিষ্ট্য বোলতান পাগুটান বা সম্মতন নয়, ছোট ছোট বিস্তারে এবং আন্দোলিত তানে। পুরোনো বাংলাগানের সংগঠন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় খুব একটা গুস্তারি অবকাশ তাতে নেই কিন্তু ছোটখাটো বিস্তার এবং তানপ্রবাহের অবলম্বন আছে। এতে খুশি না হয়ে অনেকে নানাকরন কৌশল বিস্তার খাটিয়ে উপবেশালের অবতারণ করেছিলেন বটে কিন্তু তাতে অনেক ক্ষেত্রেই কাব্য এবং সংগীত এই দুই বস্তুরই অনগ্রহণি ঘটেছে। নিধুবাবুর রচনার সবচেয়ে বড় কথা হল একটি মানবিক আবেদন—সুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয় সংগীতের ক্ষেত্রেও ঘটে উঠেছে এবং এই আবেদন যাতে সর্বোপেক্ষা সেমন্ত তিনি টঙ্কার তানকে জুড়ত করেন নি, তাকে দীর্ঘ আন্দোলিত রূপে প্রকাশ করেছেন। উত্তরভারতে যে টঙ্কার তান প্রচলিত তার রূপ আর নিধুবাবুর টঙ্কার তানের আকৃতি এক নয়। একটি জুড়ত তানকর্তব্যের সর্গ, অপরটি সর্গেরই দ্বৈত আন্দোলিত চেউয়ের মত দুশে দুশে চলছে, আর আবাসের ক্ষমতায় এসে আচ্ছন্ন পড়ছে। শোরির টঙ্কার জুড়ত তানে একটি কাঙ্ক্ষা আছে, তানহিন্নোলে সেই কাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। বিখ্যাত টঙ্কা "ও দ্বিঞা যে জানেন্ড্রালে" গুনটিতে হিন্দিমলে জুড়ত তানে চমৎকার রসপট্টা করার সুযোগ আছে। এগানটি গাইবার সময় বাংলা টঙ্কার চাল আবাসের মনে আসে না। কিন্তু এরই ছকে ফেলা গান "যে যাতনা যতনে" ধ্বন গাইতে বসি তখন আপনি থেকেই আসে নিধুবাবুর প্রভাবিত সেই কল্প নিষ্ঠে দীর্ঘ দলকিচালের তান। এ গানটি জীঘর কথকের রচনা। নিধুবাবুর রচনা বলে চিরপ্রসিদ্ধ "তোনারি তুলনা কুমি প্রাণ এ বহীমতলে" এই গানটির স্বর তনলে এই দীর্ঘ আন্দোলিত তানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাত্মক বোঝা যাবে।

তোমারি ভূমিা ভূমি গ্রাণ এ মহীমওলে

আকাশের পূর্ণশি দেও কীরে কলহলে ।

এ ক্ষেত্রে “কলহলে”র পরে টগ্নার যে তান দেওয়া হয় তা যদি ক্ষত করা যায় তাহলে গুস্তানি হয়তো প্রকাশ পায় কিন্তু পূর্ণশব্দের পরিতাপ প্রকাশ পায় না। কাব্যসংগীতে নিধুবাবুর অসামান্য প্রতিভার বিকাশ এইরকম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। নিধুবাবু রাগসংগীতকে অবলম্বন করেছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন গুস্তানি যাহুব কিন্তু সংগীতের প্রকৃত রস যে কাব্যের আবেশনে, নিছক গুস্তানিতে নয়, এটা তিনি সেই যুগে বুঝেছিলেন যে যুগে এক দিকে ছিলেন হিম্মিগানের দূর্ধ্ব গুস্তানবর্ণ আর অপর দিকে কবিগান আর খেউড়-গায়করা। নিধুবাবু সে যুগের সংগীতে মধ্যপথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি গুরুশাস্ত্রীর ধ্রুপদী রীতির প্রয়োগ করেন নি, আবার হালকা চালকেও গ্রহণ করেন নি, অথচ লোকের কুটি অল্পমাত্রে গান লিখেছেন। কি সাহিত্য কি সংগীত, এই দুই ক্ষেত্রেই সাধারণের কটিকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যেটা সবাই পারেন না। সাধারণের কটি বলতে অনেক নিম্নকৃতি বোঝেন; কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ রয়েছে—যে শিল্পী এটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন তিনিই সাধারণকে অসাধারণ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। নিধুবাবু পেরেছিলেন— তাঁর সেই অন্তর্ভুক্তি ছিল। তাঁর পরে আর-একজন এই-রকম অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি ঐশ্বর কথক। বাংলা টগ্নার সবচেয়ে পরিমার্জিত রূপ ঐশ্বরের রচনায় পাওয়া যায়।

সংগীতে মানবিক আবেদন সবচেয়ে বড় বলে নিধুবাবু রাধাকৃষ্ণের প্রবরলীলার আবরণে নিজের বক্তব্যকে ঢাকেন নি অথচ প্রবহমান প্রবহসংগীতের মূলরসটি তাঁর সংগীতে ছিল। গাথকী রীতিও তিনি সেইভাবে সজ্জত করে নিয়েছিলেন যাতে গানের চাল হালকা না হয় অথচ বক্তব্য সুপরিচ্ছন্ন হয়। প্রয়োগশিল্পের এই সংযোগে যে রূপ সৃষ্ট হল তা একান্ত পরিচিত অথচ নতুন। নিধুবাবুর স্বকীয়তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সৃষ্টিকর্মে। এই প্রভাবে পরবর্তীকালের বহু রচনা গৌরবাধিত হয়েছে, এমন কি পাঁচালি-কবিতাও। পাঁচালিতে ব্যবহৃত অনেক গানের স্বর টগ্নার মাধ্যমে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এইসব রচনায় লোক-সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য আছে অথচ টগ্নার স্পর্শে এগুলি কাব্যসংগীতের লালিত্যে মনোরম রূপ ধারণ করেছে। এমন একাধিক গান দামরখি রায়েব পাঁচালিতে মেলে।

টগ্নার প্রভাবে ভঙ্গনাবে পরিত্যক্ত “খেমটা” চালের গানও মার্জিত এবং স্থলানিত হয়ে উঠেছিল। বস্ত্ত “আড়-খেমটা” গানের অন্তরাল সবধে আবারে যে একটা ভ্রুতি আছে তা অনেক পরিমাণে অঙ্গল। খেমটা চালের গান মার্জিত যে অন্তরাল এমন নয়। আড়-খেমটার চেয়ে কয়েকটি বিশেষ বনোভাবকে প্রকাশ করা যায় বা হয়তো আর কোনো সঙ্গত নয়। এই চেয়ে এক দিকে মনের প্রচুরতা, চাপল্য, অপর দিকে কারুণ্যও প্রকাশ পায়। সবচেয়ে বড় কথা এন্ নাটকীয় আবেশন। আর নাটকীয় আবেশন যানেই মানবিক অহুত্বের প্রকাশ। খেমটা ধরনের গানগুলির সার্বকতাও এইখানেই। এইসব গানের হরে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে নি গত্য কিন্তু মানবিক ক্ষয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। বা সাধারণের চেতনার উর্ধ্বে তাকে অহুত্ব করাবার চেষ্টা হয়তো বহু কিছু বা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনায়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে অথচ বা আমাদের জানান দেয় না আমাদের অন্তরে ছোঁটি একটুকরো স্বপ্নের আঘাতে যদি তার পরিচয় প্রকাশ হয় তবে তার মূল্য বড় কম নয়।

ঐ দেশাচার বাড়ি আমার

চারদিকে দালক বেড়া

অবসরে শুভ ঘন করে

কোম্পোজিত দিচ্ছে বাড়ি।

এবার এখনি মনে

আনন্দিত কৃষকবনে

আবার ঐ কৃষকগানে

ভিলেক নাই বসন্ত হাড়।

গানটি গোপাল উভের ব্যক্তায় ছিল। খাটি আড়-খেমটা চাপের গান। এক সময় এ গানের খুব আদর ছিল, এখন অবশ্য কালখর্মে একেবারেই বিস্মৃত। এখনি পড়ে গেলে এ গানে আর কি বৈশিষ্ট্য আছে? কিন্তু কালোড়। হুবে আড়-খেমটা এ গান শুনেলে মাগকের আনন্দকল্ল রূপ ভেঙ্গে উঠবে—স্বপ্নের গুচ্ছের স্রোতার কানে এবং প্রাণে পূর্ণতার লাড়া জাগিয়ে তুলবে। এইসব গান ছোট ছোট টম্বার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। বসন্ত গন্ত শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃতিতে সাধারণভাবে সর্বাঙ্গিক। অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে টম্বার। শ্রাব্যসংস্কৃতি, আগমনী, বিবিধ ভক্তিরাস্ত্রক সংস্কৃতি ও টম্বার রূপে অভিযুক্ত। বাংলা গানের ধার। পর্যবেক্ষণে করলে এইটাই মনে হয় যে বাঙালীরা একটা ধরাধা পথে কোনো নির্দিষ্ট গানের রীতি অগ্রসর করার চেয়ে আবেগপ্রধান প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল সংস্কৃতিতেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনধারার যোগ নেই এমন উচ্চ ভাবলোকে অবস্থিত সংস্কৃতিতে প্রাধান্য মিলেও আপনার করে নেন নি। এই কারণেই প্রাচীন অভিযুক্তিত রীতির কীর্তন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল এবং সে জায়গার সহস্র সরল ছন্দবেগে ছিন্নোশিত বে কীর্তন তাকে বরণ করা হল। এই একই কারণে অতীতের কোমলকাম্পনাবলী বাঙালীর এত প্রিয় যে, এই রীতিতে গান রচনা অগ্রসরের পরে শত শত বংশের ধরে চলে এসেছে। এই মনোভাবই টম্বাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছে।

নিধুবাবু বাঙালীর চরিত্রকে নিখুঁতভাবে বিবেচনা করে দেখেছিলেন। তিনি যে সহস্রা খুব উত্থানের গান বেঁধে বাংলা গানকে স্থলান্তরিত করতে চান নি এটি তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। জাতীয় মনোভাব কি রকম পেটা তিনি জানতেন এবং জাতীয় রুচির বিস্তৃতি কোথায় পেটাও তিনি ঠিক ধরেছিলেন। অতএব তাঁর চেষ্টা ছিল যাতে রুচির পোখন হয় অথচ তা জাতীয় মনোভাবের পরিপন্থী না হয়। এই হৃদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বাংলা গানের একটি স্থলান্তরিত রূপ প্রদান করলেন। এই সংগঠন-পরিচালনার তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বড় কম ছিল না। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে বাঙালীকে কঠিন হর্দোগের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। নিধুবাবু তাঁর দীর্ঘজীবনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহাবিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব তাঁকে নিত্যমাত্র ভাবগ্রহণ করে তোলে নি, তাই তিনি অগ্রপশ্চাত্ত ভাবেই আমাদের সংস্কৃতির সংস্কার-সাধনার অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে ধারা সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হলেন তাঁরা এতটা সাধনাত্মক অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না এবং এইখানেই তাঁরা যত তুল করলেন যার ফলে বহু সংস্কৃতি আর লুপ্ত হয়েছে।

গন্ত শতাব্দীতে শিক্তি সনাতনের অনেক স্থনীতি এবং সৃষ্টি প্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহে অনেক সৃষ্টি কলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। আমাদের চরিত্রের দুর্বল দিকটা বিশেষভাবে প্রকট হবার ফলে

একটা সংস্কারের আশ্রয় প্রয়োজন ছিল সভ্য। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থার কোনো কারণ ছিল না। নব-শিক্ষার প্রভাবের সূত্র পরিবর্তন এমন বৈষম্যবিশিষ্টভাবেই ঘটল যে পুরাতন প্রচলিত গানের কতটুকু রক্ষণীয় এবং কতখানি বর্জনীয় সেটি ভেবে দেখবার অবকাশ ঘটে নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে উদার মনোভাব সে যুগের শিক্ষিত সমাজে জীবনকে বৃহৎ এবং ব্যাপকভাবে দেখবার সহায়তা করেছিল সে ঊর্ধ্বাঙ্গ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্রুত হয় নি। মনে হয়, প্রচলিত সংস্কৃতিকে সাধারণভাবেই নিত্যস্থান অশিক্ষিত স্তরে আরোপ করা হয়েছে যেন সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবই সেউড়ের স্বগোষ। এই মনোভাবের ফলেই তৎকালপ্রচলিত প্রথম-সংস্কৃতির একটি বৃহৎ অংশকে কলুষের পরিচায়কজ্ঞানে ভ্রমসম্মত থেকে বর্জন করা হয়। এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু নিষ্ফল গানও দুর্নামের ভাণ্ডী হয়েছে। কালধর্ম নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠত্বের অসামান্য স্বীকৃতিও অন্যদিক থেকে অবহেলায় অবজ্ঞাত হয়ে রইল। নিধুবাবুর ক্ষতিও এইখানে যে, তিনি তাঁর যুগের সংস্কৃতিকে অস্বীকার না করে স্বসংস্কৃত করে নিয়েছিলেন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও অবহেলা করেন নি। আর পরবর্তী যুগের অশাল্য এইখানে যে, তাঁরা প্রবর্তন সংস্কৃতি-সংস্কৃতির উপর প্রবল আঘাত হেনে তাকে ভেঙে দিলেন কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য অথচ স্থলিত সংস্কৃতিগঠন লক্ষ্য হন নি। নিধুবাবুর মতো প্রগতি-বাক্তিগতপন্থা এবং সামাজিক পরিবর্তনে সচেতন সংস্কৃতিমগ্না যদি তাঁর অব্যাহত পরেই আর কেউ থাকতেন তবে দ্ব্যস্তো তিনি যুগোপযোগী মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে সংস্কৃতি স্থাপন করতে পারতেন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও অক্ষুর রাখতে পারতেন, কিন্তু সেই রকম অভিজ্ঞ এবং শিল্পকৌশল ব্যক্তি সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। বস্তুত গত শতাব্দীর অপরাধে কয়েকজন অসাধারণ সংস্কৃতিচর্চাকারীর উদয় না হলে আমাদের সংস্কৃতি-সংস্কৃতি বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়ত। পরবর্তী সংস্কৃতিমগ্নরা পূর্বের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং ক্ষতি যা হবার তাও হয়ে গেছে। তবুও রক্ষণশীল একটি সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় অতীতের কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগত আদর্শ পাচ্ছি। তাঁরাই কেবল এসব গানকে সম্পন্নজ্ঞানে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

নিধুবাবুর বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের পরিচয় পেলে তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাবে। সে যুগের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য এবং গতির সঙ্গে নিম্নেই তাঁকে দেখা কর্তব্য।

ক্রীষ্টীয় ১৭৪১ (১১৪৮ বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধেরও বোলো বছর আগে নিধুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন কলকাতার কুমারটুলির বাসিন্দা। তাঁর পিতা বর্গীর ভয়ে ত্রিবেণীর কাছে চাপড়া গ্রামে চলে এসেছিলেন এবং এইখানেই তাঁর জন্ম হয়। বছর ছয়েক বয়সে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং শিক্ষালাভ করান। নিধুবাবু সংস্কৃত পারদর্শী ছাড়া ইংরেজিও কিছু শিখেছিলেন। পরে সম্ভবত ইংরেজি পাঠ্যভাষা আরও ভালোভাবে করেন। শেষ জীবনে তিনি ইংরেজি বই পড়ে অঁসর বাপন করতেন। এর থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন অথচ এর কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। সংস্কৃত পারদর্শীও তিনি ভালোই জানতেন। এই ব্যাপক শিক্ষার ফলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও তিনি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। রামমোহন রায় প্রবর্তিত আন্দোলনে তাঁর ঐচ্ছিকতা ছিল এবং সম্ভবত রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রহ্মসংস্কৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ব্রহ্মসংস্কৃতিও রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর পূর্ব জয়গোপাল কব্জ ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) থেকে একটি চিত্তাকর্ষক অংশ উদ্ধৃত করছি—

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণ উপাচার্য শ্রীমহোদয় বিজ্ঞানোপাধায়ক মহোদয় একদিন রাত্রে নিম্নোক্ত আদেশ করিলেন—“বহান্ন, একটি ব্রহ্মসমাজী রচনা করিয়া প্রণয় করাইতে হইবে।” সেই অমৃতোষে বায়ু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ নৌন থাকিয়া এই পিত রচনা করিয়া ভনীলেন, বহা।

বোহাগ—ভাগ্য আড়া

শরৎকাল তৎপরাংপর পরসেবর
নিরন্তর নিরাময় নির্বিশেষ সঙ্গার
আশনা আপনি যেহু বিহু বিবধর
সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানাজান বহা বাস
প্রাপক সূতাবিকার
অমৃতর প্রাণধর খানস বিজ্ঞানবর
কেহোতে আনন্দর প্রাণ সিদ্ধ নর।

বিজ্ঞানোপাধায়ক মহোদয় এই পিত প্রণয় করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন—“বায়ু তুমি সাধু তোমার অসাধারণ কবিতামূর্তি আমার চক্ষুতে হইয়াছি, কারণ এ প্রকার পিত পূর্ণ, কখন রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই, বাহা হটক এই পিত বেত্তমানবীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে কেহাইরা ব্রাহ্মসমাজে গান করাইব।” এই কথাব্যবহার পর কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতদাচার্য্য সঙ্গার পরিহার করত ব্রহ্মসমাজে যাত্রা করিলেন। একান্ত অসুস্থ হইতেহে এ পিত সঙ্গারের পিত ভুল হয় নাই, অমৃতকণ রহিয়াছে।

বে যুগে বাঙালীর কাছ থেকে রামমোহনকে বহু বাধাবিপত্তি এবং উৎপীড়ন সহ করতে হয়েছিল সে যুগে নিধুবাবু কোনো সামাজিক মতবাদে শিরোধর্ম থেকে বিচ্যূত হন নি— ব্রহ্মসংস্কারের শান্ত সমাহিত রসে পরিচয়িত সঙ্গের অবগাহন করেছেন। এই গানটি থেকে সংস্কৃত মর্শনসাহিত্যে তাঁর অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি দীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু বাংলার এক বিরাট সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্মের সময় আলিবর্দি মুকের ভিতর দিয়ে বাংলার মঙ্গল মঞ্চ করেছেন। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে এল পর পর নির্মূল বর্গীর আক্রমণ। কলকাতার ইংরেজের সঙ্গে নবাবী শৈল্পের সংঘর্ষও বোধ হয় তিনি চোখের উপর দেখেছিলেন— তখন তাঁর বয়স প্রায় পনেরো হবে। ঐমুকের বাংলা সাহিত্যে তখন ভারতচন্দ্রের রাজত্ব। ভারতচন্দ্র এখন মারা যান তখন তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণ। ভারতচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে তিনি হৃদতো প্রেরণা পেতেন নতুন কিছু সৃষ্টি করার এবং হৃদতো অল্প বয়স থেকেই গানও বাঁধতেন কিন্তু তাঁর বহু গান হারিয়ে গেছে। তাঁর অল্প বে কটি রচনা আমরা পাই তা থেকে কোনোটি কোনোমতকার রচনা বোঝবার উপায় নেই।

সম্ভবত টমার সঙ্গে নিধুবাবুর তরুণ বয়স থেকেই পরিচয় হয়েছিল। নিধুবাবু পূর্বে টমার ধরন বে বাংলায় প্রচলিত ছিল না এমন মনে করা সংগত হবে না কিন্তু টমার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং জ্ঞানবিশিষ্ট নিধুবাবুই বিশেষভাবে প্ররোগ করেন। টমাকে যে এত ব্যাপকভাবে প্ররোগ করা যায় সেটা বোধহয় তাঁর পূর্বে আর কেউ ধারণা করতে পারেন নি। বাংলা টমার সাংস্কৃতিক বিবরণে বখাখণ্ডভাবে করা হয় নি। আগেকার গ্রন্থাদিতে টমার বে সজ্ঞা দেওয়া আছে তার সঙ্গে বাংলা টমার কিছু প্রভেদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত “সীতাবলী”র বিত্তীয় সংকরণে টমার বে বর্ণনা আছে সেইটি উদ্ধৃত করি—

টম্বা হিন্দী নয়, মাঝি অর্ধ লক্ষ, তারা হইতেই স্ফূর্তি সংক্ষেপ, অর্থাৎ ক্রম ও খোলা অংশকা যে বান সংক্ষেপের, তাহার নাম টম্বা। ইহার কেবল দুই তুক; আচারী ও অস্তর। খোলায়ের প্রায় সকল তালই টম্বার ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্ভূতিটি আরও কয়েক দ্বারগায় দেখেছি বলসেই এই প্রগতি উত্থাপন করা গেল। টম্বা ক্রপদ এবং খোলা থেকে সংক্ষেপের বলসে বাংলা টম্বার ভাব্যপণ্য বোঝা যায় না, কেননা এমন অনেক বাংলা টম্বা আছে যাতে উন্নত সঙ্গারী আছে। অতএব বাংলা টম্বা যে দুই তুক সোনারত্ন এ ধারণাও ঠিক নয়। আসলে টম্বা খোলায়ের রকমের হলেও উত্তরভারতীয় টম্বার কয়েকটি শিল্পকৌশলকে অবলম্বন করেই বাংলা টম্বা রচনা করা হয়েছে। নিছক খোলাদিয়ার দৃষ্টান্তে বাংলা টম্বা রচনা করা হয় নি— বাংলার টম্বা বাংলার কাব্যসংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

যদি হোক, তরুণ বয়সে নিধুবাবু টম্বা তথা বাংলার সংগীত সম্বন্ধে কতটুকু ভেবেছিলেন আমি না, তবে সংগীতচর্চার পূর্ণ অবসর হয়তো তাঁর বেলে নি, কেননা সময়টা আসৌ শান্তিপূর্ণ ছিল না। নিধুবাবুর বয়স যখন যোলা তখন পলাশীর যুদ্ধের ফলে তুমুল পরিবর্তনের মধ্যে সেপে নান। দুর্দৈব ঘটেছে। তার পরে দেখা দিল হিয়ারত্নের মরুভূমি। সেই বিভীষিকাও নিধুবাবুকে স্নেহেতে হয়েছে। তারও বছর সাতেক পরে তিনি চাকরি উপলক্ষে ছাপরায় যাত্রা করলেন। ছাপরা কালেক্টরের সেওরান ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর চেষ্টাতেই একটি কেরানির পদ পেয়ে গেলেন। প্রায় আঠারো বছর চাকরি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে সেওরান পালাটে ছিল। এর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কেউ কেউ বলেন হিলাবের খাতার পান লেখবার ক্ষমতা হাঠেবেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি পদত্যাগ করেন, কিন্তু এ রটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ছাপরায় তিনি দীর্ঘকাল সংগীতসাধনার স্বযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এক মূলমন্ত্র ওস্তাদ ছিলেন। তিনি প্রথমটা বেশ শিবিরেছিলেন কিন্তু পরে আর কিছু দিতে চাইলেন না। অতএব নিধুবাবু নিজেই সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলার কাব্যসংগীতকে সংগঠন করার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হন।

কলকাতার যখন ফিরলেন তখন তিনি প্রৌঢ় অতিক্রম করেছেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি সংগীত-চর্চাতেই অতিবাহিত করেন। প্রায় সাতানব্বই বৎসর বয়সে ১৯৭২ সালে (খ্রীঃ ১৮৩৮) রামনিধি গুপ্ত লোকান্তরিত হন। বৃদ্ধার অন্তকাল পূর্বে তাঁর একটি সংগীতসংগ্রহ “গীতরত্ন” নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিভিন্ন পুত্র ভ্রাতৃগোপাল এই গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করেন।

সুদীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং সম্মানলাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বন্দর আকৃতি এবং গভীর প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্প এবং সার্বিক প্রয়োগশিল্পী। এই প্রয়োগশিল্প চিত্রকলাই তাঁর দৃষ্টান্তে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।

স্বরলিপি

১

ত্রি'কিট-খাখাজ । আট নাকার বং । স্বরলিপি কৃষ্ণনাকার লিখিত

কত বা মিনতি ক'রে আমারে ভূলালে—

এবে অপরাধ দেখো, দেখা না দেয় সাধিলে ।

এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,

জানিলে আপন মন কেন বা সঁদিব ।

না ভেবে এই দে হল ভাসি হে দুখ-সলিলে ।

কথা ও সুর ॥ নিধুবাবু : রামনিধি গুপ্ত

স্বরলিপি ॥ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সা গা II [গা গা গমা-পপা-মগা-^১গা । মা পা -১ I
ক ত বা নি ন তি ক রে .

গা পমা গা -মরা রা গা । গমা-পপা-মগা-রগা । -মমা -গরা -সসা -১ I
আ না . রে লে

I -১ (সা গা) } । গা মা । ধা ধা -১ ধা । ধধা -সর্সা -সর্গা -ধা । ধা পা
. ক ত এ বে অ প . রু প দে খে।

I -মগা -১ গা মা । পা সর্সা -১ ধা সর্সা সর্গা -ধপা -মপা । -ধধা -পমা-গপা-পমা I
. দে খা না রে ব . সা ধি লে

I -গরা -সা সা গা II
. . . . "ক ত"

গা মা II [পধা-নর্সা -^১না না । না না না না সর্সা না সর্সা I
এ ন ন হ ই বে আ গে কে ম নে

I -১ সর্গা -ধধা-নর্সা না সর্সা -১ পা না না -১ । না না সর্সা না I
. জা নি ব . জা নি লে আ প ন য

I সর্সা সর্সা র্সা র্সা -পধা পা সর্সা । সর্গা -ধপা -ধধা -পধা । -পমা-পধা-ধপা-মগা I
ন কে ন বা গ পি ব

I -রগা -১ (গা মা) } । গা মা । ধা -১ -বর্সা -বর্সা পা ধা ধা ধা -১ I
. এ ম না জে নে এ ই দে হ ল .

I পা পা ধা ধা ধা । ধধা -পধা -পধা -বর্সা । -সর্গা . -ধা -ধা ধা I
ভা সি হে হ গ স লি

I পা -১^১ গা মা পধা -বর্সা বর্সা সর্গা । -ধপা ধধা ধপা -মগা । -মপা -পমা-গরা-সসা I
লে ভা সি হে ছব ল লি

I -১ -১ সা গা II II
. . . . "ক ত"

কামোদ-খাখায়ে । ডেউলা

নানান দেশে নানান ভাষা ।

বিনে বদেশীয় ডাঙা পূরে কি আশা ।

କଥା ନାହିଁ ମହୋଦଳ କିବା ଯଜ୍ଞ ଚାନ୍ଦକୋର,

ধারাবাহিক বিনে কত ঘটে কি ভয়া ।

कथा ७ सुर । निधुवावु : रायनिधि शुभ

ସ୍ବରୂପି । ଶ୍ରୀରାଜୋଦର ସିଂହ

II গা গম। -পা। -গা। -মা। রা। মা। রা। গরা। -পা। পা। I
না না। ন। বে। শে। না। বা। ন। জ।

ধা ধা গা ঘা । মা পবা -বসা -গা -ঘা । -না ধা পা
বি বে ব ভে ঐ ধা • যা

I গা গা গা মা গম।-পখ।-ধখ।-পম। । -গম।-পশ।-পশ।-মগ। । -রগ।-মগ।-রম।-। II
 প রে কি অ। শা।

II {-। না মা পা ধনা- -সর্গা- -ধশা- -ধা। সর্গা না সর্গা I
 . ক ত ন দী. . . . প্রো ব র

I না না মী না নর্মী - র্মসী - বধা - । ধবর্মী - সর্গধা পা -। I
 ক্রি ভা ঞ জ তঃ কো . ব .

I -। মা । পখা -গর্মা -গা -ধা । -বা ধা পা I
বি বে ক

I পা ধা মী হী । গঁর্বগা-ওঁর্বওঁর্বী-ওঁর্বওঁর্বী-ওঁর্বগা । -ধবধা-পধপা-ওঁর্বগা-ওঁর্বগা । -ওঁর্বগা -স। -। -। II II

বাংলার নবজাগরণে বিশ্ব-সভার দান

বিমল শেখ

বিভাসাগরের যুগ

বিশ্ব-সভার তৃতীয় যুগটিকে বাংলাদেশে 'বিভাসাগরের যুগ' বলা যায়। এই যুগটি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ ছুড়ে (১৮৪০-১৮৭৫) বিস্তৃত। এই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা হলেন ইশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর। বাংলাদেশে বিশ্ব-সভার ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত হল। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙালী বিশ্বজ্ঞানের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে অনেক বাড়ল। বিশ্ব-সভার নিমিত্ত হয়ে, সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা-আলোচনা করার জন্য তাঁরা অনেক বেশি উৎসাহী হলেন। প্যাক্কা ভাবধারারও দ্রুত আমদানি হতে আরম্ভ হল। ইংরেজ ও শিক্ষিত বাঙালী, উভয়েই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতের পর, উজ্জ্বলের আবেগাভিষা প্রদর্শিত হয়ে, সামাজিক জীবনে সাবোত্র সর্বাঙ্গ-পর্বের সূচনা হ'ল বলা চলে। তৃতীয় যুগের বিশ্ব-সভাগুলি এই সর্বাঙ্গ-পর্ব ও আত্মীকরণের পথ প্রস্তুত করে দিল।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, এর মধ্যে, বিশ্ব-সভার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম যুগের 'আত্মীয় সভা', 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ছিল স্বতন্ত্র। যেরোয় বৈঠকের নতন। দ্বিতীয় যুগের 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নেশন' বা 'তত্ত্বাবোধিনী-সভা' আর যেরোয় বৈঠক টিক রইল না, তার কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হল। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও, ইং বৈঠকের যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রেরণার ক্ষেত্রে, জ্ঞানাবেষণের ক্ষেত্রে, তার দান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তত্ত্বাবোধিনী সভার কাজ বিভাসাগর-যুগে আরও বাড়ল। বিভাসাগর মহাশয় নিজেও তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সরিষ্ট হলেন। কিন্তু নতুন যে-সব বিশ্ব-সভা তৃতীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত হল, তার স্বরূপই অনেকটা বদলে গেল। সমাজ-জীবনের গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে জ্ঞানতপস্বী করলে, বিশ্ব-সভা যে প্রাণহীন স্থানান্তরিত অ্যাকাডেমিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত দেশের বিশ্বজ্ঞানদের বৃহৎশের সঙ্গে তার যে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্পর্শও থাকে না, এ দৃষ্টান্ত আখ্যায়িক দেশে বিরল নয়। ঊনিশ শতকে বাংলাদেশে যে-সব বিশ্ব-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কোনোটাই সমাজ-জীবনের যোগদানে ছিন্ন করে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ অ্যাকাডেমিতে পরিণত হয় নি। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, প্রত্যেক যুগের বিশ্ব-সভার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। স্বয়ং সেগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ দেশের বিশ্ব-সমাজ প্রধানতঃ এই সব সভার ভিতর দিয়েই আয়তনশীল ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং নিজেদের জ্ঞানবিজ্ঞানকেও সমাজ ও দেশের কল্যাণের কাছে নিয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ছোট ছোট সভাসমিতি ও আলোচনা-চক্র এই সময় অনেক বেশি গড়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনে

তারের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু যে কয়েকটি বিদ্য-সভা, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, শিক্ষিত বাঙালীর দ্বাৰা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—

- বেথুন সোসাইটি (১৮৭১)
- বিক্রোংসাহিনী সভা (১৮৭৩)
- স্বল্প সমিতি (১৮৭৩)
- ফ্যানিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৭৭)
- বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭)

এ ছাড়া, পূর্বে স্থাপিত হলেও, 'তত্ত্বাবোধিনী সভার' প্রতিপত্তি এই সময় আলো ছড়ায় নি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনদের তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য, শিক্কা ও সমাজ-জীবনকে ঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

বেথুন সোসাইটি

১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর ডক্টর ম্যুট মেডিক্যাল কলেজে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রসোকদের একটি সভা ডাকেন এবং সেই সভায় একটি নতুন বিদ্য-সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এমিষ্টিফিক সোসাইটি ও স্বল্প সমিতির কথা উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, শিক্ষিত বাঙালীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পান, তার অত্র এই জাতীয় বিদ্য-সভা আরও বেশি স্থাপন করা উচিত ("...pointed out the great necessity of devising some means of bringing the educated natives more into personal contact with each other...")। এই সভায় ম্যুট আরও একটি কথা বলেন যা প্রবিধানযোগ্য। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বিদ্য-সভার চুনিকার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, এ দেশের সমাজের গড়নই এমন বীথায়, সামাজিক প্রথার বন্ধন এত কঠোর যে পরিবার ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের সুযোগ এ দেশে অনেক সীমাবদ্ধ। বিদ্য-সভার প্রয়োজন এ দেশের স্বল্প সামাজিক জীবনযাত্রার অত্রও তাই এত বেশি ("...how much more such means of mental improvement and intellectual recreation were needed in this country, where, from the very constitution of native society and the social customs of the people, even the private relations of individuals and families were necessarily much restricted.")।

• ডক্টর ম্যুটের এই কথাগুলি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, আরও এ কথার মূল্য আছে। উনিশ শতকে বিদ্য-সভার ক্রমোন্নতি ও বিকাশ হয়েছিল যেমন, বিশ শতকে তেমনি তার ক্রমবর্ধন ও অবলম্বিত হয়েছে। বিদ্বজ্জনদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও চিন্তাভাবনার লেনদেনের পথও আরও বর্ধিত হয়েছে। 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ম্যুটের কথার তাৎপর্য তাই আজ আরও বেশি করে বোঝা যায়।

মেডিক্যাল কলেজের আলোচনাগোষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর স্ক্রব্‌টী, ডক্টর স্মিথ, হোভার্ড লঙ

প্রভৃতি যোগ দেন। সভাতে দ্বিহু হইবে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিধং-সভা স্থাপন করা প্রয়োজন ("A Society be established for the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science")। এর কিছুদিন আগে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়। ব্রীশিকা প্রভৃতি এ দেশের নানাপ্রকার সমাজকল্যাণকর কাজে উদ্যতগিরি বেথুন সাহেবের গানের কথা স্মরণ ক'রে, নতুন সভার নাম রাখা হয় "বেথুন সোসাইটি"।^১

সোসাইটির উদ্বোধন-সভাসের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীদের সংখ্যা ছিল বেশি। শিক্ষিত-সমাজে ধারা লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানসাহী ইংরেজ পাণ্ডিত্য ও রাজকর্মচারীরাও যোগ দিবেছিলেন। সোসাইটির রিপোর্টে এই উদ্বোধনসভার নাম দেখা হয়েছে এইভাবে :

জে. এফ. মুখাট	হরমোহন চ্যাটার্জি
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	জগদীশনাথ রায়
রেভারেণ্ড লড	নবীনচন্দ্র মিত্র
মেজর জি. টি. মার্শাল	জ্যোতির্মোহন ঠাকুর
রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি	প্যারীমোহন সরকার
ডক্টর স্পেন্সার	মেবেল্লনাথ ঠাকুর
ডক্টর চক্রবর্তী	প্যারীচাঁদ মিত্র
এল. চ্যাট	রসিকলাল সেন
বাবু হারমোপাল ঘোষ	প্রমথমুখার মিত্র
রাধানাথ শিকদার	গোপালচন্দ্র বসু
রামচন্দ্র মিত্র	হরিচন্দ্র বসু
কৈলাচচন্দ্র বসু	দক্ষিণারতন মুখার্জি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মেবেল্লনাথ ঠাকুর বহন বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী হয়েছিলেন তখন তাঁর আর্থগত রূপেরও যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা পরিকার বোঝা যায়। সংঘ ও সমন্বয়-সাধনা ছিল সভার অন্ততম নীতি। রেভারেণ্ড কুকমোহন, হারমোপাল ঘোষ, দক্ষিণারতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইহু বৈবলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন এক মুহূর্ত, পাণ্ডিত্য লভের নতন বিদেশী বিদ্যোৎসাহীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সমাজ বাঙালী সমাজের অগ্রগণ্যদের মধ্যে সকলেই যে বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্য উদ্বোধনী হয়েছিলেন, তা নয়। রাখাকান্ত সেব এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহী হন নি, পরে অবশ্য সভা হয়েছিলেন। ধর্মসভার ধারার ধারের মানসিক ও বৃত্তিবৃত্তি লালিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকই বেথুন সোসাইটির সম্পর্কে আসেন নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ধারা সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুসলমান বিধং-সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। মৌলবী আবদুল লতিফ ষা

(১) বেথুন সোসাইটির বিবরণ সোসাইটির ট্রান্সাকশন ও রিপোর্টগুলি থেকে সংগ্রহ করছি।

The Proceedings of the Bethune Society (1859-60, 1860-61); Calcutta, 1862.

The Proceedings and Transactions of the Bethune Society (Nov. 10, 1859—April 20, 1860); Calcutta 1870,

ঔপ্যে অকৃতব। বেখুন সোসাইটিং আংগে আর কোনো বিদ্যৎ-সভার মুসলমানরা এ বকম সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

সোসাইটিং নিয়মাবলী বা স্ক্রিপ্ট হযেছিল, তার মধ্যে নীতি-সংশ্লিষ্ট পক্ষ নিয়মটি হল—

Discourses (written or verbal) in English, Bengali or Urdu, on Literary or Scientific subjects, may be delivered at the Society's Meetings, but none treating of religion or politics shall be admissible.

‘সোসাইটিং অধিবেশনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে, ইংরেজি বাংলা বা উর্দু ভাষায়, লিপিত বা বৌখিক ভাষণ দেওয়া যাবে, কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষিদ্ধ।

প্রথম দিকে সোসাইটিং উদ্ভাবনার ধর্ম ও রাজনীতিতে সাহিত্য-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি এবং এগুণ বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেন নি। তার কারণ, উর্দু মনে করেছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি আলোচনায় ঔপ্যে আসল উদ্দেশ্য বার্থ হবে এবং অকারণে বিতর্কভাব সভ্যের মধ্যে আগিয়ে তোলা হবে। ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, তিনটি ভাষাতেই সভ্যের আলোচনার অধিকার ছিল। উর্দুর উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়, বেখুন সোসাইটিং আলোচনায় মুসলমানরাও যোগদান করতেন।

প্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই সোসাইটি শিক্ষিতশ্রেণীর প্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঢাকা শহরেও “The Branch Bethune Society of Dacca” নামে একটি শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বছরে ১৮৭২ সালেই কলকাতায় সোসাইটিং সভ্যসংখ্যা হয় ১০১ জন, তার মধ্যে ১০৬ জন বাঙালী। পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বাড়ে—

	১৮৭৩	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭
মোট :	১৪০ জন	২২৮ জন	২৮১ জন	৩০৪ জন	৩৪২ জন
বাঙালী :	১১২ জন	?	?	?	?

পৃথকভাবে এসেই ও বিদেশী সভ্যের সংখ্যা পরে রিপোর্টে উল্লিখিত না হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে সোসাইটিং সভ্যসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শ হয়েছিল, এবং তার মধ্যে অন্ততঃ তিন শ জন বাঙালী ছিলেন বলে মনে হয়। শিক্ষিত বাঙালী সবারে ‘এলিট’ (Elite) বা সন্ন্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হবার মতন ব্যক্তি ১৮৭৭ সালে এর চেয়ে খুব বেশি ছিলেন না। বেখুন সোসাইটি এই বাঙালী এলিট-সমাজের সঙ্গে ইয়োরোপীয় উচ্চ সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের স্বযোগ করে দিয়েছিল। ১৮৬১ সালের রিপোর্টের তুলিকায় এই কথাই বলা হয়েছে :

“A Society which had succeeded in bringing together—for mutual intellectual culture and rational recreation, the very elite of the educated native community and blending them in friendly union with leading members of the Civil, Military and Medical services of Government, of the Calcutta bar, of the Missionary body, and other non-official classes ;...”

১৮৭২ সালে সোসাইটি প্রায় অচল হয়ে ওঠে। দেখা যায়, সভ্যরা অধিকাংশই অধিবেশনে আসেন না, এবং ১৮৭৮ টাকা তাঁদের টাঙ্গা ব্যক্তি পড়েছে। কোনো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করাও

আর হয় না। সভাপতি মুয়াট ইংলও দ্বাবার পরে হজলন গ্র্যাট, গুডউইন, জেমস হিউম দ্বাবার পরে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হন। হিউম সাহেব ভরখাখোর ক্ষত্র সভার কাজে তেমন ননোযোগ্য দিতে পারছিলেন না। এই সময় সভার পুরাতন সভাপতি চিন্তা করতে থাকেন, কিভাবে তাকে পুনরুদ্ধারিত করা যায়। প্রথমতঃ এমন একজনকে সভার প্রেসিডেন্ট করা দরকার, যার উপর সম্প্রদায়-নিবিশেষে শিক্ত-সমাজের অনেকের আস্থা ও ভ্রদ্ধা আছে। পাত্রি আলেকজান্ডার ডাকের নাম প্রস্তাব করা হয়—"though for various reasons which it is needless now to specify, he had never joined the Society as a member."

জাহ সাহেব প্রথমে রাজী হন নি। পরে তিনি রাজী হন এবং বোধ হয় তাঁর সন্তাই সোসাইটির পক্ষ নিয়মিত (পূর্বোক্ত) সংগোধান ক'রে, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। ১৮৫২ সালের ১৪ জুলাইয়ের অধিবেশনে ডক্টর শেভার্স সংগোদিত নিয়মিত প্রস্তাবাকারে পেশ করেন এই বর্ষে:

"The grand and distinctive object of the Society being to promote among the educated natives of Bengal a taste for literary and scientific pursuits, discourses written or verbal, in English, Bengali, or Urdu, may be delivered at the Society's meetings, on any subject which may be fairly included within the range of Literature and Science."

ধর্ম ও রাজনীতিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে গণ্য করা যেতে পারে, এবং আলোচনা-কালে সেই কথা বনে রাখলে কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারও না ঘটতে পারে। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায় এবং নিয়মিতও গৃহীত হয়। বেথুন সোসাইটির ইতিহাসে, এর পর থেকে, দ্বিতীয় পর্য্যবসায় পূর্ণতা হয় বলা চলে ("With the adoption of these resolutions, the Bethune Society terminated the first period of its existence, and was fairly projected upon its second".)

সমাজবিজ্ঞানের চর্চা

সাহিত্য ও ধর্ম, মনোবাস্তব, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান—এই কয়টি বিভাগ ছিল বেথুন সোসাইটিতে। বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক বিভাগের পরিচালকদের কৃত কার্যকর্ম ও ভবিষ্যতের পরি-কল্পনা সম্বন্ধে একটি ক'রে রিপোর্ট পেশ করতে হত। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি। ইয়োরোপেও তখন সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল বলা চলে। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন প্রগতিশীল আদর্শ দ্বারা এ বেশে বহন ক'রে মানতেন, তাঁরাই সেদিন বাংলাদেশে অগ্রগত বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চর্চারও যে প্রয়োজন আছে, এ কথা বুঝেছিলেন। বিধ-সভার মধ্যে বাংলাদেশে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তকরূপে যদি কতকিছু লক্ষ্যন দিতে হয়, তাহলে সে-লক্ষ্যন বেথুন সোসাইটির প্রাপ্য। তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ও অগ্রণী হয়ে এই বিভাগের দায়িত্ব নিজে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি পাত্রি লড সাহেব। বাংলার জ্ঞানভাণ্ডারে পাত্রি লডের দান শিক্ষিত বাঙালী মাঝেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানচর্চার আদি উৎসাহদাতা

হিসেবে লও সাহেবের কথা ভাবলে, অস্বস্তি দেখে তিনি যা করেছেন, সব জান হয়ে যায়। ভাবলে অবাক হতে হয়, আশ্রয় থেকে একশ বছর আগে তিনি এ বেশে সমাজবিজ্ঞান-চর্চার বে প্রয়োজনবোধ করেছিলেন, আর শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সেই বোধশক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছে। অথচ বিংশ শতাব্দীতে আর আবরা সমাজবিজ্ঞানের যুগে বাস করছি বললেও ভুল হয় না।

এই প্রসঙ্গে পাড়ি লও সাহেব একবার তাঁর রিপোর্টে খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর উদাসীনতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

“One of the reasons why so little in the way of writing has hitherto been contributed to sociology by educated natives and others, may have been the system of education that has prevailed and is prevailing, which cultivates memory to the exclusion of almost every other faculty and particularly the necessary one of observation...”—Report of the Sociological Section, Bethune Society, April 26, 1861.

আজও যে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সমাদর বাড়ছে নি, তার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষার গোড়ার গলম আছে। পরীক্ষায় কৃতী ছাত্ররা ততটা সৃতিশক্তির সাধনা করেন, বিচারবিরোধ-শক্তির সাধনা ততটা করেন না। শিক্ষাপদ্ধতিই এমন যে তার মধ্যে একবার দায়িত্ব সৃতিশক্তি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির অহুতিলনের সুযোগ থাকে না। বিশেষ করে, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে বিরাট জ্ঞান-স্রবণ আছে, পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষার দ্বারা সে-সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলও রাগে না। শিক্ষিত বন অশ্লক্ষণী হয় না, বিচারমুখী হয় না, কেবল মুখস্থবিজ্ঞার গভীর মধ্যে থেকে নিশ্চিত চাহুরিগত জীবন কাটিয়ে দেয়। সমাজবিজ্ঞানের চর্চা এইজন্য আজও আমাদের বেশে প্রচলিত হয় নি। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, কোনো ক্ষেত্রেই আজও আমাদের বৈজ্ঞানিক অহুতিলনের সূচনা বাড়ছে নি। সর্বত্রই আমরা সৃতি স্রুতি ও অলংকরণের স্রবণে বিভ্রম করিতে চাই। তাই বাংলা সাহিত্যে কাব্য ও গল্প-উপন্যাসের এত প্রাচুর্য এবং অল্প দিকে বিশ্বদরকার দৈন্ত দেখা যায়।

১৮৬১ সালে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে লও সাহেব খুব আশঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন—

“The time is very favourable for sociological investigations as an *Educated class* of natives is rapidly rising, qualified not only to investigate, but also to write the results of their investigations.” লন্ডের আশা আজও সফল হয়নি। বেথুন সোসাইটি ও তার সমাজবিজ্ঞান বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। সোসাইটি থাকাকালীন পরে একটি স্বতন্ত্র ‘সমাজবিজ্ঞান সভা’ও স্থাপিত হয়েছিল। সে-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। কিন্তু তা গবেষণা, সমাজবিজ্ঞানচর্চার উৎসাহ শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন বাড়ছে নি। ভ্রমবিমূখ, অহুতিলনকাতর, কল্পনাগ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী আজও বৈজ্ঞানিক অশ্লক্ষণ বা আলোচনার প্রতি তেমন অস্বস্তি বন। গল্প ও কাহিনী জনতেই তাঁরা বেশি ভালোবাসেন। সবচেয়ে আশঙ্ক্যের কথা হল, বনবীণতার এই স্বপ্ন ধারাটি পঞ্চম আর আমাদের সামাজিক জীবন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার বদলে, অলস রোমাণ্টিক ভাবাভাবের রোনমনে আমরা জনেই প্রবৃত্ত হয়ে উঠছি।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

“নবমাসে সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অধ্যয়ন জন্য এক সভা করিয়াছেন” (সংবাদ প্রভাকর, ১৪ জুন ১৮৭৩)। এই সভার নামই “বিদ্যোৎসাহিনী সভা”। বেথুন সোসাইটির প্রতিপত্তির দৃষ্টেই এই সভা সিংহ মহাশয়ের পুত্রই স্থাপিত হয়, প্রধানতঃ বিদ্য-সভাকে একটি টিপিকল বাঙালী মহলিশে পরিণত করার জন্য। বেথুন সোসাইটির সব বাঙালী সভাই প্রায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার সঙ্গে ঘুট ছিলেন। নবীন তরুণ বিদ্যোৎসাহী ধারা বেথুন সোসাইটির গুরুগম্ভীর পরিবেশে খুব বেশি স্বত্বিবোধ করতেন না, তাঁরা প্রবীণবীর সংসর্গে আসতে ইচ্ছেও, বিদ্যোৎসাহিনী সভার ঘরোয়া পরিবেশে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এ-সময়ে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর বে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, তা উপভোগ্য :

“পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বলিলে আমার ঘেঁষিতে পাই যে, কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চ। আমার ধন ১৪১১ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর মোতালার একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে কৃষ্ণকমল পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণকমল পাল Commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা। জনিবা আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলেশাস্ত্রব, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটো সত্যক্ স্মরণ করিতে পারিতাম কিনা সম্ভেদ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড়লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাস্তবায়। আমি ছেলেশাস্ত্রব বলিয়াই হোক বা আর কোনও কারণেই হোক, প্রবন্ধগুলির মন্ত আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিববাবিবাংয়ের উপর—এখন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, ‘ছেলেশাস্ত্রবের প্রশংসা ক’রে ক’রে বাত কাটান যাবে না কি?’ কালী সিংহ সভার নাম নিগাছিলেন ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’; দুই লোকের তাহার নামকরণ করিল ‘রম্যোৎসাহিনী সভা’। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন। ১০০-বহো মতো সভ্যবিশেষ ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহ্বানাদিতে যোগদান করি নাই।”—পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ৮৪-৮৫।

কৃষ্ণকমলের মতন তখনকার তরুণ বিদ্যোৎসাহীরা কালীপ্রসন্ন সিংহের সভায় গিয়ে বক্তৃতা শুধুমাত্র আলাপ-আলোচনার যোগদান করতে পারতেন, বেথুন সোসাইটিতে তা পারতেন না। তার প্রধান কারণ বেথুন সোসাইটিতে ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও, তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বেথে। সভার কার্যকর্ম পাকাতা পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। তার কঠোর শৃঙ্খলা ও সংযত পরিবেশ, বাঙালীদের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয় ছিল না। তাই বেথুন সোসাইটির বাটো বাঙালী সংস্রব হয়েছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভা। একটু দিলেচাল। ঘরোয়া মহলিশি পরিবেশ না হলে বাঙালীদের বিদ্য-সভা বা সাহিত্য-সভা সম্বন্ধে চার না। সেই পরিবেশটি সিংহ মহাশয় তাঁর সভায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আর্থিক সাহায্যও ছিল এবং প্রধানতঃ তাঁর গোষকতাতাই সভা চলত।

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস বর্ণন ইত্যাদি মানাবিষয়ে সভায় আলোচনা হত। ইংরেজি ও বাংলা, দুই

জাভাতেই আলোচনা হত, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। সভার পক্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে কৃতী সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাণ্ডি শঙ্কর সাহেবকে বিভোৎসাহিনী সভা এই সময় সংবর্ধনা করেন। স্থলিখিত প্রবন্ধের জন্য সভার তরফ থেকে ২০০০-৩০০ টাকা করে পুরস্কারও দেওয়া হত। 'বিভোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে সভার একটি মুখপত্রও কিছুদিনের মত প্রকাশিত হয়েছিল। সভায় মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের আসুর বলত, নাটকেরও অভিনয় হত। 'বিভোৎসাহিনী রন্ধনক' নামে, সভার অর্থ হিসেবে, ১৮৪৬ সালে একটি পুথক রন্ধালয়ও সিংহ মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা রন্ধালয়ে ও বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রচলনে এই রন্ধনকের উল্লেখযোগ্য দান আছে।

ধনী ব্যক্তির সূত্রে সভা হত, তার সঙ্গে সংস্কৃত ও নাটক অভিনয়ও হত, এবং মধ্যে মধ্যে ভোজনানিরও ব্যবস্থা হত। সভা যে তখনকার বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকের সমাগমে বেশ জমে উঠত, তাতে সন্দেহ নেই। বিভাগাগর মহাশয়ও এই সভায় মধ্যে মধ্যে যেতেন। বড়লোকের বাড়ির এককম মন্ত্রলিঙ্গ সভাকে চুল্লীলোকে 'বিভোৎসাহিনী' না বলে যে 'বিভোৎসাহিনী' সভা বলে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের জাতীয় চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিষয়ও একটি। তখনও তার অভাব ছিল না। কিন্তু বিভোৎসাহিনী সভা যে মন্ত্রলিঙ্গ আড্ডার মধ্যেও বাইরের সমাজ-স্বাধীনতার ধারার সঙ্গে যোগ রেখে চলত, তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাংলার সমাজ-স্বাধীনে তখন একদিকে বিভাগাগর মহাশয় কর্ণধার হয়েছেন। তাঁর সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বিধ্বংসভার উপরেও পড়েছে। বেধুন সোসাইটি, বিভোৎসাহিনী সভা, কেউ সামাজিক স্বাধীনতার দ্বারপ্রতিষ্ঠান এড্‌মির চলার চেষ্টা করে নি। বিভোৎসাহিনী সভা নানানভাবে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় এই সভার সভার। অগ্রণী হয়ে কোম্পিলে ধরবার পাঠান। বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, বিধবাবিবাহ করতে ধারা ইচ্ছুক হবেন, তাঁদের প্রত্যেককে সভার পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য কোনো বিধ্বংসভার পক্ষে এই ধরনের পুরস্কারদি দিয়ে উৎসাহিত করা, যথেষ্ট আর্থিক পোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। বিভোৎসাহিনী সভার সেই পোষকতার অভাব ছিল না। না থাকলেও, এ কথা তুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তখনকার সমাজ বাঙালী সমাজে এরকম অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন ধারা এই ধরনের সভার পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন এবং সেই সভার মারফত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের কল্যাণক্ষেপে অনেক কাজ করতে পারতেন। তা না করে, বড় বড় বাঙালী ধনীর অধিকাংশ তখন অর্থের অপব্যয় করেছেন নানানভাবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণের কারণে পোষকতা করেছেন, এরকম ধনীর সংখ্যা তখনও খুব বেশি ছিল না। অর্থের চেয়ে বিভোৎসাহিনী সভার উৎসাহটাই হল বড় কথা। সেই উৎসাহ সঞ্চিতভাবে সভার সভার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

স্বল্প নমিত্তি

'স্বল্প নমিত্তি' নামের আগে 'স্বাধীনতাভিধানিনী' কথাটি আছে। প্রধানতঃ সমাজসংস্কারের প্রয়োজনবোধ থেকেই এই নমিত্তি স্থাপিত হয়। হুতরাং 'স্বল্প নমিত্তিকে' গ্রিক বিধ্বংসভা বলা যায় কিনা তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। গ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে তা বলা যায় না। ১৮৪৪ সালে

১৪ই ডিসেম্বর কান্টপুরে কিশোরীচাঁদ বিশ্বের বাসভবনে, সেবেজনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বে সভা ভাঙ্গা হয়, তাকে কিশোরীচাঁদ তাঁর ভাষণে, সমাধাৎকারের প্রয়োজনীয়তার কথা খুব জোর দিয়ে বলেন। তিনি এমন কথাও বলেন যে, কেবল প্রবন্ধ রচনা করে এবং বক্তৃতা দিয়ে কাজ হবে না। প্রাচীন ও নবীন বাঙালী সকলে মিলে মিশে একযোগে সমাজের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে।

সভায় হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং দাদবচস্পন্ন মিত্র সমর্থন করেন যে, সমিতির সভায় প্রত্যেকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী ভূমিকাভারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং নিজেরা এমন কোনো কাজ করবেন না যা যুক্তি, সভ্যতা, হুঁসিতি ও উদারতার বিরোধী। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে, খ্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-পুনর্বিবাহ প্রচলন, বালাবিবাহ বর্জন ও যব-বিবাহ নিরোধের ব্যাপারে সমিতির সভায় সমর্থন প্রদান করে সাহায্য করবেন। সেবেজনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং কিশোরীচাঁদ সমর্থন করেন যে, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের বিধিগত বাধা দূর করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হোক এবং খ্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য নগরের উপকণ্ঠে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক।^১

এই সব প্রস্তাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, হুঁসিতি সমিতি প্রধানতঃ সামাজিক সভ্য রূপেই স্থাপিত হয়েছিল, বিধব-সভা রূপে নয়। কোনো বিষয় নিয়ে বিধব-সভার মতন আলোচনা বা প্রবন্ধ পাঠ করা যে হুঁসিতি সমিতিতে হত না। তা নয়, কিন্তু সামাজিক হুঁসিতি ও সভ্যতাচরণের আদর্শ প্রচার করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায়, বিদ্যাসাগর-দুগ্গের বিধব-সভার সঙ্গে সামাজিক সভ্য খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। নতুন জ্ঞানবিদ্যার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের অহুত্ব তখন প্রায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

ক্যানিলি সিটারিয়ারি ক্লাব

সাধারণতঃ মেডিক্যাল কলেজের বিদ্যেটারে বেধুন সোশাইটির অধিবেশন হত এবং তার পরিবেশ ছিল পান্ডিত্য সভার মতন নীতিদ্রুত। ডক্টর দুর্গাট থেকে রেডারেও ভাঙ্গ পর্বত খান্না সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন, তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। ঠিক বরোয়া বৈঠকের অন্তরঙ্গতা সোশাইটির অধিবেশনে স্বভাবতই দুর্লভ ছিল। এই স্বভাব পূরণের জন্য সোশাইটির সভায় অসভ্য আরও অনেক সভা স্থাপন করেছেন, যেখানে আরও বেশি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। কান্টপুরের দিনে যখন এই সময় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপন করেছিলেন, তখনই প্রধানতঃ রেডারেও কল্লোহান বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮২৭ সালের বে মাসে "ক্যানিলি সিটারিয়ারি ক্লাব" স্থাপিত হয়েছিল। বেধুন সোশাইটি থাক। সবেও কেন তাঁরা এই সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন, তা তার নাম দেখেই বোঝা যায়। "ক্যানিলি" ও "ক্লাব" এই কথা দুটির মধ্যেই তা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। যে-কোনো বিদ্যোৎসাহী ক্লাবের সভ্য হতে পারতেন এবং শহরের ব্যাঙনাথ ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্ব চক্রাকারে ক্লাবের বৈঠক বসত। আলোচনার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব একই ছিল। যেসব বিষয় নিয়ে বেধুন সোশাইটিতে

২ দুই সমিতির বিষয় প্রাচীন পত্রিকারি ছাড়া, শ্রীধরনাথ বোমের "কর্মসূচী কিশোরীচাঁদ" গ্রন্থে (৫ পৃষ্ঠা, ২২-১১১ পৃষ্ঠা) আছে। বর্তমানে সেবেজনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতেও কিছু কিছু বিষয় পাওয়া যায়।

আলোচনা হত, ক্যামিলি লিটারারি ক্লাবেও প্রায় সেই সব বিষয় নিয়েই বৈঠক বসত। রীতিমত বিভ্রমও হত। ক্লাবে ইংরেজরাও বেগ দিতেন। স্টার রিচার্জ টেম্পল, রেভারেণ্ড ডল, রেভারেণ্ড মুন্সেল, ব্যারিস্টার উভ প্রমুখ বিজ্ঞানসাহিত্য এই ক্লাবের অগ্রগামী সভ্য ছিলেন। কেবল পরিবেশের পার্থক্য ছাড়া বেথুন সোসাইটির সঙ্গে লিটারারি ক্লাবের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।^৩

আলোচনা-সভায় বিশ্ববস্তুর বৈচিত্র্য

বেথুন সোসাইটি, বিজ্ঞানসাহিত্য সভা, হুগ্‌ব্‌ সন্থিতি, ক্যামিলি লিটারারি ক্লাব প্রভৃতি বিশ্ব-সভায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ছিল ব্যর্থ। কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো গোড়ানি ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা বেথুন সোসাইটিতে প্রথমদিকে নিষিদ্ধ ছিল বলে, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভ্যরা সকলেই খানিকটা অস্ববিধা বোধ করতেন বলে মনে হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বর্জিত হওয়ায় ক্ষত্র, সামাজিক সাহিত্যিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েই বেথুন সোসাইটিতে আলোচনা হত বেশি। সোসাইটির 'ট্রানজাকশন্সে' প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ের তালিকা থেকেই তা বোঝা যায়। ১৮৭২ সালের জাহুয়ারি মাস থেকে ১৮৭২ সালের মে মাসের মধ্যে যে সব বিষয় পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির তালিকা দিচ্ছি :

সাংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য : পঠিত ইংরেজ ভাষা

সাংস্কৃত কাব্য : রেভারেণ্ড কুম্‌মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কাব্য : হরচন্দ্র দত্ত

ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক : কৈলাসচন্দ্র বহু

বাংলা শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা : প্যারীচরণ সরকার

বাংলার কৃষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : রামশঙ্কর সেন

বৈজ্ঞানিক টেলিগ্রাফ : এইচ. উড্ডো

কলেজীয় শিক্ষার বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান : প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী

কৃষনগরে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ত ব্যক্তির চরিত্র ও সামাজিক জীবন : উমেশচন্দ্র দত্ত

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও মাতৃভাষার শিক্ষার সমস্যা : গগদীশনাথ রায়

বাঙালী সমাজ ও জীবন : হরচন্দ্র দত্ত

সংগীত প্রসঙ্গে : ক্রিসপ্যাট্রিক

বাংলার নারীসমাজ : কৈলাসচন্দ্র বহু

বাংলার ইংরেজী শিক্ষা : রেভারেণ্ড লালবিহারী মে

বাংলার শিল্প বিষয়বস্তুর পুনর্বিবাহসমস্যা : তারকনাথ দত্ত

সভায় পঠিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রাধান্য ছিল বেথুন সোসাইটিতে এবং অধিকাংশ আলোচনাই বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে করা হত। কাব্য দর্শন

৩ "ক্যামিলি লিটারারি ক্লাব" সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কুম্‌মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ হরিহর পাল আলোচনা করেছেন—
Bengal Past and Present, Vol. 38, Part I (July-September 1929)। ক্লাবের বাৎসরিক রিপোর্টও প্রকাশিত হত।

বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তত্ত্বপ্রধান আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিষয়বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটাই বড় হয়ে ছুটে ওঠে। বাংলাদেশে বাইরের সমাজ জীবনে, বিজ্ঞানাগর-মুগ্ধ, সমাজ ও শিক্ষার সমস্যা ছিল প্রধান। তখনকার বিধ্বংসবাদ এই সমস্যাগুলিই তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনের সঙ্গে তখন বাঙালী বিধ্বংসমাজের কতটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁরা তাদের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে কত গভীর ছিলেন, বিধ্বংসভার এই ইতিহাস থেকে তা বোঝা যায়।

বেধন সোসাইটিতে ধর্মালোচনার স্থানীয়তা না থাকার ক্ষত, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভার, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেও, আরও নতুন ছোট ছোট বিধ্বংস-সভা গড়ে তোলেন। তার মধ্যে বিজ্ঞানসাহিনী সভা ও ফ্যামিলি স্টিটারি ক্লাব অগ্রতম। অন্য দিকে তত্ত্ববোম্বিনী সভা তো ছিলই। এই সব সভার ধর্মের কোনো গোঁজামি ছিল না, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অবাধ আলোচনা হত। তা হলেও এই সব সভার বৈঠকেও প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে দেশের সামাজিক ও শিক্ষা-সমস্যা। ফ্যামিলি স্টিটারি ক্লাবে “বাংলাবিবাহ” “ঐশিক্য” “বহুবিবাহ” ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিজ্ঞানসাহিনী সভা ও হুজু সমিতি তো প্রত্যক্ষভাবেই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা

বিজ্ঞানাগর-মুগ্ধ বিধ্বংসভার এই সামাজিক চেতনার ভিতর থেকেই “বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা” প্রতিষ্ঠার আভাস পাওয়া যায়। বেধন সোসাইটিতেই যে একটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিল, সে কথা আগে বলেছি। রেভারেন্ড লঙ সাহেব সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সম্বন্ধে বাংলার বিশ্বজনদের অগ্রপ্রাণিত করবার ক্ষমতা সাধনা চেষ্টা করেছিলেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে যখন ‘বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা’ ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও লঙ সাহেব তার একজন অগ্রতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

নেত্রি কার্পেটার এ দেশে এসে একটি স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা চেষ্টা করেন। স্থানীয় বিবেকী ও এদেশী সমাজ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর এসিরাটিক সোসাইটিতে একটি সভা হয়। তাতে কুমারী কার্পেটার ব্রিটেনের “National Association for the Promotion of Social Science in Great Britain”-এর শাখা প্রতিষ্ঠান রূপে বাংলাদেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি বিবেচনা করে সভা সম্বন্ধে প্রাথমিক বগড়া-পরিকল্পনা রচনা করবার ক্ষমতা একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন—ইব্রাহিম বিজ্ঞানাগর, সেবেস্ত্রনাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড লঙ, জাস্টিস নরান, জাস্টিস কিয়ার, জাস্টিস সীটনকার, ই. সি. বেইলি, আর্থার গ্রোট, অ্যাটকিন্সন, কাহ্নাথ, ম্যাকেন্সী, স্কেন-নোহন চাট্টিজ্জ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হাবচন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও রাবেঞ্জলাল মিত্র। কমিটি ব্রিটেনের সমাজবিজ্ঞান সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং Bengal Social Science Association নামে একটি স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি বেটুকা হলের সাধারণ সভার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রেস্বেট্টস্-এ বলা হয় :

"The object of the Association is to promote the development of social progress in the presidency of Bengal, by uniting Europeans and Natives of all classes in the collection, arrangement and classification of facts bearing on the social, intellectual and moral condition of the people."

সভার কাজ চারটি বিভাগে ভাগ করা হয় : ১. আইন ২. শিক্ষা ৩. স্বাস্থ্য ৪. অর্থনীতি ও বাণিজ্য। প্রত্যেক বিভাগে কি কি বিষয়ে অধ্যয়ন করা যেতে পারে, তাই নিয়ে দিলেবাসের মতন একটি ক'রে 'সাকুল্যার' তৈরি ক'রে সভ্যদের বিতরণ করা হয়। এই বিভাগীয় সাকুল্যারগুলি থেকে অধ্যয়নবোঝা করেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি :

আইন বিভাগ : ট্রাষ্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান আইন পর্যালোচনা করা; তার ফলাফল বিচার করা এবং তা কী না বল।

'বেনামী' হীতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা।

পকায়েত প্রথা, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব। বিবাহ-নিষিদ্ধির ব্যাপারে তার প্রয়োজনীয়তা; কি ?

বিচারালয়ে উৎকোচ গ্রহণের দুর্নীতির অধ্যয়ন—তার কারণ কি ? প্রভাব কতদূর ? দুর্নীতি দমনের পন্থা কি ?

অপরাধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা—অপরাধ কারা করে, অপরাধীরা কেনো বিশেষ জাতির লোক কি না ? যদি হয়, তাহলে সেই জাতির প্রভাব, অভ্যাস, আর্থিক অবস্থা কি রকম ? কি কারণে অপরাধ করে তারা ? তার অন্য দায়িত্ব কতটা ন্যায্য ? মাফ-নেমা ইত্যাদি সুঅভ্যাসই বা কতটা ন্যায্য ?

আয়ত্বভার্যার কারণ অধ্যয়ন—আইন ক'রে আয়ত্বভা বন্ধ করা সম্ভব কি না ?

শিক্ষা-বিভাগ : গত অর্ধশতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শিক্ষার ফলাফল কি ? নিম্নবর্ণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হবার কারণ কি ?

প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা—কোন কোন স্কুলের মধ্যে কতটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছে ? কৃষকদের মধ্যে, কারিগরদের মধ্যে, ভূত্যদের মধ্যে ?

বিভাগ্যের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব কি না—হলে কতটা সম্ভব ?

প্রাথমিক বিদ্যালয়—হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতদূর হয়েছে ? বিদ্যালয়ের পুথি বাধা কি ? বাধা দূর করার উপায় কি ?

• প্রত্যেক অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এক-একটি বিষয়ে কর্মীদের জন্য গ্রন্থমালা তৈরি করে দেওয়া হত। 'প্রাথমিক' সম্বন্ধে এই ধরনের একটি গ্রন্থমালা পরিচয় দিচ্ছি :

১। স্কুলের ক'টি বিদ্যালয় আছে বালিকাদের জন্য ? শুধু বালিকাদের জন্য, না বালক-বালিকা উভয়েরই জন্য ?

২। ছাত্রীসংখ্যা কত ? দৈনিক ক'জন করে গড়ে উপস্থিত থাকে ?

৩। বিদ্যালয়ে ভর্তি ব্যাপারে জাতিগত বাধা আছে কিনা ?

নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিদ্বজ্জনদের ঐতিহাসিক ভূমিকারই আশ্রয় বৈশ্ববিক রূপান্তর হয়ে গিয়েছে। যে ব্যক্তিব্যক্তির মানবত্ব ও মূল্যবানের ব্যক্তি জাতিয়ে মানুষ মনুষ্যগণের স্বত্বকার গল্পের থেকে আধুনিক যুগের আলোকবাহিনী প্রবেশ করেছিল, তা আশ্রয় 'সমষ্টির' অতিপার্বি প্রতিকৃতি 'স্বাষ্টের' অংপটায় নির্ধারিতপ্রায়। এই অবস্থায় কোনো বিদ্য-সভার পক্ষে তার প্রকৃত ভূমিকা বজায় রেখে গড়ে ওঠা স্বপ্নপর্যায়ত ব'লে মনে হয়।

বিদ্য-সভা সম্বন্ধে অন্ত্যস্ত আলোচনা

(ক) "সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) : এই সোসাইটির ভিত্তি ১৩ "ট্রানজাক্ষন" প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার যেখান সোসাইটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'জ্ঞানোপার্জন সভার' ব্যাবিষ্টেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হয় (Calcutta Review, Vol 16, July-December 1851, pp 187-188)। ইংল্যান্ডের বাগল "নব্যনিক ও যেনজ্ঞান" প্রসঙ্গে (১৯শ্রী, আদিত ১৯৯৯) এই ভিত্তি ১৩ ট্রানজাক্ষনদের বিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং তাঁর "জাতিবৈর" প্রসঙ্গে (১৯৯৯) সভার প্রচারশব্দটিও উদ্ধৃত করেন।

(খ) "তত্ত্বাবধানী সভা" : তত্ত্বাবধানী সভা সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের দক্ষিণাধার (তত্ত্বাবধানী পত্রিকা), ইংল্যান্ডের দক্ষিণ (একাদশী ১৯৯৯ চৈত্র) ও ইন্ডিয়ানপত্রিকার বিবরণ (ইতিহাস পত্রিকা, ১৯৯৯-৯৯) মূলধার তথ্যসমূহ আলোচনা করেছেন। তত্ত্বাবধানী পত্রিকা থেকে এই সভার বিবরণ সংকলন করা সম্ভব।

"জাতীয় সভা" সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইংল্যান্ডের দক্ষিণাধার "তত্ত্বাবধানী পত্রিকা" (১৯ জাগ, ১৯৯৯) ধারাবাহিকভাবে করেছেন।

(গ) "বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা" : এই সভা সম্বন্ধে সম্ভবত "প্রধানী" পত্রিকাও (১৯৯৯ জাতিক, পৌষ, চৈত্র) ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-নির্ধিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

সংশোধন

"এককগার" পত্রিকা : ১৩ সংখ্যার "বিদ্যায়তী পত্রিকা" (১৯-চৈত্র ১৯৯৯, পৃ ২৯২) আদিত লিখেছে, ১৯৯৯ সালের "জুলাই মাসে কলকাতায় বঙ্গোপাধার Enquirer পত্রিকা প্রকাশ করলেন—"। জুলাই মাসের কালে যে মাস হবে, সম্ভবতঃ ১৭ মে (কলকাতা বঙ্গোপাধার, সংবাদপত্র সেকালের কথা, ২৯ ১৯, পৃ ১৭৭)। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ এই বিষয়ে আদিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ।—লেখক

বাউল-পরিচয়

শ্রীকিতিমোহন সেন

পূর্বাত্তরিত

ত্রিকাল যোগ

সংস্কৃতের আর একটি বড় কথা হইল ত্রিকাল যোগ। কৃত ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে বর্তমান কাল হইল সেতু। পূর্বেই বলা হইয়াছে গুরু কৃতকালের প্রতিমূর্তি, শিষ্য ভবিষ্যতের এবং শীক্ষা হইল বর্তমান। আমাদের বর্তমান জীবনে কৃতকালের সার্থকতা। যেন থাকে এবং বর্তমানের পরিপূর্ণতা হইবে ভবিষ্যতে। জীবন হইল এই কৃত ভবিষ্যতের মধ্যে সাধনার সমরসৌকর্য।

জক্তিহীন ভোগি বিদ্যান্ ও বিষয়লস্পর শ্রবকে দেখিয়া কবীর বলিয়াছিলেন, “তোমার জীবন একটি মর্যদ-প্রস্তর-নির্মিত মহাব সেতু, বাহ। ছই তাঁরের সঙ্গে অল্পের জন্ত হুস্ত হয নাই।” অর্থাৎ এমন মহাব উভয় জীরের সঙ্গে যোগহীন সেতু অপেক্ষা দীনহীন ব্যঙ্গ-সেতুও ভালো, যদি ছই জীরের সঙ্গে তার যোগ থাকে। যে জীবন যনে, জানে ঐশ্বর্যের তাহাতেও যদি অভীতের সার্থকতা ও ভবিষ্যতের জন্ত পরিপূর্ণতা না থাকে তবে সেই সেতু যতই মহাব ততই শোচনীয়।”

গাহারা ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা কয় করিয়া বর্তমানে ঐশ্বর্য হুস্ত ও হুখসন্ধান করেন তাহারা কপার পাত্র। তাই বাউল বলেন,

তিনকাল বাইলি এককালে।

কিনের লাইল্যা ও অভাগ্যা পড়তি এমন বেহালে

তাইলা বালি (=খেল) সোনার চাবি

এমন রতন “কোঠার” (=তাগার)

কেমনে বাবি, আপন মরম কেনে পাবি,

যরলি আপন কপালে।

বর্তমানকে প্রধান করিয়া আমরা যে আমাদের অনন্ত ভবিষ্যৎকে হারাই তাহাই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অনেক উভ প্রসোগ পায়া, (যে কন)

বড়ই কুস্ত করলি বাবি।

(এমন) অতুল “কোঠার” (=তাগার) পালি যে তুই,

কেবল পালি না তার মরম চাবি।

এই কৃত-ভবিষ্যতের যম্ যেমন একরূপ সাধনায় মিটাইতে হইবে ভিতর বাহিরের যম্ ও তেবনি সমরস সাধনা যায় মিটাইতে হইবে। বাউল বলিয়াছেন— ভিতর ও বাহিরকে সেই প্রথমকে দিয়াই এক করিতে হইবে। এই কথাই কবীর বলেন—

এ দুই-নিকটের ছল ও তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ হয় না। কারণ ব্রহ্ম দূরে বহেন।

দূর ঠাই তো পথ তাঁ নহি।

দূর নহী তো পঙ্কজী নহি।—কবীর

জীতর কহুঁ তো তপস্বী হারৈ

বাহর কহুঁ তো হুঁসায়ে।

বাহের জীতর সকল বিরতর

চিত্ত অচিহ্ন কই দীর্ঘালো।—কবীর ১ম জাগ, ১০৪

যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন তবে বিশ্বব্রহ্ম লক্ষিত হয়। যদি বলি তিনি বাহ্যে তবে সে কথা মিথ্যা হয়। বাহির-চিত্তের ব্যবধানকে নিরস্তর করিয়া আছেন তিনি, তেমন-অতেমন এই তাঁর দুই পাদপীঠ।

(কায়াযোগ)

চিত্তের সাধনা করিতে গিয়া সহস্রপদ্বীপের একটি মন্ত সাধনা হইল কায়াযোগ।

এই জীবাশ্মার সঙ্গে যেমন পরমাশ্মার একটি প্রেমের যোগ আছে তাহা উপলব্ধি করাই সাধনা, তেমনই এই দেহের সঙ্গে বিশ্বের একটি যোগ আছে, তাহা সাধন করিয়া নেয়া চাই। বাংলার নাথপদ্বী যোগীদের অনেক বাণী ও শিক্ষা বাউলদের মধ্যেও চলিত আছে।

কবীর প্রভুতির মধ্যে এই কথা বারবার আমরা পাই—

বা বট জীতর মণ্ড সমুদর বা বট নৌল্য তারা ইত্যাদি।

নানকের সমুদ্রায়ে প্রথিত “প্রাণসংগলী” কায়াযোগের একখানা বড় গ্রন্থ। দানু, সুন্দর দান প্রভৃতি সকলের মতেই কায়াযোগ একটি বড় সাধনা। দানু তাঁহার “কায়াবেদী” গ্রন্থে বলেন, এই কায়াতেই “ওকার” “আকাশ” “পবন” “প্রকাশ” “নীর” “স্ব” “ভূম” “ত্রিবেদ” “অপ্ন অভেদ” “চারিবেদ” “সব ভেদ” ও সব “বাণী” নিহিত। এই আশাসের কায়াতেই ভগবান নানাজেবে অবতীর্ণ হইতেছেন। কায়াতেই তাঁর নীলার প্রাণ, কায়াতেই প্রাণের আধার।

কায়র মধ্যেই দ্রিকুল রাম।—কায়াবেদী ১২

কায়াতেই চৌক কুল।—ঐ ২০

• কায়াতেই সব ব্রহ্মও ও বসন্ত।—ঐ ২১

কায়তেই অবিপত নাথ, ও সায়র সাত।—ঐ ২২

কায়াতেই নরা যমুয়ার সঙ্গ।—ঐ ২৩

কায়াতেই কান্দী দারকারি তীর্থ।—ঐ ২৪

কায়াতেই এরাশক্তি ও তীর্থদামো।—ঐ ৩১

কায়াতেই জ্ঞান জ্ঞান, কায়াতেই তিনি বর।—ঐ ৩৩

কায়াতেই তারা ভাওর কায়াতেই অদার বস্ত্র।—ঐ ৪১

কায়াতেই জ্ঞান কর্তা, সব কিছু কায়াতেই।—ঐ ৪৭

কাগজেই বৎ বিহার ; কাগজেই অনেক অপার ।—ঐ ৪০

কাগজেই অনেক অগাধ ।—ঐ ৪১

কাগজেই সাধনা, কাগজেই বিচার ।—ঐ ৪২

কাগজেই আগের খেলা, কাগজেই নির্বাণ পল ।—ঐ ৪৩

কাগজেই নিরস্ত হয়ে, কাগজেই সেবা করে ।—ঐ ৪৪

কাগজেই জ্ঞান কাগজেই ধ্যান ।—ঐ ৪৫

কাগজেই এক কর্তা ও অনেক কলা ।—ঐ ৪৬

কাগজেই রূপ ও কাগজেই লজ ।—ঐ ৪৭

কাগজেই পার হই উত্তীর্ণ ।—ঐ ৪৮

কাগজেই হৃৎ উদ্ধার ।—ঐ ৪৯

কাগজেই সেই সৌন্দর্য্যের বর্ণন ।—ঐ ৫০

কাগজেই প্রিয়তম যেকোন ।—ঐ ৫১

কাগজেই সেই জ্যোতি, কাগজেই সেই পরিপূর্ণ ক্ষণ ।—ঐ ৫২

কাগজেই সত্য কল্যাণ, কাগজেই মর জয় করে ।—ঐ ৫৩

অথর্বেও আছে—

ব্রহ্মদূতঃ চ হৃদ্যাক্ত পুরুষো দয়াময়ঃ ।

সদৃশো বস্ত নাত্যঃ পুরুষো দয়াময়ঃ । অথর্ব ১০, ৭, ১১

মৃত্যু ও অনৃত, এই মানবসেহের কাঠামো ; সুদূর তাহার নাড়ী । মানবের মধ্যেই ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে ।

মানবের এক-এক অঙ্গে এক সত্য, কোথাও তপ, ত্রুত, কোথাও কোথাও হৃতি, কোথাও শ্রদ্ধা, কোথাও সত্য, অগ্নি, বায়ু । চন্দ্রমাও অঙ্গ, ভূমি অন্তরীক ও জ্যোতিঃ তার অঙ্গ ।

কস্মিন্নস্মৈ তপো অত্যাধি তিষ্ঠতি

কস্মিন্নস্মৈ ব্রতব্রত্যাগাহিতম্ ।

ক ত্রুতঃ ক শ্রদ্ধাত তিষ্ঠতি

কস্মিন্নস্মৈ সত্যবত এজিষ্টিতম্ ।

কস্মিন্নস্মৈ নীলগণ্ডে অগ্নিরত

কস্মিন্নস্মৈ তপোমতে হতরিতা

কস্মিন্নস্মৈ বিদিতোহগ্নিরত

কস্মিন্নস্মৈ তিষ্ঠতি ভূমিরত

কস্মিন্নস্মৈ তিষ্ঠতি জ্যোতিঃ

কস্মিন্নস্মৈ তিষ্ঠতি জ্যোতিঃ

কস্মিন্নস্মৈ তিষ্ঠতি জ্যোতিঃ । অথর্ব ১০, ৭, ১-৩

অজপা জপ

জপও ইহাদের চলিত আছে বটে কিন্তু তাহা মালা-জপ বা কর-জপ নহে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিঃশব্দ-প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে জপ করেন । তাহাকে অজপা জপ বলে । কবীরও বলেন—“মালা চল

‘বাস উষাস কী তারে গাঁঠ ন বের।’ বাবু বলিয়াছেন, “বাসা জপুন কর জপু, জপু তো অজপা জপ।” ‘বাসা বাস উষাস কী’ ?—

বাসা জপুন কর জপু
জপুন করু ব রাম।”

—সত্য কবীরকী দাবী, সুখিম অর, ১০

(ভয়ে নাথপন্থী ও শিবপন্থীদের যোগসাধনায়ও এই অজপা জপ আছে। বাউলরা কিন্তু ইহাতেও লম্বটে নন; উহার। বলেন, যখন নিশ্বাসের টানটানি বিনা সহজেই মন স্বপ্নানন্দে ও যোগানন্দে ভরপুর থাকিবে তখনই অমিরণ বা জপ হইবে পূর্ণাঙ্গ ও সহজ।

ব্রহ্মসংকোচ

মন্দিরে বাহ্যসের প্রবেশ নাই, শাস্ত্রে বাহ্যসের অধিকার নাই, বাগধাত্তে ভ্রতে বাহ্যসের স্থান নাই তাহাদের একমাত্র বস্ত আছে আপন অন্তরাব্দ্য, আপন জীবন ও আপন কার্য। তাহাদের পক্ষে সহজ হইল আপন জীবনে বিশ্বজীবন, আপন আত্মা বিশ্বাত্মা ও আপন কার্য বিশ্বকার্য সমরূপ করিয়া দেখা। প্রেম ও জ্ঞান সব-কিছু এই সমরূপে সমন্বিত করিয়া ইহার। দেখিতে চায়। নানা ভ্রমবিভেদের কূট বিচারের মধ্যে ইহার। থাইতে নারায়ণ।

কাজেই ব্রত তীর্থ শাস্ত্রবিচারাদি ছাড়িয়া ইহার। চেষ্টা করে এই কাহাতে সমগ্র বিশ্বকে অহুত্ব করিতে ও সমগ্র বিশ্বে এই কাহাকে অহুত্ব করিতে। নিজেকে যদি বিশ্বগ্রন্থাৎ বিশ্বত না করি তবে এই জীবনে পরমাছা-বিশ্বাত্মাকে আবাহন করিতে পারা যায় না। কারণ তিনি অসীম অপর বিহু, ক্ষুদ্র এই কাহাতে তাঁহাকে আনিতে হইলে তাঁকে সংকীর্ণ করিয়া দুঃখ দেওয়া হয়। এই ব্রহ্মসংকোচের দুঃখ দূর করিতে নিজেকে ও সর্ব বিশ্বকে একরূপ করিতে হয়। ইহাই তাহাদের প্রধান বোগ। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে নিজকে ব্রহ্মধামের মত উদার কর। ইহাদের মতে সহজ গায়ত্রীর তাহাই হইল সহজ ব্যাক্তি বা ‘সুহৃৎ বঃ’। অর্থাৎ ব্রহ্মগায়ত্রী উচ্চারণের পূর্বে আপনাকে সর্ব স্তূ-স্তূব-বলোকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই ব্যাক্তি।

উর্ধ্বস্রোত

এই মেহের মধ্যে বাউলদের একটি ক্রিয়া আছে তাহাকে উর্ধ্বস্রোত করা বলে। উত্তর-পশ্চিমের সাধকের। কেহ কেহ উহাকে ‘ঘায়া উলটানো’ বলেন। ইহাদের মতে জড়ের নিম্ন অংশগারেও ব্রহ্মশক্তি বশে সব রসই নিরূপ্য। নবীনাল* বাহিষা জল সমুদ্রের দিকে চলে, জড়প্রকৃতির নিম্নে। এই নিরূপের ব্যতিক্রম হয় নোপে ও জীবনে। অর্থাৎ নীচ জগতিলে অবনি তৈলবিন্দু উর্ধ্বস্রোতে ফিরাই চলিল। জীবনের ধর্মও তাই। একটি বীজ মাটিতে অধূরিত হইলেই তাহার অধূর উর্ধ্বগামী হয়, সম্বলদে রসও উর্ধ্বগামী হয়। ভাল-শাল-নারিকেলাদি বৃক্ষ ততটা উর্ধ্ব পর্যন্ত উঠে বড়টা। তায় রস উঠে। অর্থাৎ রস উঠা লইয়াই জীবন। উর্ধ্বদিকে বড়বৃক্ষ পর্যন্ত রস উঠিতে পারে ততদূর পর্যন্তই বৃক্ষলতাদির জীবনের গীবা। কাজেই সাধনার যদি জ্যোতিঃ ও জীবনের প্রয়োজন থাকে তবে কামনার জড়ধারাকে উলটাইয়া চিরায় ধারা করিতে হইবে। নিরূপ্য কামনায জীবধারাকে উলটাইয়া জ্যোতির্ধ প্রাদব শিবধারা করিতে হইবে। পঞ্চধর্মের

জড়বর্মের ধারা অহংকে কেন্দ্র করিয়া স্বার্থের অন্তই নীচের দিকে ধাবিত হয়, ইহাকে উলটাইয়া উর্মিমুখী করিলে তাহা গ্রেম ও সেবাস্তে পরিণত হয়। তখনই তাহা শুদ্ধ হয়। গ্রেমের বলেই কামের ধারা উলটিয়া গ্রেম হইয়া যায়। গ্রেম এমন অপূর্ব বস্তু যে তাহা সেবালোকেও দুর্লভ। গ্রেমে অন্তীম দুঃখ থাকিলেও স্বার্থের অসুত তার কাছে তুচ্ছ। তাই সেবতার্য্যও গ্রেম চাহেন। দুঃখের ভরে সেবতার্য্য গ্রেমকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া অহুতপ্ত। তাই বাউলেয়া গায়—

গ্রেম আবার গল্পমদি

ভারে হুইসে যে কাম হয় যে সেবা।

(ভাই) সোলোক চার যে সুলোক হতে

মাধুৰ্য্য হৈতে চার যে সেবা।

দুঃখভীত স্বর্গলোকে গ্রেমের সত্তাবনা কোথায়? কবীরের মতে গ্রেমে যে 'জন্ম মরণ ছোড়', জন্ম-মরণ হিসাব ছাড়িয়া সোলাইতে হইবে। গ্রেমের সাধনা বড় কঠিন, সবাই তাহা সাধিতে পারে না। মোদের বোড়ার উঠিয়া অটিকুণ্ডের মধ্য দিয়া তাহাতে হয় চলিতে। তাই কবীর বলেন,

সেহ বিবানে কঠিন হৈ নব সে নীতত নাহি

চপে মোম তুহন্দর চলয়ে শারক হারি।—গ্রেম অঃ ২৩

সর্বদুঃখ লবেও গ্রেম ধর। গ্রেমহীন স্ব্থময় স্বর্গলোকও অতি ছার। এই বহনীয় গ্রেমের পরশমণি মানবজীবনেই সম্ভব বলিয়া সেবতার্য্যও সেবস্ত ছাড়িয়া মানবস্ব প্রার্থনা করেন।

উলটিয়া ধারা স্বধন শুদ্ধ হয়, মলিন কাম স্বধন শুদ্ধ গ্রেম হয়, তখনই তাহা বস্তুকে অভিক্রম করিয়া নব নব আনন্দ নব নব রস ও লীলার স্বষ্টি করে। যোগবাসিন্ধে যে—

বাসনা যিহা মোকল শুদ্ধা চ মলিনা তথা।

মলিনা কখনো হেতু শুদ্ধা জ্ঞানবাসিনী।—যোগবাসিন্দ ৩, ১১

মলিন বাসনার সংসার, শুদ্ধ বাসনার মুক্তি। অথর্ব যেহে আছে—

অষ্টচক্র নবদ্বার বেদানাং পূরণোধ্যা।

ভক্তাঃ হিন্দ্যাঃ কোণ্য অর্পা জ্যোতিষাত্মকঃ। ১০, ২, ৩১

নবদ্বারযুক্ত বেবলোক অর্থোধ্যাপুরীতে এই অষ্টচক্র বিরাজিত। তাহাতে জ্যোতির্ময় হিরণ্য কোষ লীপানান।

ভক্তি হিরণ্যে কোশে ত্রয়ে ত্রিপ্রতিষ্ঠিত।

ভক্তিঃ স্বং বস্তুভ্যং তমৈ ত্রুত্বিনো বিদুঃ।—ই, ৩, ৩২

সেই ত্রি-অরাযুক্ত ত্রিপ্রতিষ্ঠিত হিরণ্য কোষে যে আশ্বিনয় দিয়া পুঙ্খ বল করেন তাহাকে ত্রুত্ববিদ্বাই জানেন।

সেহভক্তের বহুস্ত এখানে আছে; উলটা কমলের কথা আছে অথর্ব ১০, ২, ১৪, স্নোকে, সেখানে কমলের দলে 'পাদ্র' সেবা আছে।

উর্দ্বা ভক্তত্বমুৎকঃ সুভেনেযোগবাসিন্দ।

পত্রি দর্শে চন্দ্রা ন সর্বে মনসা বিদুঃ।—অষ্টা, ১০, ৮, ১৪*

উর্ধ্বে জল ভরিবার যে কুন্ত তাহাতে হল পূর্ণ করা হইতেছে। যন দিয়া দেখিতে না পারিলে চন্দ্র কি

সেখিবে সকলে? কমলের কথা আছে ১০, ৮, ৩৪ স্নোকে। অন্তের মধ্যে ছুটিল যে কমল তাহাকে সেখানে রাখিল কোন্ নাগায়?

১
অপাংখা পুস্পপুষ্পাণি বস তদ্যায়। বিতন্—৪৫১, ১০, ৮, ৩৪

১০, ২, ৪৩ স্নোকে আছে নবদ্যারমুক্ত কাচাকলসের কথা।

পুওরীকঃ নবদ্যারম্—অর্থ, ১০, ৮, ৪৩

চক্রবেধ বা চক্রভেদ ধারা উলটানোর মধ্যে আর-একটি কথা আছে। হৃদয় ইঞ্জিরাতীত হইতে ইঞ্জিরগনা মূল ও মূলতর পরার্থের ক্রমে রূপগ্রহণই হইল সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। ইহাতেই সংসারের বন্ধন লাগিয়া আছে। উপনিষদে আছে—

এতদাম্বাধ্যতে গ্রাণে মনঃ সর্বৈঞ্জিরগি ৮।

কঃ বাহুঃ স্যাদিহা পুণ্ডরীকং বিবর্ত্য হারিণী—মুওক ২, ৩

এই পরমপুরুষ হইতে গ্রাণ মন ইঞ্জিরগণ, আকাশ বায়ু স্রোতিঃ জল সকলের আধার এই পুণ্ডরীক উৎপন্ন হইতেছে। পূরণ তত্ত্ব যোগশাস্ত্র ও বর্ণনানিতেও হৃদয় হইতে মূলে বাওয়ায় “সৃষ্টি” ও মূল হইতে হৃদয়ে বাওয়ায় “প্রলয়” প্রক্রিয়া। “সম্বন্ধ” পথ হইল হৃদয় হইতে মূলে ও “ভিন্নত্ব” পথ হইল মূল হইতে হৃদয়ে বাওয়া। কাজেই সেই পরমপুরুষে বাইবার উপায় হইল যে-ধারাতে আমরা হৃদয় হইতে মূলে উপনীত হইয়াছি তাহা উলটাইয়া আবার হৃদয়ের নিকে বাওয়া। তবেই একটি-একটি তরুকে ভেদ করিয়া উলটা নিকে বাইতে হইবে। একটি-একটি তরু হইল একটি-একটি সৃষ্টিবগল চক্র বা কমল। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মক্খ, ব্যোম এই পঞ্চ ভরের পঞ্চ চক্র বা পঞ্চ কমল ভেদ করিয়া ব্রহ্মকমলে পৌছিলে সেখানকার অক্ষরমূল রূপ বা অন্ততথ্যের পান করিয়া লোক মুক্ত্যক্ষরী হন।

কোনো কোনো বাউল-মতে আকাশই হইল মূল বা ব্রহ্মবস্ত, কাজেই চারিটি চক্র ভেদ করিয়া পঞ্চমে পৌছিলেই সেই অন্ততের সাক্ষাৎকার হয়। ধারা ছয় চক্র যানেন তাঁদের মতে পাঁচটি চক্র ভেদ করিতে হয়, আর ধারা পাঁচটি চক্র যানেন তাঁদের মতে চারিটি চক্র ভেদ করিতে হয়।

মুড় স্রোতের প্রত্যক্ষ রূপ হইল ‘রেতো’ধারা। ইহাই হইল অনন্ত সৃষ্টিবায়। বধন তরঙ্গ উলটাইয়া লোক ব্রহ্মকমলে যান তখন রপের সেই প্রত্যক্ষরূপ আপনি মিটিয়া যায়। কিন্তু কোনো কোনো মূলমতি লঙ্ঘিয়া যান করে এই রেতোধারা বা চক্রধারাকে উলটাইয়া চারিটি স্থান ভেদ করিতে হয়। তাই ইহাকে চারি চক্রের ভেদ বলে। ইহা অতি গোপনীয় তত্ত্ব। তাহা নামে মাত্র এখানে বর্ণনা হইল। পূর্বেও লব্ধ কল্প। নানানাতার বাণীতে অধোদ্ধারা উর্ধ্ব বাইবার কথা বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বটি বাউলরা নানা গানে গভীর রস দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মানবজাতি যখন ভাসানো প্রবোধের মত বহু ঘাট পার হইয়া চলে তেমনি ভিতরের ধারা অনেক ঘাট পার হইয়া চলিতেছে। কবে যে সে তার চরন স্থলে পৌছিয়া তার সব আলা জুড়াইবে তা কে জানে?

পান আবার সোতের লীল আবার ভাসাইলে কোন্ ঘাটে।

প্রকৃতি গানে দেখি আঁধারের সেই মূল আদি রহস্ত বৃষ্টিবার জন্ত ব্যাকুলতা। ভাসান প্রবীণ আদি ঘাটে ফিরিতে চাহিতেছে। যে ভাসাইয়া দিয়াছে তাহারই প্রেমময় কোলে আবার গিয়া ডালিতে চাহিতেছে।

এশ্বিমোচন

‘ঠাকোর ঠাকোর পুঁছা’ করিয়া ধাহারা হুস্থ হইতে হুলের দিকে বাইতে চান বাড়লের। বলেন টাহারা সেই বনের বাহুরকে পাইবেন কেনন করিয়া? তিনিও যেই হুস্থ হইতে হুলের দিকে চলিয়াছেন সাধকও যদি ক্রমাগত সেই নিকেই চলে তবে উভয় একই মুখে ক্রমাগত চলিতে থাকিলে পরস্পরে দেখা হইবার তো উপায় নাই। তাই তখন উভয়ের দেখা হইবে কেবনে? তাঁর দেখা যদি চাও তবে তিনি যদি হুস্থ হইতে চলেন হুলে তবে তুমি যাও হুল হইতে হুস্থে। তবেই কোনো-না-কোনোখানে উভয়ে দেখা হইতে পারে। ইহাও হুস্তির ধারাকে সাধনাতে উলটানো।

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—“তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলই রূপের দিকে নাহিয়া আলিতেছেন। আনরা তো শুধু রূপ লইয়া বাচি না, আমাদের তাই স্বরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মূর্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বহু, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।”

উত্তর-ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেও এই তত্ত্ব আছে। মহানির্বাণতন্ত্রের পঞ্চম উদ্যোগে ২৫ শ্লোক হইতেছে এই সাধনারই উপদেশ।

গম্যাদি জ্ঞানঃসুখাঃ পৃথিবীকল্প সঃসংসং ।

রূপাদি বিজ্ঞা সার্বঃ কলময়ৌ বিশাংসং ।

রূপাদি চক্ষু সার্বঃসংসং যাতৌ দিল্পাং চ ।

স্পর্শাদি শুষ্কঃসং বায়ুকাশে এশ্বিমঃসং ।

অহংকারে হরেক্যোম সলং সঃসংসং ।

মন্তকঃ চ একতৌ ভাঃ সঃসং বিলাপঃসং —মহানির্বাণ, পঞ্চম উদ্যোগ, ২৫-৩৭

এই প্রকারে আনেন্দ্রিয় গম্যাদি সমুদয়ের সহিত পৃথিবী মলে লীন করিয়া, পরে রসেন্দ্রিয় রস প্রকৃতির সহিত জল অগ্নিতে, রূপাদি ও নর্ধনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে, স্পর্শ প্রকৃতি ও বায়ুশ্রিয়ের সহিত বায়ুকে আকাশে, শেষের সহিত আকাশ অহংকারতরে, অহংকারতর বৃদ্ধিতরে এবং বৃদ্ধিতর প্রকৃতিতে লীন করিয়া প্রকৃতি ব্রহ্মতে লয় করিবে।—প্রগমরূপার শাস্ত্রীয় অল্লাবাস।

মহানির্বাণ স্পষ্ট ভাবেই বলিতেছেন সাধককে ব্রহ্ম যোগলাভের জন্য হুল হইতে হুস্থে বাইতে হইবে। হুস্তির ফিরা হুস্থ হইতে পুঁছা তাই, হুস্তিরহুলে বাইতে হইলে আনাদিগকে চলিতে হইবে হুল হইতে হুস্থে।

সেহতয়ের চক্র ও কমল ভেদ করিয়া ব্রহ্মকমলে যাওয়ার কথা বাড়লুনের গানেও আছে। এই সেহ-তয়ের গানের কিছু নমুনা বেওয়া বাইতেছে। নবঃনূত্র গম্যারামের এই গানটি—

সাত সত্ব পাকি বিলা স্তি পায় ।

তিন পাখারের লীলার পরে, দেখি তত্বদার ।

পাতাল হৈতে চড়ি আকাশ, আশি (=নাশি) রসাতলে ।

৪৪ কতুতে বেলি বৃন্দে বেলি সব কমলে ।

চৌধ তুবন সও সাকর ভের নীর পায় ।

(ভোয়) আশন ঘরে দেখা পাই নীলে অল্লাকার ।

সেই আপন হয়ে সহস্র হাহুয়ী সীলা ভসমর ।
জনম দখল করবি যদি কর নিজেই লর । ("কর" পাঠ্যে আছে)

একটি গান কৈবর্ত বলার—

মাঝার উপর মন মজানো আকাশ বীলকমলে ।
তার অবনত নল কি ভসমল ফলসে জ্যোতি আপার বীলে ।
আকাশ তরা বীলকমলে, জ্যোতির হবার বলক বলে,
বর ভ্রমর উড়ে চলে, অলপ পুড়ে মন উপাসে ।
বলা বলে ভাইয়ে (=হেবে) যে মরি,
মারে মারে হাহুই যে পথ, হল তো কি করি ?
(ভাই) বলি শুক কলতর খোকা সাপে মাথ,
যেথা ঘোর আধারে পথ মেলে বা বইতো আবার হাত ;
যখন মনে বহু মরম অম্ব, তখন আশা দিত কর্ণমূলে ।

গক্সারামের গুরু কৈবর্ত আগার একটি গান—

(আছে) তোরাই ভিতর অন্তর শাসর, তার শাইনি না মরম ।
(ভার) নাই কুলকিনারা পান্থধার, নিরম কি করম ।
(সেই) অন্তর অকুলে, পূজাময়ে বস্ত্রে তরে উলি না মেলে,
আবার না লাভা (=জানিরা) তার, বিকলে ধার, এই মহামানব-জনম ।
বরি খেলুছ (=পুলি) আপন খিল (=কর্মে) যদি মখিল সাধে ফেরে
জলা গ্রামের সাচা দিল, বস্ত্র হবি যদি শুক দুচার লব ভরম ।

বলার আর-একটি গান—

হলে পরমী তোরে উত্তরে হৈবে (=হবে) অকুল আকাশে ।
কুলদি নাকি হৈবে (=হবে) বাইতে (=যেতে) শাসর মানসে ।
বীকে বীকে (রকম রকম) দেখবি কদম-বন, বিচিত্র দল রসের সীলা গজ
আর বক্স, (বাঘি) নানান রসের রসিক হৈরা, তাই হল আনন্দে ভাসে ।

নরঃপূত্রজাতীয় গক্সারামের এই গানটি কায়া-সাধনের সমস্ত সাধনের ও লাহর সাধনের একটি

পূর্ণ প্রকাশ—

শোভাস শোভাসে গভীরত চলে নিরন্তর ।
বাহির ভিতর একার (=এক হস্ত) যাতে, (সেই) এক রসের মন্তর ।
ওর (=তোরা) আপন মারে চৌক ভুখন আবার ভুখন মারে ভুই ।
শোভাসে শোভাসে চোচলি বুঝি না কিছুই ।
সেই গ্রাণ-বজ্রিতে থান বোঝায়া হবি বোঝির ।
অলপ মেখে মাথামাখি শোভাস শোভাসে কর ।
পল পলাবি হুলহুলাসে হুলহুলাসে পলে ।
কিন্তু মনে লিখতে আর লিখু দিখে কলে ।
সহস্র ববি হয় রে সাকল যেহান সোনের পর ।
অন্তর বন দিলেবা সহস্র মোদ্ রে শরাঙ্গার ।

অনেক ঘাটে দুয়াখুরি কৈরা (—করিয়া) হদি অন্ম।

সহস্রান তুই হ' না সহস্র মিটবে সকল বন্ম।

এমন স্বপ্নের গান আরো অনেক আছে। সিদ্ধকে বিদ্রুতে, অনন্তকে পল্লের মধ্যে লয় করিয়া যে পদ্য উপলব্ধি তাহার কিছু ইঙ্গিত ব্রাউনিং শেলি কোটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিদের কাব্যেও আছে। কিন্তু তাহা সাহিত্যের কথা। এখানে সাধনার কথা।

প্রকৃতি-পুরুষের যোগে গ্রহের পর গ্রহি ধাওয়া হয়। সেই ধারা আশ্রয় করিয়াই উলট। চলিয়া প্রেমের সহস্র যোগে প্রকৃতি-পুরুষকে একরূপ বা সমরস করিয়া আনন্দবয় করিয়া পাইলে মুক্তি।

ব্রহ্মাণ্ড এবং মানবের সঙ্গে আর-এক প্রকারের যোগ আছে; তাহাতে মানব সব ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ও নিয়মকে আনিয়া লোভ-বশে সেই নিয়মবহু ধরিয়া অল্প ধারার সব শক্তি লক্ষ্য ও সংগ্রহ করিয়া শক্তিমান হয়। এই পথেই এই যুগের বিজ্ঞান প্রভৃতির সব রহস্য চুরি করিয়া শক্তিশালী হইয়া বিপক্ষকে হারিয়া প্রবল হইতে চায়। এই পথ নির্মিত পথ। সেই যুগে এই পথেই রসায়ন-সাধকেরা জীবনরস মারপরস প্রভৃতি খুঁজিয়াছেন। তত্ত্বের মতে এই পথের পথিকেরাই রসায়ন প্রভৃতি নানা শক্তির সাধক। সহস্র সাধক কিন্তু সে পথে ধান না। তিনি ঐ ধারা উলটাইয়া সমরসে সহস্র এক করিয়া পরমানন্দ রস উপলব্ধি করেন। কোনো পার্থিব বস্তু বা শক্তি তাহার। চান না। আদর্শব্রহ্মে সিদ্ধি লোভীদের হইল সে-সব বোঝ। তাহার। প্রকৃতিকে আনিয়া তাহাকে খাটাইয়া নিঃস্বের পণ্ডার্থ সিদ্ধি করিয়া লন। তত্ত্ব সে সাধনাও আছে, কিন্তু তাহা মলিন। তাহাতে সাধককে শক্তিশালী করিলেও দিনে দিনে আরও বদ্ধ করে। মুক্তির আনন্দ সে পথে নয়। তাহা সহস্র ও সমরসের পথে।

সহস্র

যতক্ষণ লোভ থাকে ততক্ষণ জীবনে এই সহস্র আসে না। তাই কবীর বলেন তখন “ন না রজারে রাজারে যোগী কাপড়া।” (কবীর ১০২)। “ন না রাজাইয়া যোগী রাজাইল তার বস্ত্র।” তখনই বাত চিরায়ির প্রয়োজন হয় কিনা। এমন অবস্থার সঙ্গত বুদ্ধি অর্থাত্ পথ দেখাইয়া দেন—

হব মৈ কুলায়ে জাগি।

সোরে সঙ্কট লুপ্তে লগাই।—কবীর ১০২ পৃ

হবন আমি কুলিরাচিয়া তখন সঙ্কটই আমাকে মুক্তিকর পথ দেখাইলেন, সেই সঙ্কট “নবদ্বার বদ্ধ করাইলেন না, বাস বদ্ধ করাইলেন না, ভবণও ত্যাগ করাইলেন না।” তখন

সহস্রে রহে সবার সমস্যা

না করু আরে ন দ্বারে।—কবীর ১০৩

তখন সহস্রেই সেই সহস্রের মধ্যে জীবিতা থাকা হইবে। আর কোথাও বাগদ-আসা নাই। তখন আমি

আমি ন হুঁ কান ন করু।

করা করু ন দ্বার।—কবীর ১০৪

তখন চক্ষুও আর বুঝি না, কানও বন্ধ করি না। কারাক্ষুণ্ড সাধন করি না; তখন

হব হব লাউ পোই পরিকর।

সো হু করু সো সো।—ঐ

তখন যেখানে যেখানে বাই তাহাতে তাঁকে প্রদক্ষিণ করা হয়, বাহা-কিছু, করি তাহাই হয় তাঁর সেবা। সেই “সহস্র সমাধি ভলী” (ঐ)—এমন সহস্র সমাধিই ভাল।

কাজেই সহস্রপন্থার তাঁরও হাইবেন না, শাস্ত্রও মানিবেন না, মন্দিরও তাঁহাদের অনাবশ্যক। তাঁহাদের সবই মাহুকের মধ্যে। তাঁহাদের উপাস্তও হইলেন পরমপুরুষ বা মনের মাহুয়। তাঁহাদের সাধনাও মাহুকের কাছা ও জীবনের মধ্যে। কাজেই মাহুয়ই ইহাদের পরাকাষ্ঠা, মাহুয়ই ইহাদের সবচেয়ে বড় কথা। তাই সহজিয়া চণ্ডীদাস বলেন—

জনব মাহুয় তাই,

সবার উপরে মাহুয় সত্য তাহার উপরে নাই।

অর্থক্বে বেদে (১০, ১, ১১-১২) দেখি মনের সেহের এই রহস্য, অর্থক্বে ১০, ১, ১৭ শ্লোকে দেখি মানবের মধ্যেই ব্রহ্ম যে “পুরুষে ব্রহ্ম বিব্রু তে বিব্রু: পরমেশ্বিনম্”—যিনি মানবের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে বার্ষ্য স্থানে দেখিয়াছেন, এই মানবজীবনেই জন্মে জন্মে নৃতন হইয়া চিরন্তনকে নব নব সাধনায় নব নব রূপে প্রকাশ করিতেছে।

সবাতন সেনমহরুতায়ো তাত্ পূর্ববঃ ।—অর্থক্বে, ১০, ১, ২০

ভগবানও মাহুয়, তাই বাউল বলেন—

আনি কোণার পাব তারে

আবার মনের মাহুয় যে যে ?

নরহরির শিষ্ট পদ্মলোচনের পদ—

চলয়ে মাহুয় বন্ধনালে (= রহস্যময় বস্ত্রপথ)

আবার চরকমল সেলাবে যে বলা ধর তারে কে জানালে।

এই কমল-রসে ভুঁয়ে কলে, শুষ্ক, ঘুঘি ভরন হলে

এখন না গেরে পথ চাহে দিবে,

চরকমল ধল না ছেলে।

সাধনা-অংশের প্রথমেই ইতিপূর্বে উদ্ভূত করা হইয়াছে বাউলের চমৎকার গান—

ভবে কবে মন মানে না ;

পার মাহুয় চাইই চাই-

মাহুয় আশার চার বে মাহুয়,

তাই বাউল বাউল হৈয়া বাই।

মানবজন্মেরই যে তাঁহার মন্দির এতখানি বাউল ও নানক কবীরাদি প্রত্যেক সাধকের অঙ্গাঙ্গ্য গানে। শাস্ত্রও যে মানবজীবনে তাহাও তাঁহাদের অনেক অনেক গানে। পূর্বেই ব্রহ্মবের এই গানটি সেওয়া হইয়াছে—

সানব হারকী অতঃ কাগর গ্রাণ অকন বাহি ।

সাধকদের অন্তরেই কাগজ, তাহাতে গ্রাণের অকরে সত্য শাস্ত্র লেখা। মানব-অন্তরেই সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চাহিয়া দেখ অসীম শাস্ত্র—

রজন বহুবা বে সব ফুল আশন কুয়াণ -

রজন কাগর কা পত্র নিকহি তাম্বা তান ।

হে রক্ষক, বহুধাই সম্পূর্ণ বেহু, সকল দৃষ্টিই কোরাণ :—রক্ষক, কাগজ আর কি পড়িবি, বিধে চাহিয়া দেখ নিতাই ভাঙ্গা জ্ঞান। আবার সকল মানবজীবনসমষ্টিতে অনন্ত বেহু—

এখন কোটি ব্রহ্মাওর্ষে বহুকে অনন্ত বেহু।

কোটি প্রাণের বে একটি মানব-ব্রহ্মাও বা বিশ্বমানব লেখানে অনন্ত অনন্তবেহু বলয়ল করিতেছে।

সহজ না হইলে প্রেমে সরল না হইলে এই শাস্ত্র এই মন্দির এই সত্য উপলব্ধি হয় না। কবীর তাই বলেন, প্রেম যদি না আসে তবে তীরে তীরে ঘুরিয়া কিলে সত্য পাইবে ?

হাকে এমন আকৃষ্ট হিরে।

কান্না করে নয় কানী রসে সে

কা দগা দল দিয়ে।—কবীর ১৩-১৭

ব্রহ্মাওর নত সহজ হইলে, জীবন আকাপের নত সহজ হইলে সেই সহজ মানুষকে দেখিতে পাইবে—

যদি তেই দি সে মানুষে।

সামনে সন্ম হবি, তোরে যেতে হবে সহজ সেসে।

হাৎ সড়া পথ সৈলো দারা, সাতার ধর পাথ কি তারা ?

বাসি মিছা হয় না সাতা, মিছা ভিত্তে জেসে ভেসে।

ভিনে কোটি তার বে সহজে, বোপ হাফেতে সনাই ধামে

কিলেবা সাতা সেই রসে মজে—

দ্বীপ চরাসে বে তোর ভিতর, চিত্ত ভূলা বিতা রসে।

“বাসি মিছা হয় না সাতা” অর্থাৎ বাহ্য মিথ্যা তাহা বাসি অর্থাৎ পুরাতন হইলেই সত্য হয় না। এই সহজ দৃষ্টিতে দেখিলে শাস্ত্র পুরাণ কোরাণ সব-কিছুই চিন্তায় নব দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

মানুষকে পাইলে শাস্ত্র সত্য সব আপনি গড়িয়া ওঠে। সত্য গুরু যখন সাতা শিষ্ট পান, যা যখন পুত্রকে পান, নারী যখন প্রিয়তমকে পান তখন সকল জ্ঞান আপনি আপনি সহজ প্রেমে ডরিয়া ওঠে। সে জ্ঞান এত সহজ যে তাহা আর শিখাইতে হয় না।

সত্যকে কোন্ শিখাতেই হৈ লব দাবীকে জন দারবা দী।

এমনকি কোন্ শিখারতা হৈ জাণ হাঁদি তোমকা পানা দী।—কবীর ১৪-৩৪

সত্যকে স্বামীর চিত্তানলে আপন দেহ ভষ করিতে শিবার কে ? ত্যাগের মধ্যে ভোগকে পাইতে প্রেমকে শিখায় কে ?

তখন সেই সহজ জীবনই হইবে নিত্য দীক্ষা—“বেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি।”

নিত্য দীক্ষার আধার ভদ্রবের মানুষকে বুঝিয়া বাহির করাই হইল সাধনা। তাই কৃষ্ণদাসী বিশার পান—

সকল মানুষ আছিল জায় কুদারনে।

জানি না তাই হারাইলান কোন্ কসে

এখন বাইরে করে পাতি যে আর নাই ;

দ্বিবাধিনি বুঁজিছে যদি কোথাও যদি পাই,

দ্ব্যনে জেসে পুকার তপে চলছে ভাসনে হামি কিনে

সেই সহজ যদি না বেহু নিজে বদা।

তবে আর ভালোবেসে মেলে না সে, (বৃথা) কেবল দুইয়ে মড়া ।

তাহার সহজ রসেই যখন কসে, বুকে (—বুকে) বিলা আপন কসে ।

তাহাকে পাওয়াই মুক্তি । এসে মুক্তি প্রেমে জানে আনন্দে ভরপুর । তাহা বস্তু নহে, তাহা জীবনের পরম অবকাশরূপা মুক্তি, তাই তাকেই বলে শূন্য । এই শূন্য একটি শূন্যতা যাত্রা নয় । এই শূন্যের কোলেই অনন্তলোকের গতি ও দীপ্তি অব্যবহিত চলিয়াছে । নির্বাণের মত মুক্তি একটা নান্দ্র্য নহে ।

এই জড়জগতে বাহ্য আচার-বিচার দিয়া শহরের প্রেমের মাহুতকে খুঁজিলে চলিবে না ।

তাই নমঃশূন্য গণ্যরাম গাহিয়াছেন—

এখা তারে দুইয়ে যায় দাটির এই কল্যানে ।

দুইয়ে কি সে বদলারি ধন, সে কসে কখন-নিঃসঙ্গনে ।

যখন সেই সহজ মাহুত মেলে তখন কোনো তীর্থের আর কোনো মূল্য নাই । তখন কোথাও আর ঘুরিয়া ঘুরিতে ইচ্ছা হয় না, তখন ক্লম্ব বলে—

ধাইতে তো চায় না যে ঘন মতা বদীনা ।

এই যে বন্ধ আমার আছে, আমি হই যে তারি কাছে

(আমি) পাপস হৈতাম ঘুরে হইতাম তারে চিন্তায় যে যদি না ।

(আমার) নাই মন্দির কি মন্দির, নাই পূজা কি বন্ধন

ভিনে ভিনে ঘোর মতা কাশী পলে পলে হুনি ।

তাই বাউলদের কোনো তীর্থ নাই । তবে যেখানে তাবের লোক একত্র হয় তাহার মাঝে মাঝে সেখানে যায় । বৈষ্ণবদের মেলার জায়গারও ইহারায় যায়, কিন্তু বৈষ্ণবদের মন্দিরে প্রবেশ করে না । কবীর অধিকারও অবশ্য তাহাদের নাই । বাংলাদেশের নানা স্থানে বংশবের নানা সময়ে অনেক মেলা হয় । তাব মধ্যে কতকগুলি মেলায় বাউলেরা পরম্পরে মিলিবার ক্ষমতা আলাপাওয়া করে । কিন্তু এখন গবেষণারত লোকের চৈল্য, বীরভূম জেলার কেশুলী, রাজসাহীর খেজুরী, মালদহের রানকেন্দী প্রভৃতি মেলা ভালো বাউলেরা প্রায় বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে । তাই আর এখন বাউলদের মেলাগুলির নাম-ধাম দিলান না । তবে ধারার এই পথের বোঝ করেন তাহার সেই সব মেলায় খোঁজও রাখেন । তবে এ কথা ঠিক, বাউলেরা অহুকুল সব স্থানে পরম্পরে মিলিবার ক্ষমতা যায় । হুঁমি মিজাসা করা যায়, কেন গুলব জায়গায় বাও ? তবে তাহার বসে, তাবের মাহুতের পরশ পাইতে । স্বচ্ছতার সাক্ষিতে যখন নৌক। চলে তখন ঘুরের মাঝি ঘুরের মাঝির ডাকের সঙ্গে ডাক মিলাইয়া যেবে ঠিক পথে আছে কি না—

যায়ে বাতে ডাক মিলাইয়া বেধি ।

নাও আমার সহজ ধারায় চলছে নাকি ।

এইখানে যেমন নানা জ্ঞানী একত্র হইয়াছিল সকলে ডাক মিলাইয়া বেধিবে যে ঠিক ধারায় সবার সত্যের সন্ধান চলিয়াছে কি না । শাস্ত্র পুঁথি তো গ্রন্থাগার ডরিয়া আছে, তবু বাহুব মাহুতের কাছে দুলভ । মাহুতের মত বল মাহুতের আর নাই—

সবার উপরে মাহুত সত্য তাহার উপরে নাই ।

সকল মস্তের পবন নয় মহারহস্যময় মহাকাব্য গুহময় ভীম একধিন বলিরাছিলেন যুধিষ্ঠিরকে—

জন্ম ত্রয় তথিবা যে ত্রীদি

ন মাহুবা ক্ষেপ্তে ভাঃ বি কিকিঃ ।—দ্বাদশবর্ষ, ২০২, ২০

ভাগবত বহু পূর্বে আকর্ষণ কবি বলিরাছিলেন, মাহুয়ের মধ্যে ত্রয়কে যিনি দেখিরাছেন তিনিই ত্রয়কে পরম স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিরাছেন—

যে পুরুষে ত্রয় বিহু কে বিহুঃ পরমেষ্টবৎ ।—অষ্টবর্ষ, ১০, ৭, ১৭

কারণ মাহুয়ের মধ্যে অনন্ত ও মৃত্যু একত্র সমাহিত । মাহুয়ের নাড়ীতে নাড়ীতে মহাগমুত্র স্পন্দিত—

গমুত্রাতঃ ৫ মৃত্যুক পুরুষেণ সমাহিতঃ ।

সমুদ্রে বস্ত নাতাঃ পুরুষেণ সমাহিতাঃ ।—ঐ, ১০, ৭, ১০

রবীন্দ্র-এসর

বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য-অনুশীলন

১৯৪০ সালে একবার পশ্চিম-ইউরোপে গিয়েছিলাম । তখন নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ হয়েছিল । আমরা এক সময়ে জানতাম যিসেমে ভারতবর্ষের প্রধান পরিচয় রবীন্দ্রনাথের যোগে, ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের দেশ । এখন কালের গতিতে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ইরোরোপে জেনেছে, ভারতবর্ষ শুধু রবীন্দ্রনাথের দেশ নয়— শাভির দেশ, হিন্দু-মুসলমানের দেশ ইত্যাদি ; ইত্যাদি কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও যে দেশ সে কথা খুব কম লোকেরই মনে আছে । পূর্বে গুঁজে কোনো সোফানে তাঁর বই দেখতাম না, ছাপা নেই, কিংবা সোফানে রাখে না । বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্ব-বন্ধন যে ভারতবর্ষের বাগী তা অনেক জানে কিন্তু সে মস্তের উৎপাতাকে তুলে গেছে ও যাচ্ছে । কালের ধর্মই এটি, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তাছাড়া প্রশংসাপাত্র যুগে, যবনের কাগজে যে সব নাম প্রত্যাহ দেখা যায় না তা কার মনে থাকে ? সাধারণ শিক্ষিত মাহুয় আমরাল খবরের কাগজ আর কাইল ছাড়। অন্ত কিছু পড়ে উঠতে পারে না ।

ঐ সময়ে ইংলণ্ডে ইতিহাস ইনস্টিটিউট অব কালচার আমাদের কিছু বলতে অহরোধ করলে আমি কবির সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম । সেই সভায় কয়েকজন ছিলেন থানা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন, এমন কি লণ্ডনে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠের দিন উপস্থিত ছিলেন । তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ । তাঁদের অহরোধে মোব হাজেসে গভারলীফ লীগের ঘরে আবার কিছু আলোচনা করবার সুযোগ পাই । সেদিন আমি বিশেষ করে কবির রচনার একটি লক্ষ্যন অহবান করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছিলাম । কবির রচনায় স্ত্রীত মানবের গুণ যে স্থপথ্য আছে ভাবার ব্যবধানের ক্ষতই তা সকলের কাছে পৌছল না, মানবজাতির এটি দুর্ভাগ্য । সেই সভায় সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের জাতুশ্রুতী লিপি ফ্রয়েড উপস্থিত ছিলেন, তিনি কবির সঙ্গে ইরোরোপে নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন, অনেক বাংলা কবিতা শিখেছিলেন ও সভায় আবৃত্তি করতেন ; এতদিন পরেও তিনি চমৎকার উচ্চারণে “হৃদয় আমার নাচে রে” আবৃত্তি করলেন । লিপি ফ্রয়েড আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন । সভাপতি পি. ই. এন. -এর সম্পাদক জীবন্ত ডেভিড কাত্তার আমাকে ডরসা

দিলেন যে, ইউনেস্কো থেকে প্রত্যেক দেশীয় ভাষার সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাঁদের তিনি অহরহ প্রবোধন দেন কবির একটি কাব্যসঙ্কলন অহুবাণ প্রকাশ করা হয়। পরে তিনি আমার জানিয়েছিলেন, এই অহরহ প্রবোধন হয় নি, ইউনেস্কো এখন রবীন্দ্রকাব্য অহুবাণ করতে রাগি নয়। তাঁরা ভারতীয় যে যে বই অহুবাণ করছেন তারও নাম জানিয়েছিলেন, তার উল্লেখ এখানে নিশ্চয়োত্তর। এই অভিজ্ঞতা আমার মনকে স্পষ্ট করেছিল। পরে তারা নীর্থ দিন গুপ্তে বাস করেছেন, এমন অনেকে আমাকে বলেছিলেন এসে সবার কবিকে তুলে দাচ্ছে, এখন নতুন করে তাঁর রচনার অহুবাণ ও প্রচার হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আমার সেই সামান্য চেষ্টা অহুবেই বিনষ্ট হল, সেখানে গুপ্তের একবারেই উৎসাহ নেই। গুনগুন প্রকাশকরাও ছাপবে না। এ সম্বন্ধে তারা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের চিঠিপত্র এখনও আমার কাছে রয়েছে।

তার পর পতনভর জুলাই মাসে সোভিয়েট রাশিয়ায় যাবার একটা সুযোগ এল। যাবার সময়েই মনে করেছিলাম, যেমন করে পারি কবির কথা বলবই। তবে মনে প্রচুর সংশয় ছিল তাঁর প্রতি এখনকার 'দুহ্মানব'দের অহুবাণ কতটা থাকবে। ইতিপূর্বে যে সব আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের অহুবাণ পড়েছিলাম সেগুলি কেবলমাত্র প্রাণাণা ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সন্দেহ ছিল বিস্তৃত আনন্দবাণী, নিছক সাহিত্য আর গুপ্তের ভালো লাগে কি না। প্রথম সংখ্য ফুল, লুগানে মহিলা সম্বলনে। প্রতিদিনের নথো রাশিয়ান মেয়ে অনেক ছিল, সেবাং তাদের একজনের সঙ্গে খাবার টেবিলে পাণ্যপানি বসেছিলাম। তাণো করে আলাপ হয়ে গেল, কারণ সে ইংরেজি বলে চমৎকার। সোভ্যেট কার করতে এসেছে। নাম জানিয়া। বেশলায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে, অনেক বাঙালী সাহিত্যিকের নাম জানে, দার্শনিক হিলাবে আমার পিতার নামও শুনেছে। বিস্মিত হয়ে গেলাম। তার কাছেই গুনগুন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা রাশিয়ান ভাষায় অহুবাণ করা ওয়া স্থির করেছে এবং একথাও বই সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। "কি বই জান কি?" "কি করে জানব? সে আমি চক্ষেও দেখিনি— দেখবার আশাও নেই। আমার নাম রেজেন্সি করিবেছি কিন্তু আমার নাম পর্ষদ পৌছতেই সব বই ছুঁয়ে যাবে। তাই পরের সংস্করণের অপেক্ষা আছি।" তাকেই আমি বিশেষ অহরহ প্রবোধন করলাম, তারা এই অহুবাণের ভার নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। আমরা পনেরো-সুড়ি মনের দল চলছি। সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন, ভিন্ন বিষয়ে অহুবাণ। বিশেষত, বেশির ভাগই ছিল শিক্ষকতা করেন, তাঁরা ছিল দেখবেন, হাসপাতাল দেখবেন, সে দেশে পড়ে আমার যা প্রধান সম্বন্ধের বিষয় তার খবর পাও কি না সম্বন্ধে ছিল। যা হোক মতো পৌছতেই, আমাদের মহিলা-কর্মিণির সেক্রেটারির ঘরে কর্মস্থলী স্থির করবার জন্য ডাক পড়ল। সবার অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁরা ভিজিটাস করলেন, তাঁদের মধ্যে আমরা কী কী দেখতে চাই, কার কার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁরা বিশেষভাবে বললেন যে আমাদের প্রোগ্রাম আমরাই ঠিক করব, তাঁরা সে বিষয়ে কিছুই বলতে রাগি নয়। বেশলায় নইলে কোথাকোথায় সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরিয়ে দিয়েছে এই নিদ্যাজগিনী হতে হবে, তাতে তাঁরা রাগি নয়। অতএব সবাই মিলে যে যা দেখব বলতে থাকায় এবং মহা-সোভিয়েটের বোলটা রিপাব্লিকের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞাতবশত সে শোনাগল যেন আসাম যাবার পথে মাহাত্ম ঘুরিয়ে দিলে পৌছে সেওয়ার মতো। যা হোক তার মতোই আমি আমার আরজি পেশ করলাম। মাহাত্ম পারফেনোভা, PERFENOV মহিলা কর্মিণির সহকারী সভানেত্রী আমায় আশ্বাস দিলেন, যে করে হোক সে ব্যবস্থা করে

দেবেন। কিন্তু মুগ্ধকিল এই যে, অসুস্থবাসকারিণী থাকেন সেনিনগ্রাদে, এবং সেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুখন গ্রীষ্মাবকাশ চলেছে। কিম্বত্তি পথে একজন বয়ীদ্বন্দ্বী মহিলা কর্মী মারিয়া বললে, “আপনি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ? আমাদের সমস্ত বেশ তাঁর ভক্ত।” তাঁর লেখার ক্ষুদ্র আমাদের জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। তাঁর গ্রন্থাবলী আট খণ্ডে ঐক্যই প্রকাশিত হবে। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই হাজার, কপি, তিন দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। আমরা নাম রেখেছি করেছি কবে পাব কে জানে ?” “কী বই সেটা বলতে পারেন ?” “উপভাস। বইটি তো আমি জানি, তার ইংরেজি নাম মনে পড়ছে না।” তার পর দু-তিনমুহুরে মিলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে বললে, “BROKEN BOAT।” “WRECK ?” “হা হা, ঠিক বলেছেন, WRECK।” “এ গল্প এসেশের লোকের এত ভালো লেগেছে ? ও তো পলাশ-বাট বছর আগেকার পুরোনো বাংলা দেশের চিত্র। একেবারেই দৈর্ঘ্য ত্রিভিন।” “তা হোক, ঠাকুরের নামে এদেশের লোক মুগ্ধ, তাঁর সব লেখা পড়তে চাই আমরা।” মারিয়া একজন সাধারণশিক্ষিতা বয়ীদ্বন্দ্বী কর্মী। মেয়ে, ঠিক ইনটেলেকচুয়াল বলা চলে না। তার মুখে এত ধবর পেয়ে বুদ্ধিতে পারলাম কবিকে জানবার ক্ষমতা এসেছে আগ্রহটা সত্য।

যেদিন সকালে সেনিনগ্রাদ পৌঁছলাম, সেদিনই দুপুরবেলা দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে দেখা করতে এলেন। জনস্রোত ঐ ভক্তলোকের বাবা রাশিয়ান ভাষায় মহাভারত অসুস্থ করেছেন। সেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী কোনো-না-কোনো প্রাচীন ভাষা শেখে। তারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সংস্কৃত আর-একজন পাঠ্য ভাষা পড়ছেন। তাঁরা বললেন স্রীমুক্তা ভিরা নভিকভা Vera Novikova যিনি বাংলার অধ্যাপিকা, তিনিই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সহযোগে এই অসুস্থবাদ-ব্যাপারের তার নির্যাসে। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম করতে গেছেন। বেশি দূর নয়, ধবর দেখা হয়েছিল, ঐক্যই এসে পড়বেন। আমাদের হাতে রাজ দুটি দিন সময় ছিল। কাজেই বেশ একটু নিরাশ হলাম। এত দূর দেশে এসেও কী ভাবে তাঁর রচনার অসুস্থ হলে তার সঠিক ধবরটা পাওয়া হবে না। মেয়ে দুটি বারবার বললে—যদিই নভিকভার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তারা প্রকাশ করছেন তাঁরা কেউ-না-কেউ যথোক্তে আমাদের কাছে নিশ্চয় আসবেন। এদের এই উৎসাহ দেখে ভিরা নভিকভার ক্ষুদ্র রবীন্দ্রনাথের একটি কোটো রেখে দিলাম। মেয়েরা লোলুপ নেত্রে তাকে রইল। তার অর্থ—“এটা তো তাঁর ? আর আমাদের ?” “তোদের চাও ?” সমস্বরে তার সাগ্রহ উত্তর এল। ছবি পেয়ে এত খুশি হল যে আশ্চর্যই হলাম। বাবার সময় বলে গেল, “পুনর্দর্শনায় চ।”

পরের দিন সেনিনগ্রাদ থেকে কিছু দূরে পিটারের গ্রামাস দেখতে বাবার ক্ষুদ্র গাড়িতে উঠছি এমন সময় একটি দ্বন্দ্বী হস্তদ্বন্দ্বী বয়ীদ্বন্দ্বী মহিলা একেবারে ছুটে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়লেন। তিনি পরিচয় করিয়ে দিল, “যেদিন থেকে এঁর রাশিয়া আসার কথা হয়েছে সেই দিন থেকে ইনি আপনার সন্ধান করছেন, এখন আপনারা দেখা করিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।” ভক্তমহিলা আমাদের অধীনে ধরলেন, ভাঙা ভাঙা অর্থোডক্সিত বাংলায় বললেন, “তোমাদের কবি আমাদেরও কবি”—বাস-স্বস্ত বসবালায় চমকে উঠলেন, একটা লাড়া পড়ে গেল। তিনি আমাদের সঙ্গে চললেন পিটারের গ্রামাস অভিমুখে। উদ্ভেদ অল্পটা ধবন প্রাপ্য দেখবে আমরা। রবীন্দ্রকব্যালোচনা করব। “তবেই বোধ হয়, নৌকাছুবি বেরিয়েছে, এবার ধবর বাইরে—অসুস্থ করছি।” এই বলেই তিনি তাঁর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে ফেললেন।

ভ্রমহিলার নামগোন্ধের বাংলাই নেই ; তাই ভাবছিলাম স্যাক্সের সরস্বতী ডে। নয়, অত মেটা। হাতব্যাগে কি আছে। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল ‘ঘরে বাইরে’র কোটোগ্রাফ-করা কতগুলি পৃষ্ঠা। তখনই ঠিকের কাছে একখানি মাত্র বাংলা ঘরে বাইরে আছে। নানা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা এক-একটা অংশ অম্বাব করছে। পরে সব একত্র করে উনি সেববেন ও প্রকাশিত হবে। ওদের বড় তড়া। কারণ জন-সাধারণের যে রকম আগ্রহ তাতে দীর্ঘে স্থির করলে চলবে না। ভ্রমহিলা বাংলা রানেন তবে কথা বলতে আটকে যায় অনভ্যাস বশত ; তাছাড়া চলতি বাংলা ও ‘সাধু’ বাংলায় গোলদল করে ফেলেন। তাই যেই শুনেছেন আমি এসেছি বা বা অম্বাব। আছে ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছেন। “আচ্ছা, ‘লাল প্যাড’ তো আমি। ‘লালপেডে’ কি ? ‘লা’ মানে তো ‘চ’লে যা’, ‘আবার মেঝে যা’ কী ?” এই রকম ছোটখাট অনেক দাগ ছিল পেনসিলে, চলতে চলতে তারই অর্থ ব্যাখ্যা হতে লাগল। অবশেষে “বে পেটেও থাকে না সেই পিঠেও সইবে” বিদেশীর পক্ষে এই দুর্বোধ্য উক্তিটিতে পৌছানো গেল। এর অর্থ বাংলা-দেশের বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন প্রযোজ্য তা বলতে বলতে বাকি সময়টা কেটে গেল। আমার অবস্থা কেবলই মনে হচ্ছিল, গল্প উপভাস প্রভৃতির চেয়ে শেষের সিন্ধুকার কবিতা প্রবন্ধ যাতে তাঁর ধর্মবৃত্ত, বিশ্বতত্ত্ব, সাহিত্যবিচার প্রভৃতি রয়েছে, যে আলোচনা বাহুরের জীবনের গভীরে প্রবেশ ক’রে তার নৃষ্টকে সত্যের অম্বাবানী করে তুলতে পারে, সেগুলির অম্বাব বেশি প্রয়োজন ; তা ছাড়া বতই এরা শিশু থাকুন একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে এমন আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি না যাতে এ কাজের দায়িত্ব একলা নিতে পারেন। এমন একজন বাঙালী সাহিত্যিক হার ভারতীয় ধর্ম ও ইতিহাসে জ্ঞান আছে এবং তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য সমন্বয়োগে অম্বাবন করেছেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া এ কাজ হৃদ্যভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু ঠিকের উৎসাহ দেখে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। কবির কাছে শুনেছিলাম যে প্রথম স্থির সময় রাশিমাতে বারে বারে ‘রাধা’ নাটকের অম্বাব KING OF THE DARK CHAMBER অভিনয় হয়েছে। তাই বেশ বিজ্ঞের মতো শ্রীমতী নভিকতাকে বললাম, “তোমাদের তো আগেও অনেক অম্বাব হয়েছে। তোমরা তো KING OF THE DARK CHAMBER স্থির সময় অভিনয় করেছে ?” “স্থির সময় !” বিস্মিত হয়ে গেলেন ভ্রমহিলা। তার পরই মনে পড়ল, “ও হ্যাঁ, সে তো প্রথম বিশ্বক, শুনেছি বটে।” কিন্তু সে সময়ই ইংরেজি থেকে অম্বাব করা। এরকম পথের হাতে ওরা নিতে রাজি নয় তাই মূল বাংলা থেকে অম্বাব করতে বন্ধপরিষ্কার হয়েছেন। আমার অবস্থা একটু সম্বোধ হয়েই গেল যে অম্বাব কতটা নিরুত্তর হবে। কিন্তু সেদিন সেই বহু দূর দেশের প্রাসাদ-উদ্যানে রোজাতে বেড়াতে শ্রীমতী নভিকতার মধ্যে যে রবীন্দ্রভক্তি, তাকে জানবার ইচ্ছা, তাঁর কাব্যকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা ও উৎসাহ সেবেছিলাম, তাতে বিশ্বাসে অভিহৃত হয়েছিলাম। কোনো সমালোচনার কথা বলতে পারি নি।

মধ্যেতে কিয়ে একদিন একটা প্রকাণ্ড সভায় আমরা যে দার স্থানে বসবার আয়োজন করছি এমন সময় একজন ভ্রমহিলা এসে অত্যন্ত ভাঙা ইংরেজী ও ফরাসী মিলিয়ে অস্ত্র কোনো একটা নতুন ডাভা তৈরি করে কিছু বলতে লাগলেন। তখন কাছাকাছি গোভারী কাউকে পাই না। শুধু তাঁর একটি কথা, ‘ভাগ্যের’ ‘ভাগ্যের’ বৃদ্ধিতে পারলাম— সেই অতিপরিচিত শব্দটি শোনা মাত্র তার পিছন পিছন এসে ডিঙের মধ্যে একজন বৃদ্ধার সামনে পৌঁছলাম। তাঁর সঙ্গে একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে ছিল, সে স্বন্দর বাংলায়

বললে, “ইনি স্টেট পাবলিশিং হাউসের ডিরেক্টর মারিয়া ভিটাসেভস্কায়। Maria Vitashevskaya। আমরা ভারতীয় যে কথানি বই অহুবাধ কঁসেছি তার এক সেট আপনাকে ও আপনার হাত দিয়ে বিশ্বভারতীকে পাঠাতে চাই। নৌকাচুবী, শঙ্কুলা ও লোকগাহিতোর কতকগুলি গল্প।” মারিয়া ইংরেজি ও বলেন না বাংলাও বলেন না, এই বালিকার সাহায্যে কথাবার্তা বলা গেল। তাঁরা কবির সমগ্র রচনাবলীর অগ্র অহুবাধ জানালেন। অনেকদিন থেকে তাঁরা চেষ্টা করছেন বই ছোপাড় হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ বেননকে বলায় তাঁর কাছে যা কিছু ইংরেজি অহুবাধ ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। “আমরা ইংরেজি অহুবাধ দিয়ে কী করব, যে ভাষায় তিনি লিখেছেন আমরা নিজেরা পড়ে তাঁর কথা আমাদের ভাষায় তুলে নেব। আমাদের দেশ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে। নব্বই হাজার কপি দু তিন দিনে বিক্রি হয়ে গেল। বেশির ভাগ লোকই পেন না। আমরা তাঁর ভক্ত।” আমি বললাম, “তোমরা এখানে একটা ভালো করে টাণোর সোসাইটি কর-না কেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যোগ থাকবে।” “বেশ তো বেশ তো”—যুব উৎসাহিত হলেন ভিটাসেভস্কায়, “তোমাদের তো খুব বড় টাণোর সোসাইটি আছে?” একটু সামলে নিয়ে বললুম, “হ্যাঁ, তা আছে বইকি।” “সেখানে তো লক্ষ লক্ষ বেয়ার, তিনিই প্রিয়তম কবি ভারতবর্ষের—সমস্ত প্রদেশে প্রদেশে নিচ্চর তাঁর নামে বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে তাঁর কাব্য পড়া হয়, আলোচনা হয়?” এবারে কষ্টে আত্মসংবরণ করে এই প্রশ্ন ইতি করে দিলাম। ভদ্রনহিলা গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন, “অসীম সৌভাগ্য তোমাদের, এমন মানুষ তোমাদের দেশে জন্মেছেন। তোমাদের ভাষা ছন্দ-রূপে ভরে দিয়েছেন, তোমাদের জীবনে প্রেরণা দিয়েছেন, তোমরা পরমহুস্মর সেই মানুষকে দেখেছ। যখন তিনি এসে এসেছিলেন আমরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। দয়া করে আমাকে একখানি ছবি দিয়ে। ভালো ছবি আমাদের নেই।”

সাধারণের অবগতির জন্য আমার এই অভিজ্ঞতা লিখলাম—লৌহবনিকার অন্তরালে যখন রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাঙাগড়া চলছিল, যখন মানুষের ভাবনা-চিন্তা আশ-আকাঙ্ক্ষাকে নূতন পঙ্খতিতে ঢেলে সাঝানো হচ্ছিল সেই দৃশ্য-আকর্ষণ সেশের মধ্যে থেকে তখনও মুছে যায় নি অল্প-একটু-সেখা আকর্ষণ মানুষের স্বভাব। তাঁর বাক্য তাঁর কাব্য যে চিরন্তন বানবের বাণী বহন করছে—সব অবস্থায় সেই অশ্রুতপাত্রে তুর্গত ও স্ক্রিষ্ট মানুষের পথ আছে, হৃদয় চিন্তের আনন্দ আছে, আনন্দিভের মুক্তি আছে, জীবনের সত্য আছে। এরা বুদ্ধিমান জাতি এবং বর্ষাধই নিজেদের মঙ্গল চায় তাই বেশ কাল ও ভাষার দ্বতর ব্যবধান পার হয়ে তারই অহুবাধানে বেরিয়েছে।

ঐন্দ্রেন্দ্রো দেবী

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

* ১৮ নবেম্বর ১৮৯৮ — ১২ জানুয়ারি ১৯৪৬

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বিদেশে— প্যারিসে। ১৯২৪ সালে।

দেশে থাকতেই তাঁর নামের সঙ্গে অবস্থা পরিচয় ছিল। কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর সন্মান শুনছি অনেকের ঘূষে। কিন্তু সাক্ষাৎ-পরিচয় হল বিদেশে। সেই পরিচয় অল্প দিনের মধ্যেই সখে গাঁড়িয়ে গেল। শেষদিন পর্যন্ত সেই সখা নিবিড় ছিল।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে আমি প্রথম বিদেশ বাত্মা করি। ভারতের বাইরে যাওয়া সেই আমার প্রথম। বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকব, কার সঙ্গে কি ভাবে পরিচয় করব, সে-দেশের আচার-আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেব কি ভাবে—এই রকম নানা প্রশ্ন মনে জেগেছিল। আর, এইসব প্রশ্ন সঙ্গে নিয়েই আমি বাত্মা করি।

প্যারিসে পদার্পণ করেই আমার সমস্ত প্রশ্নের সীমাংসা ঘেন হয়ে গেল। আমি সহায় পেয়ে গেলাম, বন্ধু পেয়ে গেলাম। ডক্টর বাগচীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। কিছুদিন আগে থেকে তিনি প্যারিসে ছিলেন।

ডক্টর বাগচী তখনও ডক্টর নন। অধ্যাপক গিলবার্ট লেভির অধীনে তখন তিনি গবেষক ছাত্র। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ-ছাশিশ, আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ। প্রায়-সমবয়সী একজন ইহুদ পুয়ে বিদেশকে আর বিদেশ বলে মনে হল না।

ইতিহাস স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশনের নামে প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রদের একটা আড্ডা ছিল। ডক্টর বাগচী ছিলেন এর সেক্রেটারি। বেশে বেশব ছাত্র বিপ্লবী বলে মার্কোমার্স ছিল, সে-আমলের ব্রিটিশ সরকার ঘাদের স্বনামের দেখতেন না, এই অ্যাসোসিয়েশন ছিল তাদের আশ্রয়। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এর শাখা ছিল, প্যারিসে ছিল প্রধান শাখা— 17 Rue du Sommerard ছিল তার ঠিকানা। এই বাড়িতে আমরা একত্রে থাকতাম। একত্রে খাওয়া-পাওয়া করতাম। তাই, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি হয়ে গেল।

ডক্টর বাগচী প্রফেসর লেভির খুব শ্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রফেসর ও মাদাম লেভি খুব স্নেহ করতেন ডক্টর বাগচীকে, বলতেন, “আমার ছেলে।”

ইতোমধ্যে নিয়ে তাঁদের গভীর গবেষণা ও অধ্যয়ন চলত। আমরা দুই থেকে দেখতাম। কেননা, ওই *বিষয় সম্বন্ধে আমার আগ্রহ থাকলেও জ্ঞান ছিল না। আমার বিষয় ছিল বিজ্ঞান—কিম্বদ।

বিজ্ঞানেই আমার সাবজেক্ট। বৈজ্ঞানিকদের উপর টান হওয়া তাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ফেলব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার আমার খুব আগ্রহ হল। কিন্তু হঠাৎ তো কারো কাছে গিয়ে ছাড়ির হওয়া যায় না।

এই সময় ডক্টর বাগচীর সহায়তা আমি পাই। তিনি প্রফেসর লেভির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে আমি মাদাম হুরীর সঙ্গে দেখা করি। এর পর আর্থানীতে গিয়ে

আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়। অবশ্য আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার পত্রবোণে পরিচয় ছিল বেশ থাকতই।

ডক্টর বাগটার আগেই আমি দেশে ফিরে আসি। আমি আসার সময় আমার অনেকগুলি বই ফেল এনহিলায়, ডক্টর বাগটা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

দেশে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক বার। দতই তাঁকে দেখেছি কাছে তাঁর নিষ্ঠা দেখে ততই মুগ্ধ হতে হয়েছে।

তাঁর পর আমি ঢাকায় চলে যাই। মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব কলকাতায় আগতাম তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হত। বৌদ্ধশাস্ত্র, ভারতের বোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আগাগোে বুঝেছি, এগর বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুবই নিবিড়। বিভিন্ন বই লিখে তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ লেখ জ্ঞান বিতরণ করে গিয়েছেন তাঁর চিরস্থায়ী মূল্য আছে।

অতি সহজ কোমল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। বিদেশে গিয়ে যেসব ছাত্র অসুবিধে পড়ত, তিনি তখন তাদের সহায় হয়ে এগিয়ে যেতেন। টাকা ভোগাড় করে তাদের সাহায্য করতেন। ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে বাতে জ্ঞানার্জন করতে পারে, তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের অত্র ছিল না। বিদেশে ভারতীয় বনিকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে তিনি একটা কণ্ড তৈরি করেছিলেন।

মনে পড়ে তাঁর হৃদয়প্রসারী দৃষ্টির কথা। চীনদেশের সঙ্গে ভারতের বোগাযোগ বহুকাল থেকে। মাঝে সেই বোগপুত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ভারতের সমস্ত চীনদেশের এই আত্মীয়তায় কথা তিনি বিশ্বস্ত তো হনই নি, বরঞ্চ সেই আত্মীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাঁর উদ্ভোগের পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম চীন-সংস্কৃত অভিধান সম্পাদন করেন, এর দ্বারা তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক নুতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
অনুসেখক শ্রীশ্রীল দায়

২

প্রবোধচন্দ্র বাগটার পরলোক-গমনে জ্ঞানবিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তথা শব্দ্র জগতের পক্ষে যে ক্ষতি হইল, তাহা উল্লেখিত কিছু কালের জন্য অনপনের গ্রহিল, এবং উবিষ্ট বহু বংসর ধরিয়া তাহা দূরপনয়েই থাকিবে। তিনি মাত্র ৫৮ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, এবং যে কাণ্ড তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনায় বাহা তিনি করিয়া উঠিবার সময় পাইলেন না তাহার বিচার করিলে আমাদের বলিতে হয় যে ইহা অকাল-মৃত্যুই হইয়াছে। পরিপূর্ণ এবং পরিণত মানসিক শক্তির অধিকারী আশি ৩ তদুর্ধ্ব বয়সের জ্ঞান-তপস্বী আমাদের দেশে বিরল নহেন; এবং এই হেতু আমাদের মনে এই অকাল-মৃত্যুর জন্য পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কথা এবং জ্ঞাতির কথা ভাবিয়া নিরুপায় হাহাকার জাগিয়া উঠে। ইহার উপর এই অকাল-মৃত্যুর কারণ পরিবার-গত ও মিত্রগোষ্ঠী-গত অনপনের শোচ্য ভো আছেই।

বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে পণ্ডিত ও গবেষকের অভাব নাই, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগটার পাণ্ডিত্যের বহু এবং প্রকাশ উভয় দিকেই একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। Indology বা প্রাচীন ভারত-বিজ্ঞান



Robert H. Lusk - 1900

W. A. H. H. H. H. H.



শ্যামাধী ব্রজব্রহ্মচন্দ্র ব্রহ্মচন্দ্র ও উপাচার্য ব্রহ্মচন্দ্র বাগচী
বিক্রমপুরে ১৯৩৩-৩৪ । শতাব্দীকল্প ১৯৩৩



ব্রজব্রহ্মচন্দ্র ব্রহ্মচন্দ্র ও ব্রহ্মচন্দ্র বাগচী
পাটনা ১৯৩৩

অবলম্বন করিয়া বহু দুরূহ পণ্ডিত আমাদের দেশে ও অল্প কতিপয় সেখাইয়া গিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে বাহার্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের নাম অন্যায়সে করা যায়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র নিজে বিশেষ কৃতিত্ব সেখাইয়াছেন সেটা অনন্তলাভাধার, সেটা হইতেছে ভারত ও চীনের সম্পর্ক। চীন-বিস্তার ও ভারত-বিস্তার, এই উভয়ের মধ্যে সে-স্বরূপ ছিল প্রবোধচন্দ্রের বিষয়। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার শুক কন্যাসী আচার্য্য Sylvain Levi সিদ্দান্তা সেতি মহাশয়ের পদাঙ্ক অমূল্য করিয়াছিলেন, এবং Paul Pelliot পোল পেলিও প্রভৃতি অল্প কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভাষনিতও তিনি ছিলেন। গবেষণা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভারত ও চীন এই দুইটা বিরাট সভ্যতার সংযোগের নৈকান্তি উদ্ধার করার কার্য্যে যে বোগ্যতা ও যে অধিকার অপেক্ষিত, তাহা সর্বজন-স্বলভ নহে। একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সহিত এবং আনুমানিক ভাবে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বনিত পরিচয় অপেক্ষিত, অন্য দিকে তেমনি চীনা ভাষাতে কান্স-চালানো বদল থাকার প্রকার; এবং চীনা লিখিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইহার দুঃসহ্যতার কথা চিন্তা করিলে, এই কান্স-চালানো বদল, অর্থাৎ কম-পক্ষে আজাই-তিন হাজার বিভিন্ন character বা অক্ষরের সহিত পরিচয়, সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এতদ্বিত্ত, ইংরেজী ছাড়া উপরন্তু অন্ততঃ পক্ষে কন্যাসী ও জার্মান ভাষার মধ্যে পরিচয় অপরিহার্য্য। তদুপরি সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও ভাল করিয়া জানা প্রকার। চীনার মধ্যে মধ্যে কিংকি জাপানী ভাষার জ্ঞানও কখনও-কখনও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তিব্বতীয় সহিত, বিশেষ করিয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্র, পরিচয়ও আবশ্যিক হয়। এবং এই-সমস্ত ভাষা-বিষয়ক বিশেষ যোগ্যতার মধ্যে মধ্যে আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী, অবজ্ঞার বিষয় বর্জন করিয়া মুখ্য বিষয় ধরিয়া লইবার শক্তি, সংস্কৃতি-শূন্য মনোভাব এবং সব কথা নিজে ভাল করিয়া বুঝিয়া সহজ ও সার্থক ভাবে তাহা অপরকে বুঝাইতে পারিবার মত প্রাচল লিখন-শৈলী, এগুলিও থাকা চাই।

ভারত ও চীনের সংযোগ সম্বন্ধে ও এশিয়া-খণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আলোকপাত করিবার কার্য্যে এই সমস্ত বোগ্যতা ও অজ্ঞান ভূমির অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রবোধচন্দ্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্রের সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন আমাদের আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম চীনবিজ্ঞানী। খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ৬০ খ্রীষ্টাব্দে, দুইজন ভারতীয় পণ্ডিত প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া চীনদেশে হান-বংশীয় সম্রাটের রাজধানী সো-হাঙ-এ উপনীত হন, ইহাদের নাম হইতেছে কান্তপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক। চীনদেশে পহঁছিয়াই ইহারা ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে চীন-ভাষায় অমূল্য করিতে আকস্মিকভাবে হইলেন। এই জাবে ইহারা ভারত ও চীনের মধ্যে যে সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত করিলেন, তাহা ১২০০-১৩০০ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত রহিল। ইহাদের প্রবর্তিত ধারা বা পরম্পরার মধ্যে আসিলেন, একদিকে বহু বহু ভারতীয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী, বাহার্য্য চীনদেশে গিয়া চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিলেন এবং চীনা পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধশাস্ত্র ভারতীয় ভাষা হইতে চীনা ভাষায় অমূল্য করিলেন, কতিং বা নুতন গ্রন্থ চীনা ভাষায় লিখিলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই চীনদেশেই রহিয়া যান, এবং দেখানেনই দেখা করান। অন্যদিকে তেমনি বহু চীনা বিজ্ঞান এই ধারার মধ্যে সেবা দিলেন, বুদ্ধ-বচন সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষায় বাহার্য্য ভাষাবৎ বিপদসমূহকে উপেক্ষা করিয়া ভারতে আসিয়া ভারতীয়

ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র বুঝিবার ও চীনা ভাষায় অল্পবাদ্য করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া যথেষ্ট প্রভাববর্জন করিলেন, এবং মাতৃভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র সংঘ-লভা করিবার কাৰ্য্য জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিলেন, ও তাহারে ভারতীয় গুরু ও অগ্রগামীদের মত এই কাৰ্য্যে জীবনপাত করিলেন। কৃষ্ণ-নগরীর কুমারজীব, দক্ষিণ ভারতের বোধিধর্ম, চীনদেশের ফা-হিয়েন, হিউএন-থ্যাং, ও টে-জুসিঙ—ইহাদের নাম এই সম্পর্কে প্রথমে করিতে হয়। কালক্রমে ভারতবর্ষে কৃষ্ণীসের ধারা বিস্তৃত হইল, ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতের সঙ্গে চীনের সাক্ষাৎ যোগবৃত্ত ছিন্ন হইয়া গেল। পণ্ডিতের আদান-প্রদান করেক শতক ধরিয়া প্রায় বন্ধই রহিল। চীনের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ নির্বাণিত হইল, চীনদেশেও সংস্কৃত-চর্চা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে তবুও চীনদেশে ভারতের সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা কীণ ধারায় প্রবাহিত রহিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয় পণ্ডিতের চীন-ভাষায় বিদ্বত্তার কাহিনীর স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

পুনরায় ইউরোপের পণ্ডিতদের চোঁচ চীনদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের আলোচনাকে আগ্রহ করিয়া ভারত ও চীনের এই প্রাচীন সংযোগের কথা আবার জনসমক্ষে পুনরুজ্জীবিত হইল। ইউরোপীয় চীন সংস্কৃতিবিৎ পণ্ডিতেরা চীনা গ্রন্থের অল্পবাদ্য আরম্ভ করিলেন, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজীতে; আমাদের দেশেও ক্রমে চীন ও ভারতের পুরাতন কল্যাণ-বিষয়তার কথা আলিঙ্গ্য পড়িল। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চোঁচের ফলে ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের আধারে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই চীন-ভারত-সংবাদ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া আসিল, এবং চীনা ভাষায় সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য কিছু পরিমাণ আগ্রহও দেখা দিল। আধুনিক ভারতে চীনা ভাষায় চর্চায় আবশ্যিকতার কথা আমাদের শিক্ষা—নেতাদের কাহারও-কাহারও মনে জাগ্রিত হইল। চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিতে হইবে দুই কারণে; এক—প্রাচীন ভারতকে আরও ভাল করিয়া বুঝিবার সাধন হিসাবে; এবং দুই—প্রতিবেশী সুপ্রাচীন হুলভা চীনকেও বুঝিবার জন্য।

এ সুপে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে প্রথম চীনা ভাষায় অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—বোধহয় ১৯১৭ সালে তিনি চীন হইতে প্রত্যাগত একজন বেদজ্ঞান পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই চীনা ভাষা পাঠের জন্য আমি অন্ততম ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ক্লাস বেশী দিন চলে নাই—ছাত্রের অভাবে। ইহার পূর্বে, ১৯১৪র পূর্বে, বিদ্যাত নানাভাষাবিৎ হরিনাথ মে নিম্ন গৃহে চীনা ভাষায় শিক্ষক রাখিয়া চীনার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইরূপ জ্ঞানীরা ছিলেন। নির্ধীপু ও পাটনার ব্যারিস্টার, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক বর্ণীর কানীগ্রাম্য কার্যবাল অককোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে অবস্থানকালে চীনা-ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া এক বৎসরের জন্য একটা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তিনি কিন্তু আর অগ্রসর হন নাই। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী দার্শনিকভেদে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রথম হইতেই তিনি চীনাভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক সিন্ধুয়া সেন্টি পার্সি হইতে বিশ্বভারতীর অভিব্য-অধ্যাপক রূপে আগমন করিলেন, এবং তাঁহার বিশ্বভারতীতে অবস্থান ভারতে চীনা ভাষায় চর্চায় পক্ষে বিশেষ অল্পপ্রেরণা ও উৎসাহ আনিয়া দিল। চীনা ও তিব্বতী উভয় ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হইল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় উপাচার্যের সঙ্গে এই দুই-ভাষা অধ্যয়নে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মীদের কেহ কেহও যোগদান করিলেন।

অধ্যাপক সিল্ভিয়া লেভির শুভাগমনে চীনাভাষার শিক্ষা সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত হইল প্রবোধচন্দ্রের জীবনে। ইহার দ্বারা ফল ইহাই হইল যে, এই যুগে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, ভারতবর্ষ প্রবোধচন্দ্রকে পাইয়া বিশ্বের চীনবিৎ পণ্ডিতদের সত্য নিম্ন গৌরবের আসন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। এ যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চীনবিৎ রূপে প্রবোধচন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। এবং কেবল তাহাই নহে। বিশেষ দৃষ্টান্তানুসারে গবেষণার দ্বারা তিনি ভারতের পক্ষে এই নূতন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিশ্বসমাজে প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, একটা অনপেক্ষিত দিকে আধুনিক ভারতের মুখ উন্মুল করিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের জীবন সাধারণ বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োজিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতের জীবন, ইহাতে ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে ভ্রমণ ব্যতীত লক্ষণীয় বা চমকপ্রদ ঘটনা বা কাণ্ডারলী আর কিছুই নাই। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র বশোহর জেলার ত্রিকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল ধুলনা জেলায়। যথারীতি স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৮ সালে ইনি বি-এ পাস করেন, এবং ১৯২০ সালে “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি” বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি স্ত্রী আন্তোভা ম্যুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন অর্থাৎ বিভাগ লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। বৌদ্ধ ধর্ম ও চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য ১৯২১ সালে স্ত্রী আন্তোভা কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, এবং এই রূপে বিশ্বভারতীতে তিনি অধ্যাপক সিল্ভিয়া লেভির শিষ্য গ্রহণ করেন। এই মেধাবী পরিভ্রমী এবং নীরব-কর্মী শিল্পকে পাইয়া অধ্যাপক লেভির মত পণ্ডিত বিশেষ প্রীত হন, এবং নিম্ন মানসিক ও চারিত্রিক গুণে ও চরিত্র-বাহুর্ঘ্যে স্বেচ্ছা-বশস্তীর নিকট প্রবোধচন্দ্র পূরবৎ বেধ ও অঙ্কুশ লাভ করেন। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে বহুগুলি ভারতীয় ছাত্রের পরিচয় হইয়াছিল, ছাত্রবংসল লেভির কাছে সকলেই প্রিয় ছিলেন, কিন্তু আশাবাদের মনে হইত, প্রবোধচন্দ্র ইহাদের সকলের চেয়ে লেভির প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। প্রবোধের সহিত সাক্ষাৎ আচরণে ও প্রবোধ সঘর্ষ পরোক্ষ উল্লেখে আচার্য্য লেভির এই প্রগাঢ় মেহের বহু নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থিক প্রবোধেরও গুরু প্রতি স্বচল্য গুরুভক্তি ছিল। ইহাদের গুরুশিষ্য-সম্পর্ক যেন আশাবাদের সেনেরই মত হইয়াছিল।

অধ্যাপক লেভির আগ্রহে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার সহিত ইন্দোচীনে ও জাপানে গান। কাষোজিয়া বা কছুজমেন, আনাম বা ডিয়েংনাম, এবং কোচিন-চীন বা প্রাচীন চম্পারাজ্য ঘুরিয়া আসিবার সুযোগ তাঁহার হয়। গুরুর নিকট এশিয়ার ইতিহাস ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে একাক্ষভাবে উপদেশ পাইবার সুযোগ এই ভ্রমণের সবার তাঁহার হইয়াছিল। “বৃহত্তর ভারত” সম্বন্ধে এইভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বৃহৎ-প্রাচ্য ভ্রমণের পরে, প্রবোধচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং অল্পকাল পরেই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়া পারিসে উপস্থিত হন ও সেখানে ধারাবাহিক ভাবে গভীর নিষ্ঠার সহিত অধ্যাপক লেভি ও অস্ত্রান্ত অধ্যাপকদের কাছে ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত ভোট ও চীন ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ও অর্থাৎ বিভাগ গবেষণা করেন। ইহার এই গবেষণার ফলস্বরূপ ফরাসী ভাষায় তিনখণ্ডে তিনি *Le Canon Bouddhique en Chine* অর্থাৎ “চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র” নামে অতি দৃষ্টান্তানুসারে, ও *Deux Lexiques Sanscrit-Chinois* অর্থাৎ “দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান” নামে দুই খণ্ডে এক অভিধান গ্রন্থ, পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পেশ করেন, এবং এই দুই বইয়ের জন্য

পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুয়ার-সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির ডক্টর-
-és-Letters (D.-és-L.) ডক্টর-এ-লেট্র্‌স্‌ অর্থাৎ সাহিত্যোচ্চাধ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ফরাসী নাগরিক
হইলে এই উপাধির সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী চাকরী বাধ্য থাকে। প্রবোধচন্দ্রের পূর্বে কেবল একজন ভারতীয়
এই উপাধি অর্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ছিলেন পরলোকগত ডাক্তার হরোথেন্দ্র মুখোপাধ্যায়— সংস্কৃত
অলঙ্কার শাস্ত্র শইয়া ইনি কাজ করেন; এবং প্রবোধচন্দ্রের পরে মাত্র আর একজন ভারতীয় এই মর্যাদার
যোগ্য বলিয়া গৃহীত হন— আমার কৃতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্‌ তারাশ্রীনাথ দাস; ইনি ফরাসী সাহিত্যে
ভারতীয় চিন্তার প্রভাব বিষয়ে ফরাসী ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করেন।

এইরূপে বিশেষ নিম্ন পাণ্ডিত্যের জন্য অর্থনালা অর্জন করিয়া প্রবোধচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান— ইতিহাস ও সংস্কৃতি— বিভাগে অগ্রতম অধ্যাপক নিযুক্ত
হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকুল্যে তাঁহার মুখ্য কৃতি ফরাসী ভাষায় লিখিত এই দুই বই Sino-
Indica গ্রন্থালায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশিত হয়, এবং এই দুই বইয়ের দ্বারা সমগ্র জগতে বিশেষ
পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের প্রশংসা জনিত হয়। চীনা ভাষায় অনুদিত সংস্কৃত ও অজ্ঞাত প্রাচীন ভারতীয়
ভাষার বৌদ্ধ গ্রন্থের হুচী বহুপূর্বে জাপানী পণ্ডিত Bunyu Nanjyo বুন্যু নান্‌জ্যো অক্ষরকোড় বিশ্ববিদ্যালয়
হইতে প্রকাশিত করেন। এই হুচী বহুবৎসর ধরিয়া চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার মন্ত্র অগ্রতম
মুখ্য সাধন-রূপে সমাদৃত হইয়া যাবহত হইয়া আসিয়াছে। নান্‌জ্যো চীনা অহুবাদগ্রন্থগুলির মূল সংস্কৃত নাম
ধরিয়া মেওগাতেই এই বইয়ের ছিল প্রধান উপযোগিতা। (ফরাসী পণ্ডিত P. Cordier করিয়ে অহুতপ
ভাবে সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভোট বা ভিক্ষুতী অহুবাদের হুচী প্রকাশিত করিয়া ভোটসেন্ধীর বৌদ্ধধর্মের চর্চায় পথ
স্বগম করিয়া সেন।) প্রবোধচন্দ্রের মুখ্য কৃতিত্ব এখানে, যে এই সমগ্র চীনা অহুবাদনাশির একটা ইতিহাস
প্রদর্শন করেন, এবং চীনা ও ভারতীয় অহুবাদগণের কালনির্দেশ ও অনুদিত গ্রন্থের আলোচনা করিয়া প্রায়
সহস্রবর্ষব্যাপী একটা সমগ্র অহুবাদ-সাহিত্যের ইতিহাস কোহুংগো পাঠক সবারের নবকে ধরিয়া সেন। চীনা
বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ তো ভারতে আসিয়া সংস্কৃতচর্চা করিতেনই; তাহা ছাড়া চীনদেশেও সংস্কৃত অধ্যয়নের ও
সংস্কৃত লেখ ইত্যাদি লিখনের রীতি ছিল। চীনাধের সংস্কৃত শিখাইবার জন্য চীনা সংস্কৃত পণ্ডিতেরা
ছোটখাট সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সবল অভিধানে প্রধান বেওরা হইত চীনা শব্দ,
ও তন্নিয় সেই শব্দের সংস্কৃত প্রতিপদ্য। সংস্কৃত শব্দের ভারতীয় লিপির অক্ষরগুলি চীনা লিপির অক্ষরগণে
উপর হইতে নীচে লেখা হইত, ও পাশে-পাশে চীনা অক্ষরে ভারতীয় বর্ণের উচ্চারণ লেখা হইত।
এইরূপ চীনা-সংস্কৃত অভিধান হস্তলিখিত ও মুদ্রিত অবস্থায় চীন ও জাপান দুই দেশেই পাওয়া গিয়াছে।
অষ্টাদশ শতকে জাপানে মুদ্রিত এইরূপ দুইখানি অভিধান প্রবোধচন্দ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়া ও ফরাসী ভাষায়
টাক-টিকনীর দ্বারা প্রকাশিত করেন। খ্রীষ্টীয় ১৮-১৯ শতকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষারূত্থা প্রাচীন চীনা
উচ্চারণের অক্ষরলেন এইরূপ অভিধানের মূল্য ইহার ভূমিকার ও চীকায় স্বস্বভাবে প্রবোধচন্দ্র কর্তৃক প্রদর্শিত
হয়। চীন ও ভারতের সভ্যতার মিলনের ইতিহাসে এইভাবে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার কর্মজীবনের প্রায়শ্চেই
সার্থক গবেষণা আরম্ভ করিয়া সেন।

১৯২৬ হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ১৯ কংসর ধরিয়া প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা
করেন। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বালিগঞ্জ স্টেশনে তাঁহার বসন্ত-বাটী তিনি প্রস্তুত করেন। এই

দীর্ঘকাল প্রবোধচন্দ্রের সহকর্মী-রূপে একত্র কার্য করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে অন্তর্য নানা স্থানে, প্রবোধচন্দ্রের নিম্নগৃহে, আমার গৃহে ও নির্ভবর্গের গৃহে, নানা দ্বারে প্রবোধের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি। পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তো উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল, উপরন্তু মাছুষ প্রবোধচন্দ্রকে ভাল না বাসিয়া পারি নাই। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী বহু বিষয়ে আমাদের একই ধরণের ছিল, উভয়েই এক হিসাবে সমানধর্মী ছিলাম। ভাষ্যভবের ক্ষেত্রেও প্রবোধচন্দ্রের বিশেষ যোগ্যতা ছিল। জীবনের ও জীবনবাহ্য গভীরতম নানা বিষয়েও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। এরূপ নিরঙ্কর অমায়িক সদাশ্রুত মাছুষ ভূরল ছিল। পাণ্ডিত্য ইহার চরিত্র-বাধুর্গকে ভার্যাক্রান্ত করিয়া বা গণিয়া বিবর্ত করিতে পারে নাই। সারল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধের চরিত্রে একটা সহজ স্বাধীনতা ছিল, যে ক্ষত তিনি স্বখনও পরম্প্রাপেক্ষা থাকিতে পারেন নাই। নিজের কোনও হুবিধার ক্ষত ক্ষমতাপালী লোকের কাছে "দরবার" করা তাহার চরিত্রের মধ্যে একেবারেই ছিল না। এইজন্য অনেক সময়ে তাহার গুণ না বুঝিয়া লোকে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, প্রবোধচন্দ্র সে বিষয়ে ক্ষেপ করেন নাই। আমাদের মনে হইত, প্রবোধচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মূল্য কলিকাতার আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে বা ধরিতে পারি নাই। নিবিবাদের একাগ্রমনে ও নিম্ন স্বাভাবিক নিষ্ঠার সহিত কাম করিয়া বাইবার অবকাশ পাইবার আশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাম ছাড়িয়া দিয়া ১৯৪৫ সালে বিশ্বভারতীর বিভাজন বা গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক গ্রহণ করেন।

কতকগুলি অহুবিধা সঙ্গেও বিশ্বভারতীতে প্রবোধচন্দ্র অনেকটা আশ্রয়রূপে কার্য করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি বিশ্বভারতীর বিভাজন ও চীনাভবন নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন; এবং বিভাজনের নানা বিভাগে উৎসাহের সহিত গবেষণার কার্য চলিতে লাগিল। নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, নুতন নুতন কতকগুলি গবেষণা দেখা গিলেন; এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাহিয়াছিলেন, বিশ্বভারতী ভারতের অন্ততম প্রধান প্রাচ্য ও পশ্চাত্য বিজ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া পড়াইল। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, তিব্বতী, চীনা, অবেস্তা, প্রাচীন পারসীক, কুর্দী, উর্দু, প্রভৃতি ভাষার মূল্যবান পুস্তক ও গ্রন্থ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া এই রূপে ভারত-বাণীকে পৌরবাচিত করিয়াছে।

১৯৪৭ সালে ভারত সরকার চীন দেশে গিয়া চীনা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষার দ্রষ্টা পাঠজন ছাত্র পাঠান, তন্মধ্যে বিশ্বভারতী হইতে দুইজন ছিলেন, এবং ইহারা সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রকে ভারত সরকার হইতে ভারত-বিজ্ঞান অধ্যাপক রূপে পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসরের জন্য পাঠানো হয়। এইরূপে চীনদেশে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া প্রবোধচন্দ্র চীনা ভাষার ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে আরও প্রাণীক অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯৪৯ সালে চীন দেশে মাও-তসে-তুঙ-এর অধীনে কনিউনিষ্ট-শাসন স্থাপিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে, ভারত সরকার চীন-দেশে অধ্যাপকতার আশঙ্কায় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্রকে ও ভারতীয় ছাত্রসমূহকে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পরে তাহাকে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত একটা সংস্কৃতি-অনুশীলক প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে আর একবার কম গণ্যের জন্য চীনদেশে বাইতে হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার ইতিমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন, প্রধান মন্ত্রী জি.ভুজবহালাল নেহরু এবিধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রথম উপাচার্য হইলেন জি.ভুজবহালাল ঠাকুর,

তৎপরে আগাধা শ্রীমুক্ত ক্ষিতিবোহন সেন, এবং ১৯০৪ সালে প্রবোধচন্দ্র এই গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নির্বাচিত হইলেন। প্রবোধচন্দ্র অনন্তকর্মী হইয়া একাএটিতে তাঁহার কর্মস্বাপালনে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই তিনি বেক্সার তাঁহার পদের প্রাপ্য বেতন ১৫০০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা কম লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরিত্র ছাত্রসেব ক্ষমতা এই অর্থ ব্যয়িত হওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রবর্তনের ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা তিনি চেষ্টিত হইলেন, এবং বিশ্বভারতীয় সর্বাক্ষয় উন্নতির ক্ষমতা প্রাপণ চেষ্টা ও পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের পারিবারিক জীবন সুখের ও শান্তির ছিল। কিন্তু মহাত্মার এক বৎসর পূর্বে বিধাতার বিধানে তাঁহাকে নিরাশ্রয় শোক পাইতে হইয়াছিল, এবং এই শোক হইতেছে ১৬ বৎসর বয়সের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু। এই শোক, ও তৎসঙ্গে দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও বিশ্বভারতীয় কাজে অত্যধিক পরিচয়, ইহাই তাঁহার অকালে পরলোক গমনের প্রধান কারণ হইয়াছিল। ১৯২১ সালে প্রবোধচন্দ্র পাননা জেলায় বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী স্রীমতী পান্না দেবী তাঁহার উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের পরপর তিনটি কন্যার পরে ১৯৩৮ সালে একমাত্র পুত্র প্রতীপ জন্মগ্রহণ করে। কন্যা তিনটির মধ্যে প্রবোধচন্দ্র দুইটির বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় কন্যার ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে মৃত্যুসুখে পতিত হয়। পুত্রের পরে প্রবোধচন্দ্রের আরও দুইটি কন্যা জন্মে। পুত্র উত্তরকালে পিতার রত পণ্ডিত হইবে এইরূপ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু ১৪ বৎসর বয়স হইতেই বালক উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়। নানা প্রকারের চিকিৎসায় বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৫ সালে কলিকাতায় মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে এই চরম শোক বাগদী-বংশভোকে সঞ্চারিত হইল। কালের মধ্যে নিরুক্ত থাকিয়া প্রবোধচন্দ্র আত্মসমর্পিত হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এইসব কারণে ও হৃদয়োগের ফলে ১৯৫৭ সালে মৃত্যুযাত্রি প্রান্তে তাঁহার জীবনসীমা নির্বাচিত হইল, বশ-ভারতী ও বিশ্ব-ভারতী এক কৃতী সন্তানকে হারাইল।

প্রবোধচন্দ্রের পুত্রক ও গ্রন্থক এবং তাঁহার সম্পাদিত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত বিশ্বভারতীয় গবেষণাময় গ্রন্থাবলীই তাঁহার প্রধান কীর্তিসম্বলরূপে বিরাজ করিবে। চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র ও চীনা-সংস্কৃত অভিধানের কথা বলিয়াছি। ভারতে আর্য্যসেব আনিবার পূর্বে যে অনার্য্য সভ্যতা— কোল বা নিবার এবং দ্রাবিড় সভ্যতা— ভারতীয় সভ্যতার আধার বংশ ছিল, ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে সে বিষয়ে তিনজন ফরাসী পণ্ডিত Jean Przyluski তাঁ পশ্চিমী, Jules Bloch স্থানীয় ব্রূক ও প্রবোধচন্দ্রের গুরু আচার্য্য Sylvain Levi সিন্‌ডা। সেটি কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ বিভিন্ন কন্যার পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এগুলির প্রচার প্রচলিত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। প্রবোধচন্দ্র এগুলির ইংরেজী অর্থবাদ করেন, ও ভারতে ও এশিয়া-বঙ্গে Austrie ও Austro-Asiatic (নিবার) ভাষাগোষ্ঠীর স্থান নির্ধারণ করিয়া একটি গবেষণাপত্র প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ও ফরাসী পণ্ডিতগণের প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে দুইটি নতুন প্রবন্ধ আরও কিছু কার্য স্বত্ব করিয়া, এবং তদ্বিষয়ে আবার রচিত একটা প্রবন্ধ লইয়া, ফরাসী হইতে অনুদিত প্রবন্ধগুলির সহিত এই চারিটি নতুন প্রবন্ধ ছড়িয়া দিয়া ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India নামে দ্বিখণ্ডিত মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক প্রকৃতি বা আধার যে মিশ্র, আর্য্যানার্য্য, তৎসম্বন্ধে বোধ বা বিচার সাগরিত করিতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে এই বই (ফরাসী গ্রন্থের স.গ্রন্থ, ও

নৃতন প্রবন্ধ কর্তা) অনেকটা কার্যকর হইয়াছে। নিখিল ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনের ১৯৪৩ সালের অধিবেশনে শাখা-সভার সভাপতি হিসাবে প্রবোধচন্দ্রের একটা মূল্যবান লেখ প্রকাশিত হয়—The Role of the Central Asian Nomads in the History of India অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে যথা-এশিয়ার যাবাবর আভিরাঙ্কণ। এই প্রবন্ধটী ভারতের ইতিহাসের একটা ভটিল অধ্যায়ের নষ্টকাণ্ডী উদ্ধারের জন্য নতুন তথ্য ও তথ্যপত্র মূল্যবান নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করে। যথা-এশিয়ার স্বর্ণের বা সোণের জাতির ভাষার আধারে গঠিত একপ্রকার প্রাকৃত ভাষাই যে ভারতে “চুলিক-পৈপাচী” নামে অভিহিত হয়, তাহা প্রবোধচন্দ্র দেখাইয়া গেল। মহাভারত অশোকের অশ্বশাসন অশ্বশিল্পন করিয়া প্রবোধ-চন্দ্র এই অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্তে পহঁছান যে হীনযান যতের বৌদ্ধধর্ম, পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র বাহার বাহন এবং যাহা সিংহল, ত্রম্পেশ, তাম ও কম্বোজে এবং চট্টলে প্রচলিত তাহাই মূল বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানের মূখ্য প্রাপ্তিপত্র বোধিসত্ত্ববাদ ও বহু প্রাচীন, এবং অশোকের শিলালেখে মহাযান-নতের অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্বোজদেশের প্রাচীন সংস্কৃত শিলালেখে উল্লিখিত কয়েকখানি সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থের পরিচয় নেপালে প্রাপ্ত পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রবোধচন্দ্র তাহার আর একটা মূল্যবান প্রবন্ধে ভারত ও বহির্ভারতের ব্রাহ্মণ ধর্মের যোগের একাংশ বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের আলোচনায়, চর্যাপদগুলির ভিন্নতী অর্থবাদ বিচার করিয়া চর্যাপদের পাঠনির্ণয়ের জন্য প্রবোধচন্দ্র অমূল্য উপাদান আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্য্য সরস্বতের কাল-নির্ণয় ও তাহার এক সার্থক গবেষণা। এদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপর্য্যবেশে রচিত বোহা ও অন্ত কবিতার সংগ্রহ ও সম্পাদনাকে তাহার কৃতিত্বের মধ্যে ধরিতে হয়।

প্রবোধচন্দ্র নিছক গবেষক ছিলেন না, সাহিত্য ও কলারসিকও ছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন বাঙ্গালা, ইংরেজী ও কন্নড়ী লিখিতে পারিতেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে, চীনের ও ভারতের সংযোগ সম্বন্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত সংস্কৃতির প্রচাদের সম্বন্ধে তাহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা বইগুলি সহরবোধ্য ভাবে এই-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ভারতে ইতিহাসের জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতি প্রচারের সহায়ক হইয়াছে। তাহার বহু প্রবন্ধের কথাও এখানে বলা হইতে পারে।

প্রবোধচন্দ্র অল্পায়ের জন্য কখনও-কখনও উচ্চা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি বিশেষভাবে কখনও আনয়ন করে নাই। প্রবল কর্তব্যনিষ্ঠা তাহার মধ্যে ছিল, তাহার সারসো ও ব্যবহার-সাহিত্যে সকলেই তাহার অর্থবাহী আপন জন হইয়া পড়িত। প্রবোধের তিরোয়ানে আবার ব্যক্তিগত দৃষ্টির কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। তাহার ব্যক্তিত্ব স্বয়ং করিয়া মনে-মনে তাহার প্রতি অশ্রুতের মত স্নেহ করিয়া আদিয়াছি, এবং তাহার পাণ্ডিত্যের কথা তাবিধা তাহার সম্বন্ধে অগ্রদ্বের উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আদিয়াছি।

ভারতের নিকট হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে, দর্শন পাইয়াছে, ভাষা চিত্রণ নৃত্য নাট্য প্রভৃতি নানা শিল্পকলা পাইয়াছে। ভারতের ভাণ্ডারে যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল তাহারও অংশী হইয়াছে। ফান্-শু বা ভারতীয় লিপিবদ্ধা চীনের মনে তাহার ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে অশ্রুতছিলিয়া আনিয়া দিয়াছে। এসব কথা ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণ আমাদের জানাইয়াছেন, আমরা তৎকাল নতুন ভাবে গর্ব্বিত অশ্রুতব করিয়া থাকি। চীনারাও এসব কথা জানিয়া আদিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের প্রতি একান্ত এতাবৎ তাহাদের শ্রদ্ধাও

ছিল অসীম। কিন্তু আমরা কি শুধুই বিদ্বাছি? চীনের মত অভাব হুগুয়া জাতির কাছ থেকে ভারত কি কিছুই শর নাই? যদি ভারত কিছুই গ্রহণ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা জাহেদেরই মানসিক বৈরাগ্য প্রদানিত হইবে—কারণ পরম্পর আদান-প্রদানের উপরেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি সম্ভবপর হয়। স্বপ্নের বিষয়, আমরাও চীনের নিকট নানা বিষয়ে শিখি—এবং এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধে আমি আমাদের সংস্কৃতির কতকগুলি দিকের উল্লেখ করি, যেখানে চীনা প্রভাব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে চীন ভ্রমণকালে চীনদেশীয় ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি। পবেষণার সাংগ্ৰহী চীনদেশে-সংগ্ৰহীত হইয়া আছে; চীনাগণ ইতিহাস-বোধ অসাধারণ, আমাদের সংস্কৃতির মত তাহাদের সংস্কৃতি ইতিহাস-বিষয়ে উদাসীন নহে। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বহুবার আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারও ধারণা, ভারতের সংস্কৃতিতে চীনের ছাপ আছে—ভারত ও চীনের মধ্যে, কেবল ভৌতিক বস্তু নাই নহে, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, কলায় ক্ষেত্রেও সেন-সেন উভয়েই হইয়া গিয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের ধারণা ছিল, চীনা গণি লাউ-সেংসের আলোচিত ভাও-বায় বা কত-বাদ অথবা নিগুণ-সুগুণ-ব্রহ্মবাদ, পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হইয়া অন্তর্ভুক্ত গ্রহণ করে, এবং আমাদের তাত্ত্বিক ব্যাচারণ ও অন্তর্গত সাধনার মধ্যে এই অর্বাচীন ভাও-বাদের প্রভাব নাকি স্থাপিত। মূল চীনা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র অবেশণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কথাসম্বন্ধে শ্রী তাঁহার সিদ্ধান্ত এই সম্বন্ধে বাহ্যতে তিনি প্রকাশ করেন সে বিষয়ে তাঁহার ও আমার উভয়েরই আগ্রহ ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃতিক চীনা ভাষার প্রভাব স্বরূপ কতকগুলি শব্দের অবস্থান দেখা যায়। সে বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র ও আমি উভয়েই আলোচনা করিতাম। আমার গ্রাম তিনিও মনে করিতেন, বোম্ব করিলে বেশ লক্ষ্যীয় একটি চীনা উপদান প্রাচীন ভারতের ভাষায় মিলিবে। চীনা-সংস্কৃত অভিধানগুলি হইতে অন্ততঃ এইরূপ একটি চীনা শব্দ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের প্রচলিত সংস্কৃতেরে তিনি পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালের আন্তর্জাতিক মানসিক সহযোগিতার ইতিহাসে এ সমস্ত অতি মূল্যবান তথ্য। এ কাজ তিনিই ভাল মতে করিতে পারিবেন তিনি চীনা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত এবং অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানেন, ও তাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে বোধ আছে। প্রবোধের তিরোধানেন এরূপ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কই? অবশ্য শ্রীমান বসন্ত বাবুদেব পরামর্শে, শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কতকগুলি তরুণতর ভারতীয় চীনবিৎ পণ্ডিত আছেন, ইংল্যান্ডে এখন আমাদের একমাত্র আশাশ্রয়।

বহুদেশ তথা ভারতের দুর্ভাগ্য যে আমরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চারিজন বিশিষ্ট বিদ্বান নবীন চিন্তানেতাকে হারালাম, বাহ্যের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যকে উজ্জ্বলভর করিয়া রাখিয়াছিল। ইংল্যান্ড হইতেছেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হরিবাল ভট্টাচার্য্য (ব্রহ্ম, প্রবোধচন্দ্রের ব্রহ্মার পরের দিন, ২০শে জানুয়ারি ১৯২৬), বেঞ্চাম সাহা (ব্রহ্ম ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬), এবং বিজ্ঞানবীর দুর্গোপাধ্যায় (ব্রহ্ম ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে আলোকিত হইয়া ছিলেন। প্রাচীন-ভারত-বিজ্ঞান ও চীন-বিজ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান ও ব্যবহার-শাস্ত্র—এতগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আলোক নিরূপিত হইল। তবে তাঁহারা বাহ্য রাখিয়া সেলেন তাহার স্ফোতি কখনও মান হইবে না।

শ্রীমদীতিভূমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয় বোধ করি ১৯১২-এর আগে। পরস্পরাকর্ষিত হেমন্তকুমার সরকার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে একপাশে দুইয়ের দোকান খুলেছিলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গেই হোক বা কলেজ স্ট্রীটের মেসেই হোক, প্রবোধবাবুকে দেখেছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বনিষ্টতা হয় আমি যখন রংপুর কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি তখন থেকে। প্রবোধবাবু শান্ত অধ্যয়নশীল পণ্ডিত; দিলীপা শেজির ছাত্র; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি তাঁর বিশেষভাবে অধ্যয়নের বস্তু ছিল। কেমন করে জানি না, আমাদের অর্ধেক মন রাজনীতিতে ছিল, কিন্তু তা সবেও তাঁর ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব পেয়েছিল। তিনি অধ্যয়নশীল হলেও, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর মনোযোগ আবহু ধাক্কাতেও বর্তমান অবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন না, এবং প্রকৃত আত্মীয়তাবাদী ছিলেন। কলকাতার যে পরীতে তিনি বাড়ি তৈরি করেন সেই পরীয়ার কল্যাণকর্মে তিনি সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। এবং সে কর্মে সময় ও অর্থদান করতে তাঁর কোনো সূঁঠা ছিল না। তাঁর সঙ্গে দু'বার আমার একত্র ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল, প্রায় আঠারো-দুড়ি বছর আগের কথা। প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে আমরা উভয়েই গিয়েছিলাম বরোয়ার একবার, ও মহীশূরে একবার। বরোয়া সম্মেলনের পর একসঙ্গেই ছিলাম আমার এক পরিচিত বাঙালী ভ্রমণলোকের বাড়িতে আমাদেরবাসে, এবং অভ্যূর গিয়ে কাঠিওয়াড়ের খানিকটা না সেবে কিম্বা না মনে করে ডাবনগর, পলিতানা, ভালী ও রাভকোট হয়ে যাবকা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তাঁর মত ইতিহাসে পণ্ডিতের সঙ্গে থাকার আমার তো খুবই সুবিধা হয়েছিল। আমরা ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ছাত্রগণা ধর্মশালাতেই খুঁজে নিতাম, হুদুতো তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু সুবিধা হয়ে যেত। প্রবোধবাবু কখনো অভিযোগ করতেন না, যা দ্রুত তাইতেই খুঁশি থাকতেন। শ্রদ্ধা পাহাড়ে ওঠবার ও নামবার সময় ঘুপান নিষেধ, মনে পড়ে শুধু এইটেতেই তাঁর তখন একমাত্র অসুবিধা হয়েছিল। তেমন মহীশূরে যখন ঘাই, তখনও সম্মেলনের শেষে দুই মনে বেলেড ও হাসেবিড়ে প্রাচীন কীর্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখে ঘাই শূকরী মঠে— সেখানে জগন্মুক শঙ্করাচার্যের মঠ দেখে কলকাতার ফিরি— বিশ্ববিদ্যালয়ের কাম, বেশি দিন ছুটি নেওয়ার ভরসা করতে পারিনি।

ব্যক্তিগত কথা একটা বলি। ফরাসী পণ্ডিত মেইয়ের আবেস্তার গাখ; লম্বা একখানি পুস্তিকা আমি বছর পঁচিশ-ছাশিশ পূর্বে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ক্যালকাতা। রিভিউ পড়ে ছাপিয়েছিলাম, পরে তা একত্র পুস্তিকা হিসাবেও প্রকাশিত হয়। পরে শুনেছিলাম, বোম্বাইয়ের কোনো কাগজে সেই পুস্তিকার তথ্য ও ভাবার বিক দিয়ে খুব এক প্রতিকূল সমালোচনা বেরিয়েছিল। প্রবোধবাবু তাঁর মূল্য খণ্ডন করে ঐ কাগজেই এক প্রবন্ধ লেখেন। তার কিছুকাল পরে আমাকে সেটা দেখান। তাঁর মূল্য স্পষ্টতা ও আক্রমণের তীক্ষ্ণতা ছিল খেটে। এমন ধারা, প্রথম চৌধুরী মহাশয়কে যখন তাঁর প্রতিকূল সমালোচকেরা তাঁর পাতিত্যা লম্বা আক্রমণ করেন তখন প্রবোধবাবুর প্রবন্ধে মূল্যেতে ও বিদ্রোপে তাঁরা নীরব হন। আন্তর্জাতিক পি. ই. এন.-এর ব্যাপারেও তাঁর আশ্রয়িতা সংগঠনপটুতা ও তেজবিতার পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন বরীষ পি. ই. এন.-এর দুঃসম্পাদক, আমিও তাঁর সঙ্গে বৃক্ত ছিলাম, কালিদাস নাগ মহাশয়ের পরে। যখন বোম্বাইয়ের ইতিহাস পি. ই. এন. বরীষ পি. ই. এন.-কে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন তখন যে পোলবোগের সৃষ্টি হয় তা যেটাবার ক্ষত ত্রিসূক্তা সন্ন্যাসিনী

নাইচু পর্যন্ত কলকাতায় আসেন। বকী পি. ই. এন. -এর মুখপাত্র ত্রিভুজ অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের হস্তি-
বিক্রমে কারও কিছু বলবার থাকেনা। কিন্তু বকী পি. ই. এন. সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

প্রবোধবাবুর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবার কথা সাধারণত লোকের মনে না-ও উঠতে পারে।
তার বিস্তর মূল্যবান প্রবন্ধ ও পুস্তক নানা ভাষায়ায় ছড়িয়ে আছে। ভাষা ছিল তার স্বজ্ঞ ও সাবলীল,
চিন্তা ছিল পরিচ্ছন্ন। সে কথা ছেড়ে নিলেও 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর প্রথম গ্রুপ মিলনভূমি ছিল তারই বাড়িতে
প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত একদিন সকলে সেখানে আসতেন, কারও কোনো বিষয়ে আলোচনা-আলোচনা করবার
থাকলে করতে, এবং পরস্পরের 'পরিচয়' হত। পরিচয়ের বৈঠকে দেখা যেত, তিনি সংস্কৃতের সমকাল
প্রোক্তা ছিলেন, সংস্কৃতের তত্ত্ববিষয়ে তার জ্ঞান ও অল্পসঙ্কীর্ণতা যথেষ্ট ছিল এবং ঐ বিষয়ে তার রচিত প্রবন্ধ
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আত্মীয়বৎসল ও বন্ধুবৎসল তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকত বাগুদেবীর উপাসনায়।
নিত্যনিয়মিত পড়াশোনাই ছিল তার অভ্যাস। জীবনের শোকে দুঃখে যদি কোথাও কিছু সাফল্য পেয়ে
থাকেন, তাহলে তাও এই বাগুদেবীর আরাধনা থেকেই। এই আরাধনা পূর্ণতর হবে বললেই তার
বিষভারতীতে যাওয়া। সেখান থেকে কলকাতাতেও তিনি বড় একটা আসতে চাইতেন না। আমাদেরও
তার সাহায্য লাভ করার সুযোগ বেশি হত না।

বিভা ভির চরিত্রের বিক গিয়ে দেখলেও তার মত সঙ্কট, সঙ্কট ও গুণী লোক হুলত নব। বিশ্ববিদ্যালয়ে
তাকে বহু ও লক্ষী হিসাবে পেয়ে বুইই ভুলি লাভ করেছিলাম। তার কর্মময় জ্ঞানব্রতী জীবনের এই
আকস্মিক অবসানে বহুদা যে বিরোগকাতর হবেন, তা তো স্বাভাবিক। জীবনে তাকেও ধারণ শোক সহ্য
করতে হয়েছিল; পূর্বে এক কন্ডাকে হারিয়েছিলেন, পরে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে খানিকক্ষণের জন্য কেমন
হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিষভারতীর আলম সবার্ভন-উৎসবের কার্যের জন্য নিজেকে দুহুর্ভের মধ্যে প্রবৃত্ত করে
নিরেখেছিলেন। "দুঃখেবহুবিধনাঃ সুখেবু বিগতশুহঃ" আমাদের জীবনের সাধনা; সেই সাধনার পরিচয় কেমন
সহজভাবে তিনি সেদিন নিরেখেছিলেন সে কথা মনে পড়ে। শান্তমুখি সংভবাক্ষ অথচ কর্ণভংগর তার
মুখি চোখের সামনে মেনে বারবার ভেসে উঠেছে।

ঐশ্বর্যরতন সেন

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ছাত্র ও কর্ম-জীবন

১৮৯৮। বনোয়ার জেলার শ্রীকোল গ্রামে জন্ম। শিক্ষা আরম্ভ হয় ঐই গ্রামেরই বিদ্যালয়ে। পরে বাগড়া
নগরে শিক্ষা লাভ করেন।

১৯১০। বাগড়া হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৮। কলকাতার কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের ধর্ম-ইতিহাস বিভাগে
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯২১। হরীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে পাণ্ড্যজ্যেষ্ঠ বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ অচার্য সিন্ধ্যা পেন্ডি শান্তিনিকেতনে

এলে তাঁর কাছে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্য দেশগুলি বিশেষভাবে চীনদেশের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি এই সময়েই তাঁর দৃষ্টি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়।

১২২২। আচার্য লেভি শর্মে নেপালে যান। নেপাল দরবারে অধ্যাপ্যে বসিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন।

১২২২-২৫। ফ্রান্সবাসিনী বোম্ব ইন্ডোলজি কলেজ হিসাবে ইন্দোচীন ও জাপান থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেন। ১২২৩ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। দুই বৎসর কাল তিনি আচার্য লেভি ও আচার্য পেলিওর কাছে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। Association des Etudiants Hindo des France (Association of Indian Students in Paris) নামক প্রতিষ্ঠানের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক।

১২২৬। প্যারিসের সর্বোচ্চ উপাধি Docteur-ès-Lettres (State Doctorate) লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল চীন দেশে বৌদ্ধ সাহিত্য। পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক এই গবেষণা বিশেষভাবে আদৃত হয়। ১২২৬ সালেই দেশে ফিরে আসেন।

১২২৮-২৯। দৌহাকোব চর্চাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার নেপালে যান।

১২৩০-৪৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে দৌহাকোবের ব্যাখ্যা ও অর্থবাদ (১২৩৫), চর্চাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা (১২৩৮) Studies in the Tantras (১২৩৯), ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১২৩৭ সালে মাদ্রাসে অঙ্কিত হাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয়-বৃত্তি-উৎসব চতুর্থ অধিবেশনে (৬ চৈত্র ১৩৪৪, ভীষ্মগড়, বরগঞ্জ, রংপুর) সভাপতিত্ব করেন। গৌহাটিতে অঙ্কিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে (১২৩৮) বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১২৩৯ সালে রেজুনে অঙ্কিত নির্মল ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১২৪৩ সালে আলিগড়ে অঙ্কিত ভারতীয় ইতিহাস পরিষদে (Indian History Congress) প্রাচীন ভারত (৭১১ খ্রী পূর্ব) শাখার সভাপতি হন।

১২৪৪ থেকে বঙ্গীয় প্রচেষ্টায় Sino-Indian Studies নামে চীন-ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করতে থাকেন।

১২৪৫। বিশ্বভারতীয় চীনভবনে গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন।

১২৪৬। নির্মল ভারত প্রাচ্যবিজ্ঞা সম্মেলন (All India Oriental Conference) -এর নাগপুর অধিবেশনে পালি ও বৌদ্ধধর্ম শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১২৪৭। Visva-Bharati Annals নামক গবেষণা-পত্রিকার পরিচালনা করেন ও সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন। পেন্টিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন অধ্যাপক রূপে চীনদেশে যান।

১২৪৮-৫১। বিশ্বভারতীয় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আচার্য ক্ষিত্রমোহন সেনের অবসর গ্রহণের পর বিভাজন বা গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন। দারভপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Education) সেক্রেটারি বহু মন্ত্রক

—অধ্যাপক রূপে বক্তৃতা দেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হলে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯২২। শ্রীলঙ্কা বিপ্লবশক্তি পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সংঘের সমন্বয়রূপে চীনদেশে যান।

১৯২৪। বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্বাচিত হন।

অ.

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর গ্রন্থপঞ্জী

ভারত ও ইন্দোচীন। প্রকাশক শ্রীকুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃ ১০, ১০৪। বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, তাহ ১৩৫৭, বিশ্বভারতী।

সূচী: ঐতিহাসিক পটভূমিকা। ইন্দোচীনের পথে। ককোন্ডের পথে। একোন্ডের ধন্যসাবশেষ। চম্পার পথে। চম্পার ধন্যসাবশেষ।

ভারত ও মধ্য-এশিয়া। ভারতী ভবন। পৃ ১৮০, ১১০। ১২৩৭? বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, আশ্বিন ১৩৫৭, বিশ্বভারতী।

সূচী: পথঘাটের কথা। মধ্য এশিয়ার প্রান্তরভূমি। কাশগর ও খোটান। তুর্ক-হোয়াং-এর পথে। ফুচী ও অগ্নিসেপ। পরিশিষ্ট: মধ্য এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অহুসঙ্কান।

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য। ভারতী ভবন। পৃ ১৮০, ১০২। বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, মাঘ ১৩৫২, বিশ্বভারতী।

সূচী: বৌদ্ধ সাহিত্য। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। হীনযান—বৈভাসিক ও সৌভাসিক। মহাযান—নাগার্জুনের নাথাসিক ধর্ম। মহাযান যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। বজ্রযান ও সহজযান। পরিশিষ্ট: পালি বৌদ্ধ সাহিত্য। তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য। চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য। নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য। মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য। মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য। ধর্মপথ।

ভারত ও চীন। বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থ, কান্তিক ১৩৫৭, বিশ্বভারতী। পৃ ১০, ৭৮।

সূচী: মৈত্রেয় বৃত্তপাত। গুরুগুণে চীনদেশে ভারতীয় পণ্ডিত। ভারতে চীনদেশীয় পরিভ্রমক। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম। চীনদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব। চীনদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি। চীনদেশে হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান। পরিশিষ্ট: যে সব ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকা।

INDIA AND CHINA. Greater India Society Bulletin 2. Calcutta. January-February 1927. Pp 42.

Contents: The Beginning of the Historical Relation: China and India; Foreign Policy of China; Unofficial Relation; Introduction of Buddhism; Ancient Routes of Communication; Ser-Indian Intermediaries; The Tibeto-Mongol Intermediaries; Indo-China and Insulinidia; Sino-Indian Collaboration.

LE CANON BOUDDHIQUE EN CHINE LES TRADUCTEURS ET LES TRADUCTIONS. Tome I, pp lii, 436. 1927. Tome II, pp vi, 437-742. 1938. Sino-Indica Publications de L'Université de Calcutta.

An inventory of Chinese Tripitaka classified according to periods and regions. The first part is devoted to the Buddhist monasteries of the North (68-581 A.D.), the second part to those of the South (222-589. A.D.) with extensive notes on their literary activities, the life and writings of the principal missionaries. The history of penetration of Buddhism into China is given in the Introduction.

The second volume continues the history of translators and translations till 1368 A. D. It also gives an account of the non-canonical works compiled in China and Japan till the latest period, works that are of help to the study of Buddhist literature.

DEUX LEXIQUES SANSKRIT-CHINOIS : FAN YU TSA MING DE LI YEN, ET FAN YU TS' IEN TSEU WEN DE YI-TSING Tome I, pp iv, 336. 1929. Tome 2, pp. viii, 337-540. 1937. Sino-Indica Publications de l'Université de Calcutta. 'The first volume gives the text of two Sanskrit-Chinese dictionaries, the FAN YU TSA MING of Li Yen and the FAN YU TS' IEN TSEU WEN of Yi-Tsing in a facsimile reprint from Japanese wood-block editions published in the 18th century, together with a Roman transcription of the FAN YU TSA MING, accompanied by French equivalents of the words occurring in it ; the Chinese characters in this lexicon have been transcribed from a standard modern pronuciation and the Sanskrit words have been transliterated, corrections (which are numerous) being given within brackets. The second volume contains full accounts of the two works, and their authors ; and the words are submitted to orthographical, linguistic and lexicographical survey.'

KAULA-JÑĀNA-NIRŪPA AND SOME MINOR TEXTS OF THE SCHOOL OF MATSYENDRA-NĀTHA. Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta, 1934. Pp. viii, 92, 148.

Critical edition of Sanskrit texts discovered in Nepal in 1921 and 1929, with introduction and notes.

AN INTRODUCTION TO THE ADHYĀTMA-RĀMĀYAṆA. Reprinted from ADHYĀTMA-RĀMĀYAṆAM in the Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta. 1935? Pp. 78.

DOHĀKOṢA, WITH NOTES AND TRANSLATIONS. Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, Calcutta University. 1935. Pp. viii, 180. Critical edition of the DOHĀKOṢA, discovered in Nepal in 1929, in Apabhramśa language, of Tillopāda, Sarahapāda (with the Sanskrit commentary by Advayavajra), and Kṛṣṇapāda (with the Sanskrit commentary called MEKHALĀ).

DOHĀKOṢA, (APABHRAṂŚA TEXTS OF THE SAHAJAVĀNA SCHOOL). Part I, Texts and Commentaries. Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta, 1938. Pp. viii, 167.

A new edition of the book noted above ; Sanskrit paraphrase (*Chāyā*) of the texts has been added ; and notes and translations have been excluded, for inclusion in a proposed second part.

MATERIALS FOR A CRITICAL EDITION OF THE OLD BENGALI CARYĀPADAS (A COMPARATIVE STUDY OF THE TEXT AND THE TIBETAN TRANSLATION). Part I. Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol XXX, Calcutta University 1938. Pp x, 156.

'I began a study of these songs for my researches in the history of later Buddhism and I found out that it was almost impossible to interpret the songs without the help of the Tibetan texts. After a considerable fruitless search I finally succeeded in discovering the Tibetan translation of the poems...The Tibetan translation provides us with materials for the first critical edition of the Caryapadas...In the present study I have taken into consideration only the translation of the Caryapadas. I have given a literal Sanskrit rendering of the Tibetan translation with notes...' —Introduction.

STUDIES IN THE TANTRAS. Part I. Calcutta University, 1939. Pp. viii, 114.

Contents : On some Tantrik texts studied in Ancient Kambuja ; Further notes on the same ; The SANDHABHĀSĀ and SANDEĀVACANA ; On the SĀDHANAMĀLA ; On Foreign element in the Tantra ; Some technical terms of the Tantras ; Some aspects of Buddhist mysticism in the CARYĀPADAS ; Notes on the word PARĀVṚTTI ; and detailed notices on the following manuscripts : NISVĀS-TATTVASAMCĪTĪ ; SAMMOHA TANTRA ; BRAHMAVĀMĀLA ; PIṅGALĀMATA JAVADRATHAVĀMĀLA.

INDIA AND CHINA, A THOUSAND YEARS OF SINO-INDIAN CULTURAL CONTACT.

China Press, P27 Prinsep Street, Calcutta. April 1944. Second Edition, Hind Kitabs, Bombay. 1950. Pp viii, 234.

Contents : Routes to China and the First contact ; Buddhist Missionaries of India to China ; Ancient Chinese Pilgrims to India ; Appendixes (i) Some letters of Hiuan-Tsang and his Indian friends (ii) Chinese inscriptions of Bodhgaya ; Buddhism in China ; Buddhist Literature in China , Indian Art and Sciences in China ; The two Civilizations—a synthesis ; China and India ; Appendix (iii) Biographical notes on Indian scholars who worked in China.

DISCOURSES ON BUDDHISM. Reprinted from the Visva-Bharati Quarterly. February-April 1949. Visva-Bharati. [1949]. Pp 16.

'These are essentially some of the lectures delivered in Peiping in 1948 by the author as the first Visiting Professor from India to China.'

Contents : Buddhism and Ancient Indian Thought ; Buddhism—The First Popular and Theistic Religion ; Hinayāna and Mahāyāna ; Place of Buddhism in Indian Life.

INDIA AND CENTRAL ASIA. Lectures delivered at the National Council of Education, Bengal, during 1949-51 as the Hemchandra Basu Mallik Professor of Indian History. Pp viii, 184. National Council of Education, Jadavpur, Calcutta, 1955 [1956].

Contents : Nomadic Movement of Central Asia ; Tokharestan and Eastern Iran ; Eastern Turkestan—The Southern States ; Eastern Turkestan—The Northern States ; Language and Literature. Appendixes (i) Role of Central Asian Nomads in Indian History (ii) Cūlika, Śulika and Cūlika—Paisaci (iii) Kuchean or Western Arsi.

PRE-ARYAN AND PRE-DRAVIDIAN IN INDIA. By Sylvain Lévi, Jean Przyluski and Jules Bloch. Translated from French by Prabodh Chandra Bagchi. Calcutta University, 1929.

Prabodh Chandra Bagchi contributed :

Introduction, pp i-xviii

Some more Austric words in Indo-Aryan, pp xxv-xxxix

Note on Tosala and Dhauri, pp 176-78.

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতির অভিভাষণ। হাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মিলনী, মার্চ ১৯৩৭। পৃ ১৬

সভাপতির অভিভাষণ। দিব্যাবুতি উৎসব, চতুর্থ অধিবেশন, ৬ চৈত্র ১৩৪৭। ভীমের গড়, বরগড়, বঙ্গপুর। পৃ ২১

সভাপতির অভিভাষণ। বৃহত্তর বঙ্গ সাখা, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, বোড়শ অধিবেশন, গোহাটি। ১৩৪৫। পৃ ১২

Presidential Address : The Indian History Congress, Aligarh, 1943, Section 1 : Ancient India up to 711 A. D. Pp 128

Presidential Address : All India Oriental Conference, Nagpur 1946, Section : Pali and Buddhism. A reprint from the Proceedings and Transactions.

বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও প্রবন্ধসংগ্রহে মুদ্রিত রচনার দ্বিতী বঙ্গাশাখা সংকলন করিয়া ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা VISVABHARATI NEWS পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। এই পত্রে পুস্তকের তালিকাও মুদ্রিত হইয়াছে ; তাহা পরিবর্তিত আকারে এখানে প্রকাশিত হইল ; এই সংশোধিত তালিকায় পুস্তকের বিবরণ, অধ্যায়বৃত্তী ইত্যাদিও যোগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্বমুদ্রিত তালিকাত্তর কলিকাতা-পরিচায়ক ভিনখানি পুস্তক-পুস্তিকা (13-15), ও বিদ্যালয়পাঠ্য একখানি গ্রন্থ (21) বর্তমান তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীকল্যাণকুমার সরকার





উপস্থিত : বাম দিক হইতে : য়েৎনাথ সাহা, আচাৰ্ জগদীশচন্দ্ৰ, জ্ঞানচন্দ্ৰ ঘোষ

দত্তাৰ্হমান । বাম দিক হইতে : স্বেংমৰ সৰ্গ, ব্ৰীসভাভ্ৰনাৰ ব্ৰহ্ম, ব্ৰীনিখিলব্ৰতন সেন, ব্ৰীজাৰ্হভ্ৰনাৰ মুখপাণ্যাৰ্হ, ব্ৰগেভ্ৰচন্দ্ৰ নাগ



১০ ডেপুটি ১৯৬০



বিজ্ঞানসূত্র মণ্ডলমাণ্ড

১১ ডেপুটি ১৯৬০

মেঘনাদ সাহার আবিষ্কার

যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অঙ্গ মেঘনাদ সাহা রমাল সোলাইটির সভাপনে বৃত্ত হয়েছিলেন, অনেকে মনে করেন, সেই আবিষ্কারের কৃতিত্বে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিলে নোবেল পুরস্কারের মান এতটুকুও হ্রাস হত না।

এই আবিষ্কারের পরিচয় দেবার আগে কয়েকটি পূর্বকথার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানী অনেকগুলি মৌলিক পর্যায়ের সন্ধান পেয়েছেন। একটা অম্লজেন অ্যাটমের ওজন 16 ধরে বিভিন্ন মৌলিক পর্যায়ের অ্যাটম-ভার বের করা হয়েছে। ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে অ্যাটম-ভার ইন্ডাল, হাইড্রোজেনের 1, তার পর হিলিয়ামের 4, তার পরেরটার 7, তার পরেরটার 9 — এই রকম চলে গিয়ে সবচেয়ে ডারি ইউরেনিয়ামের অ্যাটম-ভার হল 238। যেখা গেল, ওইসব অ্যাটম-ভারের মধ্যে কোনো শূন্য! নেই, খানপেরালিভাবে তারা বেড়ে চলেছে। মোহলে নামে একজন বিজ্ঞানী একশ-রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন যে, পরপর অ্যাটমের মধ্যে বেশ একটা শূন্যলা আছে। বাঞ্ছিত কালের বাসবের মধ্যে ইলেক্ট্রনরা ধাক্কা দিয়ে একশ-রশ্মির সৃষ্টি করে। ঘাড়ে আঘাত করে মোহলে সেই ত্রিভিনটিকে অ্যাটম-ভারের গুরুত্ব অল্পায়ে বললে বদলে বেড়ে থাকলেন; প্রতিবার নির্গত একশ-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যাপতে রইলেন। পরপর পর্যায়গুলির অ্যাটম-ভার বেহিগেবে বেড়ে চলেছে, কোনো নিয়ম নেই; কিন্তু মোহলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে, তাদের থেকে যে, বিভিন্ন তরঙ্গ বেরুচ্ছে সেই তরঙ্গবের দৈর্ঘ্যের মধ্যে বেশ একটা শূন্যলা আছে। কিন্তু এ শূন্যলা আসবে কেন? এ কথার বাঁহাংসা হল পরে।

মোহলে মৌলিক পর্যায়গুলিকে তাদের অ্যাটম-ভারের গুরুত্ব অল্পায়ে শাঙ্কিয়ে গেলেন, ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে গেলেন 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি। অনাবিষ্কৃত কয়েকটি মৌলিক পর্যায়ের স্থান ছেড়ে দিয়ে ইউরেনিয়ামের সংখ্যা পড়ল 92। এগুলিকে বলা হল অ্যাটম-অঙ্ক। মোহলে বললেন, একটি মৌলিক পর্যায়ের প্রকৃত পরিচয় হল তার অ্যাটম-অঙ্ক, অ্যাটম-ভার নয়।

পর্যায় তো হল অ্যাটমের সহস্রী, কিন্তু অ্যাটমের মূল বস্তু নয়। প্রমাণ পাওয়া গেল, বিশেষ মূল বস্তু হল— ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, নেগন, আর সম্ভবত নিউট্রিনো। পজিট্রন, নেগন কণাকণী; নিউট্রিনো এখনও আছে খাতায়-কলমে; বাকি তিনটে হল, ইলেক্ট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। এই তিন মূল বস্তু নিয়ে অ্যাটম তৈরি। চুন স্রবকি আর ইট নিয়ে যেমন হরের রকমের বাড়ি তৈরি হয়, সেই রকম ওই তিনটি মূল বস্তু দিয়ে 92টি ত্রিভিন্ন রকমের অ্যাটম গঠিত।

যে নেওগা হল যে, একটা অ্যাটমের দুটো অংশ আছে, কেন্দ্রক ও বাহির। অ্যাটমকে তো মাছের চোখে দেখতে যায় না, কিন্তু দৃষ্টির অগোচর এই অ্যাটম তার ভিতরের আর বাইরের কোনো খবরই মাছের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

বাহিরের কথার আসা দাক।

অ্যাটমের বাইরে আছে শুধু ইলেক্ট্রন, আর কিছু নেই; আর প্রতি অ্যাটমেই তাই আছে। কিন্তু ক'টা করে ইলেক্ট্রন আছে? এখানে হিসেবটা ডারি সোজা। আবাবের মনে রাখতে হবে গোটা অ্যাটমটি তড়িৎশূন্য। সেই অ্যাটমের অ্যাটম-অঙ্ক যত, তার বাইরের ইলেক্ট্রন-সংখ্যা তত। একটা

উদাহরণ নেওয়া যাক। সোনার আটম-অর হল ৭৭। আমাদের হিসেবে পাড়াল, সোনার একটা আটমের বাইরে আছে ৭৭টা ইলেক্ট্রন।

একটা আটমের চিত্রটা বোটাটুটাবে একবার দেখা যাক। প্রথম হাইড্রোজেন। এর বাইরে একটা ইলেক্ট্রন আছে, কেন্দ্রকে আছে প্রোটন। কেন্দ্রের এই প্রোটন থেকে ইলেক্ট্রনটি কত দূরে আছে? স্কয়ারকোর্ড আশুফা-নন্দি পাঠিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে তার একটা আভাস দিলেন। আগে অনেক পরীক্ষা থেকে সমস্ত আটমটার ব্যাসের একটা হিসেব পাওয়া গিয়েছিল। এখন দেখা গেল, কেন্দ্রকে ওই প্রোটনের ব্যাস সমস্ত আটমটার ব্যাসের প্রায় লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র, বাকিটা একেবারে খালি পড়ে রয়েছে।

একটা আটমের রাসায়নিক ধর্ম আর তার বর্ণালি বোটাটুটাবে নির্ভর করে বাইরে ইলেক্ট্রন-সংখ্যা কত তার উপর। অত্যধিক উচ্চতায়, উচ্চ বিভবের তড়িৎপ্রবোণে, নিকটে এক্স-রশ্মি বা তেজস্বিয় পদার্থ আনলে বাইরের ইলেক্ট্রন বেরিয়ে যায়।

যেমনটা সাহা অর করে বের করলেন, কত উচ্চতায় একটা আটম থেকে তার ইলেক্ট্রনকে ভাঙানো যেতে পারে। একটা আটম থেকে যখন তার বাইরের ইলেক্ট্রন চলে যায় তখন ইলেক্ট্রন-বর্জিত এই আটমের বর্ণালি গোট। আটমের বর্ণালির সনান হয় না। সূর্যের বর্ণালিতে কতকগুলি বৌলিক পদার্থের ক্ষত্র তাদের নির্দিষ্ট রেখা দেখা যায়, কিন্তু অপর পদার্থজনিত রেখা পাওয়া যায় না। এর সঠিক কারণ আগে জানা ছিল না। সাহা'র গণনা থেকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা বীনাংসা হল। আনা গেল, সূর্যের যে উত্তাপ সে উত্তাপে সূর্যস্থিত ওই বৌলিক পদার্থগুলি তাদের বাইরের ইলেক্ট্রন হারিয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালিতে কোন্ কোন্ রেখা লোপ পেয়েছে দেখে সাহা তাঁর হিসেব দিয়ে ওই-সকল নক্ষত্রের উচ্চতা নিরূপণ করলেন। তিনি নক্ষত্রগুলিকে তাদের উচ্চতা অল্পগারে ছ'টি বিভিন্ন মলে ভাগ করলেন। আগে স্ফোতিবিশেষ নক্ষত্রগুলিকে তাদের উচ্চতা অল্পগারে ছ'টি মলে ভাগ করেছিলেন; তাদের সে বিভাগ ও সাহা'র বিভাগ একেবারে মিলে গেল। আর-একটা কথা এস। সূর্যের চেয়ে সূর্য-কলকের উচ্চতা কম। সাহা হিসেবে দেখালেন যে, সূর্যকলকের কম উচ্চতায় কয়েকটি বৌলিক পদার্থ তাদের বাইরের ইলেক্ট্রন হারা'নি, স্বতরাং সূর্যকলকের বর্ণালিতে তাদের নির্দিষ্ট রেখা পাওয়া যাবে। সাহা'র এ কথাটা ঘাটাই হল। রাউট উইলসন মাননবিরের বড়ো দূরবীন দিয়ে স্ফোতিবিশ্ব রাসেল সূর্য-কলকের বর্ণালিতে ওইসব রেখা দেখতে পেলেন। একটা আটমের বাইরের অংশ লুপ্তে বিজ্ঞানী যে চিত্র এতদিন কল্পনা করে আসছিলেন, সাহা'র গবেষণা তাকে সত্যনি করল।

যেমনটা সাহা স্ফোতিবিজ্ঞান একটা নতুন দিক বুলে দিলেন।

শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিণত বয়সে পৌছবার আগেই অবসর নিতে হয়েছিল শারীরিক অসুস্থতার রক্তে। তিনি যখন 'ছুটি নিয়ে দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন তখন আদর্য্য সকলেই আশা করেছিলেন যে, একটানা কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে নীরোগ হয়ে তিনি ফিরে আসবেন। কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন একটু ভালোও ছিলেন। হুতরাং ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিকেলবেলা যখন টেলিফোনে খবর এল যে, বিজ্ঞানবাবু শেষ নিঃশ্বাস ফেলে মহাপ্রস্থান পথে চলে গেছেন তখন আদর্য্যের সকলেরই মনটা কেমন যেন বিকল হয়ে গেল। আদর্য্য ক'জন তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুকাল কাঁচ করবার স্বযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর নিকটসামিথ্য লাভ করেছিলেন, সেইজন্তে তাঁর মৃত্যু আদর্য্যের কাছে যেন একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি বলেই মনে হল।

১৮৯১ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে বিজ্ঞানকুমারের জন্ম হয় নবদ্বীপ অঞ্চলের এক ন্যাবিত গৃহস্থের ঘরে। তাঁর পিতা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন কিন্তু তিনি কাঁচ করতেন হগলী জেলা-আদালতে। সেইজন্তে বিজ্ঞানকুমারের বাস্যাশিক্ষা হয়েছিল হগলীতে। পরে তিনি কলকাতায় পড়তে আসেন। ইতিহাসচর্চা করেছিলেন এবং ইতিহাসেই এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। একে একে বি. এল. এবং এম. এল. পরীক্ষার তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। তিনি অসামান্য গবেষণা-বৃত্তিও লাভ করেছিলেন।

১৯১৪ সালের ২ জানুয়ারি তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ডাক্তি হয়েছিলেন। ওকালতি ব্যবসাতে ছোকরা উকিলের দম্ভভূট করা যে কি কঠিন কাজ তা যিনি না ভুগেছেন তিনি সহজে বুঝবেন না। দিনের পর দিন আদালতে ধাঁওরা এবং রিক্‌হস্টে ফিরে আসা এক মর্মান্তিক ব্যাপার। আশায় আশায় কিছু দিন চলে, কিন্তু শেষে যেন মন দুর্বল হয়ে ভেঙে আসে। ঠিক সেই সুস্থিকণে যদি কবিতা ফিলে তবেই সে উত্তরে গেল। এই মর্ম্মভগ্ন কষ্টের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানকুমারকেও যেতে হয়েছিল। যখন আর চলছিল না তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে বিহারে গিয়ে ওকালতি করবার জন্তে মনকে প্রস্তুত করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণগত মনবী স্রাব আন্তর্য্যে মুখোপাধ্যায়ের নম্বর পড়েছিল এই মেধাবী কৃতবিদ্য ছাত্রটির 'পরে। তিনি বিজ্ঞান-কুমারকে বিনবিভাগের আইন কলেজের একটি অধ্যাপকের পদ দান করলেন। বিজ্ঞানকুমারের জীবনরথের চাকা ঘুরল। হঠাৎ একদিনে নয়, দিনে দিনে অরাস্ত পরিভ্রম করে তিনি ব্যবসারে উন্নতি করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবগতির ঠাঁকে ঠাঁকে অধ্যয়ন করে তিনি ডি. এল. উপাধি লাভ করলেন। এই সময়ে তিনি 'এ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা তাঁর পরিণত বয়সে খুব কাজে এগেছিল। আইন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এবং হাতে কলমে ওকালতি করে যে অভিজ্ঞতা গুণ করেছিলেন তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর আইন-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মিতার স্বন্দর সংমিশ্রণ হয়েছিল। তাঁর বাগ্মিতায় পুলিশ কোর্টের কিংবা সেশন্স আদালতের বিয়েটারি চট ছিল না। তাঁর ভাষার এবং বলবার ধরনে একটা কমনীয়তা ছিল। কখনো তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল অরেষের কাছে এবং তাঁর চেয়েও কঠিন যে ঠাই সেই উকিল-বহলে। ১৯৩৪ সালে তিনি ছোট সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হলেন এবং দু বছরের

মধ্যে বড় সরকারী উকিলও হয়েছিলেন। তার পর যা হওয়া উচিত তাই হল। তিনি ১৯০৬ সালে মহামাত্র কলিকাতা উচ্চ আদালতের জজ হলেন।

বিদ্রোহের ওকালতি ব্যবসাতে খুব বড় হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে তিনি আরো মহীয়ান হয়েছিলেন। কোমল স্বভাবে এবং মধুর বাক্যালাপে তিনি সকলের মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেহাত ছোকায়া উকিলও তাঁর ঘরে নির্ভয়ে সওয়াপ জবাব করে খুশি হয়ে ফিরে আসত। তাঁর সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে একসঙ্গে বেঞ্চে বসবার সুযোগ আমার হয়েছিল— তাঁর ব্যবহারের গৌরব ও ভাষার অমায়িকতার সাক্ষ্য আমি নিতে পারি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

১৯৪৭ সালে যে সীমানা-কমিশন বসেছিল বিদ্রোহবাবু তার একজন সভ্য হয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁকে পাতাব ও পূর্ববঙ্গের ভাগবাটোয়ারার কাষ করতে হয়েছিল। পর বৎসরই তিনি ও স্বেচ্ছা মেহেরচন্দ মহাশয় তখনকার দিনের কেডারেল কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। কর্তব্যের ডাকে তাঁকে কলকাতা ছেড়ে, নিজের একমাত্র পুত্রকে সেখানে রেখে দিল্লী চলে আসতে হয়েছিল। তার পর আমাদের স্বপ্নীয় কোর্টের জজ হলেন এবং শ্রীযুত মেহেরচন্দ মহাশয় সাহেব ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ সালে অবসর নিতে বিদ্রোহবাবু তারতের সর্বোচ্চ জায়াধিকারের মূল্য দায়ী হওয়ায় আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই শারীরিক অসুস্থতার দ্বারা তাঁকে ছুটি নিতে এবং কিছুদিন পরে অকালে অবসর নিতে হয়েছিল। স্বপ্নীয় কোর্টের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর বিখ্যাত টেগোর ল লেকচার লিখেছিলেন হিন্দু দেবোত্তর আইন সম্বন্ধে।

ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে তিনি গভীর ব্যবহারজ্ঞান, সুস্থ বিরোধপন্থিত এবং অপক্ষপাত সত্যপরতার উচ্চ আদর্শ অদ্বৈত উজ্জলভাবে রক্ষা করে গেছেন। গুরুদেবের বাণী “অস্তাধ যে করে আর অস্তাই যে সবে, তব ছাড়া যেন তারে কৃপসব ধরে” বিদ্রোহবাবুর অস্বাভাবিক স্বাধীন মূর্তি হয়ে উঠেছিল। যে-সকল দায় তিনি লিখে গেছেন তার মধ্যে একটা নির্ভীক অথচ সংযত ন্যূনত। সেখানে পাণ্ডুরা দায়। শুধু কতকগুলি পুরোনো নজিরের নাল। তিনি গেছে বান নি। তিনি আইনের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ ক’রে তাকে বিশ্লেষণ ক’রে তার সারমর্মটুকু অসহকরণীয় প্রাণল ভাষায় লিখে রেখে গেছেন একাল এবং পরবর্তী কালের সম্মতে। তিনি এর হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের এবং স্বপ্নীয় কোর্টের ঐতিহ্যকে উজ্জল করে গেছেন।

বিদ্রোহবাবুর কর্মক্ষেত্র শুধু আইন-আদালতেই আবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এটা বোধ হয় তাঁর শিশুস্বের কাছ থেকে পাওয়া, তিনিও বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। যহ ও রাজ্যাবস্থা তিনি সংস্কৃতে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যের সঙ্গে তিনি ভরপুর ছিলেন। যেমন অনর্গল আত্মিক করে যেতে পারতেন গুরুদেবের কাব্যগ্রন্থ থেকে, তেমনি অনায়াসে বলতে পারতেন কালিদাস ও ভবভূতি থেকে। ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁর অস্বাভাবিক লক্ষ্য করেছি। বৈষ্ণব সাহিত্য, নবদ্বীপের লোকের ভো রক্তমাংসই মিশিয়ে থাকে। তিনি সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং “সরস্বতী” উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভ্য হয়েছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ক্যাকালার্সও সভ্য ছিলেন।

তাঁর পারিবারিক জীবন কঠোর সংযমের মধ্যেই কেটেছে। যৌবনেই তাঁর স্ত্রীবিবাহ গটে। একমাত্র শিশুপুত্র রেখে তাঁর সন্তানহীন ইহলোক থেকে চলে যান—বিদ্রোহবাবুর বয়স তখন জিনের কোঠায়।

জনেছি শিশুপুত্রের কথা অরণ করে তাঁর পত্নী তাঁকে অশ্রুরোপ করেছিলেন যে, শিশুটি যেন বিবাতার কাছে কষ্ট না পায়। সে অশ্রুরোপ বিজ্ঞানকুমার আত্মীয় বন্ধু করে গেছেন, শিশুপুত্রের মা বাবার কাছ একাধারে গালন করে।

বিজ্ঞানকুমার নির্ভাবান ভ্রামণের সর্বগুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সংযম, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা ছিল। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে—সেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে তাঁর উন্নত চরিত্রের অস্বাভাবিক পবিত্রতার পরিচয়ে। একাদিক লোকের মুখে শুনেছি—“বিজ্ঞানবাবুর কাছে দু-দু-বসে কথা শুনে এনে মনে হয় গভীরতায় করে পবিত্র হয়ে কিরে এলার।” বাহুব বাহুবকে এর চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা কী আর জানাতে পারে?

বিজ্ঞানবাবুর মৃত্যুতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হল। আর্য সাধারণ, গভীর-শাস্ত্রজ্ঞানী, আনন্দিক স্বভাব—যে ভারবই তাঁকে দেখি না কেন, দেশে ও সমাজে, ক্ষুদ্র স্বান ক্ষুদ্র-পুত্র হবার নয়। আর, আমরা যারা তাঁর সাহচর্য পেয়ে খত হয়েছি, তাঁর স্বপ্নবোধ-ভ্রামণ নিয়েছি ও তাঁকে আমাদের স্বপ্নবোধ-ভ্রামণ করেছি, আমরা হারালাম আত্মবোধ অর্থাৎ শুদ্ধমান-মর্ত্তীপক্ষে, স্বভাবভাজন দেহকে আর পরম প্রেমাস্পদ স্বপ্নকে—আমাদের ক্ষতি কেমনামিনিই পূরণ করা যায় না।

ঐশ্বর্যবীরজন দাস

চিত্রপরিচয়

পৃ. ৩২

আচার্য দিলীপ্য লেভি যখন বিবাতারতীতে-অধ্যাপনাকর্মে যোগ দেন (১৯২১) সেই সময় প্রবোধচন্দ্র বাগচী ভূমি হাজির। তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন; তাঁরই—বাগ্‌প্রতিশ্রুতি-একটি তাঁরই সহকারী-রূপে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে অকস্মেৎ প্রবোধচন্দ্র প্যারিসে যান তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করতে—ছবিটি সেই সময়কার (১৪ এপ্রিল ১৯২৩)। প্যারিস থেকে ভারতবর্ষে আবার প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পূর্বে (১৯২৩) প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Indian Civilization বা ভারত-সংস্কৃতি-পরিষদ সংগঠনে অধ্যাপক লেভিকে সাহায্য করার জার তিনি গ্রহণ করেন। প্রত্যাত যুবী ভক্তির নিরহনপ্রসাদ চন্দ্রবর্তী (যিনি পরে Archaeological Survey of India-র সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন) এবং ডক্টর প্রবোধচন্দ্র যুথোপাধ্যায়কে তিনি এই পরিচয়ের কাজে আকর্ষণ করেছিলেন—চিত্রে ঐক্যবলে উপস্থিত আচার্য-লেভির ব্যাকরণে দক্ষিণে ও বামে এঁদের স্রোতা বাহু; নিরহনপ্রসাদের দক্ষিণে প্রবোধচন্দ্র। চিত্রে যে দিল্লী মহিলাকে (Mamle N. Tchoonpak ক্রীতী চূপাক) দেখা যাচ্ছে, তিনি

পোলাণ্ডের অধিবাসী, সংস্কৃত ভাষায় বিদ্বৎ—বংকাল তিনি উক্ত ইনস্টিটিউটের সম্পাদিকার কার্য নিৰ্বাহ করেছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র দেশে গিয়ে এসে Indo-Latin Societyর কাছে তাঁকে পেয়েছি, সুবোধচন্দ্রও এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়কৃত ফরাসী সংস্কৃতি-চর্চার প্রসারে তাঁর সহযোগী ছিলেন। শেষে যখন *Oriental India Society* বা প্রথম ভারত পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করি তখন পরিবহ-প্রকাশিত একাদশ্য তিনি *China and India* নামে একটি পুস্তিকাঙ্কুরের ব্যবহার কল সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। পরিবহের উদ্যোগে অল্পকিছু বিভিন্ন সভায় তৈরিক বৌদ্ধধর্ম, ইন্দো-চীন, চীন ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগ প্রভৃতি বিষয় বক্তৃতা করে পরিবহ-স্থাপনায় উদ্বুদ্ধকে তিনি সার্থক করেছিলেন। এট সংশ্লিষ্ট চিত্রপরিচয় লিপিতে দিয়ে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের সেই সহযোগের নানা মধুর স্মৃতি মনে পড়ছে।

ঐকালিদাস নাগ

পৃ ৩৩৩

ভারতকে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাদীন আদম লাভ করবে অগণীশচন্দ্রের অধ্যয়নের পূর্বে তা একত্বপ কল্পনার অতীত ছিল—আধুনিক বিজ্ঞানের দীপ্যগিতে ভারতবাসী তিনিই প্রথম ভারতের দীপ্যগি উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। তারপর দীপ থেকে দীপমালা স্ফালকিত হয়ে চলল অগণীশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রের চাত্রদ্বারের সাধনায়। এই সময়কালের মধ্যে বীজ্য প্রবাস, আচার্যপরিষদে তাদের কর্মক্ষেত্র অনেক ছবি এই চিত্রে সংগঠিত হয়েছে।

নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ—আচার্য অগণীশচন্দ্র বহু বৈজ্ঞানিক ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার করে কিনা তাতে বার্তা প্রেরণের স্বচন্য করলেন। নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ আশ্রয় কালে সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন। বহু-বিজ্ঞান-বন্ধির প্রতিষ্ঠিত হলে আচার্যের বহু-বিজ্ঞান-মন্ডিরে তাঁর সহকারী পরিচালকরূপে গ্রহণ করেন।

সিরেবেঞ্জামোহন বসু—বিজ্ঞান কলেজে প্রবর্তী যৌব অধ্যাপক পরে পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। আচার্য অগণীশচন্দ্রের সেহাবাসনের পর হতে এমন অবধি তিনি বহু-বিজ্ঞান-মন্ডিরের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পণ্ডিত করেছেন।

ঐক্যোৎসাহক বহু মেথনাব নাগ, ঐক্যনন্দ যোষ, ঐক্যনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐক্যবিলম্বজন সেন—একই বছর এই কলকাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করে নিম্ন নিম্ন বিষয়ে মৌলিক ব্যবস্থার রত হলেন, আর তাদের যাবিবিধা ভারতকে অগণ্যতার এক উন্নীত আদম দান করল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এরকমটি আর কোনদিন দেখা যায় নি।

মেহমদ মত—এমন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এন্স সি উপাধি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ্যবিদ্যার অবদান করেন। পরে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ঐক্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়